প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

অষ্টম পুনর্মুদ্রণ : জুন, 2015

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ভূগোল **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায় : EGR 02 : 1 & 2

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	ড. সুনীতা চন্দ্র (রায়)	ড. আশীষ কুমার সেন
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়	ঐ
একক 4	ড. আশীষ কুমার সেন	ড. অনীশ চট্টোপাধ্যায়
একক 5	ঐ	ঐ
একক 6	অধ্যাপিকা শুভমিতা চৌধুরী	ঐ
একক 7	ঐ	ঐ
একক 8	ড. আশীষ কুমার সেন	ঐ
একক 9	ড. আশীষ কুমার সেন	ড. অনীশ কুমার চট্টোপাধ্যায়
একক 10	ঐ	ঐ
একক 11	অধ্যাপিকা অলকা রায়	ঐ
একক 12	ঐ	ঐ
একক 13	অধ্যাপিকা শুভমিতা চৌধুরী	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EGR – 02

ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
1

একক 1	আবহবিকার ও পুঞ্জিত ক্ষয়	7-34
একক 2	চক্রীয় ও অচক্রীয় মতবাদ : ডেভিস, পেঙ্ক ও হ্যাকের তত্ত্ব	35-51
একক 3	নদীর কার্য ও উদ্ভূত ভূমিরূপ	52-83
একক 4	হিমবাহ ও নদী-হিমবাহের যৌথ প্রক্রিয়া	84-108
একক 5	বায়ুর কার্য	109-140
একক 6	উপকূল অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনের প্রক্রিয়া ও উদ্ভূত ভূমিরূপ	141-173
একক 7	কার্স্ট অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপের উদ্ভব	174-196
একক 8	চালের উদ্ভব ও ঢাল বিকাশের তত্ত্ব	197-223

পর্যায়
2

একক 9	জলচক্র—ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা, বিভিন্ন অংশ ও গুরুত্ব	227-247
একক 10	ভৌমজলের প্রকার, নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ ও ভৌমজলের পরিচলন ও প্রবাহ	248-267
একক 11	মহাসাগর তলের ভূপ্রকৃতি	268-303
একক 12	মহীসোপান ও মহীঢাল	304-325
একক 13	সামুদ্রিক অবক্ষেপণ ও সামুদ্রিক সম্পদ	326-343

একক 1 ❑ আবহবিকার ও পুঞ্জিত ক্ষয়

গঠন

A. আবহবিকার

1.1 প্রস্তাবনা

1.2 উদ্দেশ্য

1.3 আবহবিকারের সংজ্ঞা

1.4 আবহবিকারের নিয়ন্ত্রকসমূহ

1.5 আবহবিকারের প্রকারভেদ

1.5.1 যান্ত্রিক বা ভৌত আবহবিকার

1.5.2 রাসায়নিক আবহবিকার

1.5.3 জৈবিক আবহবিকার

1.6 ভূমিরূপের উপর আবহবিকারের প্রভাব

1.6.1 যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রভাব

1.6.2 রাসায়নিক আবহবিকারের প্রভাব

1.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1.8 উত্তরমালা

B. পুঞ্জিত ক্ষয়

1.9 পুঞ্জিত ক্ষয়ের সংজ্ঞা

1.10 পুঞ্জিত ক্ষয়ের সহায়ক বা প্রভাবক কারণ সমূহ

1.11 পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ

1.11.1 গতির শ্রেণীবিভাগ

1.11.2 শার্পের শ্রেণীবিভাগ

1.12 ভূমিরূপের উপর পুঞ্জিত ক্ষয়ের প্রভাব

1.13 মানুষের জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর পুঞ্জিত ক্ষয়ের প্রভাব

1.14 সারাংশ

1.15 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1.16 উত্তরমালা

A. আবহবিকার

1.1 প্রস্তাবনা

এর আগের এককে আপনি শিলার উদ্ভব, গঠন এবং বিভিন্ন ধরনের ভাঁজ বা বলি, চ্যুতি প্রভৃতি ভূ-আভ্যন্তরীণ শিলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। এই এককে আমরা শিলার উপরে ভূ-বহিস্থঃ শক্তির যেমন, তাপ, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস এমন কি উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের প্রভাব জানব। বস্তুত ভূ-পৃষ্ঠের উপরে কোন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে শিলাকে প্রভাবিত করে। যেমন উষ্ণ মরু-পরিবেশে শিলার মধ্যে তাপের প্রভাবের প্রসারণ ও সঙ্কোচন ঘটে। আবার কোন কোন শিলা অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতির সাথে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে নিজেকে দুর্বল করে তোলে। এইভাবে ভূ-পৃষ্ঠে শিলার দুর্বলতা, তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সাপেক্ষে একদিকে যেমন ঝড়, তেমনি এই দুর্বল শিলার উপরে নানান প্রাকৃতিক শক্তি নানান ধরনের ভূমিরূপ সহজে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। তাই পৃথিবীর কোথায় কোন ভূ-প্রাকৃতিক শক্তি কি ধরনের ভূমিরূপ গড়ে তুলতে পারে, তা বুঝতে হলে সেই জায়গায় শিলার উপরে আবহবিকারের প্রভাব জানতে হবে।

1.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- আবহবিকার কি তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন।
- আবহবিকার কিভাবে ঘটে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবহবিকার কত রকম তা জনতে পারবেন।
- পৃথিবীর কোথায় কোথায় কি কি প্রকার অবহবিকার ঘটে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- আবহবিকারের ফলে কি কি ভূমিরূপ গঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোন কোন শিলায় কি কি আবহবিকার ঘটে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

1.3 আবহবিকার কি ?

আবহবিকার কথাটি 'আবহাওয়া' থেকে এসেছে। আবহাওয়ার নানা উপাদান যেমন বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, প্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহের যে ক্ষয় বা পরিবর্তন হয়, তাকেই আবহবিকার (weathering) বলে। এর আর এক নাম বিচূর্ণীভবন কারণ এই প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই ক্ষয় প্রক্রিয়া কিন্তু একই স্থানে সম্পন্ন হয়। যদি এই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি কোন গতিশীল মাধ্যম দ্বারা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে তাকে ক্ষয়ীভবন (erosion) বলে। থর্নবেরি (Thornbury) আবহবিকার সম্বন্ধে বলেছেন Weathering may be defined as the disintegration or decomposition of rock in place''। অর্থাৎ একই

স্থানে কোন শিলার বিচূর্ণভবন বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত ও পরিবর্তিত (শিলার মধ্যস্থ খনিজ পদার্থগুলি) হয়, তখন তাকে আবহবিকার বলে।

1.4 আবহবিকারের নিয়ন্ত্রকসমূহ (Controlling factors of weathering) :

শিলার মধ্যস্থ খনিজ পদার্থ (minerals) রাসায়নিক সংযুক্তি Chemical composition), গ্রথন (texture), গঠন (structure), জলবায়ু (climatic conditions) ও সময়ের ব্যাপ্তি (span of time) আবহবিকারের হার (rate), প্রকার (type) ও পরিমাণ (amount) নির্ণয় করে।

A. শিলাস্থ খনিজের রাসায়নিক সংযুক্তির প্রভাব— সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় যে গাঢ় রঙের (ক্ষারকীয় প্রকৃতির) খনিজগুলি রাসায়নিক আবহবিকারের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়। কোয়ার্টজাইট (বালি), বেলেপাথর (sandstone) শ্লেট প্রভৃতি শিলা রাসায়নিক অবহবিকার দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয় না।

B. শিলা গ্রথনের প্রভাব— সাধারণভাবে সূক্ষ্মদানাবিশিষ্ট শিলার বেশী তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার কথা, কারণ সমগ্রভাবে দানার পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল বাড়ে এবং বেশী স্থান (area) আবহবিকারের সম্মুখীন (exposed to surface for weathering) হয় বলে আবহবিকার বেশী হয়। কিন্তু শিলার অন্যান্য অবস্থায় বিপরীত ফল হতে পারে। যেমন, একটি শিলার মধ্যে অনেক ধরনের খনিজপদার্থ থাকে এবং এক একটি আবহবিকার প্রাপ্তির হার এক রকম। সেই হেতু কিছু খনিজ অন্যান্য খনিজের তুলনায় আগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে (**বিশেষতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার**) মূল শিলা থেকে আলগা হয়ে খসে পড়ে যায়। এইভাবে স্থূল দানাবিশিষ্ট শিলা সূক্ষ্মদানাবিশিষ্ট শিলা থেকে আগেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

C. শিলা গঠনের প্রভাব— শিলার দারণ (joints), শিলার স্তরায়ণ তল (stratification), পত্রায়ণ (lamination) ইত্যাদি শিলার মধ্যে জলের প্রবেশে সহায়তা করে। এতে রাসায়নিক আবহবিকারের ফলে ফাটলগুলি বেড়ে গিয়ে অবশেষে শিলাকে খণ্ডিত করে।

এইভাবেই গ্রানাইট শিলায় গোলাকার আবহবিকার (spheroidal weathering) এবং শুল্কমোচন (exfoliation) হয়।

বেসল্ট বহুভূজাকৃতি (বিশেষত ষড়ভূজাকৃতি — **hexagonal) উলম্ব** দারণের (vertical or columnar joints) সৃষ্টি হয়ে আবহবিকারে সাহায্য করে। আবার ফাটলযুক্ত চুনাপাথরেও সহজে জল প্রবেশ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

D. জলবায়ুর প্রভাব — আবহবিকারের হার (rate) ও প্রকৃতি (nature) কোন অঞ্চলের জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্মণীয়—

(i) ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে রাসায়নিক আবহবিকার বেশী ঘটে কারণ বৃষ্টিহীন পাঁচ বা ছয় মাস ব্যপী কালে কৌশিক প্রক্রিয়য় (capillary action) মাটির নীচের স্তরের রাসায়নিক দ্রবণ ওপরে উঠে আসে। আবার, বৃষ্টিপাতের পর জল মাটির তলায় প্রবেশ করে (ভৌমজল), ধৌত প্রক্রিয়ায় (leaching action) রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে অনেক ক্ষেত্রে ল্যাটেরাইট (laterite) মাটি সৃষ্টি করে।

কোন অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তনও আবহবিকারের প্রকারভেদের সহায়ক।

(ii) শীতল নাতিশীতোষ্ণ (সরলবর্গীয়) অঞ্চলে গাছের পাতা পচে হিউমিক এসিডের (humic acid) সৃষ্টি হয় বলে রাসায়নিক আবহবিকার বেশী হয়।

(iii) উপরোক্ত অঞ্চল থেকে তুন্দ্রা অঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক আবহবিকার কমতে থাকে।

(iv) মেরু অঞ্চলে (Polar regions) তুষারক্ষেত্রের মাঝখানে নূনাটিক (nunatak) মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সেগুলির গায়ে তুষারের সাহায্যে রাসায়নিক আবহবিকার সম্পন্ন হয়।

(v) উষ্ণ মরু অঞ্চলে দিন ও রাতের উষ্ণতার তারতম্যের (difference in diurnal temperature) জন্য যান্ত্রিক আবহবিকার (mechanical or physical weathering) বেশী ঘটে।

(vi) অর্ধ মেরু অঞ্চলে যান্ত্রিক আবহবিকার বেশী পরিমাণে হলেও স্বল্প আর্দ্র জলবায়ুর জন্য রাসায়নিক আবহবিকারেও ঘটে।

(vii) শীতল পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টির জল শিলার ফাটলে প্রবেশ করে এবং তা রাতে আবহাওয়ায় তাপমাত্রা কমলে বরফে পরিণত হয়। বরফের আয়তন জলের তুলনায় বেশী বলে সেটি চারপাশের শিলাকে চাপ (pressure) দেয় ও অবশেষে শিলাকে ভাঙ্গাতে সাহায্য করে। সুতরাং এখানে যান্ত্রিক আবহবিকার প্রাধান্য লাভ করে।

E. সময়ের ব্যাপ্তির প্রভাব (Effect of time period) — সাধারণভাবে যত দীর্ঘকাল ধরে একটি অঞ্চল আবহবিকারে প্রভাবিত হয় তত বেশী সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অথচ ডেভিসের মত অন্যান্য ভূমিরূপবিদেরাও মনে করেন যে যতক্ষণ না এই আবহবিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলি কোন মাধ্যমের সাহায্যে অপসারিত না হয়, সেই পদার্থগুলি একটি রক্ষণশীল আস্তরণ (Protective layer) হিসাবে তার তলার শিলাকে আবহবিকারের হাত থেকে বাঁচায়। এটি অবশ্য যান্ত্রিক আবহবিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অপর দিকে, যেহেতু জল মাটি বা শিলাস্তরের অনেক নীচে পর্যন্ত চুঁইয়ে যেতে সক্ষম হয়, তাই ওপরে আবহবিকারপ্রাপ্ত পদার্থসমূহের উপস্থিতিতেও, শিলার নীচের স্তরে রাসায়নিক আবহবিকার **অব্যাহত** থাকে।

F. জৈবিক নিয়ন্ত্রক — সাধারণভাবে বলা যায় যে কোন অঞ্চলের আবহবিকার সেখানকার উদ্ভিদ আচ্ছাদনের ওপর নির্ভর করে। যেমন, আদ্র ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চলে উদ্ভিদের ঘন আবরণ মাটির স্তরকে ধৌত হতে নিবারণ করে। আবার মাটির ওপর সঞ্চিত জৈব পদার্থ (পচাপাতা ইত্যাদি) উদ্ভূত জৈব অ্যাসিড চিলেশন প্রক্রিয়ায় (Chelation) কিছু শিলায় খনিজ পদার্থের (বিশেষতঃ লোহার) স্থানান্তরে সহায়তা করে।

G. ভূমিরূপের প্রভাব— ভূমির মৃদু ঢালে নির্মোচনের হার কম এবং খাড়া ঢালে বেশী হয়। আবার, ভূপৃষ্ঠ যদি দীর্ঘকাল ধরে সুস্থির অবস্থায় থাকে তার ওপর আবহবিকার পর্যাপ্ত কার্যসাধন করে এবং গভীর আস্তরণ (আবহবিকার প্রাপ্ত পদার্থের) তৈরী করতে সক্ষম হয়।

আবার, উচ্চভূমি থেকে সহজেই জল নিষ্কাশিত হতে পারে, কিন্তু নিম্নভূমিতে জল জমার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

1.5 আবহবিকারের প্রকারভেদ

ভৌতিক (Physical) রাসায়নিক (Chemical) ও জৈব-রাসায়নিক (bio-chemical) মূলতঃ এই তিনটি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে ভূপৃষ্ঠে আবহবিকার ঘটে। অনেক সময় একাধিক প্রক্রিয়া একসঙ্গে কাজ করে বলে আবহবিকার একটি জটিল প্রক্রিয়া হিসাবে পরিচিত। যাই হোক, সাধারণভাবে আমরা আবহবিকারকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে থাকি—(A) যান্ত্রিক আবহবিকার (Physical or Mechanical weatheirng), (B) রাসায়নিক আবহবিকার (Chemical weathering) এবং (C) জৈব—আবহবিকার (Biological weathering)। প্রতিটি শ্রেণীকে আবার উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয় (প্রক্রিয়ার তারতম্যের ভিত্তিতে)।

1.5.1. (A) যান্ত্রিক বা ভৌত আবহবিকার (Mechanical weathering)

যে আবহবিকারের শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন না ঘটে শুধু বিচূর্ণীভবন ঘটে, তাকে যান্ত্রিক বা ভৌত

আবহবিকার বলে। ''The disintegration of rock without chemical change is referred to as mechanical or physical weathering.''

এই প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে যেমন, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্য, আদ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতি শিলাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে।

1. যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ (Different processess of mechnanical weathering) :

যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রক্রিয়াকে সাধারণতঃ 9টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(a) **তাপজনিত (উষ্ণতার পার্থক্য) শিলার প্রসারণ ও সংকোচন—**

দিনের বেলা উত্তাপে শিলা প্রসারিত হয় ও রাতে তাপ হ্রাস পেলে শিলা সংকোচিত হয়। ঠিক তেমনি গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে একই প্রক্রিয়া ঘটে। ফলে শিলাটি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে এই ধরনের যান্ত্রিক আবহবিকার হয়ে থাকে—

(i) প্রস্তরচাঁই বিচ্ছিন্নকরণ বা খণ্ডীকরণ (Block disintegration) — এটি বিশেষতঃ মরু অঞ্চলে বেশী হয়। যেহেতু শিলা তাপের কু-পরিবাহী (a poor conductor of heat), সেইজন্য ওপরের অংশের থেকে নীচের অংশ কম উত্তপ্ত থাকে এবং কম প্রসারিত হয়। এর ফলে শিলার মধ্যে পীড়নের (stress) সৃষ্টি হয় এবং শিলাস্তরের মাঝখানে সমান্তরালভাবে ফাটলের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ওপরের শিলাস্তরটি নীচের স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। (চিত্র 1.1)।

চিত্র 1.1 : প্রস্তরচাঁই বিচ্ছিন্নকরণ

(ii) ক্ষুদ্রকণা বিশরণ (granular disintegration) — একই উষ্ণতায় বিভিন্ন খনিজ পদার্থগুলি বিভিন্ন হারে প্রসারিত ও সংকোচিত হয় (Minerals have different co-efficients of expansion)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে গ্র্যানাইট পাথরের ভিতর কোয়ার্টজ অভ্র থেকে বেশী তাড়াতাড়ি প্রসারিত ও সংকোচিত হয়। এর ফলে শিলার মধ্যে অসমান চাপের সৃষ্টি হয়। (differential stress) এবং অবশেষে শিলাটি ফেটে যায়। এই প্রক্রিয়াকে দানাদার খণ্ডীকরণও বলে। (চিত্র 1.2) মরু অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া বেশী কার্যকরী এবং সেখানে অনেক সময় শিলা ফাটার শব্দও শোনা যায়।

(চিত্র 1.2) : ক্ষুদ্রকণা বিশরণ

(iii) **শল্কমোচন বা এক্সফোলিয়েশন (Exfoliation) —** 'শলক' অর্থাৎ আঁশ এবং 'মোচন' অর্থাৎ ত্যাগ বা খসে পড়া এই প্রক্রিয়ায় শিলার এক একটি আস্তরণ বা স্তর পেঁয়াজের খোসার মত **গোলাকার** ভাবে উঠে যায়। তাই একে (Spheroidal weathering বা onion - like peeling off বলে। (চিত্র 1.3) এর প্রধান কারণ যে তাপের প্রভাবে শিলার ওপরের স্তর নীচের তুলনায় বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওপরের দিকে প্রসারিত হয় বা ফুলে ওঠে।

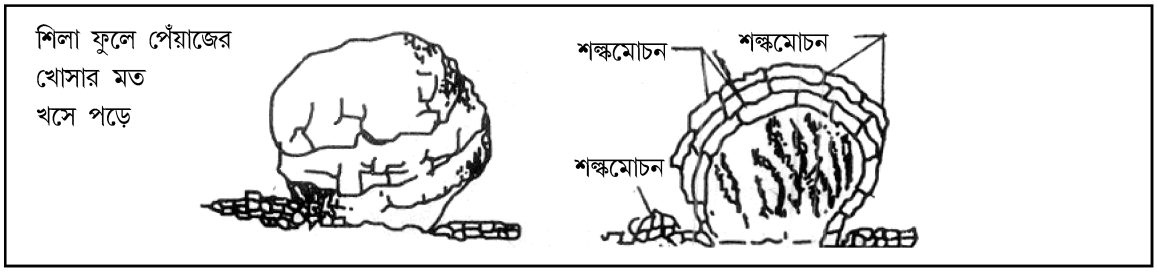

চিত্র 1.3 : শল্কমোচন

অবশেষে আলগা হয়ে নীচের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা শিলাস্তর থেকে খুলে আসে। গ্রানাইট শিলার ওপর এই প্রক্রিয়া বেশী কার্যকরী এবং গ্রানাইট শিলাযুক্ত অঞ্চলে আমরা তাই গোলাকৃতি বা গম্বুজাকৃতি পাহাড় দেখতে পাই (Exfoliated domes)। (চিত্র 1.4)।

চিত্র 1.4 : এক্সফোলিয়েশান সৃষ্ট গম্বুজাকৃতি ঢিবি

(b) কেলাস গঠন (Growth of Crystals)— শিলার ফাটলের মধ্যে কেলাস গঠনের ফলে শিলাস্তরে চাপ সৃষ্টি হয়ে শিলাটি চূর্ণবিচূর্ণ করে। এই কেলাস গঠন সাধারণতঃ দুই ভাবে হয়—

(i) তুষার কেলাস (Frost crystal)— অত্যন্ত শীতল বায়ুযুক্ত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায়ই হিমাঙ্কের নীচে (below freezing point) থাকে। দিনের বেলায় উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বরফগলা জল

শিলার ফাটলে প্রবেশ করে, আবার রাতে তাপমাত্রা কমলে সেই জল বরফে পরিণত হয়। বরফের আয়তন জলের চেয়ে প্রায় নয় শতাংশ বেড়ে যায় বলে শিলার ফাটলের মধ্যে চাপের সৃষ্টি করে। সেইজন্য ফাটল **বরাবর** শিলাটি ছোট ছোট খণ্ডে পর্বতের গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (চিত্র 1.5)। এই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি পর্বতের পাদদেশে জমা হলে স্ক্রী (scree) বা ট্যালাস (talus) বলে। পর্বতের পাদদেশে যে প্রস্তর ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে ফেল-সেনমিয়ার বা ব্লকস্পেড (felsen-meere or Blockspade) বলে।

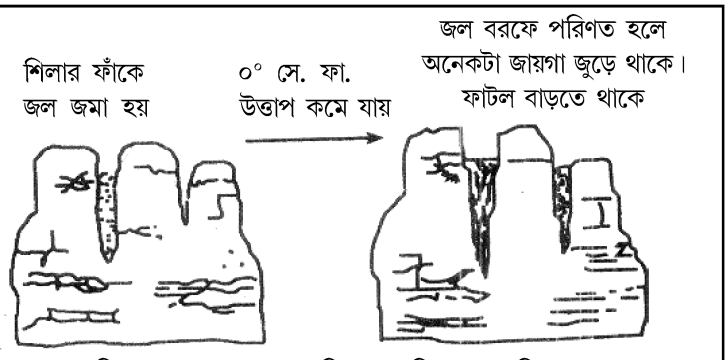

চিত্র 1.5 : কেলাসন প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক আবহবিকার

(ii) লবণ কেলাস (Salt crystals) — মরু বা মরুপ্রায় অঞ্চলে (arid or semi-arid lands), শিলাস্তরের ফাটলে বাষ্পীভবনের ফলে দ্রবীভূত লবণ লবণের কেলাসে পরিবর্তিত হয় এবং উপরোক্ত একই প্রক্রিয়ায় শিলাকে খণ্ডিত করে। উপকূল অঞ্চলে লবণ আবহবিকার ঘটতে পারে কারণ সমুদ্র থেকে লবণাক্ত বাষ্প শিলার ফাটলে প্রবেশ করে।

লবণ কেলাসন প্রক্রিয়া গহ্বরীকরণ আবহবিকার (cavernous weathering) ঘটে। প্রাথমিক কোন অগভীর ক্ষুদ্র গর্তে লবণ কেলাসন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়ে ওই গর্তকে প্রসারিত করে। এরকম অনেক গর্তের সমাবেশে গঠিত শিলাপৃষ্ঠ মৌচাকের (honeycomb) মত দেখতে হয়। ইউরোপে 20 – 100 মিমি ব্যাসযুক্ত এরকম গর্তকে অ্যালভিওল (alveole) বলে এবং 1 থেকে 2 মি ব্যাসযুক্ত গর্তকে ট্যাফোন (taffoni) বলে।

(c) **শিলাস্তরের উপরিভাগে চাপের মোচন (Release of pressure in the upper rock strata)**

—আবহবিকারের ফলে চূর্ণবিচূর্ণ পদার্থগুলি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অপসারিত হয়। এর ফলে নীচের শিলাস্তর উন্মুক্ত হয়, ওপরের চাপ কমে যাওয়ার ফলে। এই উন্মুক্ত শিলাস্তর ক্রমশঃ প্রসারিত হলে শিলাপৃষ্ঠে নানা ধরনের ফাটলের সৃষ্টি হয়।

গ্র্যানাইট শিলা এই চাপমোচন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ফাটল বরাবর পাতের মত (sheety structure) বিচ্ছিন্ন হয়। এইরকম ফাটল গ্রানাইট ছাড়াও চুনাপাথর, বেলেপাথর, আরকোজ (arkose), কংগ্লোমারেট (conglomerate) প্রভৃতি শিলাতেও সৃষ্টি হয়। আবার হিমবাহের কার্যের ফলেও (কোন হিমবাহ শিলাস্তর থেকে অপসারিত হয়ে চাপমোচন ঘটায়)। এইরকম ফাটল দেখা দেয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে শিলাখণ্ড পাতের মত না ভেঙ্গে চাঙ্গাড়ের মতো খসে পড়ে। গহ্বর বা সুড়ঙ্গের দেওয়ালে পাশের দিকে অবরোধী চাপের অপসারণের ফলে কৃন্তন ফাটলের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে বোঝার হাল্কা হওয়ার জন্য ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে আর একপ্রান্ত ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই দুই প্রকার ফাটলের জন্যই শিলা চাঙ্গাড় আকারে খসে পড়ে। একে চাঙ্গাড় ভাঙ্গান (spalling) বলে।

(d) **বৃষ্টিপাত সৃষ্ট বিচ্ছিন্নকরণ** (Shattering) — উষ্ণ মরুপ্রায় অঞ্চলে সাধারণতঃ উত্তপ্ত শিলাপৃষ্ঠের ওপর বৃষ্টির জল পড়লে তার ওপর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটলের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ফাটল বরাবর শিলাস্তর বিচূর্ণ হয়। একে বৃষ্টিপাত সৃষ্ট বিচ্ছিন্নকরণ বলে। (চিত্র 1.6)।

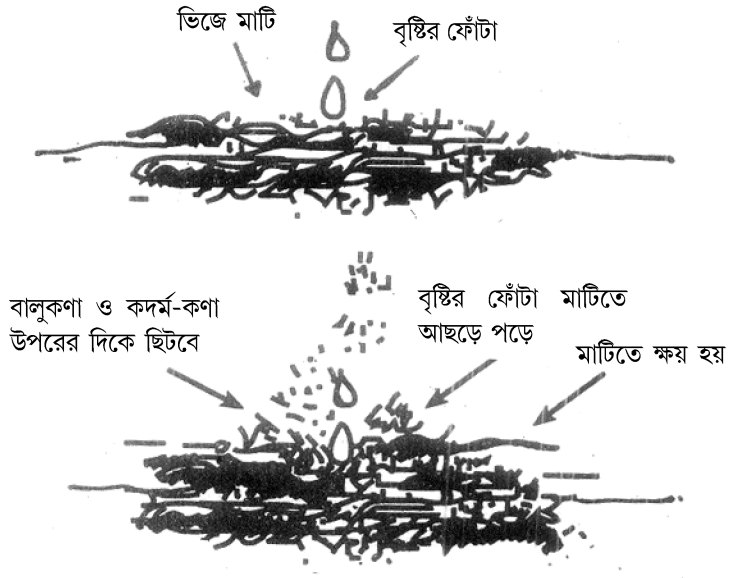

চিত্র 1.6 : বৃষ্টির ফোঁটার প্রভাব

(e) **বুদবুদজনিত চাপ** (Pressure created by bubbles) — যখন নদীর জল দ্রুতবেগে শিলার ওপর বয়ে যায়, তখন বহু বুদবুদ ও ঘূর্ণির (Whirpool) সৃষ্টি হয়। বুদবুদ ও ঘূর্ণির মাঝখানের বাতাস প্রচণ্ড চাপ দেয় এবং সেটি শিলাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দেয়। সাধারণতঃ জলপ্রপাতের দুপাশে এই প্রক্রিয়া প্রভাবশীল।

(f) **কলিকরণ** (Slaking) — সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে জোয়ার-ভাঁটার প্রভাবে শিলাস্তর পর্যায়ক্রমে আর্দ্র ও শুষ্ক হয়। এর ফলে কর্দম খনিজ গঠিত শিলাস্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাপাতের (flakes) সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে কলিকরণ বলে। কর্দম জাতীয় শিলায় এটি বেশী প্রভাব ফেলে এবং এর জন্য নিয়মানুগ জলের অণু সজ্জা (molecular arrangement of water) দায়ী বলে মনে করা হয়।

(g) **কলয়েড উৎপাটন** (Colloidal plucking) — বৈজ্ঞানিক রিশের (Riche) মতে আঠালো ধরনের মাটি যদি দীর্ঘকাল শিলাস্তরের সংস্পর্শে থাকে, তাহলে মাটির আকর্ষণে শিলাস্তরে চাপ পড়ে। সেটি ক্ষুদ্রাকারে খণ্ডিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়। সম্ভবতঃ ভিজে মাটি শুকাবার সময় কোলয়েড কণা শিলাপৃষ্ঠ থেকে ক্ষুদ্র কণা উৎপাটন করে।

(h) **কিছু গৌণ প্রক্রিয়া** (Other minor processes)—উপরোক্ত প্রধান প্রক্রিয়াগুলি ছাড়াও কিছু গৌণ প্রক্রিয়া আবহবিকারে সহায়তা করে। যেমন—

(i) দাবানল শিলাতে চিড় ধরাতে বা ছাল ওঠাতে সাহায্য করে।

(ii) বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের সংঘাত

(iii) বজ্রপাত।

(i) **জৈবিক ক্রিয়া** (Biological activities)—

শিলার দারণ (Joints) ও ফাটলের (cracks) মধ্যে গাছের শেকড় চাপ দিয়ে শিলা ভাঙ্গাতে সাহায্য করে। (চিত্র 1.12)

আবার কিছু জীবজন্তু, যেমন— কেঁচো, পিঁপড়ে, খরগোশ, 'প্রেয়রী' কুকুর ইত্যাদি প্রাণী শিলা খনন করে। (চিত্র 1.11)

মানুষও খনিজ উত্তোলন (mineral excavation) করার সময় শিলার ভাঙ্গান ঘটায়।

1.5.2 রাসায়নিক আবহবিকার (Chemical weathering)

অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প (water vapour) ইত্যাদি বায়ুমণ্ডলের উপাদান (Elements of the atmosphere) শিলা গঠনকারী খনিজের ওপর রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reaction) ঘটায়। এর ফলে শিলায় যে বিয়োজন (decomposition) ও পরিবর্তন (alteration) হয়, তাকে রাসায়নিক আবহবিকার বলে। এই প্রক্রিয়ায় শিলার উপাদানগুলি (ingredients of rocks) দ্রাবিত হয়ে পরিবর্তিত হয়। আর্থার হোম্‌সের (Arthur Holmes) এর ভাষায়—''The alteration and solution of rock material by chemical processes is referred as chemical weathering'' এটি মনে রাখা দরকার যে জল এবং উষ্ণতা রাসায়নিক আবহবিকারে প্রধান ভূমিকা নেয়।

রাসায়নিক আবহবিকারের প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ (Different process of chemical weathering)।

বায়ুর সব উপাদানের সঙ্গে সমস্ত রকম খনিজ পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি বা হার সমান নয়। সেই জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়াজনিত আবহবিকার বিভিন্ন রকমের হয়। রাসায়নিক আবহবিকার প্রধানতঃ 5টি প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়—

(i) **জারণ বা অক্সিডেশান (Oxidation)** — সাধারণভাবে শিলা খনিজের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়াকে জারণ বলে। যে সমস্ত শিলাস্তরে লোহার পরিমাণ বেশী থাকে তাতে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্যাস যুক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে লোহাযুক্ত শিলার ওপর লাল, হলদে বা বাদামী রঙের মরচে ধরে। আর্দ্র অঞ্চল ও ভেজা লোহায় এই প্রক্রিয়া সহজেই কাজ করে। লোহাযুক্ত শিলার জারণ সমীকরণ এই রকম—

$4FeO + 3H_2O + O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3, 3H_2O$

(লোহা) + (জল) + (অক্সিজেন) $\rightarrow$ লিমোনাইট

(Iron) + (Water) + (Oxygen) $\rightarrow$ (limonite)

(ii) জলযোজন (Hydration) — এই প্রক্রিয়ায় জল প্রধান উপাদান। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার মধ্যে অবস্থিত খনিজের সঙ্গে জল মিশলে জলের অণু (molecule) খনিজ অণুর সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে শিলা আগের থেকে কোমল (soft) হয় এবং নতুন এক রকমের খনিজে পরিবর্তিত হয়ে (changes into a mineral with a different chemical constituent) ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

জলযোজনের সমীকরণ এইরকম—

$CaSO_4 + 2H_2O \rightarrow CaSO_4, 2H_2O$

(ক্যালসিয়াম সালফেট) (জল) (জিপসাম)

(Calcium Sulphate) (Water) (Gypsum)

Butzer-এর ভাষায়—''Hydration is a matter of water molecules attaching themselves electrically to mineral molecules, thus weakening the mineral bonds''

(iii) আর্দ্র বিশ্লেষণ বা হাইড্রোলিসিস (Hydrolysis) — মৃত্তিকা বা শিলার মধ্যস্থ জল খনিজদ্রব্যের সঙ্গে

মিশে যে এক আণবিক পুনর্গঠন (molecular recombination) করে তাকে হাইড্রোলিসিস বলে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের অণুগুলো সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে আয়ন (Ion) অনুযায়ী আলাদা হতে থাকে এবং এইভাবে শিলাস্তরের বিয়োজন ঘটায়। যেমন— কেওলিনাইট (Kaolinite) একটি কঠিন ক্লে (কর্দম) খনিজ দ্রব্য (ফেল্‌সপার খনিজ থেকে উৎপন্ন), কিন্তু রাসায়নিক বিক্রয়াতে উৎপন্ন (KOH) (হাইড্রক্সাইড) কার্বনিক অ্যাসিডে দ্রবণীয়। এই বিক্রিয়ায় হাইড্রক্সিল আয়ন (OH ions) খনিজ আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। যেমন—

$KAlSi_3O_8 + HOH \rightarrow HAlSi_3O_8 + KOH$

(ফেলসপার) + (আইয়োনাইস্‌ড জল) → (অ্যালুমিনোসিলিসিক অ্যাসিড) + (পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড)

(Felspar) + (Ionised water) → (Aluminosilisic) + (Potassium hydroxide)

(iv) অঙ্গারযোজন বা কার্বোনেশান (Carbonation) — শিলার মধ্যস্থ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইডের রাসায়নিক সংমিশ্রণকে 'কার্বোনেশান' বলে। যদিও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা 1 ভাগেরও কম, তবুও সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ার সময় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে মিশে মৃদু অ্যাসিডে ($H_2O + CO_2 = H_2CO_3$) পরিণত হয়। এই অ্যাসিড মিশ্রিত জল বিভিন্ন শিলার ওপর নানারকম বিক্রিয়া ঘটায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড (কার্বনিক অ্যাসিড) মেশানো জল চুনাপাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তখন ওই জলের সঙ্গে চুনাপাথরের (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট—($CaCO_3$) রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সেটি ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেটে (Calcium bi-carbonate) পরিণত হয় এবং সহজেই চুনাপাথরকে ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। যেমন—

$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)$

(ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (জল) (কার্বন ডাইঅক্সাইড) (ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট)

(Carbonate) + (Water) + (Carbon di-oxide) → (Calcium bi-Carbonate)

(v) দ্রবণ, গলন বা সলিউশান (Solution) — সাধারণতঃ কোন খনিজ পদার্থ জলের সংযোগে দ্রবীভূত হলে তাকে দ্রবণ বলে এবং তা শিলার বিচূর্ণভবন ঘটায়। কিছু খনিজ, যেমন সৈন্ধব লবণ, জিপসাম ইত্যাদি বিশুদ্ধ জলে গলে যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে তরল অ্যাসিড মিশ্রিত জল খনিজ দ্রাব গলাতে সাহায্য করে।

পচা গাছ ও ডালপালা থেকে কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। আবার বৃষ্টির জল বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে মিশেও কার্বনিক অ্যাসিড তৈরী করে। এই অ্যাসিড ফেলসপার (Felspar) কে গলাতে সাহায্য করে। আবার তরলীকৃত অ্যাসিড চুনাপাথর ও ডলোমাইটকে গলিয়ে দেয়।

1.5.3 জৈবিক আবহবিকার (Biological Weathering) —

উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ আবহবিকারে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়া যান্ত্রিক ও রাসায়নিক দুই প্রকারেই হতে পারে। জৈব আবহবিকারকে তাই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(i) **জৈব যান্ত্রিক আবহবিকার —** এটি আবার দুটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত— (ক) উদ্ভিদ দ্বারা সৃষ্ট জৈব যান্ত্রিক আবহবিকার — যাতে শিলার ওপর অবস্থিত গাছপালার শেকড় তাকে বিচূর্ণীভবন করায় (চিত্র 1.7)। (খ) প্রাণী দ্বারা সৃষ্ট জৈব — যান্ত্রিক আবহবিকার — ছোট প্রাণীবিশেষ, যেমন— ইঁদুর, খরগোশ, পিঁপড়ে, কেঁচো, প্রেয়রী কুকুর প্রভৃতি শিলাস্তরে গর্ত খনন করে আবহবিকার ঘটায় (চিত্র 1.8)।

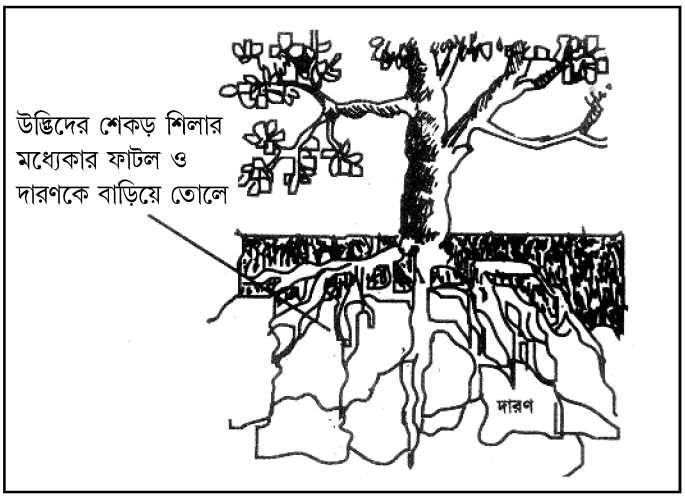

চিত্র 1.7 : জৈব আবহবিকার

চিত্র 1.8

(ii) **জৈব রাসায়নিক আবহবিকার** — কোন শিলার ওপর মস, লিচেন, শৈবাল ইত্যাদি উদ্ভিদ থাকলে সেই এলাকায় জল জমে থাকে। জল ও তাপের প্রভাবে এই উদ্ভিদগুলি পচে যায় (decomposed) এবং 'হিউমাস' (Humus) সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জল এই হিউমাসের ওপর পড়ে জৈব অ্যাসিডে (Humic acid) পরিণত করে যা প্রথমেই শিলাকে ক্ষয় করে। এরকম উদ্ভিদ পদার্থের ওপর ব্যাক্টেরিয়া কাজ করে হিউমিক, অ্যাসিটিক (acetic), লাক্টিক (lactic), অক্সালিক (Oxalic), সাইট্রিক (Citric), টারটারিক (tartaric), অ্যাসপারটিক (aspertic) প্রভৃতি অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়।

পরিশুদ্ধ জলে অ্যাসেটিক ও অ্যাসপারটিক অ্যাসিডের মত লঘু অ্যাসিড মিশে গেলে সেটি আবহবিকারের হার (ratio) দশ গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। গুরু অ্যাসিডের (heavy acid) ক্ষেত্রে এটা 100 গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

এইরকম জৈব অ্যাসিড ও চিলেশান (chelation) এর সাহায্যে প্রধানতঃ আবহবিকার ঘটে।

উদ্ভিদ এক রকমের জৈব পদার্থের সাহায্যে অদ্রাব্য কঠিন খনিজ থেকে কোন ধাতব আয়ন আহরণ করে এবং একে N, O, S দিয়ে ঘিরে এক অঙ্গারীয় গঠনযুক্ত (ring like or annular structure) জৈব পদার্থ গঠন করে ও সেটি উদ্ভিদ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এই অঙ্গুরীয় গঠনের জৈব পদার্থের মধ্যে ধাতব আয়ন ধারণের প্রক্রিয়াকে চিলেশান (Chelation) বলে। এই চিলেশানের ফলে কেলাস কাঠামোর (Crystalline structure) ধাতব ক্যাটায়ন (metallic cation) বহিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই কেলাস (crystals) ভেঙ্গে পড়ে আবহবিকারে সাহায্য করে।

1.6 ভূমিরূপের উপর আবহবিকারের প্রভাব (Influence of weathering on landforms) :

সাধারণভাবে আবহবিকার ভূপৃষ্ঠে নিম্নলিখিত প্রভাব বিস্তার করে—

(a) শিলাসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিয়োজিত করে।

(b) অপ্রত্যক্ষভাবে আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় (mass wasting) ও ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়াকে (erosion) ত্বরান্বিত করে।

(c) ভূপৃষ্ঠে আলগা পদার্থের উদ্ভব ঘটিয়ে আবহবিকার মৃত্তিকা গঠনের প্রধান এবং প্রথম ধাপ হিসাবে কাজ করে।

(d) ভূপৃষ্ঠে উচ্চতা হ্রাস করতে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক আবহবিকার উভয়ই দায়ী, তবে দ্রবণের ফলেই উচ্চতা বেশী হ্রাস পায়।

(e) আবহবিকার ভূপৃষ্ঠে বৈষম্যমূলক আচরণ করে ক্ষুদ্র ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিলা-সোপান (Stone lattice), মৌচাকের মত গর্তবিশিষ্ট শিলাপৃষ্ঠ (Honeycombed appearance of rocks), শিলার পাঁজর (Stratification ribs) প্রভৃতি।

সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠে শিলাসমূহের উপর যান্ত্রিক আবহবিকার ও রাসায়নিক আবহবিকারের আলাদা রকমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

1.6.1 যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রভাব

(i) মূল শিলাগুলি ছোট ও বড় খণ্ডে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

(ii) শিলাগুলি স্তর অনুযায়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যার ফলে নীচের স্তরের শিলা উন্মুক্ত (exposed to the surface) হয়।

(iii) উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় গ্র্যানাইট পাথরে শল্কমোচন (exfoliation) ঘটে। এ ক্ষেত্রে পেঁয়াজের খোসার মত একটা একটা করে স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নীচের স্তর উন্মোচিত হয়। ভূমিরূপ সমগ্রভাবে একটি গম্বুজাকৃতি (Exfoliated dome) ধারণ করে। (চিত্র 1.4) ভারতে ছোটনাগপুর মালভূমিতে এইরকম ভূমিরূপ লক্ষনীয়। আবার এই একই অঞ্চলে পাহাড়ের (টিলার) গা বেয়ে যখন প্রস্তরখণ্ডগুলি ভেঙ্গে নীচের দিকে এসে জমা হয়, তাকে 'টর' (Tor) বলে।

বৈষম্যমূলক আবহবিকারের ফলে ভূপৃষ্ঠে যখন নানা আকৃতির শিলা জমায়েত হয়, সামগ্রিকভাবে তাকে হুডু (Hoodoo) শিলা বলে।

(iv) হিমবাহ বা তুষারের ক্ষয়কার্যের প্রভাবে পাহাড়ের চূর্ণ-বিচূর্ণ শিলাস্তর পাহাড়ের ঢালে সঞ্চিত হয়ে স্ক্রী (Scree) বা ট্যালাস্ (talus) এর সৃষ্টি করে। পাহাড়ের পাদদেশে যে প্রস্তর ভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে 'ফেলসেন্‌মিয়ার' (felsenmeere) বা 'ব্লকসেড্' (blockspade) বলে।

(v) শীতপ্রধান দেশে তুষারের কার্যের ফলে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে যায়। শুষ্ক ঋতুতে 'রেগুর' (Regur) বা কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black cotton soil) অঞ্চলেও মাটির ঢেলা ভেঙ্গে গেলে চাষাবাদের সুবিধা হয়।

(vi) শিলার দারণ, ফাটল ইত্যাদি আবহবিকারের প্রভাবে বেড়ে গিয়ে বৃষ্টির জল বা অন্যান্য উৎস থেকে জলের সহজেই ভূগর্ভে নামতে সুবিধা হয় তাই ভৌমজলের (groundwater) পরিমাণকে সমৃদ্ধ করে।

(vii) যান্ত্রিক আবহবিকার পরোক্ষভাবে মৃত্তিকা গঠনে সাহায্য করে। আবহবিকারের অবশিষ্ট অংশ হিসাবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণ অদ্রবীভূত সিলিকা (silica) বা বালু (Sand) পাওয়া যায়।

(viii) শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ খণ্ডগুলি ভূ-ত্বকের উপর সঞ্চিত হয়ে 'রেগোলিথ' (regolith) অর্থাৎ এক ভূ-আস্তরণের সৃষ্টি করে।

(ix) কোমল শিলায় 'গালি' (gully) ও 'র‍্যাভাইন'-এর (ravine) সৃষ্টি হয়। এইরকম এলাকায় বৃষ্টিপাত হতে ছোট ছোট খাতের (Channels) সৃষ্টি হয়ে এইরকম ভূমির উদ্ভব হয়। (চিত্র 1.9)

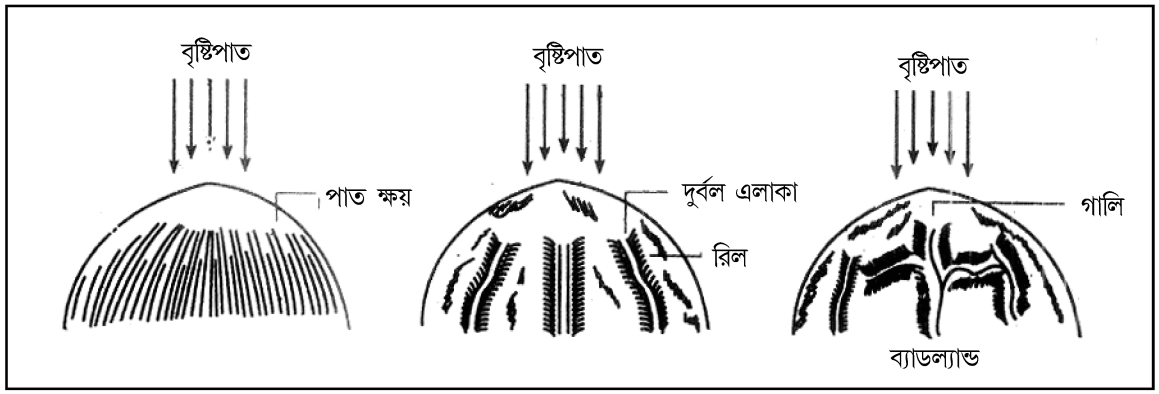

চিত্র 1.9 : 'গালি' সৃষ্টির প্রক্রিয়া

1.6.2 রাসায়নিক আবহবিকারের প্রভাব—

(i) শিলার মধ্যে অবস্থিত কিছু খনিজ পদার্থ (Minerals) দ্রবীভূত (Chemical reaction) হয় এবং ক্রমে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে উদ্ভিদকে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং সার যোগায়।

(ii) শিলা মধ্যস্থ কয়েকটি খনিজ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিয়োজিত হয় বলে বৃষ্টিবহুল ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে 'বক্সাইট', 'ল্যাটেরাইট', 'জিপ্‌সাম', 'কেওলিন' (ফেলসপার থেকে পরিণত হয়), 'নিকেল' ইত্যাদি খনিজের সৃষ্টি হয়।

উষ্ণ ও শুষ্ক আর্দ্র জলবায়ু, গভীর আবহবিকার, ভূজলপৃষ্ঠের ওঠানামা—এই সকলের সমন্বয়ে ল্যাটেরাইটের সৃষ্টি হয়। ল্যাটেরাইট কাদার মত লাল রঙের মাটি। ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমাংশে এই ল্যাটেরাইট বিশেষ লক্ষণীয়। (চিত্র 1.10)

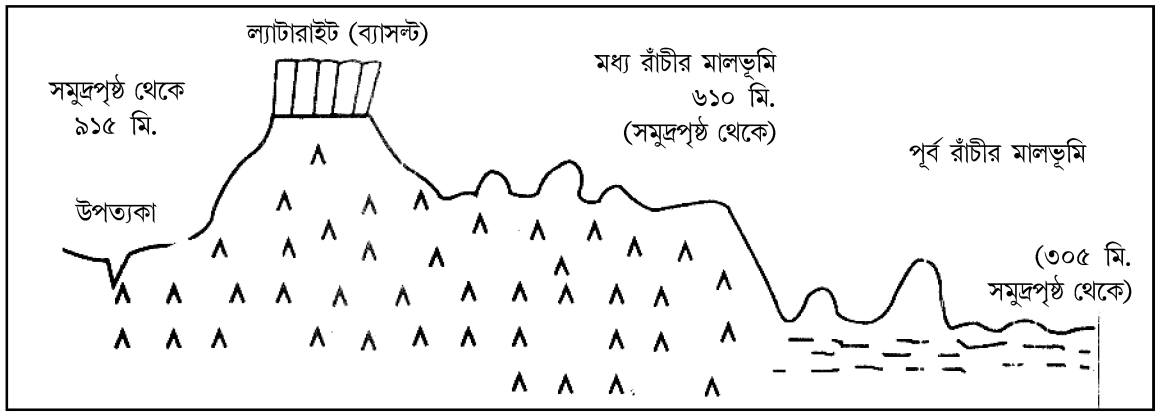

চিত্র 1.10 : রাঁচী মালভূমির (বিহার) পাটভূমি ও ল্যাটারাইট গঠিত ভূমিরূপ

(iii) ড্যুরিক্রাস্টের (Duricrust) সৃষ্টি ড্যুরিক্রাস্ট মৃত্তিকার ওপরের অংশে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক কঠিন ত্বক। আবহবিকারজাত কাদা ও কোয়ার্টজ কণাগুলি লোহা, সিলিকা বা চুনের সংমিশ্রণে সিমেন্টের মত কঠিন হয়ে যায়। ড্যুরিক্রাস্টের এই ত্বক কয়েক মিটার পুরু হয়। এর আর এক নাম আবহবিকার ত্বক (weathering crust) বা কুইরাস (cuiass) বলে।

বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে ল্যাটেরাইটের লৌহ অক্সাইডের আবার কেলাসন (crystallisations ও নির্জলীকরণ (dehydration) হয় বলে ল্যাটেরাইট কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়।

যে ড্যুরিক্রাস্টে গিবসাইট সমৃদ্ধ থাকে তাকে 'বক্সাইট' ; যাতে সিলিকা সমৃদ্ধ থাকে, তাকে 'সিলক্রিট' (selcrete); যাতে চুন সমৃদ্ধ থাকে তাকে 'ক্যালক্রিট' (Calcrete) এবং যাতে সেসকুই-অক্সাইড সমৃদ্ধ থাকে তাকে 'ফেরিক্রিট' (ferricrete) বলে।

উপরোক্ত এই সকল ড্যুরিক্রাস্ট বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে উদ্ভুত হয়।

(iv) চুনাপাথর অঞ্চলে নানারকম ভূমিরূপের (karst topography) সৃষ্টি হয়, যেমন, সোয়ালো হোল্ (swallow hole) সিঙ্ক হোল্ (sink hole), উভালা (Uvala), ডোলাইন্ (Doline) , স্ট্যালেকটাইট্ (Stalactite) , স্ট্যালেগ্মাইট (Stalagmite) ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে বৃষ্টির জলের কার্বন ডাই অক্সাইড চুনাপাথরের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়ে তাকে ক্ষয় করে। (চিত্র 1.11, 1.12 এবং 1.13)।

চিত্র 1.11 : চুনাপাথরের উপর সৃষ্ট ভূমিরূপ

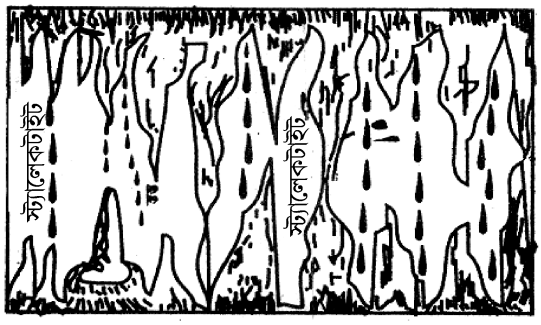

চিত্র 1.12 : চুনাপাথরের সঞ্চয়ের ভিতরের রূপ

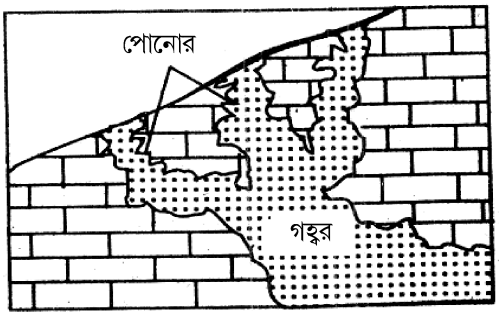

চিত্র 1.13 : চুনাপাথরের সৃষ্ট গহ্বর ও পোনোর

চুনাপাথর অঞ্চলে আবহবিকারের ফলে লৌহ কণাযুক্ত একরকমের আস্তরণ সৃষ্টি হয় যার নাম 'টেরা রসা' (Terra Rossa)।

(v) উদ্ভিদের প্রভাব— অ্যালগি ও মস্ (algae and moss) শিলাতে গর্তের সৃষ্টি করতে পারে। এর কারণ এই জাতীয় উদ্ভিদ যথেষ্ট জল ধারণ করে ও কার্বন ডাই অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এর ফলে রাসায়নিক আবহবিকার ঘটে, ও শিলায় আবহবিকার গর্তের সৃষ্টি হয় (weathering pits)।

লবন কেলাসন প্রক্রিয়ায় অ্যালভিওল (alveole), ট্যাফোনি (taffoni) ইত্যাদি ক্ষুদ্র গর্ত সৃষ্টি হয়।

সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে, সব শিলার খনিজ গঠন (Mineral composition) এক নয় এবং সেই জন্যই তার ওপর যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাব, বিভিন্ন প্রকারের এ ক্ষেত্রে অবশ্য জলবায়ুর প্রভাবও বিস্তর।

1.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. বিষয়মুখী / রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (600 শব্দের মধ্যে)

(i) আবহবিকারের সংজ্ঞা দিন। আবহবিকারের প্রক্রিয়াগুলির শ্রেণীবিভাগ করুন।

(ii) বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে আবহবিকারের তারতম্য কেন এবং কিভাবে হয় তা সংক্ষেপে লিখুন।

(iii) যান্ত্রিক ও রাসায়নিক আবহবিকারের ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (150টি শব্দের মধ্যে)

(i) তাপজনিত যান্ত্রিক আবহবিকারের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(ii) রাসায়নিক আবহবিকারের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

(iii) জৈবিক আবহবিকার কিভাবে সংঘটিত হয়?

C. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (50টি শব্দের মধ্যে)

(i) জলযোজন ও আর্দ্রবিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

(ii) চুনা পাথর অঞ্চলে দ্রবণ প্রক্রিয়া বেশী দেখা যায় কেন?

(iii) ড্যুরিক্রাস্ট কাকে বলে?

(iv) ফেরিক্রিস্ট কাকে বলে?

D. নৈর্ব্যক্তিক বা অব্‌জেকটিভ প্রশ্ন :

(i) **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(a) শিলার খনিজের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়াকে —— বলে।

(b) গাছের শিকড়ের মাধ্যমে যে আবহবিকার হয়, তাকে —— আবহবিকার বলে।

(c) বিভিন্ন খনিজপদার্থের সঙ্গে কার্বন-ডাই অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে —— বলে।

(d) সমুদ্র উপকূলে কর্দম খনিজ গঠিত শিলাস্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাপাত —— প্রক্রিয়াকে ফলে সৃষ্টি হয়।

(e) জলপ্রপাত অঞ্চলে —— ক্ষয় দেখা যায়।

(ii) সত্য / মিথ্যা বলুন :

(a) মরু অঞ্চলে যান্ত্রিক আবহবিকার দেখা যায়।

(b) চুনাপাথর অঞ্চলে রাসায়নিক আবহবিকার দেখা যায়।

(c) হাইড্রোশানের ফল শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন হয়।
(d) অক্সিডেশানের ফলে ফেরাস্ অক্সাইড ফেরিক্ অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়।
(e) কার্বনেশানের ফলে ক্যালশিয়াম কার্বনেট গঠিত হয়।

1.8 উত্তরমালা

A. (i) 2.01.3 এবং 2.1.5 দ্রষ্টব্য
(ii) 2.01.4-এর অন্তর্গত জলবায়ু অংশটি দ্রষ্টব্য
(iii) 2.01.6.1 এবং 2.01.6.2 দ্রষ্টব্য

B. (i) 2.01.5.1 দ্রষ্টব্য
(ii) 2.01.5.2 দ্রষ্টব্য
(iii) 2.01.5.3 দ্রষ্টব্য

C. (i) 2.01.6.2 -এর অন্তর্গত জলযোজন ও আর্দ্রবিশ্লেষণ অংশটি দেখুন।
(ii) 2.01.6.2-এর অন্তর্গত দ্রবণ প্রক্রিয়া অংশটি দেখুন।
(iii) 2.01.6.1 -এর অন্তর্গত 'ড্যারিক্রাস্ট' অংশটি দেখুন।

D. (i) / a জারণ বা অক্সিডেশান
(i) / b জৈবিক
(i) / c কার্বনেশান
(i) / d স্লেকিং
(i) / e বুদ্‌বুদ্‌জনিত

D. (ii) / a সত্য
(ii) / b সত্য
(ii) / c মিথ্যা
(ii) / d মিথ্যা
(ii) / e মিথ্যা

B. পুঞ্জিত ক্ষয় (Mass Wasting)

1.9 পুঞ্জিত ক্ষয়ের সংজ্ঞা

কোন ভূমিভাগের ওপরের অংশ থেকে নীচের দিকে (মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে) ঢাল বেয়ে যখন একজোটে (Mass) শিথিল শিলা, স্তূপ, শিলাখণ্ড, রেগোলিথ এবং মৃত্তিকা অবতরণ করে বা অপসারিত (transferred) হয়, তাকে পুঞ্জিত ক্ষয় বা পুঞ্জ ক্ষয় (Mass wasting) বলে। সাধারণতঃ যে কোন ভূমিতে আবহবিকারের পরই পুঞ্জিত ক্ষয় ঘটে থাকে। শার্প (Sharpe 1938) বিস্তৃত গবেষণার ফলে এই পুঞ্জিত ক্ষয়ের ধারণার উপস্থাপনা করেছেন। এটা মনে রাখা দরকার যে পরিবহনের মাধ্যম, যে প্রবাহমান জল (Running water or river), হিমবাহ (Glacier), বায়ু (Wind) ইত্যাদি দ্বারা যে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি স্থানান্তরিত বা অপসারিত হয়, তা পুঞ্জিত ক্ষয়ের

অন্তর্ভূক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে অভিকর্ষণ টানের ফলে সমস্ত রকম পদার্থের (মৃত্তিকা বা আলগা আবহবিকারপ্রাপ্ত শিলাখণ্ড ইত্যাদি) নিম্নগমনকেই পুঞ্জিত ক্ষয় বলে।

মাধ্যাকর্ষণ ব্যতীত আর যে সব প্রভাবগুলি (factors) পুঞ্জিত ক্ষয়ে সহায়তা করে, তাদের মধ্যে জলধারা বা জলের উপস্থিতি (flow or presence of water) খাড়া ঢাল (steep slope), পদার্থগুলির আকার ও আয়তন (Shape & size of the sediments), উদ্ভিদের অভাব (lead of vegetative cover), মানুষের কার্যকলাপ (human interference or human activities) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

1.10 পুঞ্জিত ক্ষয়ের সহায়ক বা প্রভাবক কারণসমূহ (Controlling factors influencing wastings)

যে সকল কারণ দ্রুত পুঞ্জক্ষয়ের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে, শার্প (Sharpe) তাদের অক্রিয় (Passive) এবং সক্রিয় (active) - এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। অক্রিয় কারণগুলি নিম্নে লেখা হল—

(i) একটি অঞ্চলে আর্দ্র অবস্থার উপস্থিতি প্রয়োজন কারণ জল পিচ্ছিলকারক (slippery) উপাদান হিসেবে কাজ করে। একটানা শুষ্ক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যদি বৃষ্টি হয় (আর্দ্র আবহাওয়ার সূচনা হয়। তাহলেই পদার্থগুলি দ্রুত নিম্নগমন করে থাকে।

(ii) পদার্থের নিম্নগমন কি হারে হবে (ratio of mass movement of sediments) তা মৃত্তিকা এবং আবহিকবিকারপ্রাপ্ত আবরণ পদার্থ কতখানি কৌণিক অবস্থায় আছে এবং শিলাস্তর কতটা নতিযুক্ত অবস্থায় (angle of dip) হেলে রয়েছে তার উপর নির্ভর করে।

(iii) যখন মৃত্তিকা বা শিলাখণ্ড আলগাভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ তা গভীরভাবে আবহিকবিকারপ্রাপ্ত হয়, তখনই পুঞ্জ ক্ষয় বেশী ও দ্রুত হয়।

(iv) যখন কঠিন ও কোমল শিলা পরস্পর উপর-নীচে অবস্থান করে এবং তার মধ্যভাগে কাদা থেকে যায় তখন এই কাদাস্তরে জল গ্রহণ করে পদার্থের গমনের গতি বৃদ্ধি করে। কঠিন ও কোমল বা প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের দুর্বল স্থান স্খলিত হওয়ার প্রবণতা থাকে।

(v) পাতলা স্তরের অবস্থান গমনের গতি বৃদ্ধি করে কেননা এক্ষেত্রে স্তরায়ন-তলের সংখ্যা বেশী থাকে এবং এই তল বরাবর শিলা পিছলে যায়।

(vi) দারণ (joints and cracks) ও চ্যুতি-তল (faults) প্রভৃতি শিলার দুর্বল অংশে সংসক্তি (Cohesive force) কম থাকে এবং পীড়ন (tensional force) বৃদ্ধি পেলে এই তল বরাবর শিলার স্খলন ঘটে।

(vii) ঘাসে চাপা পড়া এবং গাছের লম্বা শিকড় শক্ত, বাঁধুনি দিয়ে মৃত্তিকা ও ভূ-পৃষ্ঠের আবরণকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তাই এদের অনুপস্থিতি অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্ভিদের অভাব (lack of vegetation) পুঞ্জক্ষয়কে সহায়তা করে।

উপরোক্ত এই নিয়ন্ত্রকগুলি ছাড়াও আরও কিছু কারণ (সক্রিয় active পুঞ্জিত ক্ষয় এবং পুঞ্জ চলনকে (Mass movement) সহায়তা করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

1. ভূমির ঢাল নানাভাবে বাড়ার জন্য এর কারণগুলি হল—

(i) নদী, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্রতরঙ্গের ক্ষয়কার্যের ফলে ঢালের নিম্ন অংশে তার কার্যকারীতা বেশী হয় (Work of running water or rivers glaciers, wind sea wave etc.)।

(ii) আবহবিকারের ফলে (Weathering)।

(iii) ধ্বংস (landslides) ও চ্যুতির (faults) এর ফলে।

(iv) প্রস্তর খনি (Mines), খাল খনন (digging of canals), রাস্তা তৈরির ফলে।

(v) হ্রদ বা কৃত্রিম জলাধারে (artificial reservoirs) জল তলের পরিবর্তনের ফলে (fluctuating water levels)।

II. ঢালের ওপর বোঝার চাপ pressure of load) বাড়ার ফলে। এর কারণগুলি হল—

(i) বৃষ্টি ও তুষারপাত, জলের পাইপলাইন এবং খাল নির্মাণ।

(ii) ট্যালাস (talus) সঞ্চয়।

(iii) উদ্ভিদের বৃদ্ধি।

(iv) আবর্জনা সঞ্চয়, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি।

III. অবলম্বন অপসারণের কারণে। এর কারণগুলি হল—

(i) নদী ও সমুদ্রতরঙ্গের মাধ্যমে নিম্নখনন (undercutting)

(ii) চুনাপাথর বা অন্যান্য দ্রব্য শিলার গহ্বরীকরণ (Underground limestone cave) বা ভূগর্ভস্থ খনি (underground mine)।

(iii) নিম্নাংশে অবস্থিত অবক্ষেপের সহনশীলতা হ্রাস।

(iv) নিম্নে অবস্থিত অস্থিতিস্থাপক পলির বৃদ্ধি।

IV. শিলায় সহনশীলতা কমার জন্য। এর কারণগুলি হল—

(i) কাদার ফাটলে জল প্রবেশ করে তাকে নরম করে দেয়।

(ii) যান্ত্রিক আবহবিকারের ফলে ভাঙ্গা শিলার সহনশীলতা কমে যায়।

(iii) জল শোষণের ফলে কর্দম খনিজের (Clayey minerals) সংসক্তি হ্রাস হয় ও তার স্ফীতি (expansion) ঘটে।

(iv) দ্রবণের ফলে পাললিক শিলার সহনশীলতা কমে গিয়ে তা কোমল প্রকৃতির হয়ে যায়।

(v) জল শোষণের ফলে অবস্করের (debris) স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়।

(vi) জীবজন্তুর মাটিতে খনন ও উদ্ভিদ শিকড়ের পচনের ফলে অবক্ষয়ের ভৌতিক ধর্মের পরিবর্তন (Physical change in state)।

(vii) মৃত্তিকার উত্তপ্ত ও শীতল হওয়া— যা শিলাকে দুর্বল করে দেয় (অনবরত স্ফীতি ও সংকোচনের ফলে)।

(viii) মৃত্তিকার ওপরের ও নীচের স্তরে বরফ কেলাসন (formation of ice crystals)—এটি ঠাণ্ডা দেশে বেশী হয়।

(ix) বৃক্ষের অপসারণ (deforestation or cutting of trees) যা মাটি আলগা করে দেয়।

(x) ভূ-কম্পন সৃষ্ট ঝাঁকানি, যেমন বজ্রপাত, খনিতে বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প অথবা ভারী যানবাহনে চলাচলজনিত কম্পন। এর ফলে অবস্করের আভ্যন্তরীন গঠনে পরিবর্তন ঘটে ও অবস্করের সহনশীলতাও কমে গিয়ে পুঞ্জচলনকে (Mass movement) সাহায্য করে।

সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত কারণগুলি পুঞ্জচালনে সহায়তা করলেও, দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের ভর সঞ্চালন প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ স্বাতন্ত্র্য বিরাজ করে। পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ করে এবার তার কার্যপ্রণালী বোঝা যাবে।

1.11 পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ

পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগের আগে পদার্থসমূহের গতির শ্রেণীবিভাগ করলে (types of motion) বিভিন্ন ধরনের পুঞ্জক্ষয়ের প্রক্রিয়া বুঝতে সুবিধা হবে।

1.11.1 গতির শ্রেণীবিভাগ (Types of Motion) —

(a) পতন বা fall — অতি খাড়া ঢালযুক্ত অঞ্চলে পদার্থসমূহ সরাসরি ওপর থেকে ঢালের নীচে পতিত হয়।
(b) স্লাইড (slide) — পদার্থসমূহ ঢাল বরাবর গড়িয়ে নীচের দিকে নামে। (চিত্র 1.14)।

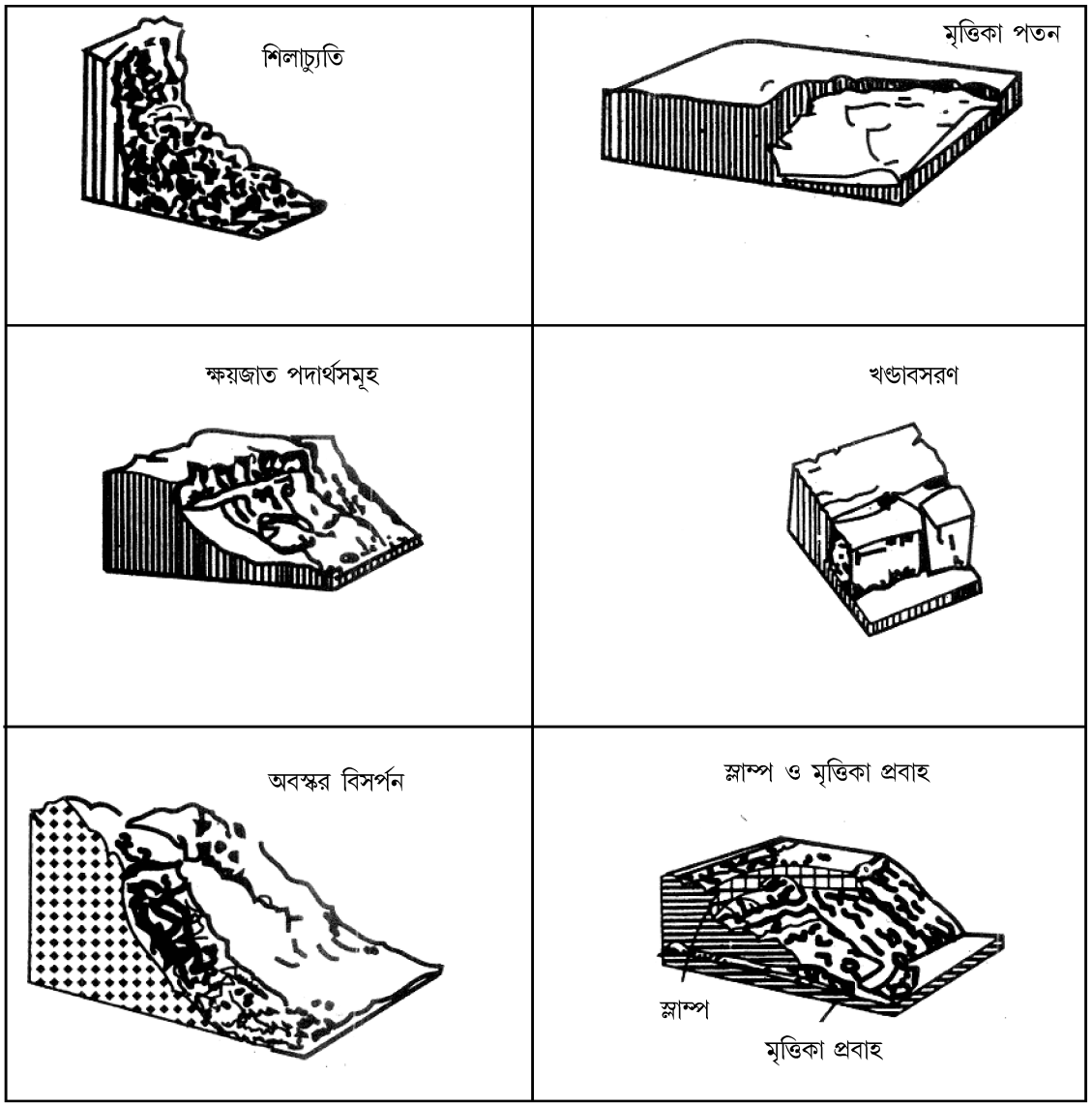

চিত্র 1.14

(c) স্লাম্প্ (slump) — পদার্থসমূহ বাঁকাপথে (Curved path) নীচে নামে।

(d) ফ্লো (flow) — আঠালো পদার্থসমূহ ওপরের ঢাল বরাবর নীচের দিকে অবতরণ করে। (চিত্র 1.15 ও 1.19)

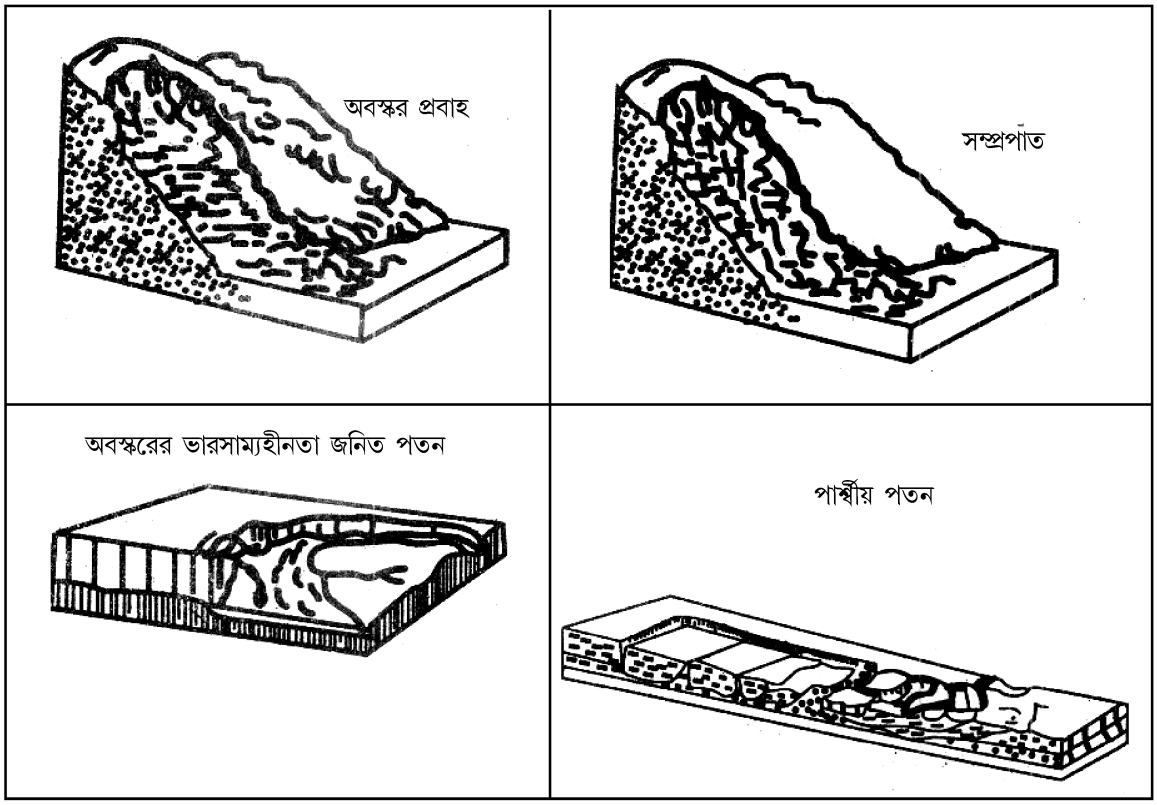

চিত্র 1.15

(e) লোব্ (lobe) — এ ক্ষেত্রে পদার্থসমূহ জল দিয়ে পরিপৃক্ত থাকে এবং পদার্থসমূহ ঢাল বরাবর কানের লতির (lobe) বা শিঙ্গা আকারে নীচে অবতরণ করে।

1.11.2 পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ — (শার্পের শ্রেণীবিভাগ)

ঢাল বেয়ে প্রবাহমান পদার্থসমূহের পার্থক্য এবং তাদের প্রবাহের গতিবেগের পার্থক্যর ওপর ভিত্তি করে শার্প (Sharpe) পুঞ্জিত ক্ষয়কে 4টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

I. ধীর প্রবাহ, II. দ্রুতপ্রবাহ, III. ধ্বংস এবং IV. অবনমন। এই প্রতিটি শ্রেণীর আবার উপভাগ (sub-types) রয়েছে।

I. ধীর প্রবাহ শ্রেণী (slow flowage of mass wastings) — এই শ্রেণীর দুটি উপবিভাগ রয়েছে—

(i) বিসর্পন (creep) এবং (ii) সোলিফ্লাক্সান (Solifluction) ।

(i) **বিসর্পন (Creep)—** এতে উচ্চ অংশ থেকে ঢাল বেয়ে নীচের দিকে পদার্থসমূহ ধীরগতিতে অবতরণ করে। বিসর্পন (creep) কে আবার 8টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

(a) মৃত্তিকা বিসর্পন (soil creep), (b) ট্যালাস বিসর্পন (talus creep), (c) শিলা বিসর্পন (rock creep), (d) শিলা-হিমবাহ বিসর্পন (Rock-glacier creep)। (চিত্র 1.16)।

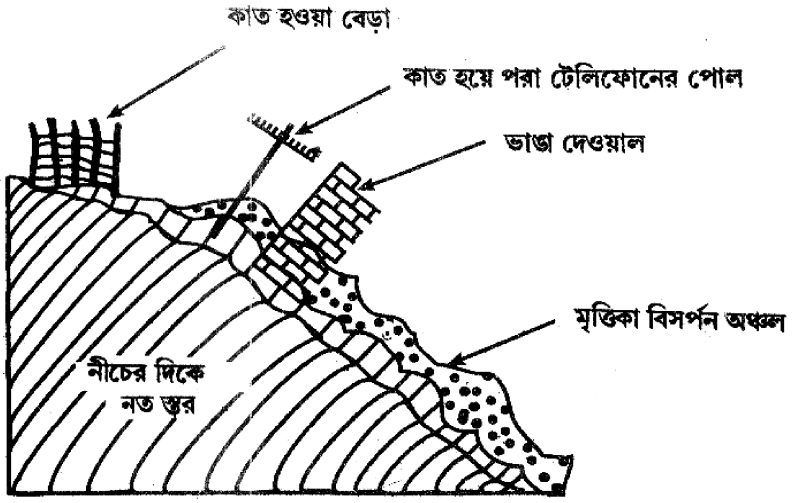

চিত্র 1.16

(a) **মৃত্তিকা বিসর্পন (soil creep)** — ঢালের উচ্চাবস্থান থেকে নীচের দিকে যখন মৃত্তিকা ধীরগতিতে অবতরণ করে, তাকে মৃত্তিকা বিসর্পন বলে। এর অন্যতম কারণের মধ্যে মৃত্তিকার পর্যায়ক্রমে আর্দ্রতা ও শুষ্কতা। জল জমে যাওয়া মাটি সিক্ত হলে মৃত্তিকা কণাগুলিকে ভূমিঢালের সমকোণে উত্থিত করে এবং শুষ্ক কণাগুলিকে একটু নীচের দিকে অবতরণ করায়। আবার প্রবল বৃষ্টিপাত বা তুষারপাতের ফলে মৃত্তিকা জলসিক্ত হয় বলে মৃত্তিকার নিজস্ব বাঁধন আলগা হয়ে যায়। ফলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে মৃত্তিকা নীচের দিকে অবতরণ করে।

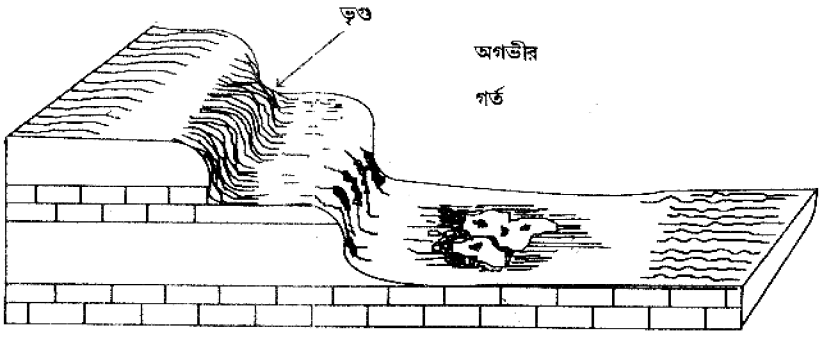

চিত্র 1.17 : বিসর্পন সংঘটিত ভৃগু ও অগভীর গর্ত

মৃত্তিকা বিসর্পনের ফলে ঢালের গায়ের মৃত্তিকাস্তর ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে। এর ফলে মাঝে মাঝে ভূমির ঢালে ক্ষুদ্র আকারের ভৃগুতট বা অগভীর গহ্বর সৃষ্টি হয়। (চিত্র 1.17)।

(b) **ট্যালাস বিসর্পন (Talus Creep)** — এই প্রক্রিয়ায় খাড়া ঢাল বরাবর ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থসমূহ ঢালের নীচে সঞ্চিত হয়। শীতল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে ঠাণ্ডা-গরম প্রক্রিয়ায় (freeze and thaw process) কোণাকার প্রস্তর খণ্ড সাধারণতঃ ঢালের নীচে সঞ্চিত হয়।

(c) **শিলা বিসর্পন (Rock creep)** — অতি বৃহৎ আকারের বেলেপাথর, কংগ্লোমারেট, গ্র্যানাইট ইত্যাদি প্রস্তরখণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে উচ্চভূমির ঢাল বরাবর নীচের দিকে অবতরণ করে।

(d) **শিলা-হিমবাহ বিসর্পন (rock - glacier creep)** — উচ্চভূমিতে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে উৎপন্ন পদার্থসমূহ ঢাল বেয়ে নীচের দিকে অবতরণ করে। এর ফলে নীচের ট্যালাস (talus) বা স্ক্রীর (scree) মধ্যে বড় বড় কোণাকার (angular) প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশ সমস্ত ঢালের পথ বরাবর দেখা যায়।

(ii) **সোলিফ্লাক্সান্ (Solifluction)** — এই শব্দটি 'solum' অর্থাৎ 'মৃত্তিকা' এবং (flure) অর্থাৎ 'প্রবাহ' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অ্যান্ডারসানের (Anderson - 1960) মতে, উচ্চ অক্ষাংশের (high latitudinal areas) এবং অধিক উচ্চতা সম্পন্ন (high altitude areas) স্থানগুলিতে জল দ্বারা সিক্ত মৃত্তিকা যখন মাধ্যাকর্ষণের টানে কোন উচ্চভূমি থেকে ঢাল বরাবর নীচের দিকে নামে, তাকে সোলিফ্লাকসান বলে। এইরকম অবতরণ বিশেষতঃ চারটি অবস্থানে অনুকূল হয়—

(i) তুষার গলনের ফলে জলের প্রাচুর্য,

(ii) মাঝারি থেকে খাড়া ভূমির ঢাল,

(iii) ঢালের গায়ে উদ্ভিদের স্বল্পতা,

(iv) ভূ-পৃষ্ঠের নীচে চির তুষার (permafrost) অবস্থা।

উপরোক্ত এই চারটি অনুকূল অবস্থার জন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মৃত্তিকা অতিরিক্ত সিক্ত হয় এবং মৃত্তিকা ভারী হয়ে ঢাল বরাবর নীচের দিকে নামতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্থানীয় ভাবে ঢালে সোপানের মত (Step like) ভূমি সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা এর ফলে ঢালের গর্তগুলি বা অবতল অংশগুলি ভরাট হতে পারে।

II. দ্রুতপ্রবাহ শ্রেণীর পুঞ্জিত ক্ষয় (Rapid flowage types of mass wasting)

(a) ভূমি বা মৃত্তিকা প্রবাহ (Earth flow), (b) কর্দম প্রবাহ (mud flow), (c) অবস্কর প্রবাহ বা সম্প্রপাত (debris avalanche) — এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (চিত্র 1.17)

(a) মৃত্তিকা প্রবাহ (Earth flow) — এই প্রক্রিয়ায় কর্দম (clay) বা সিল্ট প্রধান (silty) মৃত্তিকা ঢালের ওপরে থেকে নীচের দিকে জিহ্বার আকারে অবতরণ করে। আর্দ্র অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে এই ধরনের পুঞ্জিতক্ষয় সাধারণতঃ বেশী হয়ে থাকে। ঢালের ওপরের অংশে অগভীর ক্ষতস্থান এবং প্রবাহপথের শেষের দিকে অল্প উচ্চতা বিশিষ্ট ঢিপির (mound) সৃষ্টি হয়। (চিত্র 1.16, 1.19)।

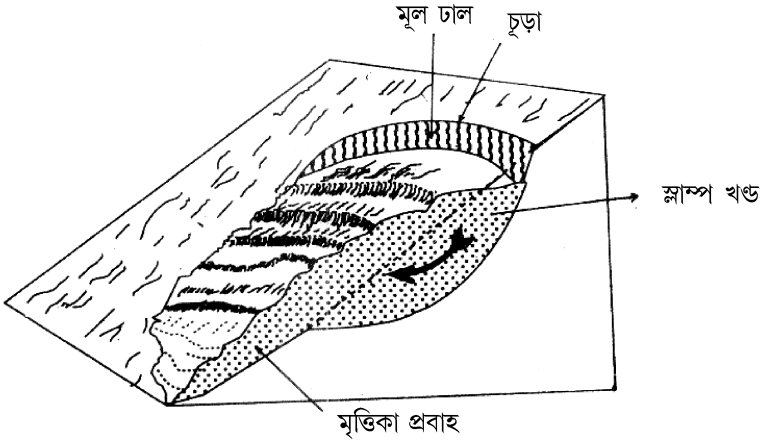

চিত্র 1.19 : প্লাম্প ও মৃত্তিকা প্রবাহ

(b) কাদাপ্রবাহ (Mud flow) — এই প্রক্রিয়ায় সুক্ষ্ম দানার মৃত্তিকা জলে ভালভাবে সিক্ত হয়ে এক তরল প্রবাহের মত (fluid flow) ঢালের নীচের দিকে অবতরণ করে। মৃত্তিকা প্রবাহের তুলনায় কাদাপ্রবাহতে জলের পরিমাণ বেশী থাকে। ওই প্রবাহ বিভিন্ন খাত ধরে হয় এবং কাদা ক্রমশঃ ঘন হলে সেটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষ এমনকি ঘর বাড়িও বহন করতে পারে। (চিত্র 1.16, 1.19)।

কাদাপ্রবাহ নিম্নলিখিত অনুকূল অবস্থায় বেশী শক্তিশালী হয়—

(i) উদ্ভিদহীন খাড়া ঢাল, (ii) শিলাসমূহের রাসায়নিক আবহবিকারের ফলে কাদার উৎপত্তি, (iii) ঢালে আগ্নেয়-ভস্মের উপস্থিতি ইত্যাদি।

'ব্যাড্‌ল্যান্ড' (Badland) যুক্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকার কাদাপ্রবাহগুলি পাতলাস্তরের আকারে নালাগুলির ওপরের অংশ থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। এইরকম ভূমিরূপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকে এবং মধ্য ভারতের চম্বল উপত্যকা অঞ্চলে দেখা যায়।

শার্প (Sharpe) কাদাপ্রবাহকে তাদের প্রাপ্তিস্থানে ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন—(i) মরুপ্রবাহ শ্রেণী, (ii) পার্বত্য শ্রেণী, (iii) আগ্নেয়গিরি শ্রেণী।

(e) **অবস্কর প্রবাহ বা সম্প্রপাত (Debris avalanche) —** উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে শিলা বা তুষারের সম্প্রপাত প্রায়ই ঘটে। খাড়া ঢালে সঞ্চিত বৃহৎ শিলাখণ্ডগুলি জলাসিক্ত হলে তার নীচে কাদা পিচ্ছিল অবস্থার সৃষ্টি করে। এর ফলে শিলা বা প্রস্তরখণ্ডগুলি হঠাৎ গতিলাভ করে সম্প্রপাতের আকারে নীচের দিকে নামতে থাকে। (চিত্র 1.17)।

যে সমস্ত অঞ্চলে সম্প্রপাত প্রায়ই ঘটে, সেখানে যদি ঢালে খাত সৃষ্টি হয়, তা হলে তাকে 'সম্প্রপাত স্যুট' (avalanche chutes) বলে।

আকস্মিক ঘটার জন্য সম্প্রপাতের ফলে ঘরবাড়িও ধ্বংস হতে পারে। পার্বত্য পথগুলিতে হিমানী সম্প্রপাত বা শিলা সম্প্রপাত যানবাহন চলাচলে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটায়।

III. ধ্বস (Land slides) — ঢালের উচ্চ অংশ থেকে নীচের দিকে শিলাখণ্ড বা শুষ্ক মৃত্তিকার পতনকে ধস বলা হয়। এটি নানা কারণে ঘটতে পারে, যেমন, (i) ঢালের অতি-তীব্রতা (ii) অধিক বৃষ্টিপাত অথবা তুষারগলা জলের প্রাচুর্য (iii) যে শিলাগুলি সিক্ত হলে পিচ্ছিল হয়, (iv) ভূমিকম্প, (v) ঢালে অবস্থিত বনভূমি মানুষ দ্বারা অপসরণ বা ধ্বংস ইত্যাদি।

ভূতত্ত্ববিদেরা ধ্বসকে ৫টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—

(i) স্লাম্প (slump), (ii) অবস্কর বিসর্পন (debris slide), (iii) debris fall, (iv) শিলাখণ্ড বিসর্পন, (v) শিলাচ্যুতি বা লোষ্ট্র পতন (rock fall)।

(i) স্লাম্প (slump) — নদী, সমুদ্রতরঙ্গ বা মানুষের কার্যের ফলে ঢালের নীচের অংশ কর্তিত হলে সাধারণতঃ বক্রআকারে (curve like) শিলাখণ্ডগুলি খাড়া ঢাল বরাবর গড়িয়ে নীচের দিকে পতিত হলে তাকে স্ল্যাম্প বলে। এই প্রক্রিয়ায় শিলাখণ্ডগুলির সঞ্চালনে পিছনের দিকে আবর্তন (backward rotation) লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র 1.16, 1.21)

(ii) অবস্কর বিসর্পন (Debris slide) — এই প্রক্রিয়ায় শিথিল মৃত্তিকা পিছনের দিকে আবর্তন ছাড়াই যদি গড়িয়ে বেয়ে নীচের দিকে দ্রুত অবতরণ করে। সাধারণতঃ কোন দুর্বল তল বরাবরই এটি হয়ে থাকে। (চিত্র 1.16)

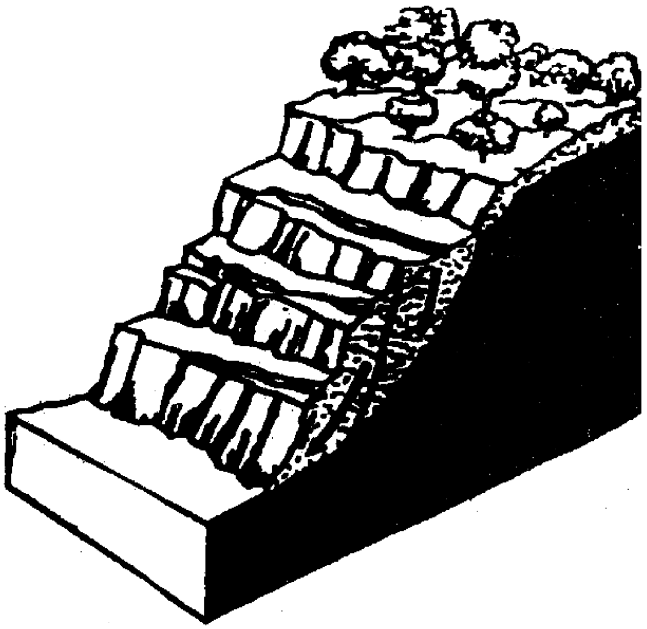

চিত্র 1.21 : স্লাম্প সংঘটিত ধস

(iii) অবস্কর পতন (Debris fall) — এই প্রক্রিয়ায় ঝুঁকে থাকা অথবা অতি খাড়া ঢাল বরাবর প্রায় লম্বালম্বিভাবে মৃত্তিকা ও শিলাখণ্ড নীচে পতিত হয়। সাধারণতঃ নদীক্ষয়ের দ্বারা যদি নদীর পাড়ের অংশ কেটে অতি খাড়া ঢালের সৃষ্টি হয়, সেই জায়গায় এই পদ্ধতি বেশী লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র 1.16)

(iv) শিলাখণ্ড বিসর্পন (Rock Slide) — এই প্রক্রিয়ায় কোন স্তরায়ন - তল, শিলার দারন (joints) বা চ্যুতিতল (faults) বরাবর শিলাখণ্ডগুলি গড়িয়ে বা খাড়াভাবে নীচের দিকে পড়ে। (চিত্র 1.1, 1.6)

(v) শিলাচ্যুতি বা লোষ্ট্রপতন (Rockfall) — এই প্রক্রিয়ায় কোন খাড়া ঢাল বরাবর শিলাখণ্ডের পতন ঘটে। এই প্রক্রিয়া পার্বত্য অঞ্চলে, উষ্ণমণ্ডলে বর্ষার সময় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসন্তকালে বেশী হয়। (চিত্র 1.6)

(vi) অবনমন (Subsidence) — এই প্রক্রিয়ায় ঢালের ওপরের মাটি, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি ঢালের নতির দিকে অথবা ধারের দিকে না সরে নীচের দিকে বসে যায়। ভূগর্ভে খনিজদ্রব্যের উত্তোলন বা কঠিন ভূপৃষ্ঠের তলা থেকে লাভার উদ্গীরন হলে অথবা নীচের দিকে বসে যাওয়া ভূমিভাগের তলা থেকে পদার্থসমূহ অপসারিত হতে থাকলে অথবা ভূ-গর্ভস্থ জলের তল খুব নেমে গেলে, ওপরের অংশ বসে যেতে পারে (Land subsidence)। এর ফলে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত ঘর-বাড়ি সব ভেঙ্গে পড়ে।

1.12 ভূমিরূপের ওপর পুঞ্জিত ক্ষয়ের প্রভাব

পুঞ্জিভূত ক্ষয় ধীরভাবে অথবা দ্রুতভাবে ঢালের ভূমিভাগের অবনমন ঘটায়। এর ফলে জলবিভাজিকা অঞ্চলের ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটে। রিচ্ (Rich — 1957)–এর মতে যে অঞ্চল বিষমশিলা দিয়ে গঠিত সেই অঞ্চলে পুঞ্জিত ক্ষয় বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

ক্রীপ (Creep) ক্রমঢালু (Gently sloping land) অঞ্চলেও কাজ করতে সক্ষম বলে, এই প্রক্রিয়াটি বেশী অঞ্চল জুড়ে কার্যকরী হয়।

চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে গহ্বরের ছাদ ধ্বসে পড়ার ফলে সিঙ্কহোল, উভালা প্রভৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

জলাভূমি অঞ্চলে পাঁকের সংবদ্ধতা, লাভা প্রবাহের ওপরের অংশে কঠিন ভূত্বকের নীচে তরল লাভার নিষ্কাশন অবনত ভূমি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

1.13 মানুষের জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর পুঞ্জিতক্ষয়ের প্রভাব

ভূমিরূপের উপর তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার না করলেও ধস ও স্লাম্প মানুষের জীবনযাত্রার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ধ্বস বিশেষ করে এক দৈব দুর্বিপাক (natural hazard) নামে পরিচিত কারণ এর আকস্মিকতা ও ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব মানুষের জীবনহানি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিপর্যয় ঘটায়।

ধসের বিধ্বংসী রূপের নমুনা পৃথিবীর নানা এলাকা থেকেই পাওয়া যায় এগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বৃহৎ আকারের ধস এমনকি ক্ষুদ্র আকারের ধসও স্থান বিশেষে প্রায়ই বিনাশকারী প্লাবনের (flood) সৃষ্টি করে। অনেক সময় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধস নেমে নদীর পথ রুদ্ধ করে দেয় ও নদীবক্ষে বাঁধের সৃষ্টি হয়। এই ধসজনিত বাঁধ ভেঙ্গে যখন অবরুদ্ধ নদী ও তার পিছনে সৃষ্ট হ্রদের জল নিষ্কাশিত হয়, তখন চারপাশের ভূমিকে প্লাবিত করে দেয়। নদীর পথ রুদ্ধ না হয়েও ধ্বসের জন্য নদীর জলস্ফীতি ঘটে সংলগ্ন এলাকাকে প্লাবিত করে। পাহাড়ী নদী নালা অবরোধের ফলে নিম্নপ্রবাহে অবস্থিত জনপদ-গুলোতেও জল সংস্থানের অভাব হয়।

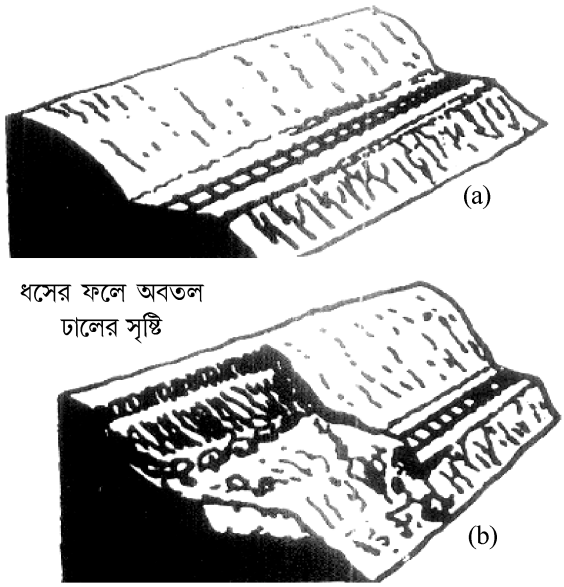

ধসের ফলে অবতল ঢালের সৃষ্টি

ক্রমে ক্রমে ধসজনিত বস্তু রেলপথ ঢেকে ফেলে রেলপথের ধারে ধস

চিত্র 1.22

আবার পাহাড়ী অঞ্চলে ঢালের ওপর রাস্তা তৈরি করার সময় পথের পাশে অবস্করের অবলম্বন অপসারণের কারণ ঘটায়। সেইজন্যই পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় ঢাল বেয়ে ধস নেমে পথঘাটের অবরোধ ঘটায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রেল লাইনের ওপরে অত্যধিক বর্ষণের ফলে ধস নামে ; এর ফলে অবতল ঢালের সৃষ্টি হয় এবং উপর থেকে ধসজনিত পদার্থ নেমে এসে ক্রমে রেলপথকে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে। (চিত্র 1.22)

অতএব ধস প্রতিরোধকারী নিম্নলিখিত কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত—

(i) এলাকাটির তীক্ষ্ণ ও বিস্তারিত সমীক্ষা। (বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে)।

(ii) পথের ধারে উচ্চ ঢালের দিকে দেওয়াল বাঁধানো।

(iii) নদীর তট বাঁধানো (বিশেষ করে নদী যেখানে ভঙ্গিল শিলার উপর প্রবাহমান)।

(iv) কৃত্রিম আওয়াজের সাহায্যে ধ্বস নামানো যায়। এটি বিশেষ করে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পাহাড়ী জায়গায়। বসন্ত কালের শেষে যখন বরফ গলে তখন অবস্করের মধ্যে সহনশীলতা কমিয়ে দেয় ও তাই ধ্বসের প্রবণতা বাড়ে। এই সকল কৃত্রিম আওয়াজের ফলস্বরূপ কম্পন ধস নামিয়ে এক বড় ধরনের ধস বা ধসের সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে। ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে বর্ষা নামার আগে এই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(v) পত্রায়িত রূপান্তরিত শিলাদ্বারা গঠিত অঞ্চলে পত্রায়ন তল বরাবর ধ্বস নামার প্রবণতা থাকে। এটি কোমল শিলা দিয়ে গঠিত পাললিক শিলাযুক্ত অঞ্চলেও এটি প্রচলিত। বিশেষত সিস্ট (Schist) ও শেল (Shale) যুক্ত অঞ্চলে বেশী হয়। এ ক্ষেত্রে পথের ধারে এবং পাহাড়ী ঢালের পাদদেশে দেওয়াল কাটালে এটি ধস প্রতিরোধ করতে পারে।

(vi) অনাহত বা স্বল্প উদ্ভিদ বিশিষ্ট অঞ্চলে ধসের প্রবণতা থাকে বলে পার্বত্য অঞ্চলে তৃণাচ্ছাদন ও বৃক্ষরোপণ করা উচিত। এই উদ্ভিদগুলির শিকড় মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

(vii) কৃত্রিম নালা কেটে জল নিষ্কাশন করলে সেই অঞ্চলে ধস নিবারণ বাড়া বা কমানো যায়।

(viii) ধসপ্রাপ্ত অঞ্চলে ঢালের গায়ে একটি চামচের আকারে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং এই জায়গা দিয়ে পরবর্তীকালে আরও ধস নামতে সুবিধা হয়। সুতরাং এই নগ্ন শিলা স্থানে প্রথমে তৃণাচ্ছাদন এবং পরে বৃক্ষরোপণ করা উচিত। এতে ভবিষ্যতে ধ্বসের সম্ভাবনা কমে যায়।

1.14 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আপনি জেনেছেন যে, অবরোহন প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে আবহবিকার ও পুঞ্জিত ক্ষয় দুটি প্রধান প্রক্রিয়া। ভূমিরূপ উদ্ভব, গঠন, বিনাশ ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে এই দুই প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলার যান্ত্রিক বিচুর্ণীভবন ও রাসায়নিক বিয়োজন হয়, তাকেই আবহবিকার বলে। আবহবিকারের তিনটি প্রধান প্রকার যথা যান্ত্রিক আবহবিকার, রাসায়নিক আবহবিকার ও জৈবিক আবহবিকার এই এককে আলোচিত হয়েছে। যদিও জৈবিক আবহবিকার বর্তমান এককে পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে এবং আপনারা পৃথকভাবে এর সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন, তথাপি বলা যেতে পারে যে জৈবিক আবহবিকার কোন কোন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে (জৈব-যান্ত্রিক) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদ্ধতিতে (জৈব-রাসায়নিক) সংঘটিত হয়। ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রেও আপনারা দেখেছেন যে, কোন কোন ভূমিরূপ শুধুমাত্র আবহবিকারের ফলেই সৃষ্টি হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষয়ীভবন ও আবহবিকার যৌথভাবে ভূমিরূপ গঠনে সহায়তা করে।

ঢাল অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শিলা, মৃত্তিকা অবস্কর প্রভৃতির যে নিম্নমুখী প্রবাহ, তাকেই পুঞ্জিত ক্ষয় বলে। বর্তমান এককে ধীর পুঞ্জিত ক্ষয় ও দ্রুত পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ করে তাদের সম্বন্ধে আপনারা অবহিত হয়েছেন। এ ছাড়া ভূমিরূপের উপর পুঞ্জিত ক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধেই এই এককে আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে মানবজীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর পুঞ্জিত ক্ষয়ের প্রভাব সম্বন্ধেও আপনাদের আলোকপাত করা হয়েছে।

1.15 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. বিষয়মুখী / রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (600 শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে)

(i) পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ করুন এবং তাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(ii) পুঞ্জিত ক্ষয়ের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(iii) গতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পুঞ্জিত ক্ষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (150টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে)

(i) ধীর পুঞ্জিত ক্ষয় ও দ্রুত পুঞ্জিত ক্ষয়ের মধ্যে পার্থক্য কী ?

(ii) বিভিন্ন প্রকার ধ্বসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(iii) ধীর পুঞ্জিত ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ করুন।

C. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (50টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে)

(i) মৃত্তিকা বিসর্পন কাকে বলে ?

(ii) ট্যালাস্ বিসর্পন কাকে বলে ?

(iii) সোলিফ্লাক্সন কাকে বলে ?

(iv) হিমানী সম্প্রপাত কাকে বলে ?

D. **নৈর্ব্যক্তিক বা অব্‌জেকটিভ প্রশ্ন :**

1. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(a) মৃত্তিকা বা প্রস্তরখণ্ড নীচে বসে গেলে তাকে —— বলে।

(b) জল শোষণের ফলে কর্দম খনিজের সংসক্তি হ্রাস হয় ও তার —— ঘটে।

(c) মৃত্তিকাসমূহ ঢাল বরাবর গড়িয়ে নীচের দিকে নেমে আসলে তাকে —— বলে।

(ii) সত্য/মিথ্যা বলুন ঃ

(a) পুঞ্জিত ক্ষয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সংঘটিত হয়।

(b) বিসর্পন একটি দ্রুত পুঞ্জিত ক্ষয়।

(c) স্বল্প ঢালযুক্ত অঞ্চলে অবস্কর পতন দেখা যায়।

(d) মৃত্তিকা বিসর্পনের ক্ষেত্রেও মৃত্তিকা জলসিক্ত হয়।

1.16 উত্তরমালা

A. (i) 1.11 দ্রষ্টব্য

(ii) 1.10 দ্রষ্টব্য

(iii) 1.11.1 দ্রষ্টব্য

B. (i) 01.11.2.1 এবং 01.11.2.2 দ্রষ্টব্য

(ii) 01.11.2.3 দ্রষ্টব্য

(iii) 0.11.2.1 দ্রষ্টব্য

C. (i) 01.11.1 অংশের অন্তর্গত মৃত্তিকা বিসর্পণের অংশটি দেখুন।
(ii) 01.11.1 অংশের অন্তর্গত ট্যালাস্ বিসর্পণের অংশটি দেখুন।
(iii) 01.11.2.1 অংশের অন্তর্গত 'সোলিফ্লাক্সন' অংশটি দেখুন।
(iv) 01.11.2.2 অংশের অন্তর্গত 'অবস্কর প্রবাহ' অংশটি দেখুন।

D. (i)/a অবনমন
(i)/b স্ফীতি
(i)/c সোলিফ্লাক্সন্
(ii)/a সত্য
(ii)/b মিথ্যা
(ii)/c মিথ্যা
(ii)/d সত্য

একক 2 ❑ চক্রীয় ও অ-চক্রীয় মতবাদ : ডেভিস, পেঙ্ক ও হ্যাকের তত্ত্ব (Cyclic and Non-cyclic Concept : Concept of Davis, Penck and Hack)

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.2 ক্ষয়চক্র-ডব্লু. এম্. ডেভিসের মতবাদ

2.2.1 যৌবন অবস্থা

2.2.2 পরিণত অবস্থা

2.2.3 বার্ধক্য অবস্থা

2.3 ডেভিসের মতবাদের সমালোচনা

2.3.1 মতবাদের ইতিবাচক দিক

2.3.2 মতবাদের নেতিবাচক দিক

2.4 পেঙ্কের ভূমিরূপ বিবর্তন ধারণা

2.4.1 ক্ষয়কার্য সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

2.4.2 তিন প্রকার ভূমি উত্থানের হার।

2.4.3 'ট্রেপেন'-এর উৎপত্তি

2.4.4 পেঙ্কের মতবাদের সমালোচনা

2.5 হ্যাকের অচক্র ভূমিরূপ বিবর্তনের ধারণা

2.5.1 গতিশীল ভারসাম্য তত্ত্ব

2.5.2 উন্মুক্ত প্রণালী

2.5.3 একটি উদাহরণ

2.5.4 হ্যাকের গতিশীল ভারসাম্যতত্ত্বের সমালোচনা

2.6 সারাংশ

2.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

2.8 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

আগের এককে আবহবিকার এবং পুঞ্জিত ক্ষয় এবং ভূমিরূপ উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই প্রক্রিয়ার ভূমিকা ও প্রভাব আলোচিত হয়েছে। বর্তমান এককে আপনি ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে চক্রীয় ও অচক্রীয় মতবাদ

সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন। ভূমিরূপবিদ্যায় বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায় থেকে আরম্ভ করে শেষ বা চূড়ান্ত পর্যায়ে ভূমিরূপের যে উদ্ভব, বিকাশ, রূপান্তর ও বিনাশ হয়, তাকে ক্ষয়চক্র (Cycle of Erosion) বলে। ডব্লু. এম. ডেভিস এই ক্ষয়চক্র মতবাদের প্রথম প্রবক্তা। তার এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে চক্রীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিসের এই চক্রীয় মতবাদের বিভিন্ন পর্যায়ে (stages) সময়ের উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ডেভিস তার স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র প্রসঙ্গে যে ভারসাম্যের উল্লেখ করেন, তা নির্দিষ্ট সময় বা পর্যায়ে অর্থাৎ পরিণত পর্য্যায়েই সংঘটিত হয়।

ডেভিসের এই মতবাদের অন্যতম সমালোচক হিসাবে পেঙ্কের ভূমিরূপ বিবর্তনের ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে বর্তমান এককে ক্ষয়কার্য সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম, তিন প্রকার উত্থানের হার, 'ট্রেপেন'-এর উৎপত্তি এবং পেঙ্কের ঢাল উদ্ভবের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

ডেভিসের চক্রীয় মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বা বিপরীত মেরুর তত্ত্ব হল হ্যাকের অচক্রীয় মতবাদতত্ত্ব। এই তত্ত্ব বর্তমানে এককেও আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে হ্যাকের উন্মুক্ত প্রণালী (open system) এবং গতিশীল ভারসাম্যের তত্ত্ব উদাহরণ সহযোগে বর্তমান এককে আলোচিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- চক্রীয় মতবাদ ও অচক্রীয় মতবাদ কাকে বলে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।
- ডেভিস ক্ষয়চক্র কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন, সে সম্বন্ধে আপনি অবহিত হতে পারবেন। ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্য্যায়গুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।
- ডেভিসের ক্ষয়চক্র তত্ত্ব কারা এবং কোন কোন কারণে সমালোচনা করেছেন, সে সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- ডেভিস ও পেঙ্কের মতবাদের দর্শনগত পার্থক্য কি— তার সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন।
- অচক্রীয় মতবাদ প্রসঙ্গে হ্যাকের গতিশীল ভারসাম্যতত্ত্ব ও উন্মুক্ত প্রণালী সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

2.2 ক্ষয়চক্র — ডব্লু. এম্. ডেভিসের মতবাদ

কোন একটি অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে সেই ভূমিটির ওপর ক্ষয়কার্য এবং গঠনকার্য সাধিত হওয়াকে ক্ষয়চক্র বলে। ভূমিরূপ বিবর্তনে এই ক্ষয়চক্র ধারণাটিকে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রখ্যাত ভূমিরূপবিদ্ ডব্লু. এম্. ডেভিস প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদূর ভবিষ্যত পর্যন্ত প্রকৃতি বা ভূ-ভাগের উপর অবিরাম ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলে এসেছে, চলেছে এবং চলবে। এই ভাঙ্গা গড়া একে অপরের শেষে চক্রাকারে সাধিত হয় বলে একে ক্ষয়চক্র (cycle of erosion) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ''Landforms ... are seen in their significance only if it is remembered that they are developed and are developing''—S.W. Woolridge—এই ভূবৈজ্ঞানিকের উক্তি আমাদের মনে রাখতে হবে।

ভূপৃষ্ঠের এই পরিবর্তন কিন্তু একটি জটিল ও মিশ্র প্রক্রিয়া কারণ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ। (যেমন জল, বায়ু, হিমবাহ, উত্তাপ ইত্যাদি) তাদের বিভিন্ন কাজের (যেমন ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয়) মাধ্যমে ভূভাগের অবিরাম পরিবর্তন ঘটায়। ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে যখন কোন এক ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর উত্থিত হয়, তখন

থেকেই সেই ভূভাগের ওপর বৃষ্টিপাত, নদী, বায়ু, হিমবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ধীরগতিতে তার ওপর ক্ষয়কার্য সাধন করে। ক্রমশঃ ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটে এবং এই ধারাটি যথেচ্ছ না হয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী নিয়মানুগ হয়।

শেষ পর্যন্ত ক্ষয়ের নিম্নসীমায় (base level of erosion) পৌঁছে এই ক্ষয়কার্য থেমে গিয়ে একটি সমপ্রায়ভূমির (peneplain) সৃষ্টি হয়। ডেভিসের মতে এই ক্ষয়চক্র চলাকালীন ভূ-ভাগটি সুস্থিত অবস্থায় থাকে, কিন্তু ক্ষয়কার্যের শেষ অবস্থা যখন আসে তখন আবার ভূ-আন্দোলনের ফলে সেই ভূ-ভাগটি উত্থিত হয় এবং ক্ষয়কার্য আবার শুরু হয়। সুতরাং এই ভূমিরূপের পরিবর্তনের কার্যাবলীর একটি ধারাবাহিকতা আছে বলেই এটিকে ক্ষয়চক্র বলে। ডব্লু. এম্. ডেভিসের ভাষায় ''A landscape has a definite life history during which it shows gradual changes, whereby the initial forms pass through a series of sequiential form to an ultimate form''. অর্থাৎ যে কোন ভূমিভাগের একটি সুনির্দিষ্ট জীবনের ইতিহাস আছে এবং এই জীবনকালের মধ্যে ক্রমিক পর্যায়ে ভূমিচিত্রটির নিয়মিত পরিবর্তনগুলি প্রকাশ পায়। এর ফলে ভূমিরূপ আদি অবস্থা থেকে পর্যায়ক্রমে শেষ পরিণতিতে পৌঁছায়।

ডেভিসের মতানুসারে ভূমিচিত্র বা ভূমিরূপ সেই অঞ্চলের গঠন, প্রক্রিয়া ও পর্যায়— এই তিনটি সমন্বয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে উদ্ভব হয়। ওঁর ভাষায় ''Landscape is a function of structure, process and stage''.

গঠন (structure) অর্থাৎ শিলার বৈশিষ্ট্য যেমন কাঠিন্য (hardness), সচ্ছিদ্রতা ও প্রবেশ্যতা (porosity and permeability), নতি (dip), ভাঁজ (fold) বা চ্যুতি (fault) ইত্যাদিকে বোঝায়। প্রক্রিয়া (process) অর্থাৎ আবহবিকার (weathering), পুঞ্জিত ক্ষয় (mass wasting), নদী, বায়ু, হিমবাহ, সমুদ্রতট প্রভৃতি পরাকৃতিক শক্তিসমূহের কথা বোঝায়। এই সকল শক্তি ভূপৃষ্ঠের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পর্যায় (stage) বলতে কত সময় ধরে এই সকল প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ক্ষয়কার্য সাধন করেছে অর্থাৎ ক্ষয়কার্যের জন্য কত সময় ব্যয় হয়েছে তাকে বোঝায়। এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়েই একটি ভূমিরূপের উদ্ভব হয়।

বিভিন্ন রকমের ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়া (যেমন নদী, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্রতরঙ্গ ইত্যাদি) অনুযায়ী ভূমিরূপ বিবর্তনের ধারাও নানারকমের হয়। এক একটি বিশেষ প্রক্রিয়া দিয়ে সাধিত ভূমিরূপও এক একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে— তাতে আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় যে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির ওপরে কোন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কাজ করেছে। ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনকারী বিভিন্ন শক্তির মধ্যে প্রবাহমান জল (flowing water) অর্থাৎ নদীর কার্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে তাকে "স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র" বা ''Normal cycle of erosion'' বলে।

ডেভিস তাঁর ক্ষয়চক্র মতবাদের বর্ণনার নিম্নলিখিত কিছু ধারণার উপস্থাপনা করেছিলেন।

(i) সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরে উত্থিত ভূমির প্রাথমিক গঠন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন, উল্লম্ব বা তির্যকভাবে উত্থিত, বলিত, চ্যুতি-যুক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণভাবে ডেভিসের ধারণা অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় উল্লম্বভাবে ভূমির উত্থান ঘটে। এটি সম্ভবতঃ ডেভিস তাঁর ধারণাকে সহজভাবে বোঝাবার জন্যই ধরে নিয়েছেন।

(ii) সদ্যোত্থিত ভূমির ওপর আবহবিকার, পুঞ্জক্ষয় ও ক্ষয়কার্যের সাধারণ প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায়।

(iii) ভূমির উত্থান নানা হারে হতে পারে, যেমন- দ্রুত, নিরবিচ্ছিন্ন বা সবিরাম গতিতে। ডেভিস কিন্তু তাঁর মতবাদে ভূমির উত্থানকে দ্রুত হিসাবেই দেখিয়েছেন যার ফলে উত্থানের সময়ে ভূমির ওপর ক্ষয়কার্য সমাপ্ত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

(iv) ক্ষয়চক্র চলাকালীন ভূমিটি সুস্থিত অবস্থায় থাকে। সেইজন্য তখন ভূমিরূপ পরিবর্তনের পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়।

(v) ক্ষয়চক্র কিছুটা সাধন হওয়ার পর যদি ভূ-আন্দোলন হেতু ভূ-ভাগটি আবার খানিকটা উত্থিত হয়, তাহলে আর একটি নতুন বা দ্বিতীয় ক্ষয়চক্রের সূচনা হয়। কিছুকাল পরে আবার একই ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং একটি অঞ্চলে আংশিক বা বহুসংখ্যক ক্ষয়চক্র চলতে পারে (polycyclic region)।

(vi) ক্ষয়চক্রের অধীনে বিভিন্ন ভূমিরূপের ধারাকে সহজে বোঝার জন্য তাকে কতগুলি পর্যায় বা অবস্থায় (stage) ভাগ করা হয়েছে। যেমন— যৌবন, পরিণত এবং বার্ধক্য অবস্থা।

(vii) উপরোক্ত প্রত্যেকটি অবস্থায় ভূমির এক বিশিষ্ট রূপ বা চিত্র বা লক্ষ্মণ আছে।

(viii) কোন এক অবস্থায় (stage) ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য তার গঠন (structure) প্রক্রিয়া (process) এবং অবস্থার (stage) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

(ix) ক্ষয়কার্যের বা নদীর নিম্নক্ষয়ের শেষ সীমাকে ক্ষয়ের নিম্নসীমা (Base level of erosion) বলে। এক্ষেত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠকেই নিম্ন সীমা (০ মিটার) হিসাবে ধরা হয়।

(x) ক্ষয়চক্রের শেষ পর্যায়ে যখন আদি বৈচিত্র্যময় বন্ধুর ভূমিরূপটি একটি হ্রাসপ্রাপ্ত নিম্ন সমপ্রায়ভূমিতে পরিণত হয়, তাকে সমপ্রায়ভূমি (peneplain - almost a plain) বলে।

নদীর ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের নিম্নলিখিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—

2.2.1 যৌবন অবস্থা (Young stage)

(a) ক্ষয়চক্রের যৌবনাবস্থায় ভূমির প্রারম্ভিক ঢাল অনুযায়ী কিছু প্রধান নদী (অনুগামী নদী) ও কিছু উপনদীর উদ্ভব হয়। ক্ষুদ্র উপনদীগুলি মস্তকদেশে প্রসারিত হয় (by headward erosion)। (চিত্র 2.1)

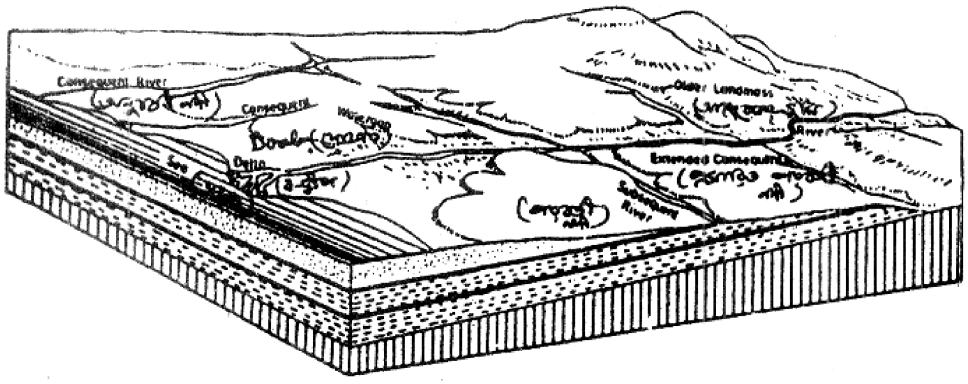

চিত্র 2.1 : অনুবর্তন ও পরবর্তী নদীর ধারণা

(b) যেহেতু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা সব থেকে বেশী থাকে, ভূমির ঢাল ও নদীর নিম্নক্ষয় বেশী কার্যকরী হওয়ায় উপত্যকার আড়াআড়ি পার্শ্বচিত্র 'V' আকৃতির হয়।

(c) নদীগুলি বড় আকারে বাঁক নিতে পারে না কারণ নদীর দুই দিকে খাড়া ঢাল (কঠিন শিলাবেষ্টিত) থাকে। সাধারণতঃ প্লাবনভূমিরও অভাব দেখা যায়। যদি কোথাও নদীতে বাঁক থাকে তবে তা প্রাথমিক

ভূমিরূপ অনুসারেই হয়ে থাকে, যেমন প্রাবরিত অভিক্ষিপ্তাংশ (interlocking spurs) কে অতিক্রম করার জন্য। (চিত্র 2.2.2)

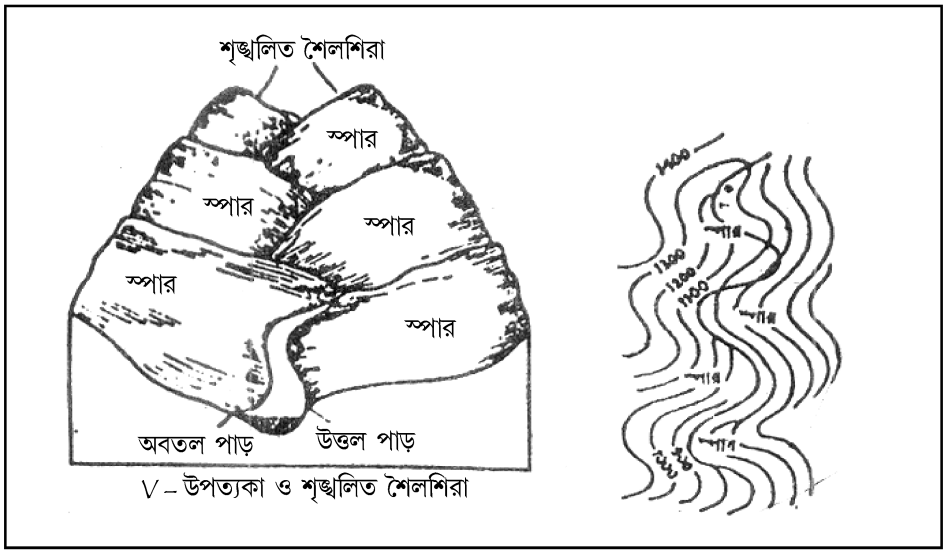

চিত্র 2.2 : ইন্টারলকিং স্পার

(d) এই অবস্থায় নদী বিভাজিকাগুলো সাধারণভাবে প্রশস্ত থাকে। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভাল না থাকার জন্য হ্রদ, জলাভূমি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

(e) দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা 'দোয়াব' (doab) প্রশস্ত হয়। (চিত্র 2.1)

(f) নদীখাত অপর্যায়িত (not graded) অবস্থায় থাকে বলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়।

(g) সাধারণভাবে এই অবস্থায় নদীর ক্ষয়কার্যের নিম্নকর্তন প্রাধান্য থাকে।

পরবর্তীকালে উপত্যকাগুলি আরও প্রশস্ত ও গভীর হতে থাকে। সমগ্রভাবে ভূমির বন্ধুরতা বাড়তে থাকে।

(h) উপত্যকার পার্শ্বদেশ নগ্ন শিলা (bare rocks) দিয়ে আবৃত থাকে।

2.2.2 পরিণত অবস্থা (Mature stage)

(a) উপত্যকাগুলি বিস্তৃতি লাভ করে বলে জলবিভাজিকাগুলি তীক্ষ্ণ ও সংকুচিত হয়। পরবর্তীকালে তার শেষ চিহ্নটুকু অবশিষ্ট থাকে।

(b) নদী বিভাজিকাগুলি সুস্পষ্টভাবে শৈলশিরার (ridge) আকারে অবস্থান করে।

(c) নদী বিভাজিকার শীর্ষদেশের উচ্চতা হ্রাসের হার উপত্যকা গভীরীকরণের থেকে বেশী হয় বলে, সমগ্রভাবে ভূমির বন্ধুরতা কমতে থাকে।

(d) নদীর জল বিস্তৃতি লাভ করে, বিশেষতঃ যখন ভূমিটি সর্বোচ্চ উচ্চতা লাভ করে। নদী জালের ঘন বুনন (high drainage density) সাধারণতঃ সব থেকে বেশী ব্যবচ্ছিন্ন (dissected) অবস্থা নির্দেশ করে।

(e) অঞ্চলের কোন দুর্বল গঠনযুক্ত (weak planes) জায়গাগুলি আবিষ্কার করে, তার উপর প্রবাহিত হতে শুরু করে। এইরকম নদীকে পরবর্তী নদী (subsequent stream) বলে। (চিত্র 2.1)

(f) নদীবক্ষের ঢাল পর্যায়িত হওয়ার ফলে জলপ্রপাত, হ্রদ ইত্যাদি অবলুপ্ত হয়।

(g) নদীগুলি প্রশস্ত প্লাবনভূমির সৃষ্টি করে। (চিত্র 2.3)

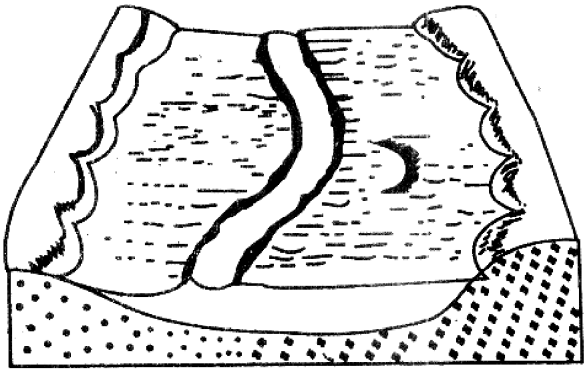

চিত্র 2.3 : বন্যাগঠিত সমভূমি ও সংশ্লিষ্ট ভূমিভাগ

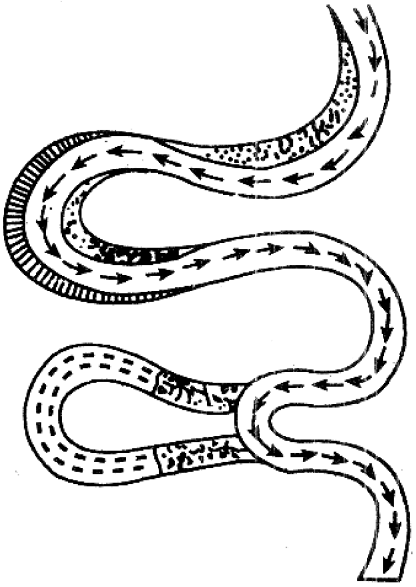

চিত্র 2.4 অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া

(h) উপত্যকায় ঢাল কমে যাওয়ার জন্য নদীতে বড় বাঁকের (meander) সৃষ্টি হয়। বাঁকগুলি স্থান পরিবর্তন করে এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদেরও (ox-bow lakes) সৃষ্টি হয়। কারণ এই অবস্থায় নদী ক্ষয়কার্যের তুলনায় সঞ্চয়কার্য বেশী করে, যার জন্য উপত্যকা গভীরীকরণের (vertical erosion or downcutting) থেকে প্রশস্তীকরণ (lateral erosion) বেশী হয়। নদীর ক্ষয়কার্য ও সঞ্চয়কার্য — দুটিই চলতে থাকে।

(i) এর ফলে নদীর আড়াআড়ি আকৃতি একটু প্রশস্ত V এর মত হয়। (চিত্র 2.11)

(j) উপত্যকার ঢাল পর্যায়িত অবস্থায় পৌঁছায় বলে, যে পরিমাণ শিলাচূর্ণ উপর থেকে আসে মোটামুটি সেই পরিমাণ শিলাচূর্ণই নীচের দিকে অপসারিত হয়। সেই জন্য উপত্যকার ঢাল বরাবর, না ক্ষয় না সঞ্চয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(k) উপত্যকার পার্শ্বদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাচূর্ণ দিয়ে তাই আবৃত থাকে।

2.2.3 বার্ধক্য অবস্থা (old stage)

(a) উপনদীগুলি ক্রমশঃ মস্তকদেশে প্রসারিত হয়ে জলবিভাজিকার শীর্ষদেশ অতিক্রম করে নদীগ্রাস (river capture) ঘটায়। সুতরাং নদী ও উপনদীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। (চিত্র 2.9)

(b) ক্রমাগত ক্ষয়কার্যের ফলে ভূমির সাধারণ ঢাল কমতে থাকে ও মৃদু প্রকৃতির হয়। (চিত্র 2.11)

(c) নদীর নিম্নবর্তনের থেকে পার্শ্বক্ষয় বেশী হয় কারণ নদী এখন সহজেই কোমল পলিযুক্ত প্লাবনভূমি ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। সুতরাং নদীর আড়াআড়ি আকৃতি ছড়ানো (ইংরাজি 'ইউ' U অক্ষরের মত) হয়।

(d) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উপত্যকার উচ্চতা অনেক কম থাকার জন্য নদীবক্ষের গভীরতা বহু নীচে পৌঁছায়।

(e) উপত্যকার ঢাল নদী বরাবর ও পার্শ্বদিকে— দুই দিকেই মৃদু প্রকৃতির হয়। সুতরাং বন্ধুরতাও কম হয়।

(f) স্বভাবতঃই দোয়াব অঞ্চলের বা নদী বিভাজিকার শীর্ষদেশের উচ্চতা হ্রাস পেয়ে আর তেমন তীক্ষ্ণ বা সুনির্দিষ্ট থাকে না। (চিত্র 2.10)

(g) নদীর কার্যের চেয়ে পুঞ্জিত ক্ষয় (mass wasting) ও রাসায়নিক ক্ষয় এই অবস্থায় বেশী প্রাধান্য লাভ করে।

(h) সমস্ত অঞ্চলটিতে ক্ষয়প্রাপ্ত (আবহবিকারের জন্য) পদার্থের সঞ্চয় ঘটে। কঠিন শিলা তাই শিলাচূর্ণ দিয়ে আবৃত থাকে। আদি গঠনগত দুর্বল জায়গাগুলি (যার উপরে নদীখাত তৈরী হয়েছিল) এই গভীর পলিস্তরের নীচে চাপা পড়ে যায়। এই অবস্থায় নদীর সঞ্চয়কার্যই বেশী প্রাধান্য পায়।

(i) ভূমিভাগের ঢাল মৃদু হওয়ার জন্য নদী অনেকাংশে বড় বড় বাঁকে পরিণত হয় এবং নদী স্থানও পরিবর্তন করতে পারে।

(j) এই অবস্থায় মৃদু ঢালের উপর দিয়ে নদী খুব ধীর গতিতে বয়ে চলে। মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদেরও (ox-bow lakes) সৃষ্টি হয়।

(k) নদীর পলিমাটি (alluvium or silt) দিয়ে গঠিত প্লাবনভূমি বিস্তৃত রূপ নেয়। এই প্লাবনভূমিতে হ্রদ, জলাভূমি ইত্যাদিও থাকতে পারে। (চিত্র 2.3, 2.4)

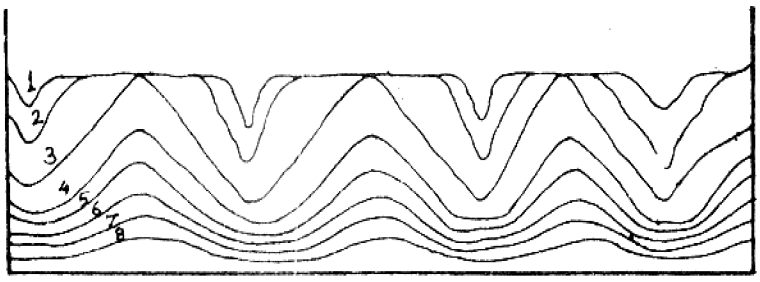

নদীর ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন অবস্থায় উপত্যকার ছেদ। 1 ও 2 যৌবন অবস্থা, 3 প্রারম্ভিক পরিণত অবস্থা, 4 ও 5 মধ্য পরিণত, 6 বিলম্ব পরিণত, 7 ও 8 সমপ্রায় ভূমি গঠনের মধ্যে বার্ধক্য অবস্থা

চিত্র 2.11

(l) অবশেষে সমগ্র অঞ্চলটি নিম্নক্ষয় সীমার (base level of erosion - sea level) অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি একটি তরঙ্গায়িত সমভূমির (undulating plain) সৃষ্টি হয়। এই ভূমিকেই ডেভিস 'পেনিপ্লেন' (peneplain - almost a plain) অর্থাৎ সমপ্রায়ভূমি আখ্যা দিয়েছেন।

এই ভূমির কিছু অংশে (দূরে দূরে অবস্থিত) নদী বিভাজিকায় (কঠিন শিলার) অংশবিশেষ ছোট ছোট পাহাড় বা টিলার আকারে দাঁড়িয়ে থাকে। এগুলিকে ডেভিস 'মোনাডনক্' (Monadnock) নাম দিয়েছেন। (চিত্র 2.10) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব দিকে নিউ হ্যাম্পশায়ারে এরকম পাহাড়— মান্ট মোনাডনক্ নামানুসারে এই নামকরণ করা হয়েছে। (চিত্র 2.5, 2.6, 2.10)।

ক্ষয়চিত্রের শেষ সীমায় পৌঁছলে নদীগুলি পর্যায়িত অবস্থায় (graded stream) পরিণত হয়।

ডেভিসের মতে একটা ক্ষয়চক্র (তিনটি অবস্থার অবশেষে) সমাপ্ত হলে, ভূমিভাগ আবার উত্থিত হয় (ভূ-আন্দোলনের জন্য) এবং সেই ভূমির ওপর আবার নতুন এক ক্ষয়চক্রের সূচনা হয়। পর্যায়িত নদী (graded stream) তখন পুনর্যৌবন (rejuvenation) লাভ করে এবং তাই সেই নদীবক্ষে 'নিক্‌পয়েন্ট' (kinck point) দেখা যায়। (চিত্র 2.7, 2.8)। পুনরায় নদীর নিম্নক্ষয় শুরু করে আবার পর্যায়িত অবস্থায় (graded profile) আসার চেষ্টা করে। মনে রাখা দরকার যে সমুদ্রপৃষ্ঠেই (sea-level) আর্দ্র ক্ষয়কার্যের নিম্নসীমা হিসেবে গণ্য হয়।

2.3 ডেভিসের মতবাদের সমালোচনা

ডেভিসের মতবাদের ভাল মন্দ দুই দিকই রয়েছে।

2.3.1 ইতিবাচক দিক (Positive aspects)

(a) ডেভিসের ক্ষয়চক্র মতবাদটি অতি সরল ও সহজ করে বোঝানো হয়েছে। ওঁর ভাষা সাবলীল। ''Landform is a function of structure, process and stage''—এই একটি উক্তিতেই তাঁর মতবাদের সারমর্ম বোঝা যায়।

(b) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আসল ভূমিরূপের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই (on the basis of detailed field observations) তিনি তাঁর মতবাদটি খাড়া করেছেন।

(c) হাটনের (Hutton) ভূ-ভাগের চক্রের ন্যায় বিবর্তনের অনেক কাল পরই ডেভিসের ভূমিরূপ বিবর্তনে এই ক্ষয়চক্র ধারণাটি এক **সহজবোধ্য** ধারণা হিসেবে গণ্য করা হয়।

(d) ওঁর মতবাদটি কিছু ভূ-তাত্ত্বিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে হয়েছে, যেমন 'ক্ষয়ের নিম্নসীমা' (base level of erosion), জি. কে. গিলবার্টের উপর ভিত্তি করে পর্যায়িত নদীর ধারণা (the concept of a graded stream based on G.K. Gilbert), ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের মতানুসারে নদীর সাম্য-রেখার (profile of equilibrium of a river) ধারনা ইত্যাদি।

(e) ডেভিসের মতবাদানুসারে একটি ভূ-ভাগের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যত বা পরবর্তী ভূমিরূপের ধারণাও করা যায়।

2.3.2 ডেভিসের মতবাদের নেতিবাচক দিক (Negative aspects)

(a) প্রথমতঃ ওঁর মতানুসারে ভূমি উত্থান যে দ্রুতগতিতে এবং অল্পকালের মধ্যে সম্পন্ন হয় তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। পাত-সংস্থান (plate tectonics) বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ভূমির উত্থান একটি অত্যন্ত ধীর গতিতে ও ক্রমাগতরূপে হয়ে থাকে।

(b) ভূভাগের উত্থান ও ক্ষয়ের সম্পর্কটিও যথাযথ নয়। ডেভিসের মতে ভূমির উত্থান একেবারে থেকে গেলেই তবে তার ওপর ক্ষয়কার্য শুরু হয়, অথচ বাস্তবে তা ঘটে না। ভূমির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষয়কার্য চলতে থাকে। **পেঙ্কেরা** মতে ভূমিভাগের উত্থান বার্ধক্য (old stage) অবস্থা অবধি চলতে পারে। ডেভিস অবশ্য বলেছেন যে তাঁর মতবাদকে সহজ ও সরল করার জন্য এবং এই প্রাথমিক অবস্থায় (ভূমি উত্থানের সঙ্গে ক্ষয়কার্য চলার সময়) ক্ষয়কার্য খুবই কম পরিমাণে হয় বলে, তিনি এই বিষয়টিতে গুরুত্ব দেননি।

(c) ভূমি উত্থানের পর সুদীর্ঘকাল ধরে ভূমিটি সুস্থির অবস্থায় থাকে বলে ডেভিস দাবী করেছেন। কিন্তু পাত-সংস্থান (plate tectonics) অনুসারে ভূ-ত্বকের পাত (crustal plates) সর্বদাই ভ্রাম্যমান এবং তার জন্য ভূ-আলোড়ন প্রায়ই ঘটে ভূপৃষ্ঠকে প্রভাবিত করে। ডেভিস আবার এই প্রতিবাদে সাড়া দিয়ে বলেছেন যে যদি ভূমিটি বেশীদিন সুস্থির অবস্থায় না থাকে, তবে **ক্ষয়চক্র** চলাকালীনই নতুন আর এক বা একাধিক ক্ষয়চক্রের (multicyclic or polycyclic regions) সূচনা হতে পারে।

(d) ডেভিসের মতানুসারে সমপ্রায়ভূমি (peneplains) আধুনিক পৃথিবীতে সেরকমভাবে দেখা যায় না।

(e) ডেভিসের মতে শৈলশিরাগুলির (ridge) উচ্চতা নিম্নমুখী ক্ষয়ের ফলে হ্রাস পায়, কিন্তু পেঙ্কের মতে পশ্চাৎদেশীয় ক্ষয়ের (back wasting) ফলে কমে।

(f) ডেভিস তাঁর মতবাদে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভূমিরূপের বিবর্তনের ইতিহাস (time-dependent

series) স্থাপন করতে চেয়েছেন। অপরদিকে পেঙ্ক 'সময়-নিরপেক্ষ' (time-independent series) মতের উপস্থাপনা **করেছেন**। সময়ের থেকেও ভূমির গঠন ও ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়ার ওপর পেঙ্ক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। পেঙ্ক ভূমির উত্থানের **হারের** সঙ্গে ক্ষয়কার্যের হারের সম্পর্ক স্থাপন করায় বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন।

(g) এ. এন্. স্ট্র্যাহলার (A. N. Strahler), জে. টি. হ্যাক (J.T. Hack), আর. জে. চোরলে (R.J. Chorley) প্রমুখ ভূমিরূপবিদেরা ডেভিসের পর্যায়ক্রমে ভূমি বিবর্তনের ধারণাকে (theory of historical evolution) অস্বীকার করেছেন। তার পরিবর্তে তাঁর । অচক্র ভূমিরূপ বিবর্তনের ধারণাকে (non-cyclic concept of erosion) কে উপস্থাপন করেছেন। ডেভিসের বন্ধ ধারণার (closed system) পরিবর্তে বা উন্মুক্ত ধারণাকে (open system) বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা।

ডেভিসের ভূমিরূপ বিবর্তনে ক্ষয়চক্র ধারণার কঠোর প্রতিবাদ করেন ওয়াল্থার পেঙ্ক (Walther Penck) এবং পরবর্তীকালে জে. টি. হ্যাক (J.T. Hack) তাঁর অচক্র গতিশীল সাম্য ধারণার (non cyclic) dynamic equlibrium concept) মাধ্যমে।

2.4 পেঙ্কের ভূমিরূপ বিবর্তন ধারণা

ভূমিরূপ বিবর্তনে ডব্লু. এম. ডেভিসের ধারণাটি একটি বন্ধ ধরনের প্রণালীকে (closed system) উপস্থাপন করে। ভূ-উত্থানের পর ভূমিটি যখন সুস্থিত অবস্থায় থাকে। তখন এক স্থৈতিক শক্তির প্রভাবে নির্মোচন প্রক্রিয়ায় ভূমিটি এক নিয়মিত ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্ষয়ের শেষ অবস্থায় পৌঁছায়। ক্ষয়ের নিম্নসীমায় (Base level of erosion) পৌঁছলে স্থৈতিক শক্তিটি নিঃশেষিত হয়। সুতরাং ডেভিসের মতবাদটি অতি সরল, অবাস্তব ও তত্ত্বীয় ধরনের। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভূমির অস্থিরতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান-পতন, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জলচক্রের পরিবর্তন অতি জটিল রূপ নেয়।

ডেভিসের সমালোচক হিসাবে ডব্লু পেঙ্ক, (L.C. King) এ. সি কিং, **হ্যাক্** (Hack) **ইভানস্**, (Evans) **রাম্সে** (Ramsay) **ক্রিক্মে** (Crickmay) প্রমুখ ভূবৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন প্রস্তাবনা রেখেছেন। 1928 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ভূমিরূপবিদ ওয়াল্থার পেঙ্ক (Walther Penck) তাঁর 'Die Morphologische Analyse' পুস্তকটিতে ভূমিরূপ বিবর্তনে এক সর্বাধিক মৌলিক ধারণার অবতারণা করেন। ওঁর মতে ভূমিরূপ বিবর্তনের জন্য অন্তঃস্থ (endogenic) এবং বহিঃস্থ (exogenic) বলের অনুপাত বিবেচনা করা উচিত। এক কথায়, ভূ-আন্দোলনের হারের ওপর ক্ষয়কার্যের হার এবং ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থের অপসারণের হারও নির্ভর করে। ডেভিসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এটাই বলতে চেয়েছেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূ-আন্দোলনজনিত উত্থান (endogenetic force—rate of uplift of a landmass) এবং ক্ষয়কার্য (exogenetic force - rate of vertical incision of a landmass) একই সঙ্গে চলতে থাকে। বিভিন্ন জলবায়ুতে ক্ষয়কার্যের হারের পার্থক্য ঘটতে পারে। উপরন্তু এই ভূ-আন্দোলনের হার সাধারণভাবে মন্থর গতির।

পেঙ্কের মতবাদ মূলতঃ শিলার অবক্ষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চার ওপর নির্ভরশীল। অবক্ষয় প্রক্রিয়ার দ্বারা ভূ-ত্বক চূর্ণ, বিচূর্ণ হয় এবং এই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি গতিশীল ও বহনযোগ্য হয়। আবহবিকার ও ক্ষয়প্রাত পদার্থগুলির নীচের দিকে অবতরণ করার প্রক্রিয়াসমূহ, যেমন rainwork, soil creep ও mass movement (পুঞ্জিত ক্ষয়) ইত্যাদির ওপর পেঙ্কের ধারণা প্রতিষ্ঠিত।

2.4.1 পেঙ্কের মতে ক্ষয়কার্য কিছু সাধারণ নিয়মানুসারে হয়ে থাকে

(a) কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে ক্ষয়কার্যের তীব্রতা এই অংশের ঢালের সঙ্গে সমান অনুপাতে ঘটে।

(b) ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলির আয়তনের ওপর কোন অংশের ভূমির ঢাল নির্ভর করে।

(c) সাধারণভাবে, ভূমির ঢাল বেশী হলে, তার পরিবহন ক্ষমতা বেশী হয় এবং বৃহত্তর শিলাখণ্ডগুলি দ্রুত ও সহজে অপসারিত হয়।

(d) ঢালের কোন অংশে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলির পরিমাণ সমান থাকলে, তাহলে ক্ষয়কার্যের দ্বারা সমান্তরাল দিকে ঢালের পশ্চাদপসরণ ঘটে।

(e) কোন এক পশ্চাৎগামী ঢালের পাদদেশে যদি কোন ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়, তাহলে পূর্ববর্তী ঢালের সামনের দিকে অপেক্ষাকৃত কম ঢালযুক্ত অন্য এক ভূমির সৃষ্টি হয়।

ডেভিসের ভূমি বিবর্তনে stage বা অবস্থার কথা উল্লেখ না করে পেঙ্ক উল্লেখ করেছিলেন 'enturicelung' বা 'development' যা উন্নয়ন বা বিকশিত হওয়াকে বোঝায়। পেঙ্কের মতে, ভূমিবিবর্তনের গোড়ার দিকে সমুদ্রতলের কাছাকাছি এক বন্ধুরতাহীন নিম্ন সমপ্রায়ভূমি অবস্থান করে। এটিকে পেঙ্ক 'প্রাইমারামফ' 'primarumpf অর্থাৎ 'primary peneplain' নাম দিয়েছেন। এই প্রাথমিক ভূমিতে ক্ষয়জনিত পলি সঞ্চয়ের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভূমির উত্থান প্রাথমিক পর্বে ধীরগতিতে, তার পর ত্বরান্বিত এবং পর্যায়ক্রমে মন্থর গতিতে সম্পন্ন হয়ে অবশেষে সুস্থিত অবস্থায় এসে পৌঁছায়। ভূমিরূপের বিবর্তনও কিরকম হবে তা নির্ভর করে ভূমির উত্থানের হারের ওপর।

2.4.2 ভূমি উত্থানের হারকে পেঙ্ক প্রধানতঃ তিনটি প্রকারে ভাগ করেছেন

(i) ক্রমবর্ধমান উত্থান aufsteigende entwickelung),

(ii) সম-উত্থান (glichformige entwickelung),

(iii) ক্ষীয়মান-উত্থান (absteigende entwickelung)।

উত্থানের প্রকৃতির ওপর উপত্যকার ঢালের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়।

(i) Aufsteigenda entwickelung বা ক্রবর্ধমান পর্যায়ে ত্বরণ সহকারে ভূমির উত্থান ও ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ভূমির ক্ষয়কে বোঝায় (waxing or accelerating rate of landform development)। এই পর্বে ভূমির উত্থানের হারের থেকে উপত্যকা গভীরীকরণের হার (rate of downcutting or vertical erosion) কম থাকে এবং উপত্যকা গভীরীকরণের সঙ্গে সমতা রেখে উপত্যকার প্রশস্তীকরণও কম হয়। সাধারণভাবে নদীর নিম্নক্ষয়ের জন্য V আকারের উপত্যকার সৃষ্টি হয়। উপত্যকার পার্শ্বদেশ উত্তল প্রকৃতির (convex slope) হয়। ভূমির বন্ধুরতাও সাধারণভাবে বাড়তে থাকে।

পরবর্তীকালে এইরূপ গম্বুজাকৃতি ভূমিতে পাদদেশীয় ধাপের (piedmont treppes) সৃষ্টি হয়। (চিত্র 2.16)

চিত্র 2.16 : পেঙ্কের ধারণা অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান গম্বুজের গায়ে পাদদেশীয় ধাপ উদ্ভবের চিত্র।
(piedmont treppen)

(ii) gleichformige entwickelung বা সম-উত্থান (uniform development of landform) পর্যায়ে ভূমির উত্থান সমভাবে ঘটে এবং ভূমিক্ষয়ও সমভাবে হয়ে থাকে। এই পর্বে ভূমির বন্ধুরতা ও উপত্যকার ঢাল অপরিবর্তিত থাকে এবং উপত্যকার পার্শ্বদেশের ঢাল সমতল প্রকৃতির হয়।

(iii) **Absteigende** entwickelung (waning or decelerating rate of landform development) পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান ভূমির উত্থান ও ক্রমবর্ধমান ভূমিক্ষয় বোঝায়। এই পর্বে উপত্যকার পার্শ্বদেশের ঢাল অবতল (concave slope) প্রকৃতির হয়। ভূমির বন্ধুরতা ক্রমশঃ কমে যায় কারণ ভূমি উত্থানের হার কমে যাওয়ার ফলে ভূমিক্ষয় বাড়তে থাকে। অপরদিকে সমান্তরালভাবে ভূমির ঢাল পশ্চাদপসরণ করে (parallel retreat of slopes) কারণ— ঢালের ওপর নির্মোচন সমহারে হয়। এই পর্বে উপত্যকার পার্শ্বদেশ দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত থাকে— উপরের অংশটি অপেক্ষাকৃত খাড়া প্রকৃতির (steep slope এবং তাকে grallity slope বা Bosche বা steilwand বা অভিকর্ষক ঢাল বলে। (চিত্র 2.15) এই অধিকতর ঢালযুক্ত ভূমিটি দ্রুততর পশ্চাদপসরণ করে। উপত্যকার নীচের অংশের ঢাল অপেক্ষাকৃত মৃদু ধরনের (gentle slope) হয় এবং তাকে wash slope বা 'Haldenhang' বা ধোয়াট ঢাল (চিত্র 2.15) নাম দেওয়া হয়েছে। এই দুটি ঢাল একটি সুনির্দিষ্ট কোণে মিলিত হয়। অভিকর্ষজ বা উপরের অংশের ঢাল থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে অপসারিত হয়ে উপত্যকার নিম্নাংশে সঞ্চিত হওয়ার ফলেই এই কম ঢালযুক্ত ধোয়াট ঢালের সৃষ্টি করে।

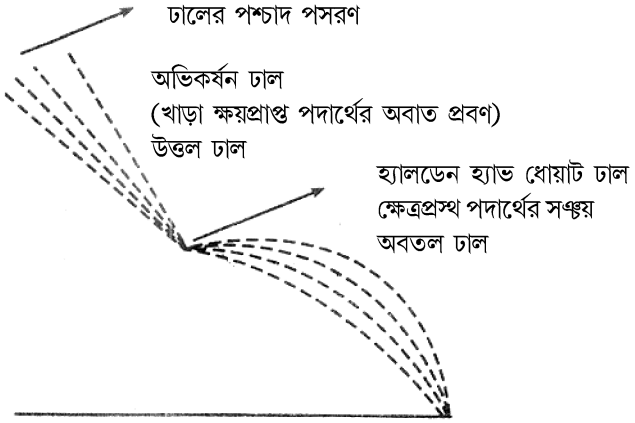

চিত্র 2.15 : পেঙ্কের ধারণা অনুযায়ী ঢালের বিবর্তন। ঢালের মূলত দুটি উপাদান অভিকর্ষজ ঢাল gravity slope ও ধোয়াট ঢাল (wash slope) লক্ষণীয়

পরবর্তীকালে অভিকর্ষজ ঢালটি সমান্তরালভাবে পশ্চাদপসরণ করে। ক্রমশঃ এই অভিকর্ষজ ঢাল পিছিয়ে গিয়ে ধোয়াট ঢালের বিস্তৃতি ঘটায়। এই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে অভিকর্ষজ ঢালের প্রায় সমগ্র অংশটি অবতল প্রকৃতির (concave) ধোয়াট ঢাল অধিকার করে। জলবিভাজিকা অংশে অবশিষ্ট খাড়া অভিকর্ষজ ঢাল বিশিষ্ট ইন্‌সেলবার্গ ধরনের পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। ক্ষয়কার্যের শেষ পর্যায়ে এই প্রায় সমতল ভূমিটিকে পেঙ্ক 'এন্ডরামফ্' (Endrumpf) নাম দিয়েছেন। (চিত্র 2.14)।

পেঙ্কের মতে ঢালের প্রকৃতি ও নতি নদীক্ষয়ের হারের ওপর নির্ভর করে। যদিও অনেক ভূমিরূপবিদ্ এই ধারণাটিকে মেনে নিতে পারেননি। নদীর নিম্নক্ষয়ের (downcutting) সঙ্গে উপত্যকার ঢালের একটি সম্পর্ক থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণ, যেমন শিলার প্রকৃতি, জলবায়ু, ভূতাত্ত্বিক গঠন ইত্যাদি, স্থানীয় (local) বা আঞ্চলিক (regional) ভাবে ঢালের ওপর তাদের প্রভাব ঘটায়। (চিত্র 2.12, 2.13, 2.14)।

2.4.3 'ট্রেপেন' এর উৎপত্তি

ভূমিরূপ বিবর্তনের শুরুতে প্রাইমারাম্ফ্ সৃষ্টি হওয়ার পর ক্রমবর্ধমান ভূমি উত্থানের ফলে একটি গম্বুজাকৃতির ভূমির সৃষ্টি হয় এবং উপত্যকার পার্শ্বদেশ উত্তর প্রকৃতির হয়। এই গম্বুজের শীর্ষদেশে প্রাইমারাম্ফের অংশবিশেষ বিরাজ করে। পরবর্তীকালে উপত্যকার নীচের দিক খাড়া ঢাল অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে সমান্তরালভাবে পশ্চাদপসরণ করে। আরও সময় অতিক্রম হলে, এই গম্বুজাকৃতির ভূমি কতগুলি ধাপের সমষ্টিতে পরিবর্তিত হয়। এইরকম ধাপবিশিষ্ট (step-like landform)। ভূমিকে পাদদেশীয় ধাপ (piedmont treppen) বলে। (চিত্র 2.16)

সাধারণভাবে এই গম্বুজাকৃতি ভূমিতে বিকেন্দ্রমুখী নদী-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। ত্বরণ সহকারে ভূমি উত্থানের ফলে একের পর এক নিক্‌বিন্দুর সৃষ্টি হয়। এর কারণ ক্রমবর্ধমান ভূমি-উত্থানের সময় গম্বুজের প্রান্তে ঢাল ক্রমশঃ বাড়ে এবং নদীর নিম্নক্ষয়ও সেই অনুপাতে বাড়ে। প্রত্যেক নিক্‌বিন্দুর নিম্নপ্রবাহ অংশে একটি সংকীর্ণ খাড়া ঢাল থাকে (উপত্যকার অংশবিশেষ) এবং এই অংশের পার্শ্বদেশের ওপরের দিকে উত্তল (convex) ধরনের ভূমিঢালের সৃষ্টি হয়। এই সংকীর্ণ উপত্যকার নিকট উপরদিকের প্রবাহ অংশে উপত্যকাটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত থাকে ও পার্শ্ববর্তী অংশে হ্যালডেন হ্যাঙের বিস্তৃতির ফলে ঢাল অবতল (concave) প্রকৃতির হয়। (চিত্র 2.15) দুটি নিক্‌বিন্দুর অন্তবর্তী অংশে গম্বুজের গাত্রে পাদদেশীয় ধাপের সৃষ্টি হয়। এর কারণ আড়াআড়ি দিকে প্রবাহিত উপনদীর উপত্যকার তলদেশের উচ্চতা এই অংশের স্থানীয় নিম্নক্ষয় সীমার ওপর নির্ভরশীল।

2.4.4 পেঙ্কের মতবাদের সমালোচনা

প্রথমেই বলা প্রয়োজন পেঙ্কের মতবাদের রচনাটি জার্মান ভাষায় হওয়ার জন্য সেটি অনেকাংশেই অস্পষ্ট। তাছাড়া ওঁর ব্যবহৃত পদবাচ্যের সংজ্ঞার সুনির্দিষ্টতার অভাবও ছিল। সেই কারণেই পেঙ্কের মতবাদ বোধগম্যতার অভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তার উপর পেঙ্কের অকাল মৃত্যু ঘটার জন্য ওঁর মতবাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি করে যেতে পারেননি।

ভূমি বিবর্তনের প্রথম পর্বে ভূমিরূপের আদর্শ চিত্রটি কাল্পনিক— সব ক্ষেত্রে তা হয় না। পেঙ্কের ভূমিরূপ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বের অবস্থাও একই রকম হতে পারে না, সেটিও কাল্পনিক। আমেরিকান ভূমিরূপবিদ্‌রা যে বিষয়টির উপর বেশী জোর দিয়ে প্রতিবাদ করেছেন সেটি ঢালের সমান্তরালভাবে পশ্চাদপসরণ ও ক্রমাগত ভূ-উত্থান ও ভূ আন্দোলনের তত্ত্বটি। (চিত্র 2.15) পঙ্কের মতবাদানুসারে ভূমিরূপ বিবর্তন একটি জটিল অবস্থা পেশ করে।

ভূমি উত্থানের প্রকৃতির সঙ্গে ভূমির ঢালের যে সম্পর্ক আছে তা খুবই সরল এবং অবাস্তব বলে মনে হয়। উপত্যকার ঢালের গঠনে শিলাপ্রকৃতি, জলবায়ু, ভূতত্ত্বীয় গঠন, শিলাচূর্ণের আয়তন ইত্যাদিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ পেঙ্কের মতবাদে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়নি। সুতরাং ওঁর মতবাদটি উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর নয়। ভূমিরূপের প্রকৃতি বিচার করে— কি ধরনের ভূমির উত্থান হয়েছে সেই সম্বন্ধেই তাঁর মতবাদটি পেঙ্ক পেশ করেন।

অল্প সময়ের মধ্যে বারবার ভূমির উত্থান ও সমতলীকরণ ব্যতীত আদি প্রাইমারাম্ফ থেকেই অনেক ধাপের বা সমতলের সৃষ্টি হতে পারে। এইরকম পাদদেশীয় ধাপ (piedmont treppen) সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা পেঙ্ক দিয়েছেন তা পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না। (চিত্র 2.16)।

পেঙ্ক তাঁর ভূমি বিবর্তনের আলোচনায় এনড্রাম্ফ সৃষ্টির আগে কোন সুনির্দিষ্ট ভূমি বিবর্তনের বা অবস্থার (stages) কথা উল্লেখ করেননি।

যদিও এই উপরোক্ত অসুবিধার জন্য পেঙ্কের মতবাদটি তেমন স্বীকৃতি লাভ করেনি, তবুও ওঁর মতবাদের কিছু গুণাবলীও রয়েছে।

পেঙ্কের সমগ্র কাজটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করেই করা হয়েছে। তাছাড়া এই কাজটি তিনি একটি সুনির্দিষ্টভাবেই উপস্থাপনা করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ পেঙ্ক আল্পস পর্বতের নিম্নপ্রান্তে পাললিক শিলার রূপভেদ লক্ষ্য করে এই তত্ত্বটি উপস্থাপন করেছেন যে ভূমির উত্থান প্রাথমিক পর্বে ধীরগতিতে, পরে ত্বরণসহকারে এবং তার পর আবার মন্থরগতি এবং তারও পরে সুস্থিত অবস্থায় এসে পৌঁছায়।

ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ আধুনিক ভূমিরূপবিদ্যা প্রবক্তাদের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে কিং-এর মতবাদে শুষ্ক অঞ্চলের ভূমিরূপ বিবর্তনে যে পাদভূমি গঠন ধারণার উদ্ভব হয়েছে। তা পেঙ্কের ভূমির ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসারণের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং ভূমিরূপ বিবর্তন সম্বন্ধে পেঙ্কের মতবাদটি আধুনিক ভূমিরূপবিদদের নতুন করে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দিয়েছে।

2.5 হ্যাকের অচক্র ভূমিরূপ বিবর্তন ধারণা

ডেভিসের বিখ্যাত ক্ষয়চক্র মতবাদের সাম্প্রতিককালে সর্বাপেক্ষা জোরালো বিরুদ্ধ সমালোচনা জে. টি. হ্যাক্ (1960) করেছিলেন। তিনি অ্যাপালেসিয়ান পর্বত ও প্রান্তীয় মালভূমি অঞ্চলে নিবিড় সমীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ওই অঞ্চলে টার্শিয়ারী যুগ থেকে একাধিক ক্ষয়চক্রের ফলে সমপ্রায় ক্ষয়জাত ভূমির অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ সেরকম ভাবে পাওয়া যায় না। বর্তমান ভূমিরূপকে ক্ষয়চক্রের অবশেষ রূপে বিবেচনা করা যায় না। ভূমিরূপটি বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্য প্রতিরোধকারী শিলাসমূহের ওপর বর্তমান প্রচলিত ক্ষয়কার্যের পদ্ধতিগুলির কাজের ফলেই গঠিত হয়েছে। হ্যাকের মতে ভূমিরূপের স্থান ভেদে পার্থক্য মূলতঃ দুটি কারণে ঘটে—

(a) শিলার ক্ষয়— প্রতিরোধকারী ক্ষমতার পার্থক্য।

(b) শিলার উপর কার্যকরী প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ক্ষয়-সাধনের ক্ষমতার পার্থক্য।

2.5.1 গতিশীল ভারসাম্য তত্ত্ব

ডেভিসের ক্ষয়চক্রের ফলস্বরূপ ভূমিরূপের বিবর্তন ব্যাখ্যাটিকে হ্যাক না মেনে নিয়ে তাঁর ''Dynamic''— তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই গতিশীল সাম্য ধারণা অনুসারে ভূমির রূপ সময় নিরপেক্ষ। অথচ ভূমিরূপের অপরিবর্তিত অবস্থা এই নির্ণয় করে না যে ভূমিটি স্থিতিশীল। বাস্তবে অবিরাম আবহবিকার ও ক্ষয়কার্যের ফলে ভূমির উচ্চতা সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেলেও ভূমিরূপের বিভিন্ন অংশের ঢাল, বন্ধুরতা, ঢালের দৈর্ঘ্য, গড় ও সর্বোচ্চ কোন নদীখাতের অনুদৈর্ঘ্য নতিমাত্রা ইত্যাদি সময় নিরপেক্ষ ভাবেই অপরিবর্তিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভূমিরূপের প্রতিটি অংশ যেমন উপত্যকার তলদেশ, পার্শ্বদেশের ঢাল ও বিভাজিকার শীর্ষদেশের উচ্চতা সমহারে হ্রাসের ফলেই ভূমির আকৃতি আপাতঃদৃষ্টিতে একই থেকে যায়। ভূমির উচ্চতা হ্রাস সত্ত্বেও ভূমির রূপ অপরিবর্তিত থাকে। এই ধারণাটিকেই গতিশীল সাম্য ধারণা (Dynamic equilibrium concept) বলা হয়।

2.5.2 উন্মুক্ত প্রণালী (Open system)

হ্যাকের মতবাদটি এক উন্মুক্ত প্রণালী (open system) হিসাবে ধরা হয়। সাম্য অবস্থার জন্য ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটে না। এই অবস্থায় ভূমিরূপের প্রক্রিয়া একই রকম থাকে। এই উন্মুক্ত প্রণালীর বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে এক যোগসূত্র থাকে যাতে সর্বত্র শক্তি সরবরাহ ও পরিবহন মাধ্যমে শক্তি ব্যয়ের মধ্যে এক সংতুলন (balance) রয়েছে। বিভিন্ন অবস্থায় তাই ভূমিরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। ভূমিরূপ প্রণালীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে এক পরস্পর নির্ভরতা রয়েছে। সুতরাং এই প্রণালীর কোন এক অংশে কোন পরিবর্তন বা বিঘ্ন ঘটলে এর প্রতিক্রিয়া সমগ্র নদী অববাহিকায় এমনভাবে সঞ্চারিত হয় যাতে প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভূমিরূপের একটা সামঞ্জস্য বজায় থাকে। হ্যাকের মতানুসারে বর্তমান ভূমিরূপের মূল বিষয়গুলির উদ্ভব বতর্মান কালেই ঘটেছে— সুদূর ভূ-তাত্ত্বিক অতীত কালে (geological past) নয়।

2.5.3 একটি উদাহরণ

নিম্নলিখিত একটি উদাহরণে হ্যাকের মতবাদটি বুঝতে সুবিধা হয়। (চিত্র 2.17)।

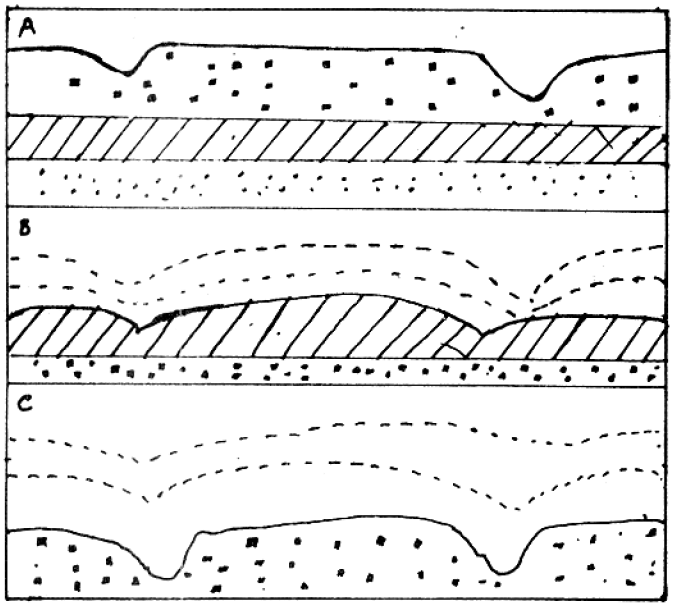

চিত্র 2.17 : গতিশীল সাম্য ধারণা অনুসারে অনুভূমিক (horizontal) শিলাস্তর গঠিত অঞ্চলে ভূমিরূপের উদ্ভব (হ্যাকের ধারণা)

চিত্র - A তে দেখা যাচ্ছে যে কোন এক স্থান তিনটি সমান্তরাল শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। উপরের ও নীচের স্তরটি দুটি ক্ষয়কার্যের প্রতিরোধকারী বেলেপাথর (sandstone) এবং মধ্যবর্তী শিলাস্তর কোমল কাদাপাথর (shae) দিয়ে গঠিত। বেলেপাথরের ক্ষয়প্রতিরোধকারী ক্ষমতার জন্য ওপরে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হবে সেটি বন্ধুর প্রকৃতির এবং তার উপত্যকা সংকীর্ণ ও অগভীর। উপত্যকার দুই দিকের ভূমির ঢালও খাড়া (steep) হবে।

চিত্র - B তে দেখা যাচ্ছে যে উপরের কঠিন বেলেপাথরের স্তরটি সুদীর্ঘকালীন নদীক্ষয়ের ফলে এবং ঢালের পশ্চাদপসারণের ফলে অপসারিত হয়েছে। এখন কোমল চরিত্রবিশিষ্ট কাদাপাথরের উপর যে ভূমিরূপটি সৃষ্টি হবে তার বন্ধুরতা কম হবে এবং উপত্যকা প্রশস্ত ও উপত্যকার ঢাল মৃদু প্রকৃতির হবে। সাধারণভাবে ভূমির উচ্চতাও হ্রাস পায়।

চিত্র - C তে দেখা যাচ্ছে যে পরতর্বীকালে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে কাদাপাথরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে তলার বেলেপাথরের স্তর প্রকাশিত হয়েছে। এই কঠিন বেলেপাথরের স্তরের উপর গঠিত ভূমিরূপটি আবার আগের বেলেপাথরের স্তরের ওপর গঠিত ভূমিরূপের মতই হবে।

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে ভূমিরূপ পরিবর্তনের পরম্পরা ক্ষয়চক্রের মত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ভূমিরূপের সাম্য অবস্থা অর্জনের জন্য নিয়ন্ত্রণ শক্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে। এই উদাহরণে নিয়ন্ত্রক শক্তিটি শিলা। অন্য ক্ষেত্রে জলবায়ুও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তন নদী ক্ষয়ের হারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আবার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকগুলি একই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে ভূমিরূপের সাম্য অবস্থাকে আরও জটিল করে দিতে পারে। এই সব নিয়ন্ত্রকের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া নদী প্রণালীতে এমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারে যে প্রণালীর উপাদানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার সংতুলিত (balanced) হয়ে এক নতুন সাম্য ভূমিরূপের উদ্ভব ঘটায়।

2.5.4 হ্যাকের মতবাদের সমালোচনা

হ্যাকের গতিশীল সাম্য ধারণার কিছু অসুবিধাজনক বিষয় আছে। যেমন, এই ধারণায় নদীর ক্ষয়কার্যের জন্য কোন নির্দিষ্ট নিম্নসীমা (Base level of erosion) ধরা হয়নি। উপরোক্ত উদাহরণেই দেখা যায় যে তিন ধরনের শিলার ওপরেই নদী তার নিম্নক্ষয় অবাধভাবে করে চলেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভূমিটি যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছে অবস্থিত থাকে এবং ভূমির উত্থান যদি না হয়, তাহলে ভূমির রূপ অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। যেমন কর্দমগঠিত অঞ্চলে নদী যদি নিম্নক্ষয় করে সমুদ্রপৃষ্ঠে (নিম্নক্ষয়ের শেষ সীমায়) পৌঁছে যায়, তাহলে নদী বিভাজিকা অঞ্চলটি আবহবিকার, পুঞ্জক্ষয় ও ধৌত প্রক্রিয়ার ফলে ক্রমশঃ নীচু হয়ে যাবে (অর্থাৎ ভূমির উচ্চতা হ্রাস পাবে)। এই অবস্থায় ভূমির বন্ধুরতা ও ঢালও কমবে। সুতরাং-এই ক্ষেত্রে ভূমিরূপের বিবর্তন ডেভিসের ক্ষয়চক্রের মতই হবে।

ডেভিসের ধারণা অনুযায়ী পর্বতশীর্ষের সমোন্নতি (accordance of summit levels) একটি উত্থিত সমপ্রায়ভূমি নির্দেশ করে। হ্যাকের ধারণায় সমপ্রায়ভূমি বা সমতলীকরণ পৃষ্ঠের সৃষ্টি এবং পর্বতশীর্ষের সমোন্নতি, সমান ব্যবধানে নদীর উপস্থিতি, পর্বতশীর্ষের সমপরিবর্তন ও সমকর্তনের ফলেই হয়েছে। এটার জন্য এক ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হতে পারে যে এক প্রাচীন সমপ্রায়ভূমির উত্থানের ফলে এরকম অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

হ্যাকের ধারণাটি অনেক ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদের ধারণার পরিপন্থী কারণ তাঁরা মনে করেন যে বর্তমানকালের ভূমিরূপ আগের ভূমিরূপের অবশেষরূপে অবস্থান করে। ভূমিরূপের বিবর্তনমূলক উদ্ভবে এক ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। হ্যাকের মতে বর্তমান ভূমিরূপের মূল বিষয়গুলির উদ্ভব বর্তমানকালেই ঘটেছে— সুদূর ভূতাত্ত্বিক অতীতকালে নয়। গতিশীল সাম্য ধারণায় কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে যে কোন একটি স্থানের বর্তমান পদ্ধতিগুলির কার্যকলাপ এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। অথচ অতীতকে অগ্রাহ্য করে এই মতবাদটি ভূমিরূপের যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারে না কারণ বেশীরভাগ অঞ্চলেই ভূমিরূপের এক দীর্ঘ প্রসারিত ও জটিল ইতিহাস থাকে যার কিছু নমুনা বা চিহ্ন বর্তমান ভূমিরূপেও অবশিষ্ট আছে। স্কুম (Schumm), লিচি (Lithy, 1965) প্রমুখ ভূমিরূপবিদের মতে হ্যাকের মতবাদটি কম সময়ের পরিসরে সত্য হলেও ডেভিসের ক্ষয়চক্র (cycle of erosion) মতবাদের যুক্তির গ্রাহ্যতা এখনও এত বেশী যে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়।

ভূমিরূপ বিশ্লেষণে গতিশীল সাম্যধারণার এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ এটি ভূমিরূপের ঐতিহাসিক গঠনের পরিবর্তে প্রক্রিয়া (process) এবং ভূমিরূপের (form) ওপরেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। হ্যাকের মতবাদটি ডেভিসের ক্ষয়চক্র ধারণার বিকল্প নয়, বরং তার পরিপূরক হিসাবে ধরা যেতে পারে।

2.6 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আপনি ক্ষয়চক্র সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পেরেছেন। ভূমিরূপ উদ্ভব ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিরূপ বিশারদ ডব্লু. এম্. ডেভিস অন্যতম পথপ্রদর্শক এবং মূলতঃ তিনিই সর্বপ্রথম ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের উল্লেখ করেন। এই ক্ষয়চক্রের আলোচনা থেকে আপনারা জেনেছেন যে ক্ষয়চক্রের তিনটি প্রধান পর্যায় যথা যৌবন অবস্থা, পরিণত অবস্থা ও বার্ধক্য অবস্থা অনুযায়ী ভূমিরূপের পবিরর্তন ও রূপান্তর হয়। ডেভিসের এই মতবাদ চক্রীয় মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

ডেভিসের চক্রীয় মতবাদের যে বিভিন্ন সমালোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে পেঙ্কের মতবাদ বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে আপনারা পেঙ্কের তিনপ্রকার ভূমি-উত্থানের হার ও ট্রেপেনের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন।

পেঙ্কের মতবাদের কিছু সমালোচনা করা হয়। সে সম্বন্ধেও আপনারা জেনেছেন। এরপর অচক্রীয় মতবাদ হিসাবে হ্যাকের গতিশীল ভারসাম্য তত্ত্বের অবতারণা করা হয়। বর্তমান এককে আপনি ডেভিসের স্থিতিশীল ভারসাম্য ও হ্যাকের গতিশীল ভারসাম্যের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে তার সম্বন্ধেও অবহিত হয়েছেন।

2.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(A) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(1) বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ করে ডেভিসের ক্ষয়চক্র তত্ত্বের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

(2) চিত্র সহযোগে ভূমিরূপ উদ্ভবের বিভিন্ন পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(3) ডেভিস ও পেঙ্কের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(B) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(1) ডেভিসের ক্ষয়চক্রতত্ত্বে উল্লেখিত আদর্শ অবস্থাগুলি উল্লেখ করুন।

(2) ডেভিসের ক্ষয়চক্রতত্ত্বে উল্লেখিত আদর্শ অবস্থাগুলির বিচ্যুতিতে ক্ষয়চক্রের কি কি রূপান্তর বা পরিবর্তন হয় তাদের উল্লেখ করুন।

(3) ডেভিস ও হ্যাকের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(4) ডেভিসের ক্ষয়চক্রের নেতিবাচক দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(C) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(1) ট্রেপেন কীভাবে সৃষ্টি হয় ?

(2) উন্মুক্ত প্রণালী বলতে কী বোঝায় ?

(3) ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ বলতে কি বোঝায় ?

(4) গতিশীল ভারসাম্য কাকে বলে ?

(D) অব্জেকটিভ প্রশ্ন ঃ

(1) নদীর নিম্নক্ষয়ের শেষ সীমানাকে বলে ————।

(2) দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ———————— বলে।

(3) ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণের অন্যতম প্রবক্তা ————।

(4) গতিশীল ভারসাম্য তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ————।

2.8 উত্তরমালা

A (1) 2.2 এবং 2.3 দ্রষ্টব্য।

A (2) 2.2.1 থেকে 2.2.3 অংশটি পড়ে উত্তর লিখুন।

A (3) 2.2, 2.3 এবং 2.4 অংশগুলি পাঠ করে উত্তর লিখুন।

B (1) 2.2 দ্রষ্টব্য
B (2) 2.2 এবং 2.3 দ্রষ্টব্য।
B (3) 2.2 এবং 2.5 দ্রষ্টব্য।
B (4) 2.2.3 দ্রষ্টব্য।
C (1) 2.4.3 দ্রষ্টব্য।
C (2) 2.5.2 দ্রষ্টব্য।
C (3) 2.4 দ্রষ্টব্য।
C (4) 2.5.1 দ্রষ্টব্য।
D (1) ক্ষয়করার শেষ সীমা।
D (2) দোয়াব।
D (3) পেঙ্ক।
D (4) হ্যাক।

একক 3 ❑ নদীর কার্য ও উদ্ভুত ভূমিরূপ

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

3.2 নদী ও নদীর উপত্যকা

3.3 নদীর কার্য প্রণালী

3.3.1 ক্ষয় প্রক্রিয়া

3.3.2 পরিবহন প্রক্রিয়া

3.4 নদীর প্রস্থচ্ছেদ

3.4.1 নদীর অনুদৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদ

3.4.2 নদীর আড়াআড়িভাবে প্রস্থচ্ছেদ

3.5 নদীখাত ও নদীখাতের বিভিন্ন প্রণালী

3.5.1 নদী বাঁক প্রণালী

3.5.2 বিনুনীরূপী জলনির্গম প্রণালী

3.6 নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে উদ্ভুত ভূমিরূপ

3.6.1 নদীর ক্ষয় বক্ররেখা

3.6.2 জলপ্রপাত ও খরস্রোতা

3.6.3 মন্থকূপ

3.6.4 প্রাবরিত অভিক্ষিপ্তাংশ

3.6.5 'নিক্ বিন্দু'

3.6.6 সঙ্কীর্ণ নদী উপত্যকা, গিরিখাত ইত্যাদি

3.6.7 প্লাবনভূমি

3.6.8 গাঠনিক শিলাধাপ

3.6.9 খোদিত নদীবাঁক

3.6.10 নদীমঞ্চ

3.7 নদীর সঞ্চয় কার্য ও উদ্ভুত ভূমিরূপ

3.7.1 প্লাবনভূমি

3.7.2 ব-দ্বীপ বার

3.7.3 স্বাভাবিক বাঁধ

3.7.4 পশ্চাৎ জলভূমি সঞ্চয়

3.7.5 বিনুনী নদী সঞ্চয়
3.7.6 বদ্বীপ সমভূমি সঞ্চয়
3.8 নদীর ক্ষয়চক্র
3.8.1 ক্ষয়চক্রের সংজ্ঞা
3.8.2 ক্ষয়চক্রের আদর্শ অবস্থা
3.8.3 ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায়
3.8.4 ক্ষয়চক্রের পর্যালোচনা
3.9 সারাংশ
3.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
3.11 উত্তরমালা

3.1 প্রস্তাবনা

আগের এককে ভূমিরূপগঠনকারী প্রক্রিয়া ও উদ্ভুত ভূমিরূপের আলোচনায় আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয় প্রভৃতি বিভিন্ন বহিঃস্থ অবরোহনকারী প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এর পর ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে চক্রীয় ও অচক্রীয় মতবাদ আছে, তাদের সম্বন্ধেও আলোচিত হয়েছে। বর্তমান এককে আমরা নদীর কার্য ও উদ্ভুত ভূমিরূপ সম্বন্ধে জানবো।

ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা যখন নির্দিষ্ট খাত বরাবর প্রবাহিত হয়, তাকে নদী বলে। এই নদী একটি নির্দিষ্ট উৎসস্থল থেকে উৎপপন্ন হয়ে ঢাল বরাবর প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত বড় নদীতে অথবা সাগরে বা অন্তবর্তী বা মধ্যবর্তী জলাশয়ে পতিত হয়। নদীর শক্তি অনুযায়ী নদী বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয় কার্য করে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে নদীর ক্ষয়যুক্ত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ গঠিত হয়। নদীর বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও তাদের কার্যের ফলে উদ্ভুত বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপগুলি এই এককে আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে ক্ষয়চক্রের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল ভূমিরূপের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। তাদের সম্বন্ধেও এই এককে আলোচিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ এই এককটি পাঠ করে আপনি

- নদী কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
- নদীখাত, উপনদী, শাখানদী নদী অববাহিকা জলবিভাজিকা ইত্যাদি কাকে বলে, তা জানতে পারবেন।
- নদীর জলের কি কি উৎস, সে সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন।
- নদীর কার্য প্রণালী সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।
- নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর ও প্রস্থ বরাবর প্রস্থচ্ছেদে। নদীর ঢাল এবং নদীর খাত কতরকম হয়, সে সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন।
- নদীর কার্যের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে জানতে পারবেন।
- ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল ভূমিরূপের উদ্ভব হয়, সে সম্বন্ধে আপনি একটা ধারণা করতে পারবেন।

3.2 নদী ও নদীর উপত্যকা

নদী ভূপৃষ্ঠের নিয়ত পরিবর্তন সাধনকারী শক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম ব্যস্ত শক্তিরূপকার। নদী প্রকৃতির এক অপরূপ ভাস্কর। নদী উপত্যকার উৎপত্তি ও প্রকৃতি, স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র, আর্দ্র পরিবেশে ভূমিরূপের বিবর্তন ইত্যাদির বিশদ্ আলোচনার আগে নদীর উপত্যকার সংজ্ঞা এবং প্রাথমিক বিষয়গুলি আরম্ভ করা হল।

সাধারণভাবে নির্দিষ্ট স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত স্বাদু জলধারা যা অন্য কোন নদী, হ্রদ, জলাভূমি বা সাগরে পতিত হয় তাকে নদী বলা হয়। নদী প্রবাহ নিত্য, অনিত্য, বিরতিপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। এই প্রবাহিত জলধারা যে কোন মাপের অর্থাৎ ছোট, মাঝারী, বড় বা খুব বড় দৈর্ঘ্যের নদীর সৃষ্টি করে। নদী উপত্যকা গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত কম দৈর্ঘ্যের নদ-নদী বা উপনদী মিলিত হয়ে মূল নদীটিকে পরিপুষ্ট করে ও নদীর ক্ষয়কার্যে শক্তি যোগায়। আবার নদীর নিম্ন প্রবাহ মূল নদী থেকে নির্গত শাখাগুলো বা শাখা নদীগুলো বদ্বীপ আকারে পলি সঞ্চয় করে (নদী গর্ভের শীর্ষস্থ, অধঃস্থ বা পার্শ্বীয় স্থানে) বিশাল ব-দ্বীপ সমভূমি বা নিম্নভূমি গঠন করে।

ভূ-পৃষ্ঠে নদী গঠিত বা নদী অধিকৃত নিয়মিত ঢালযুক্ত, দীর্ঘ অবনত স্থানকে নদী উপত্যকা বলা হয়। নদী উপত্যকার বিস্তৃত, ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে উদ্ভূত ভূমিরূপ, এমন কি নদী অববাহিকার আকৃতি ইত্যাদি উপনদী ও শাখানদীর প্রসারের উপর অনেকটা নির্ভর করে। নদী উপত্যকার ব্যাপক প্রসারের প্রধান তিনটি প্রক্রিয়া হল—

(a) উপত্যকার গভীরীকরণ, (b) বিস্তৃতিকরণ এবং (c) দীর্ঘকরণ বা প্রলম্বিতকরণ।

নদীর প্রধান দুটি উৎসের মধ্যে প্রথমটি হল বরফগলা জল ও অপরটি বৃষ্টির জল। উৎসের প্রকৃতি, প্রবাহের ধরন, গতিপথের প্রসার, জলনিকাশের তারতম্য, ব্যবহারের বৈচিত্র ইত্যাদি অনুসারে অঞ্চলভেদে নদীর কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। নদী স্বভাবতই স্বগঠিত বা প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট (যেমন চ্যুতি, ভাঁজ ইত্যাদি) এক ভিন্ন প্রকার উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলে যা নদীর গতিপথ নির্দেশ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণগুলি, যেমন ভূগঠন বিশেষতঃ শিলার বৈচিত্র্য ভূ-প্রকৃতি (ভূমিঢাল সহ), নদীর বিচিত্র গতিপথ ও বিভিন্ন পর্যায়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অবস্থানের উচ্চতাগত পার্থক্য, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বণ্টনের ভিন্নতা, উষ্ণতা বাষ্পীভবনের (আঞ্চলিক) তারতম্য, মাটির বৈশিষ্ট্য, বনভূমি বা স্বাভাবিক উদ্ভিদের অবস্থান এবং সেইসঙ্গে ক্ষয়সাধনের মাত্রা, ভূমিরূপের ভিন্নতা, নদী বিবর্তন ইত্যাদি কারণের ওপরে নদী-উপত্যকার বিস্তৃতি, গভীরতা ও চরিত্রগত বৈচিত্র্যের অনেকটাই নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক উৎসের প্রকৃতি, নদীর গতি ও জলপ্রবাহ অবঘর্ষ ক্ষয়ের তীব্রতার হেরফের, ভূপ্রকৃতি বিশেষতঃ ঢালের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রধান নদীর স্রোতের ধরন অর্থাৎ খরস্রোতা, শান্ত না উত্তাল তা নির্ধারণ করে।

মুখ্যত বহু ছোট ছোট জলধারা বা নদী পরস্পর মিলিত হয়ে মাঝারী বা বড় নদীর সৃষ্টি হয়। এইসকল ছোট বা বাঝারী নদ-নদীগুলোকে বড় বা প্রধান নদ নদীগুলোর উপনদী বলা হয়। যেমন যমুনা, শোন, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, রাপ্তী, গণ্ডক, বাগ্‌মতী, কোশী, মহানন্দা ইত্যাদি গঙ্গা নদীর উপনদী। এদের মধ্যে যমুনা, শোন ইত্যাদি নদ-নদীগুলো গঙ্গার ডানতটের প্রধান উপনদী। অপরগুলি গঙ্গার বাঁ তটের। অবশ্য গঙ্গার উপনদী যমুনা, শোন, রামগঙ্গা, কোশী ইত্যাদি প্রত্যেকটি নদ-নদী বহুসংখ্যক উপনদী আছে। জল সরবরাহের পরিমাণের প্রসঙ্গে ঘর্ঘরা নদীর নাম বিশেষভাবে করতে হয় ; কেন না গঙ্গা নদীতে সবচেয়ে বেশী জল (প্রায় এক চতুর্থাংশ) যোগান দেয় এই ঘর্ঘরা নদী। প্রায় 1100 কিমি দৈর্ঘ্যের ঘর্ঘরার উৎস মানস সরোবর হ্রদের কাছে। শেষ পর্যায়ে ঘর্ঘরা বিহারের ছাপরা শহর থেকে কিছু দূরে মূল নদীর অর্থাৎ গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। জলের যোগানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে যথাক্রমে যমুনা কোশী ও গন্ডক। আগেই বলেছি যে গঙ্গার উপনদীগুলোর আবার

অসংখ্য ছোট ছোট উপনদী আছে। উদাহরণ হিসাবে যমুনা নদীর (ডান তটের) প্রধান উপনদী যেমন চম্বল, হিনদন্, শারদা, বেতোয়া ও কেন এর নাম করা যায়। তবে যমুনা নদীর সবচেয়ে দীর্ঘ উপনদী হল টন্স্।

নদীর নিম্নপ্রবাহে বিশেষ করে শেষ পর্যায়ে পলিগঠিত সমভূমি বা বদ্বীপ এলাকায় মূল নদী থেকে নির্গত ছোট নদীকে এর শাখানদী বলে। যেমন— জলঙ্গী, ইচ্ছামতী ইত্যাদি ভাগীরথী হুগলী নদীর শাখানদীর উদাহরণ। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার জন্য সব নদ নদীর শেষ পর্যায়ে শাখানদী গঠিত হয়নি। ফলে সবক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়নি ব-দ্বীপের। নদী মানচিত্রের মাধ্যমে ভারতের উপনদী শাখানদীগুলোর বিস্তৃতির বৈচিত্র্য দেখান হয়েছে।

মূল নদীতে যোগদানকারী উপনদী ও নদ নদী থেকে নির্গত শাখা-নদীগুলোর মিলিত অবস্থানই প্রকৃত নদীর উপত্যকা এবং অববাহিকা নির্দেশ করে। যে কোন নদী এদের অবস্থানের ফলে সুসম্পূর্ণ নদী অববাহিকা গঠন করে একটি আদর্শ নদীতে পরিণত হতে পারে। পৃথিবীর বড় বড় নদীগুলোর সাধারণতঃ ঊর্ধ্ব প্রবাহে পর্বতের উপর দিয়ে মধ্যপ্রবাহ সমভূমির উপর দিয়ে ও নিম্নপ্রবাহে নিজের গড়া বদ্বীপের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরূপ নদীকেই আদর্শ নদী বলে। আমাদের দেশের গঙ্গা একটি আদর্শ নদী। এছাড়া সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, কাবেরী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ইত্যাদিরও নাম করা যায়। এদের মধ্যে সু-উচ্চ হিমালয় পর্বত শ্রেণীর হিমবাহ সম্পর্কিত বরফগলা জলে পুষ্ট নদ-নদীগুলো যেমন সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নিত্যবহা নদীর উদাহরণ।

নদী উপত্যকার গঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য হল নিম্নক্ষয় ও পার্শ্বক্ষয় একই সঙ্গে চলে। সাধারণতঃ নিম্নক্ষয়, পার্শ্বক্ষয় থেকে বেশী হয় আর নদী থেকে আড়াআড়ি দিকে যতদূর যাওয়া যায় পার্শ্বক্ষয় তত কমে। এজন্য আড়াআড়ি দিকে নদী উপত্যকার চিত্র 'V' আকৃতির হয়। দুটি পাশাপাশি নদী উপত্যকার মধ্যবর্তী উচ্চভূমিকে নদী বিভাজিকা বলে। আবার নদী বিভাজিকার শীর্ষদেশকে জলবিভাজিকা বলে।

আরম্ভেই বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির এক ভাস্কর স্বরূপ নদী ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে সর্বদাই ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে চলেছে। আবহবিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, শিলাচূর্ণ পরিবহন করার সঙ্গে সঙ্গে নদী-শিলার ভগ্নীকরণ করে। বৃষ্টির জলে বা তুষারগলা জলে ধুয়ে বা অভিকর্ষণ বলের প্রভাবে শিলাচূর্ণ ঢাল বেয়ে নদীতে এসে পড়ে। এতে নদীর দু'পাশ ক্ষয় পায়। একে নদীর পার্শ্বক্ষয় বলে। প্রধানতঃ নদীবাহিত কঠিন শিলাচূর্ণের ঘর্ষণে নদীগর্ভ আরও বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই রকম ক্ষয়কে নদীর নিম্নক্ষয় বলে। আবার ক্ষয়ের এই প্রক্রিয়াকে অবঘর্ষও বলে। নদীবাহিত সকল পদার্থকে নদীর বোঝা (load) বলে। ভাসমান অবস্থায় বা নদীগর্ভে গড়িয়ে বা দ্রবীভূত অবস্থায় এই বোঝা পরিবাহিত হয়। নদীর বেগ কমে গেলে বা বোঝার পরিমাণ অতিরিক্ত হলে নদী আর বোঝা বইতে পারে না। তখন বোঝার কিছু অংশ নদী উপত্যকা, হ্রদ বা সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে। একে নদীর সঞ্চয়কার্য বলে।

3.3 নদীর কার্যপ্রণালী

প্রবাহিত জলধারা শক্তি বহন করে, কিন্তু এই শক্তির সম্পূর্ণ অংশই ক্ষয় পরিবহনে ব্যয়িত হয় না। এর কিছু অংশ নদীগর্ভ ও তলদেশের সহিত ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপ সঞ্চারের জন্য ব্যয়িত হয়। শেষোক্ত উপায়ে শক্তির বিনাশের পরিমাণ নির্ভর করে নদীগর্ভে ও পার্শ্বদেশের মসৃণতা এবং নদীবাঁকের সংখ্যাও বক্রতা এবং তাৎক্ষণিকভাবে নদীবক্ষের ক্ষেত্রফলের ওপর। নদীগর্ভও পার্শ্বদেশ যত বেশী মসৃণ হবে এবং বাঁকের সংখ্যা যত বেশী হবে ও নদীবক্ষের বিস্তার যত বেশী হতে ততই ঘর্ষণজনিত ক্রিয়া বেশী হবে এবং শক্তির বিরাম বেশী ঘটবে।

3.3.1 ক্ষয়প্রক্রিয়া

নদীর জলে বিক্ষুব্ধ প্রবাহের জন্য এবং বিভিন্ন ত্বকের মধ্যে ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করার জন্য কিছু পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়। বাকী শক্তি, নদী ক্ষয় ও পরিবহনে ব্যয় করে। নদীর ক্ষয়কার্য বিশেষ করে উপত্যকার গভরীকরণ ৪টি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়ে থাকে।

(i) উদক প্রক্রিয়া বা জলের গতিশক্তি (hydraulic action)। নদীবক্ষের আবহবিকার ও আবহবিকার প্রাপ্ত পদার্থ প্রবাহিত জলের ও শক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় ও ক্ষয়সাধিত হয়।

(ii) নদীর মধ্যস্থ যে শিলাচূর্ণ বর্তমান থাকে তার সঙ্গে নদীগর্ভ পার্শ্বদেশের ঘর্ষণজনিত ক্রিয়া বা অবঘর্ষ (abrasion)। অবঘর্ষেরই একটি বিশেষ প্রকার হ'ল মন্থকূপ খনন (Pothole driling)। জলপ্রবাহের পাদদেশে বা যেখানে নদীর ঢাল বেশী থাকে সেখানে নদীর জল অনেক সময় পাক খেয়ে অগ্রসর হয়। এর ফলে অর্ধগোলাকৃতি গর্তের সৃষ্টি হয়। এদেরকেই মন্থকূপ বলে।

(iii) জল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং দ্রবণের (solution) দ্বারা ক্ষয়কার্য করে।

3.3.2 পরিবহন প্রক্রিয়া

নদী পরিবাহিত পদার্থ তিনভাবে স্থানান্তরিত হয়। যথা—(a) দ্রবীভূত অবক্ষয়, (b) ভাসমান অবক্ষয়, এবং (c) নদীবক্ষের উপর দিয়ে। শেষোক্ত প্রক্রিয়ার পরিবাহিত পদার্থকে চলমান ভূমি আবর্জনা (traction load) বলে। এইরূপ পদার্থ গড়ানো, বিসর্পন ও উল্লম্ফন (sartation) প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয়।

এই বিভিন্ন পদ্ধতিতে পদার্থ বা আবর্জনার পরিবহনের পারস্পরিক সম্পর্ক নদীর প্রকৃতি জলবায়ু ও নদীবক্ষের শিলার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। নদী গতিবেগের সঙ্গে পরিবর্তিত পদার্থের কণার আয়তন বহুলাংশে নির্ভর করে। সর্বনিম্ন গতিবেগের সাহায্যে ক্ষুদ্র বালুকণা পরিবাহিত হতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে গতিবেগ বাড়লেই বৃহদাকৃতি কণা স্থানান্তিতির হতে পারে। বিশেষ লক্ষ্যনীয় বিষয় হল যে, সূক্ষ্মবালি অপেক্ষা ক্ষুদ্র কণা পরিবহনের জন্য কিন্তু যথেষ্ট বেশী গতিবেগ প্রয়োজন হয়। কারণ এরা নদীতে মসৃণভাবে সৃষ্টি করে এবং কর্দম কণার মধ্যে সংসক্তি cohesion বেশী থাকে বলে সহজে তাড়িত হতে পারে না।

একটি নদীর পরিবহনে দুটি বিষয় প্রয়োজনীয়, (a) সামর্থ (Competence), (b) ক্ষমতা (capacity)। কিরকম আয়তনের শিলাখণ্ড নদী পরিবাহিত করতে পার তার দ্বারা নদীর সামর্থ (competence) বিচার করা হয়। নদীর তলদেশের গতিবেগের পৃষ্ঠঘাতের সঙ্গে পরিবাহিত শিলাখণ্ডের ওজন সমানুপাতিক বলে মনে করা হয়। কি পরিমাণ পদার্থ নদী পরিবহন করতে সক্ষম তাকে নদীর পরিবহন ক্ষমতা বলে। একটি নির্দিষ্ট গতিবেগ, নির্দিষ্ট আয়তন ও নির্দিষ্ট শিলাখণ্ডের ওজন সাপেক্ষে নদীর একটি সর্বোচ্চ পরিমাণ পলি পরিবহনের ক্ষমতা থাকে। নদীতে পলির পরিমাণ তার থেকে কম হলে নদী ক্ষয় করবে এবং যতক্ষণ না ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ দ্বারা পদার্থের সংযোজন পলি পরিবহন ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত নদী ক্ষয় করে। অপরপক্ষে যদি পলির পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমায় থাকে এবং এই অবস্থায় নদীর গতিবেগ হ্রাস পায় তাহলে নদীর পলি পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং কিছু পলি নদীবক্ষে সঞ্চিত হয়।

নদী জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও পলি পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এজন্য প্লাবনের সময় বর্ধিত জলের পরিমাণের জন্য পলি পরিবহনের ক্ষমতা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায় এবং পার্বত্য নদীগুলো সুবৃহৎ খণ্ড শিলার (বড় বোল্ডার) অপসারণ ঘটাতে পারে।

3.4 অনুদৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদ (Long profile of a River)

3.4.1 নদী বক্ররেখা (Curve of water erosion)

নদীর কার্যে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নদীর অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। প্রাথমিক অবস্থায় একটি নদী গতিপথের ঢাল ভূমির ঢালের ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয়। যদি ক্ষয় সর্বত্র সমান হ'ত তাহলে ঢাল পূর্ববৎ থেকে যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি নদীর গতিপথে সর্বত্র এরূপ হয় না। সাগরের কাছে নদীর নিম্নকর্তন সীমায়িত হয়। কারণ সমুদ্রতলের নীচে নদী খুব কমই ভূমি কর্তন করতে পারে। আবার নদীর উৎসস্থলে এর আয়তন এতই কম থাকে যে নিম্নখনন (নিম্নকর্তন) করার ক্ষমতা নদীর খুব কম থাকে। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী নদী উপত্যকা অংশে নিম্নকর্তন সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই প্রাথমিকভাবে নদীর অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ অবতল প্রকৃতির হয়। একে নদী বক্ররেখা (Curve of water erosion) বলে। প্রারম্ভিক অবস্থায় নদীর নিম্নকর্তন সক্রিয় থাকে কিন্তু শিলার কাঠিন্যের তারতম্যের অনুযায়ী ক্ষয় সর্বত্র সমান হয় না। এর ফলে নদীবক্ষে নানা প্রকারের ঢালের অনিয়ম জলপ্রপাত বা খরস্রোতার সৃষ্টি হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নদীবক্ষে শুরুতেই খাড়াতল বর্তমান থাকতে পারে। যেমন আড়াআড়ি যদি চ্যুতি ভূপৃষ্ঠ অবস্থিত থাকে (চিত্র 3.1) । এরূপ অনিয়মিত থাকলেও এটি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

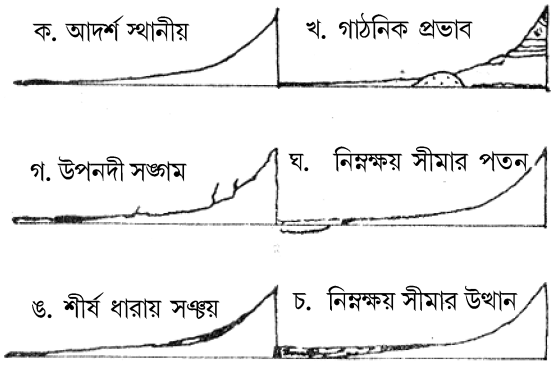

চিত্র 3.1 : আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন প্রভাবকের ভূমিকা প্রদর্শন নদীর অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদের সরলীকৃত চিত্রায়ন স্বাভাবিক নদীখাতে এরকম একাধিক প্রভাবক এক সঙ্গে কাজ করতে পারে।

পর্যায়িত নদী ঢাল (Graded river profile)

এই প্রসঙ্গে নদীর অনুদৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদের প্রকৃতিতে নদীর পর্যায়িত ঢাল (graded profile) সৃষ্টির প্রবণতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গিলবার্টকে অনুসরণ করে ডেভিস পর্যায়িত ঢাল ধারণার উন্মেষ ঘটান। একটি নদী সৃষ্টি হবার অল্প কিছু পরে, অর্থাৎ ক্ষয়চক্রের বিলম্ব যৌবনের পর থেকে নদীখাত ও প্রবাহের প্রকৃতি এমনই হয় যে, নদীর কার্যকরী শক্তি কেবলমাত্র পলি পরিবহনেই ব্যয়িত হয়। সঞ্চয় বা ক্ষয় উভয়ই সাধারণভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন নদী এই অবস্থায় পৌঁছলে এটি পর্যায়িত অবস্থায় রয়েছে বলে মনে হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় নদী বরাবর ঢাল পর্যায়িত থাকে না। এর অর্থ নদীপথে বিভিন্ন অংশে নদীর গতিবেগ এমনই থাকে যে, ঐ অবস্থার মধ্যে কোন অংশে নদী যে পরিমাণ পলির বোঝা বহন করে তার থেকে বহন ক্ষমতা বেশী থাকে এবং ফলস্বরূপ নদী ক্ষয় করে অথবা নদী মধ্যস্থিত পলির পরিমাণ নদীর বহন ক্ষমতার বেশী থাকে ও নদী সঞ্চয় করে। এখন কিভাবে নদী পর্যায়িত ঢাল তৈরী করে তা আলোচনা করা হল।

নদীর গতিপথকে ক্ষয় ও সঞ্চয় প্রক্রিয়ার অধীন কতকগুলো অংশে ভাগ করা যায়। মনে করা যাক, একটি অংশে উপস্থিত অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ পার্শ্বদেশ থেকে ক্ষয়ের ফলে নদীতে সংগৃহিত পলি এবং নদীর উর্ধ্বপ্রবাহ থেকে আনীত পলির পরিমাণ এমনই থাকে যে, নদী তার থেকে বেশী পলি বহনের ক্ষমতা রাখে। এই অবস্থায় এই অংশে সামগ্রিকভাবে নদীবক্ষের ক্ষয় হয় এবং এই ক্ষয় উর্ধ্ব প্রবাহে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধৌতের ফলে যে পলি সংযোজন ঘটে তাতে নদীর পলির বোঝা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে ও নদীর ক্ষয়কার্য হ্রাস পায়। তখন নদীর উর্ধ্বপ্রবাহে নিম্নক্ষয় বেশী ও নিম্নপ্রবাহে নিম্নক্ষয়ের হ্রাস নদী বরাবর ঢালকে হ্রাস করে। ঢালের ক্রমহ্রাসের ফলে নদীর গতিবেগ ও ক্ষয়ের ক্ষমতা কমতে থাকে। এরূপ প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না এই অংশের ঢাল এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় এবং নদীর গতিবেগ এমনই হয় যে নদীবাহিত পলি তার পরিবহন ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। এই অবস্থায় নদী না ক্ষয় না সঞ্চয় অবস্থায় বিরাজ করে এবং নদীর ঢাল পর্যায়িত হয়।

এখন উপরিউক্ত অবস্থার এক বিপরীত অবস্থা কল্পনা করা যায়। মনে করা যাক, কোন এক অংশে নদী বরাবর ঢাল এমনই যে এই ঢালের উর্ধ্বপ্রবাহ থেকে যে পরিমাণ পলিবাহিত হয়ে আসে ও পার্শ্বধৌতের ফলে যে পরিমাণ পলি নদীতে সংযোজিত হয় তা নদীর পলি পরিবহন ক্ষমতার বেশী। এরূপ অবস্থায় নদী সামগ্রিকভাবে পলি সঞ্চয় করবে। নদীর এরূপ অবস্থাকে ভূমি গঠন (aggredation) বলে। নদীর কার্যে বা সঞ্চয় কার্যে ব্যপৃত এই নদী এই এই অংশে উর্ধ্বপ্রান্তে অধিক সঞ্চয় এবং নিম্নপ্রান্তে কম সঞ্চয় করবে। কারণ যত পলি সঞ্চিত হবে ততই পলির বোঝা (load) হ্রাস পাবে। নদীর গতিবেগ বাড়বে ও নদীর পলি পরিবহন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে ও পলি সঞ্চয় ক্রমশ কম হবে। এইভাবে উর্ধ্বপ্রান্তে অধিক সঞ্চয়ও নিম্নপ্রান্তে ক্রমশঃ কম সঞ্চয় নদীর ঢালকে বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে নদীর গতিবেগ ও পলি পরিবহন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না ভূমির ঢাল ও নদীর গতিবেগ বৃদ্ধি এমনই হয় যে, যে পরিমাণ পলি নদীতে এসে পৌঁছায় সেই পরিমাণ পলি নদী পরিবহনে সক্ষম হয়। ফলে নদীর ঢাল পর্যায়িত অবস্থায় পৌঁছায়।

নদী পর্যায়ের অন্যান্য নিয়ন্ত্রকগুলো হল নদীর গতিবেগ যা সম্পূর্ণভাবে ভূমির ঢালের ওপর নির্ভরশীল নয়, নদীখাত বৈশিষ্ট্য এবং পরিবাহিত দানার আয়তন। নদীখাতের বৈশিষ্ট্য বলতে খাতের আকার, খাত পদার্থের দানার আয়তন, নদী খাতের পার্শ্বচলনের হার প্রভৃতিকে বোঝায়। নদীর পার্শ্বচলন আবার নদীর গতিবেগ এবং তট অঞ্চলের পদার্থের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

ম্যাক্‌কিনের (Mackin) এর মতে এক স্বাভাবিক নদীর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রকগুলোর ঘাত প্রতিঘাতে নদীর উর্ধ্বপ্রবাহ থেকে নিম্নপ্রবাহ পর্যন্ত স্থানে এক ধারাবাহিক নিয়মানুগ পরিবর্তন হয় এবং নদীর অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ অবতল প্রকৃতির হওয়ার প্রবণতা থাকে। এই নিয়ন্ত্রকগুলো নদীর বিভিন্ন প্রবাহে নিম্নলিখিতভাবে কাজ করে।

(ক) নিম্নপ্রবাহে পলির বোঝার পরিমাণ থেকে জলপ্রবাহের পরিমান বাড়ে। ব্যতিক্রম হল সেই সমস্ত নদী যেগুলো পর্বত অতিক্রম করে মরুভূমি বা প্রায় মরুভূমি অঞ্চলে পতিত হচ্ছে। সাধারণক্ষেত্রে বর্ধিত জলপ্রবাহের অর্থ অপেক্ষাকৃত কম ঢালযুক্ত ভূমির ওপর দিয়েও পরিবহনে সমর্থ হয়।

(খ) নদীর নিম্নপ্রবাহে পলি কণার আয়তন হ্রাসের জন্য বোঝার পরিমাণ স্থির থাকলে অপেক্ষাকৃত কম ঢাল বরাবর এই পলি পরিবাহিত হতে পারে।

(গ) বর্ধিত জল প্রবাহের অন্তর্নিহিত অর্থ নদীখাতের প্রস্থচ্ছেদের পরিসীমা বৃদ্ধি এবং খাতের আকার বৃদ্ধি পরিবর্তিত থাকে তাহলে নদীখাতের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি নদীর পলি পরিবহনের ক্ষমতা বাড়ায়।

(a) নদীর গভীরতা যত বাড়ে পলির দানা তত সূক্ষ্ম হয় এবং নদীবক্ষ ততই মসৃন হয়। এরফলে ঘর্ষণ, বিক্ষুব্ধ প্রবাহজনিত নদীর শক্তিক্ষয় হ্রাস পায় অপেক্ষাকৃত মৃদ ঢালেও পলি পরিবহন সম্ভব হয়।

এক আদর্শ নদীর ক্ষেত্রে উৎস থেকে দূরত্বে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জল প্রবাহের পরিমাণ যে হারে বাড়ে তার সঙ্গে সমতা রেখে পলির বোঝাও বাড়া উচিত কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এরকম অবস্থা কদাচ দেখা যায়। যেমন উপনদী সঙ্গমস্থলে স্বভাবতই জল প্রবাহ ও পলির বোঝার সংযোজন প্রধান নদীর সাম্য অবস্থার বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়াও উপনদীগুলোর প্রবাহমাত্রা ও পরিবাহিত পলির বোঝা সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হয়। তাই বর্তমানে পর্যায়ন ধারণা সেকেলে বলে পরিগণিত হয়। কারণ, যদি বা সাময়িকভাবে নদীর এক অংশে পর্যায়ন সম্ভব হয় পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সাম্য বা পর্যায়ন অবস্থায় বিচ্যুতি ঘটে। লিওপোল্ড, উলম্যান, মিলারের মতে নদীর ঢাল নদীখাতের আটটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নিয়ন্ত্রক রয়েছে। এগুলি হল নদীর প্রস্থ, গভীরতা, গতিবেগ, ঢাল, পলির বোঝা, পলির দানার আয়তন, নদীবক্ষের মসৃণতা, নদীর কারণ। এই নিয়ন্ত্রকের কোন একটির পরিবর্তন হলে নদীর সাম্য অবস্থার বিঘ্ন ঘটে ও প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্য সবগুলো বা কতকগুলো নিয়ন্ত্রকের উপর প্রভাব পড়ে।

এখানে উল্লেখযোগ্য ভূ-আন্দোলন, জলবায়ু পরিবর্তন, বৃক্ষচ্ছেদন, কৃষিকার্য প্রভৃতি মানুষের হস্তক্ষেপ, অববাহিকা অঞ্চলে ভিন্ন প্রকৃতির শিলার প্রকাশ নদীতে পরিবাহিত পলির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায় ও এরফলে নদী নতুন করে পর্যায়িত ঢাল তৈরী করতে সচেষ্ট হয়।

প্রধান নদীর সঙ্গে সমতা রেখে উপনদীগুলোও তাদের অনুদৈর্ঘ্য ঢালকে পর্যায়িত করতে সচেষ্ট হয়। উপনদীর ক্ষেত্রে মূল নদীর উচ্চতাই নদীর নিম্নক্ষয়ের সীমা। একে ঐ উপ-নদীটির স্থানীয় নিম্নক্ষয়সীমা (local base level erosion) বলা হয়। প্রধান নদীটির উচ্চতা হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে এতে পতিত উপনদীগুলোর ক্ষয় ও সঞ্চয় ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

3.4.2 নদীর আড়াআড়িভাবে প্রস্থচ্ছেদ (Cross profile of a river)

নদী উপত্যকা (river valley) : নদীর আড়াআড়ি দিকে বা সমকোণের দিকে উপত্যকা গঠনের মূল প্রক্রিয়াই হল নিম্নক্ষয়। ক্ষয়কার্যের ফলে নদীগর্ভে নীচের দিকে কাটতে থাকে। অপরপক্ষে নদীর পাড় ও পার্শ্বদেশ ধৌত (বৃষ্টি ফল, তুষারগলা জল প্রভৃতির দ্বারা) ও অন্যান্য পুঞ্জক্ষয় প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। এই দুই প্রক্রিয়ার সম্মিলিত হল হল 'V' আকৃতির উপত্যকা। যেখানে নদীর নিম্নক্ষয় নদীর পার্শ্বক্ষয় থেকে প্রবল হয় সেই অংশে নদী উপত্যকার পার্শ্বদেশ অধিক ঢালযুক্ত হয় ও সংকীর্ণ 'V' আকৃতির উপত্যকা গতি হয়। ক্ষয়চক্রের যৌবনকালে অর্থাৎ ভূমির উত্থানের অব্যবহিত পরে নদী নিম্নক্ষয় বেশী করে ও সংকীর্ণ 'V' আকৃতির উপত্যকার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে এই ধরনের উপত্যকা লক্ষ্য করা যায়। মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অভাবে পার্শ্ববর্তী অংশে ক্ষয় খুব কমই হয়, কিন্তু নদীর নিম্নক্ষয় অব্যাহত থাকে। ফলে প্রায় খাড়া পার্শ্ববিশিষ্ট I আকারের উপত্যকা বা গিরিখাতের (canyon) সৃষ্টি হয়। কলেরাডো মরুভূমিতে কলেরাডো নদীতে এরূপ গিরিখাত লক্ষ্য করা যায়। এই নদীর গ্রান্ড ক্যানিয়ন (grand canyon) এক পৃথিবী বিখ্যাত উদাহরণ। পর্বতশ্রেণী অতিক্রমকালে পূর্ববর্তী নদীতে এরকম গিরিখাত সৃষ্টি করে।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদী যতই নিম্নক্ষয় করতে থাকে ততই ক্ষয়ের নিম্নসীমার সাপেক্ষে এর উচ্চতা ও ঢালের হ্রাস ঘটে। ফলে নদীর নিম্নক্ষয় ক্ষমতা কমতে থাকে। অপরপক্ষে তুলনায় পার্শ্বক্ষয় প্রবল হতে থাকে। ফলে উপত্যকার প্রশস্তিকরণ চলতে থাকে এবং উপত্যকার 'V' আকৃতি ক্রমশ প্রশস্থ হতে থাকে।

যদি নদী উপত্যকা বরাবর কোন স্থানে কোমল শিলার প্রকাশ ঘটে তাহলে সেই অংশে নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে সম্পন্ন হয়। এই অংশে সাধারণতঃ উপনদীর সৃষ্টি হয় এবং উপত্যকা আদর্শ আকৃতির 'V' এর মত না হয়ে অনেকটা গোলাকৃতি ও উন্মুক্ত হয়। (চিত্র 3.2)

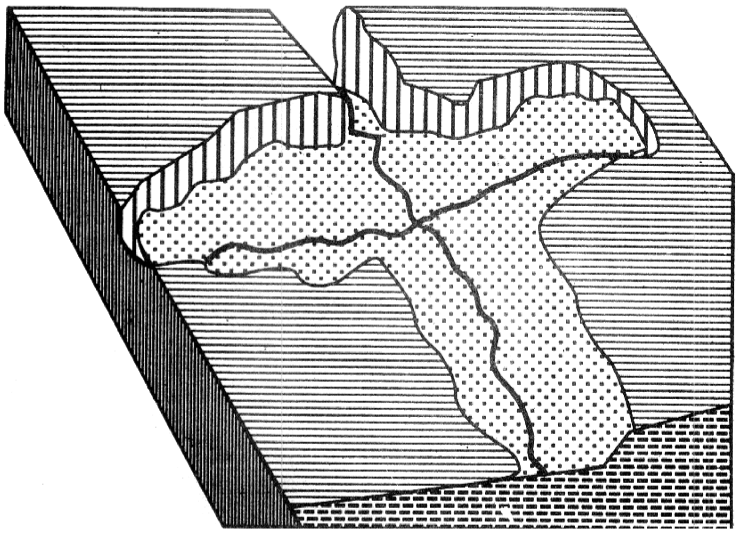

চিত্র 3.2 : কঠিন ও কোমল শিলার ওপর গঠিত উপত্যকায় প্রস্থচ্ছেদের ভিন্নতা।
ডট্ চিহ্নিত কোমল শিলার ওপর উন্মুক্ত ও প্রশস্ত উপত্যকার সৃষ্টি।

অনেক সময় নদী উপত্যকা শিলাস্তরের সমান্তরাল দিকে গঠিত হয়। এরূপ অবস্থায় নদীর একটি বিশেষ প্রবণতা হল শিলাস্তরের নতি বরাবর অর্থাৎ নদীর আড়াআড়ি দিকে স্থান পরিবর্তন। এরূপ অবস্থায় যে ঢাল বরাবর নদীর পার্শ্বসরণ ঘটে সেই ঢাল অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং যে দিকে পার্শ্বসরণ ঘটে তার বিপরীত দিকের উপত্যকার ঢাল অপেক্ষাকৃত খাড়া হয়। ফলে অপ্রতিসম প্রকৃতির উপত্যকা সৃষ্টি হয়।

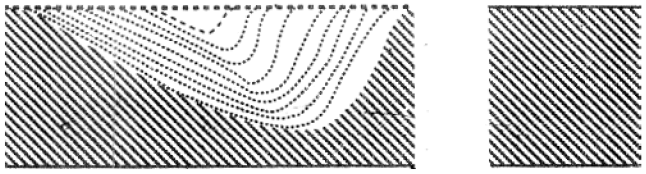

চিত্র 3.3 : শিলানতির পার্শ্বসরণে ফলে সৃষ্ট অপ্রতিসম প্রকৃতির উপত্যকা

গাঠনিক শিলাধাপ (Structural rock benches) : একটি অঞ্চলের গঠনের উপরেও উপত্যকার পার্শ্বদেশের চিত্র অনেকাংশে নির্ভর করে। যদি একটা অঞ্চল পর্যায়ক্রমে প্রায় অনুভূমিকভাবে কঠিন ও কোমল শিলা দ্বারা গঠিত হয় তাহলে কঠিন শিলার উপর অপেক্ষাকৃত খাড়া উপত্যকার ঢাল ও কোমল শিলার উপর মৃদু ঢালযুক্ত উপত্যকার সৃষ্টি হয়। ফলে উপত্যকার পার্শ্বদেশ ধাপবিশিষ্ট হয়। একে গাঠনিক শিলা ধাপ (Structural rock benches) বলে। (চিত্র নং 3.4)

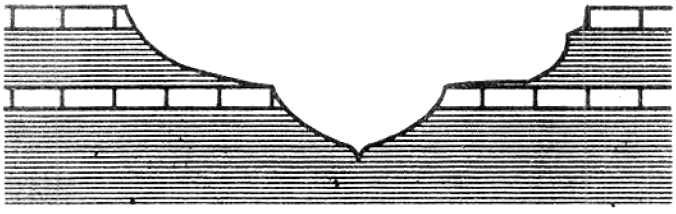

চিত্র 3.4 : নির্দেশক : কঠিন শিলা কোমল শিলা গাঠনিক শিলাধাপ সমন্বিত নদী উপত্যকার ছেদ

প্লাবনভূমি ও নদীমঞ্চ (flood plain এবং river terrace) : নদী বাঁক নেবার কালে ক্ষয়কার্য করে নদীর পার্শ্ববর্তী অংশে এক প্রায় সমতল সৃষ্টি করে। একে প্লাবনভূমি বলা হয়। পরবর্তীকালে কোন কারণে নদীর নিম্নক্ষয় ক্ষমতা বেড়ে গেলে ঐ প্লাবনভূমির মধ্যে নদী কেটে বসে যায় ও পুরানো প্লাবনভূমি নদীবক্ষ থেকে কিছুটা ওপরে মঞ্চের আকারে দাঁড়িয়ে থাকে। একে নদীমঞ্চ (river terrace) বলে। প্লাবনভূমি ও নদীমঞ্চ উপত্যকার তলদেশে কিছু পরিমাণ সমতল অংশের সৃষ্টি করে।

3.5 নদীখাত ও নদীখাতের বিভিন্ন প্রণালী (River Channel and Channel Pattern)

3.5.1 নদীবাঁক (Meander)

প্লাবনভূমি নদী বাঁক এটাই নির্দেশ করে যে নদীর পাশের দিকেও ক্ষয় করে। কিন্তু নদী তার গতিপথে কেন বাঁধ সৃষ্টি করে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়নি। তবে গতিপথে দৈবাৎ বাধাকে পাশ কাটানোর জন্য নদী বাঁকের সৃষ্টি হয় বলে সরল ধারণা যে ঠিক নয়, এটা পরিস্কার। তার কারণ অনেক নদীকে সুন্দর প্রতিসম বাঁকের সৃষ্টি হয়েছে বা এলোপাথাড়ি বাধার ফলে সৃষ্টি হতে পারে না বলেই মনে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে খাতের প্রস্থ, বাঁকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য, বাঁকের বিস্তার, বাঁকের বক্রতার ব্যাসার্ধ প্রভৃতির মধ্যে যে সুসম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় তাতে এগুলো যে দৈবক্রমে হয় তা মেনে নেওয়া যায় না। সুসম্পর্কের উদাহরণ হিসাবে ইঙ্গালিস, লিওপোল্ড, উলম্যান। (Inglis, Leopold, Wolman) দেখিয়েছেন যে, নদী বাঁকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নদীখাতের প্রস্থের 7 থেকে 11 গুণ হয়। কোন নদীর নিম্নপ্রবাহের দিকে ক্ষরণের পরিমাণ যেমন বাড়ে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুটো বাঁকের অন্তবর্তী দূরত্ব বাড়ে। নদী বাঁকের বক্রতার ব্যাসার্ধ গড়ে নদী খাতের প্রস্থের প্রায় তিনগুণ হয়।

একথা সত্য যে কতকগুলো বিষয়ে সরলরেখাবৎ নদী ও বাঁকযুক্ত নদীর মধ্যে খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন আয়তনের পলিকণা পরিবহন করে এমন সরলরৈখিক নদীর ক্ষেত্রে স্থূলতর পলিকণা পরিবহন প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়ে গ্রাভেল দ্বারা চরা (bar) বা অগভীর খাতের সৃষ্টি করে। এই অংশে নদী দ্রুত প্রবাহিত হয় ও প্রবাহ অল্প বিক্ষুব্ধ বা জলপৃষ্ঠ তরঙ্গায়িত প্রকৃতির হয়। তাকে রিফ্‌ল (riffle) বলে। এইরকম দুই রিফ্‌লের অন্তবর্তী অংশে খাত গভীরতর থাকে যেখানে নদী শান্তভাবে প্রবাহিত হয়। এরূপ অংশকে পুল (pool) বলে। নদীর অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদে অনেক সময় পর্যায়ক্রমে এরকম 'পুল' ও 'রিফ্‌ল' সৃষ্টি হয়।

এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে চরের ব্যবধানের মধ্যে এক সুসম্পর্ক রয়েছে। সাধারণতঃ দুটো চরের মধ্যে দূরত্ব নদী-খাতের 5 - 7 গুণ হয়ে থাকে। চর সরল রৈখিক নদী প্রবাহে পার্শ্বচলনের এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এতে নদী বাঁক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। বাঁক সমন্বিত নদীতেও এরকম পুল ও রিফল্ লক্ষ্য করা যায়। বাঁকের বর্হিপ্রান্তদেশে পুল ও যেখানে বাঁকের বক্রতার দিক পরিবর্তিত হয় সেখানে রিফ্‌লের সৃষ্টি হয়। বাঁকের অন্তঃপ্রান্তদেশে বিন্দুবারের (point bar) সৃষ্টি হয়। উল্লম্বতলে স্প্রিং এর মত পাক খেয়ে জলের অনুভূমিক প্রবাহ নদীবাঁকে পুল ও বিন্দুবার উভয়ের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। যখন বাঁকের একধার থেকে অন্যধারে জলপ্রবাহ হয় তখন সর্বোচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন প্রবাহ বাঁকের এই অংশের প্রবল কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal) ক্রিয়া করে। ফলে তীরবর্তী অংশে জলের সঞ্চয় বেড়ে যায় বা জল ফুলে ওঠে। ওজন বেশী বলে জল এই অংশে নিম্নগামী হয়। ক্ষয়কার্য সাধন করে ও পুলের সৃষ্টি করে। প্রবাহের অনুভূমিক উপাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থকে নদীবক্ষ বরাবর পরিবাহিত করে ও বাঁকের অন্তঃপ্রান্তের কেন্দ্রের কিছু নিম্ন প্রবাহে এদের সঞ্চয় করে। এছাড়া নদীর জলপ্রবাহে

বাঁকের বহিঃপ্রান্তে চালিত হলে বাঁকের অন্তঃপ্রান্তদেশে জলের খাতটি দেখা যায়। ফলে এই অংশে জলপৃষ্ঠে এক বিপরীত ঘূর্ণী (back eddy) সৃষ্টি হয়। প্রবাহের বেগ মন্দীভূত হয় ও সঞ্চয় ঘটে। যেখানে বাঁকের মক্রতার দিক পরিবর্তিত হয় সেখানে মূল প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়। ফলে এই অংশে ক্ষয় কম হয় ও অগভীর অংশ বা রিফ্‌লের সৃষ্টি হয়।

এরূপ দুটো সন্নিহিত বাঁকের অভিমুখ পরিবর্তন বিন্দু (inflection point) বা রিফ্‌লের অন্তবর্তী দূরত্ব সরলরৈখিক নদীর দুটি চর বা রিফ্‌লের অন্তবর্তী দূরত্বের মত নদী খাতের প্রস্থের 55 - 80 গুণ হয়। এর অর্থ সরলরৈখিক ও বাঁক সমন্বিত নদীখাতের প্রকৃতিও এই বিষয়ে একই রকম। লিওপোল্ড ও উলম্যান (1957) বাঁক সমন্বিত নদী (meandering stream) ও বিনুনী নদী (braided) সম্পর্কে এক মূলবান বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। যেসমস্ত নদীতে ক্ষরণ খুবই অনিয়মিত (যেমন হিমবাহগলন পুষ্ট নদী) ও নদীর তট সহজ ক্ষয়প্রাপ্ত যোগ্য (যেমন দৃঢ়সংবন্ধ বালি ও গ্রাভেল) পদার্থ দিয়ে গঠিত সেখানে বিনুনী নদীখাতের সৃষ্টি হয়। যখন নদীর প্রবাহ তুঙ্গো থাকে তখন খাতের তটভাগে নিম্নখনন দ্রুত হয় ও নদীবক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বোঝার সংস্থান হয়। এই বোঝা নদীখাতের আর এক অংশে সঞ্চিত হয় ও মগ্নচরার সৃষ্টি করে। যখন নদীর ক্ষরণ কমে আসছে বিশেষ করে সেই সময় এই সঞ্চয় হয়ে থাকে। যদিও সাময়িকভাবে এই সঞ্চয় অস্থায়ী থাকে কিন্তু কালে সঞ্চয় ক্রমশঃ বাড়ে ও এর ওপর গাছপালা জন্মালে এরা সুস্থিত হয়। এরফলে নদী শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, পুনর্মিলিত, পুনর্বিভক্ত হয়ে বিনুনী নদীখাতের সৃষ্টি করে। নদীতটের ক্রমাগত ক্ষয়ের ফলে নদীর প্রস্থ সামগ্রিকভাবে ক্রমশ বাড়তে থাকে ও অন্য পক্ষে জলের গভীরতা ক্রমশঃ কমতে থাকে। বিনুনী নদীখাতে বোঝা পরিবহনে তেমন কার্যকরী প্রক্রিয়া নয় কারণ জল সংস্পর্শ ভূমি পরিসীমা (wetted perimeter) অস্বাভাবিক দীর্ঘ থাকে। এই অকর্মণ্যতা কাটাতে ও বর্ধিত পরিমাণ জল ও বোঝা পরিবহনের সামর্থ্য অজয়ন করতে নদী বিভিন্ন শাখা অংশের খাতের ঢাল বৃদ্ধি করে।

নদী বাঁকের উৎপত্তির কারণ বিনুনী নদীখাত থেকে স্বতন্ত্র ধরনের বোঝা গেলেও ঠিক কী কারণে নদী বাঁকের উদ্ভব হয় তা রহস্যজনক রয়ে গেছে। এস. শুলিট্‌সের (S. Shulits) মতে কোন এক অংশে নদীবক্ষের ঢালের সঙ্গে নদী বাঁকের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আবার নদীবক্ষের ঢাল ভূমিদেশে পরিবাহিত পদার্থের কণার আয়তনের উপর নির্ভরশীল। যদি দীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে কণার আয়তন হ্রাস পায় বা সন্নিহিত ঢাল বেয়ে আগত পদার্থ কণার আয়তন হ্রাস পায় তাহলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার কণা পরিবহনে নদীর সামর্থ্য বেড়ে যায় বলে সাম্য অবস্থা ফিরে আসার জন্য নদীরবক্ষে ঢালও এর উপর নির্ভরশীল নদীর বেগের হ্রাস প্রয়োজন হয়। এই অবস্থা উত্তরণের সহজ উপায় হল গতিপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা যা বাঁক সৃষ্টির ফলে সম্ভব হয়। লিওপোল্ড, উলম্যান ও মিলার নদী বাঁক উৎপত্তি সম্বন্ধে আর এক পরিশীলিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের যুক্তি হল যে নদী তার খাত বরাবর এমনভাবে এক স্থিতিশীলতা অর্জনে সচেষ্ট হয় যাতে খাত বরাবর সর্বত্র শক্তিক্ষয় সমহারে হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা হয় যে, নদী এক সমপর্যায়ের শক্তিরেখা (Uniform energy grade line) অর্জন করে। রিফ্‌ল ও পুল সমন্বিত সরলরৈখিক নদীতে শক্তি ক্ষয় তখন প্রকৃতির হয়, কারণ রিফ্‌ল অঞ্চলে নদীর শক্তিক্ষয় বেশী ও পুল অঞ্চলে শক্তিক্ষয় কম হয়। অনুরূপভাবে, বাঁক সমন্বিত নদীতে বক্রতার অভিমুখ পরিবর্তন অবতলে অগভীরতার জন্য নদীর শক্তিক্ষয় বেশী হয় ও বাঁকের পুল অঞ্চলে শক্তিক্ষয় কম হয়। আবার যদি নদীপথের বক্রতা নদীর শক্তিক্ষয়ে কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করে তা বিবেচনা করি, তাহলে দেখি যে বক্রতার অভিমুখ পরিবর্তন অংশে নদী সরলরেখা বরাবর বিস্তৃত থাকায় নদীর শক্তিক্ষয় ন্যূনতম এবং বাঁক অঞ্চলে নদী প্রবাহের ডান বা বঁদিকে বিক্ষেপের জন্য নদীর শক্তিক্ষয় সর্বোচ্চ হয়। কাজেই এক অংশে বাঁক ও পুল এবং অন্য অংশে সরল গতিপথ ও অগভীর জল পরস্পর বিপরীতমুখী ক্রিয়া করে সমগ্র খাত বরাবর সমপর্যায় শক্তিরেখা অর্জনে সাহায্য করে।

3.5.2 বিনুনীরূপী নদীখাত প্রণালী (Braided Channel Pattern)

যে ভূমিভাগের ওপর দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে তার পদার্থের প্রকৃতির ওপরও নদীর বাঁকের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, বালুকা ও গ্রাভেল জাতীয় পদার্থ গঠিত অঞ্চলে নদী সাধারণতঃ বিনুনীখাত তৈরী করে। অপরপক্ষে কর্দম গঠিত অঞ্চলে নদীর বাঁক দিয়ে প্রবাহিত হবার প্রবণতা থাকে। কর্দম বেশ সংসক্ত বলে নদীতট সহজে ধসে পড়ে না ও একবার বাঁক নিলে সে বাঁক সহজে বিনষ্ট হয় না। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে কর্দমগঠিত অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত গোমতী ও সাই নদী বাঁক নিয়ে চলে ও বালুকাময় অঞ্চলের ওপর প্রবাহিত ঘর্ঘরা ও গঙ্গা নদী বিনুনীর আকার নিয়েছে। এছাড়াও বড় বড় নদী যেমন ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, ঘর্ঘরা, শতদ্রুর বিনুনী প্রবাহ সৃষ্টির প্রবণতা থাকে। অপরপক্ষে যমুনা, সারদা, চম্বল, বেতোয়া, কেন, টন্‌স, গোমতী, সাই, রাপ্তী, বুড়িগণ্ডকের বাঁক নিয়ে চলার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, একই নদী প্রায় সমপ্রকৃতির ভূমির ওপর প্রবাহপথের এক অংশে বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ও অন্য অংশে বিনুনী সৃষ্টি করে প্রবাহিত হচ্ছে। যেমন হিমালয় পাদদেশ অঞ্চল থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত অংশে গঙ্গা নদী বিনুনীরূপে প্রবাহিত হচ্ছে এবং এরপর থেকে বলিয়া পর্যন্ত অংশে প্রধানতঃ বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কোশী নদী পর্বত পাদদেশীয় অঞ্চলে বিনুনীরূপে ও নিম্নপ্রবাহে (ঘুঘরী নামে পরিচিত) বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একথা সত্য যে নদীখাত সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এখনও এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। এতৎসত্ত্বেও ভারতের কতকগুলো প্রধান নদীর ক্ষেত্রে খাত বৈশিষ্ট্য ও প্রবাহপথের পদার্থের প্রকৃতির সম্পর্ক নিম্নলিখিত তালিকায় প্রকাশ করা হল—

গতিপথের উপর পদার্থের প্রকৃতি	**নদীখাত বৈশিষ্ট্য**	**উদাহরণ**
কর্দম	ব্রেসলেট অনুরূপ বা প্রায় গোলাকার বা অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক	গঙ্গা, গোমতী, ঘাই, রাপ্তী নন্ডক, নিম্ন কাশী, নিম্ন চম্বল বেতোয়া, কেন ইত্যাদি
দোঁয়াশ, বেলে, দো-আঁশ	বিনুনী প্রবাহ, সরল তরঙ্গা সদৃশ বা অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক	গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ঘর্ঘরা, শতদ্রু
গ্রাভেল, শিঙ্গাল ও স্থূল বালি	বিনুনী প্রবাহ	হিমালয় ঘানুদেশীয় ভাবর অঞ্চলের নদীখাত ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে দক্ষিণ বিহার সমভূমিতে অবতীর্ণ নদী।
মিরেট শিলা	মোটামুটি মরণ বা কুব্জ খাত বা মৃদু বক্র তরঙ্গা সদৃশ বাঁক	হিমালয় পর্বতের নদী, ঊর্ধ্ব শোন, ঊর্ধ্ব নর্মদা, ঊর্ধ্ব কেন, ঊর্ধ্ব বেতোয়া, ঊর্ধ্ব ধামান

পরিশেষে ডিউরির (G.H. Dury) পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডিউরী লক্ষ্য করেছেন যে উপত্যকা ও নদী দুই-ই আঁকাবাঁকা পথে প্রসারিত হতে পারে। এরকম উপত্যকার মেঝে পলল গঠিত ও এই নদীগুলি পলিকে কেটে নিম্নস্থিত ভিত্তিশিলার ওপর বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর এদের বাঁকের ভিতর উপত্যকার বাঁকের বিস্তার থেকে অনেক কম। দক্ষিণ ইংল্যান্ড উপত্যকার পললে গর্ত করে দেখা গেছে যে পললের নীচে সুবৃহৎ, প্রাচীন নদীখাত রয়েছে বা উপত্যকা বাঁকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডিউরি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই সমস্ত

প্রাচীন উপত্যকার বাঁক নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে তখনই উদ্ভুত হয়েছিল যখন নদীর ক্ষরণ বর্তমানের থেকে 80-100 গুণ বেশী ছিল। কোয়াটার্নারী যুগের বর্ধিত বৃষ্টিপাত ও কম বাষ্পীভবন, প্রস্বেদন এরকম বর্ধিত জলপ্রবাহের কারণ ঘটিয়েছিল। হিমযুগের শেষে প্রাচীন উপত্যকা পলি ভরে গিয়েছিল এবং বর্তমানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাঁক সমন্বিত নদীগুলোর আর সেরকম ক্ষমতা নেই ও বেমানান নদী হিসেবে প্রাচীন উপত্যকা বাঁকের মধ্যে অবস্থান করছে।

খোদিত নদী বাঁক (Incised Meandor) : নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে উদ্ভুত বিশিষ্ট ভূমিরূপ।

3.6 নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে উদ্ভুত ভূমিরূপ

3.6.1 নদীর ক্ষয় বক্ররেখা (Curve of water erosion)

নদী ক্ষয় বক্ররেখা বা অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ মূলতঃ ক্ষয়কার্যের ফলেই গঠিত হয়ে থাকে। অবশ্য নদীর নিম্নপ্রবাহে বদ্বীপ গঠন নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে হয়ে থাকে। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সঞ্চয়কার্য মধ্য প্রবাহেও বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। যেমন উর্ধ্ব ও মধ্য গঙ্গা সমভূমি, গঙ্গা-নদী ও এর বিভিন্ন উপনদীর সঞ্চয়কার্যের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের ভূমির উত্থানের ফলে নিজের পুরানো সঞ্চয়ের মধ্যে অল্প হলেও গঙ্গা নদী নতুন করে ক্ষয় করছে। যেকোন নদীর সমভূমি প্রবাহ অংশে কম বেশী ক্ষয় হয়ে যাবে। কাজেই বদ্বীপ প্রবাহের আগে পর্যন্ত নদীর অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ মূলতঃ নদীর ক্ষয়কার্যের ফলেই সৃষ্টি হয়। একেই নদীক্ষয় বক্ররেখা বলে। এই বক্ররেখা অবতল প্রকৃতির হয় ও অবতল পার্শ্ব অপরের দিকে মুখ করে থাকে। নদীক্ষয় বক্ররেখা উৎপত্তির বিবরণ, নদীর অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদের বর্ণনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে।

3.6.2 জলপ্রপাত ও খরস্রোতা (water falls and rapids)

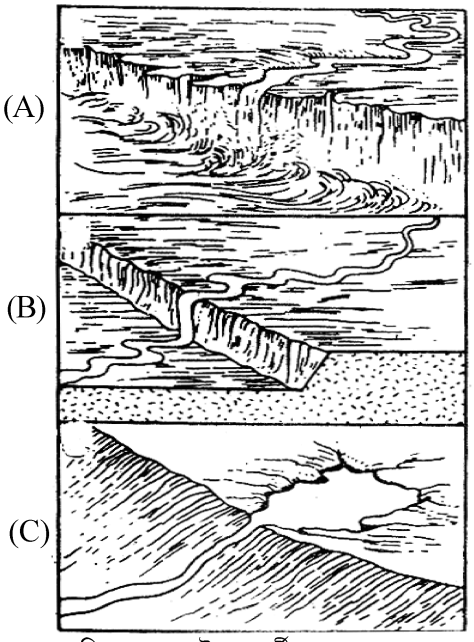

চিত্র 3¯5 : (A) উপকূলবর্তী ভৃগু অঞ্চলে
(B) চ্যুতি অঞ্চলে, (C) উত্থানের ফলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি

পর্বত ও মালভূমি অংশে নদীর নিম্নকর্তন সক্রিয় থাকে কিন্তু শিলার কাঠিন্যের তারতম্যের অনুযায়ী ক্ষয় সর্বত্র সমান হয় না। এর ফলে সৃষ্ট নদীবক্ষে নানা প্রকার চালের অনিয়ম জলপ্রপাত বা খরস্রোতের সৃষ্টি হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নদীবক্ষে শুরুতেই খাড়াতল বর্তমান থাকতে পারে। যেমন নদীর আড়াআড়ি চ্যুতি ভৃগুতটের অবস্থান (চিত্র 3.5)। এরূপ অনিয়মিত থাকলেও এটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাধারণতঃ যেখানে নদীবক্ষে কঠিন ও কোমল শিলার সন্ধিস্থল প্রকাশ পায় সেখানে সবসময়ই ঢালের বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়। কারণ নিম্নপ্রবাহে অবস্থিত কোমল শিলা অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই অংশে নদীবক্ষের ঢাল বৃদ্ধি পায়। যদি শিলাস্তরগুলি অনুভূমিকভাবে সজ্জিত থাকে তাহলে সাধারণতঃ জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। এভাবেই নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে উপকূলবর্তী ভৃগু অঞ্চলে, চ্যুতি সংঘটিত অঞ্চলে এবং উত্থানপর্বের ফলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। (চিত্র 3.5 a, b এবং c) এই জলপ্রপাতে কিন্তু ক্রমশঃই

পশ্চাদগামী হচ্ছে। কারণ প্রপাতের জল যে ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে তার দ্বারা কঠিন শিলার তলদোষেনিম্নখনন চলতে থাকে (বিশেষ করে নিম্নস্থিত কোমল শিলার উপর)। ফলে অবলম্বনহীন ও পাতলা হয়ে উপরিস্থিত কঠিন শিলা ধ্বসে পড়ে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে বলে ক্রমান্বয়ে জলপ্রপাত পশ্চাদগামী হতে থাকে এবং প্রপাতের উচ্চতাও ক্রমশঃ কমতে থাকে। পশ্চাদগমনকালে নদী এই অংশে গিরিখাতের সৃষ্টি করে। পশ্চাদগমন ও উচ্চতা হ্রাস হবার ফলে এক সময় জলপ্রপাত অন্তর্হিত হয়। যদি শিলাস্তরগুলি বা আগ্নেয় শিলা উদ্ভেদ (প্রধানতঃ ডাইক) বেশ খাড়াভাবে অবস্থান করে তাহলে সাধারণতঃ জলপ্রপাতের পরিবর্তে খরস্রোতার সৃষ্টি হয়। বিরাট আকারের পাথরের চাঁই ফাটল, দারণ বা স্তরায়ণ তল বরাবর খুলে ভেঙ্গে পড়লেও জল প্রপাতের সৃষ্টি হয়। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সোপান প্রপাতের (Cataract) উৎপন্নও হয়। (চিত্র 3.5) স্তরায়ণ তল বা কারণতল বরাবর জলপ্রবাহের নিম্নখনন পাথরের চাঁই এর খননে সহায়তা করে।

3.6.3 মন্থকূপ (Pot holes)

খরস্রোতা বা জলপ্রপাতের পাদদেশে নদীর জলে স্থায়ীভাবে অনেক আবর্তের সৃষ্টি হয়। এই অংশে নদীর জল পাক খেয়ে আবর্তিত হতে থাকে বলে নদী মধ্যস্থিত শিলাচূর্ণের ঘর্ষণে নদীগর্ভের শিলায় গোলাকৃতি গর্তের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে মন্থকূপ বলে। পর্বত বা মালভূমি উভয় অংশেই এরূপ মন্থকূপ দেখা যায়।

3.6.4 প্রাবরিত অভিক্ষিপ্তাংশ (Interlocking spurs) :

পার্বত্য অংশে নদী ছোট ছোট বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ কঠিন শিলাকে পরিহার করার জন্যই নদী এরূপ বাঁক নেয়। যেহেতু নদী বাঁকের বর্হিপ্রান্তদেশে জলপ্রবাহের বেগ সবচেয়ে বেশী থাকে সেইজন্য এই বাঁকের অন্তঃপ্রান্ত পর্বত অভিক্ষিপ্তাংশ বিস্তৃত হয়। এইভাবে পাশাপাশি দুটি বাঁকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিক্ষিপ্তাংশগুলো একে অপরকে অতিক্রম করে বা প্রাবরিত করে। এরূপ প্রাবরিত অভিক্ষিপ্তাংশের মধ্য দিয়ে নদী ছোট ছোট বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়। (চিত্র 3.6)।

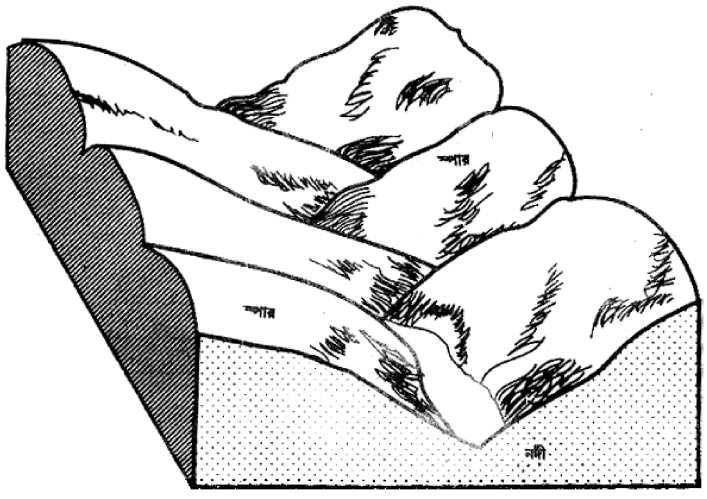

চিত্র 3.6 : প্রাবরিত অভিক্ষিপ্তাংশ (স্পার) অতিক্রম করার কালে নদী ছোট ছোট বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়

3.6.5 নিক্‌বিন্দু (Knickpoint)

নদীবক্ষে বিশেষ করে মালভূমি অংশে অনেক সময় হঠাৎ ঢালের বিচ্যুতি ঘটে এবং এই অংশে জলপ্রপাত,

খরস্রোতা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এগুলো কঠিন ও কোমল শিলার সংযোগস্থলে বৈষম্যমূলক আবহবিকার ও ক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে বলে গণ্য করা যায় না। কারণ অনেক সময় জলপ্রপাত বা খরস্রোতার উভয় পার্শ্বের শিলার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষয়চক্র চলাকালীন পরিণত বা বার্ধক্য অবস্থায় (যখন নদী পর্যায়িত ঢাল সৃষ্টি করে) যদি ভূমির উত্থান, সমুদ্রতলের পতন বা অন্যান্য কারণে নদীর নিম্নক্ষয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাহলে পরিবর্তিত অবস্থায় নদী নিম্নগতির দিক থেকে ঊর্ধ্বগতির দিকে নতুন করে একটি পর্যায়িত ঢাল তৈরী করতে সচেষ্ট হয়। ফলে পুরাতন নদী ঢাল ও নবসৃষ্ট নদীঢালের ছেদস্থানে ঢালের বিচ্যুতি ঘটে ও প্রস্থ অংশে জলপ্রপাত ও খরস্রোতার সৃষ্টি হয়। এরূপ বিচ্যুত ঢালের সন্ধিকে নিক্‌বিন্দু (knickpoint) বলে (চিত্র 3.7) (নদীর পুনর্যৌবন প্রাপ্তি দ্রঃ)

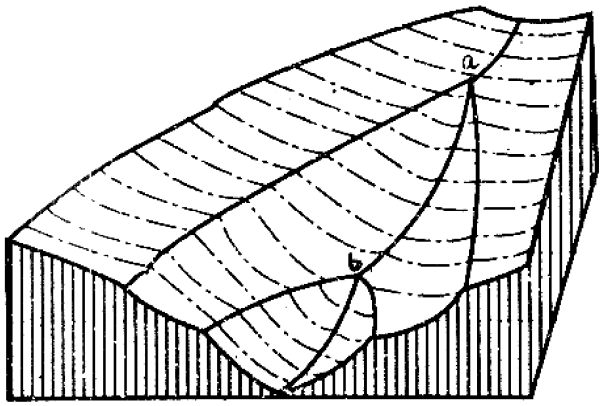

চিত্র 3.7 : নদীর দৈর্ঘ্য পরাবর প্রস্থচ্ছেদ a এবং b স্থলে 'নিক্ পয়েন্ট' গঠন

3.6.6 সঙ্কীর্ণ নদী উপত্যকা, গিরিখাত ইত্যাদি (river valleys, gorges, etc.)

নদী প্রস্থচ্ছেদ প্রসঙ্গে নদী উপত্যকা ক্যানিয়নের কথা আগেই বলা হয়েছে। নদী উপত্যকার মূলে রয়েছে ক্ষয়কার্য। নদীর নিম্নক্ষয় ও পার্শ্বক্ষয়ের সম্মিলিত ফল হল আদর্শ 'V' আকৃতির নদী উপত্যকা। মরুভূমি অঞ্চলে পার্শ্বক্ষয়ের অভাব ক্যানিয়নের সৃষ্টি হয়।

অন্যভাবেও গিরিখাত সৃষ্টি হতে পারে। মেযন নদীর পুনর্যৌবন লাভের ফলে নদী দ্রুত নিম্নক্ষয় করে গিরিখাত সৃষ্টি করতে পারে। আবার অরুণ, তিস্তা প্রভৃতি নদীগুলো হিমালয় পর্বত উত্থানের আগে থেকেই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হত বলে অনুমান করা হয়। এরপর যখন হিমালয়ের উত্থান হতে থাকে তখন উত্থানের হারের সঙ্গে সমতা রেখে নদী বারবার গতিপথ বজায় রাখে। পরিশেষে দেখা যায়, ঐ নদী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গভীর গিরিখাত কেটে প্রবাহিত হচ্ছে। একে পূর্ববর্তী নদী (antecedent river) বলে (গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নদী নকশা ও ভারতের নদী পরিবেশ দ্রঃ)। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদী যতই নিম্নক্ষয় করতে থাকে ততই ক্ষয়ের নিম্নসীমার সাপেক্ষে এর উচ্চতা ও ঢালের হ্রাস ঘটে। ফলে মালভূমি অংশে ভূমির ঢাল ও নদীর বেগ কম থাকে বলে পার্বত্য অঞ্চলের মত নদী প্রবল নিম্নক্ষয় করতে পারে না। কিন্তু পার্শ্বক্ষয় তুলনায় বেশী থাকে। সেইজন্য মালভূমি অংশে নদী উপত্যকা তুলনায় বেশী প্রশস্থ থাকে।

3.6.7 প্লাবনভূমি (flood plain)

নদীর প্রাথমিক ভূমির অনিয়মের জন্য সর্বদাই নদীর কোন কোন অংশে বাঁকের সৃষ্টি হয়। এই বাঁকের বহিঃপ্রান্তদেশে নদী জলস্রোত সরাসরি আঘাত করে ও এর সঙ্গে পাড়ের ক্ষয়ও সংযুক্ত হয়। ফলে এই অংশে নদীর

ক্ষয়কার্য বেশী হয় ও বাঁকের বক্রতাও বাড়তে থাকে। সম্ভবতই এই অংশে নদী যে ভূমি পরিত্যাগ করে এসেছে সেই অংশের ঢাল মৃদু হয় এবং বাঁকের বর্হিপ্রান্তদেশের ঢাল খাড়া হয়। ফলে নদীর পার্শ্বদেশে অপ্রতিসম ঢালের সৃষ্টি করে। যে ঢাল বরাবর নদী বাঁক নেবার সময় অগ্রসর হয়, তাকে পরিত্যক্ত নদী বাঁক ঢাল (slip off slope) বলে। অপরপক্ষে, নদীবাঁকের বর্হিপ্রান্তদেশের খাড়া ঢালকে নিম্নকর্তিত ঢাল (undercut slope) বলে।

চিত্র 3.8 : নদী বাঁকের অন্তর্দেশে বিন্দুবারের সৃষ্টি ও বহির্দেশে ক্ষয় সাধিত হয়ে থাকে। নদীবাঁকের এক অংশে সঞ্চয় ও অন্য অংশে ক্ষয়ের ফলে উদ্ভূত অপ্রতিসম নদীবক্ষের পার্শ্বচিত্র বাঁকের পাশে এঁকে দেখানো হয়েছে। তীরচিহ্নের সাহায্যে জল প্রবাহের প্রকৃতি দেখান হয়েছে।

এইভাবে বাঁকের একদিকে প্রায় সমতল বা ঈষৎ ঢালযুক্ত ভূমির সৃষ্টি হয়। প্লাবনের সময় এর উপর জলের অনুপ্রবেশ ঘটে ও জলমধ্যস্থিত পলি এই ভূমির উপর থিতিয়ে পলির এক আস্তরণ ফেলে। এর ফলে ঐ প্রায় সমতলভূমি আরও মসৃন বা সুসমতল হয়ে ওঠে। একেই প্লাবনভূমি (flood plain) বলে। (চিত্র 3.9) পার্বত্য অংশে নদীর বাঁক ছোট থাকে বলে প্লাবনভূমি সাধারণতঃ সংকীর্ণ থাকে ও প্লাবনভূমির প্রস্থ নদীর বাঁকের প্রস্থ থেকে খুব একটা বেশী থাকে না। মালভূমি বা উচ্চ সমভূমি অংশে নদী বাঁক অপেক্ষাকৃত বড় হওয়ায় প্লাবনভূমি বেশী প্রশস্থ হয়।

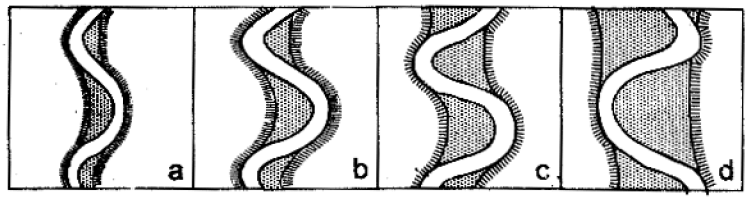

চিত্র 3.9 : প্লাবনভূমি উৎপত্তিরক্রম পর্যায়। (A) বাঁকের অন্তঃস্থলে সীমাবদ্ধ প্লাবনভূমি (B) প্লাবনভূমির বর্ধিতকরণ ও বাঁকের নিম্নগতির দিকে চলন (C) বাঁকের নিম্নগতির দিকে চলনের ফলে সঙ্কীর্ণ কিন্তু অনবচ্ছিন্ন প্লাবনভূমির উদ্ভব (D) নদীবাঁক বলয়ের বিস্তৃতি প্লাবনভূমির বিস্তৃতি সমান।

3.6.8 গাঠনিক শিলাধাপ (Structural Rock Benches)

অনুভূমিকভাবে বিস্তৃত পর্যায়ক্রমে কঠিন ও কোমল শিলার গঠিত অঞ্চলে বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যের ফলে উপত্যকার পাদদেশে গাঠনিক শিলাধাপ গঠিত হয় (চিত্র 3.8) এই প্রসঙ্গে উপত্যকার ছেদ প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

3.6.9 খোদিত নদী বাঁক (incised meanders)

নদীর পুনর্যৌবন প্রাপ্তি ঘটলে নদীর নিম্নক্ষয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে নদী বাঁকের মধ্যে কেটে বসে যায় ও দুপাশে কাড়া প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকে। খোদিত নদী বাঁকের ক্ষেত্রে নদীর তল পূর্বেকার প্লাবন ভূমির অনেক নিম্নে থাকে এবং প্লাবনজল কখনই ঐ অংশে উত্থিত হতে পারে না। স্বভাবতই এই অবস্থা নদীর বর্ধিত নিম্নক্ষয় বা নদীর পুনর্যৌবন প্রাপ্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ভূমির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি প্রসঙ্গ দ্রঃ)। অপরপক্ষে অ-সমপারে বিশিষ্ট খোদিত বাঁকের (Ingrown meander) ক্ষেত্রে নদীর নিম্নক্ষয় অপেক্ষাকৃত কম প্রবল থাকে। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে নিম্নক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নদী পার্শ্বদেশেও কিছুটা সরতে থাকে। ফলে নদী বাঁকের উভয় পার্শ্বের ভূমির উচ্চতা একই প্রকার থাকে না। (চিত্র 3.10a, b)

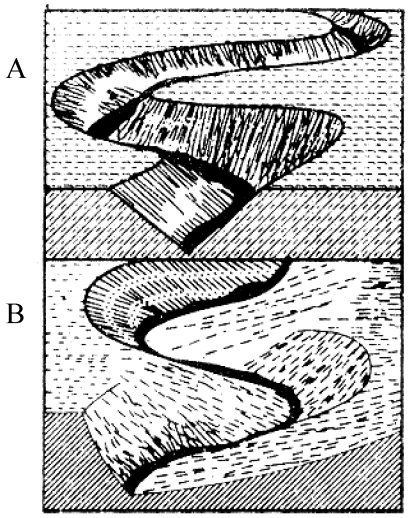

চিত্র 3.10 : (a) খোদিত নদী বাঁক। (A) সম পাড় (B) অসম পাড়।

পরবর্তীকালে প্লাবন সমভূমিতে যেমন পরিত্যক্ত নদী বাঁক, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়, তেমন অসমপাড় খোদিত নদী-বাঁকের ক্ষেত্রেও একইভাবে এরূপ হ্রদের সৃষ্টি হতে পারে। একে বিচ্ছিন্ন নদী বাঁক (meander cut off) বলে। বিচ্ছিন্ন নদী বাঁকের অন্তর্বর্তী অংশ পাহাড়ের আকারে দাঁড়িয়ে থাকে। একে নদী বাঁক অষ্ঠি (Meander core) বলে।

3.6.10 নদীমঞ্চ (river terrace)

নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক সময় এক বা একাধিক ধাপ বা মঞ্চ দেখা যায়। এই মঞ্চ পুনর্যৌবন লাভের পুর্ববর্তীকালের নদী উপত্যকার তলদেশের সমতল প্লাবনভূমিকে উপস্থাপিত করে। পুনর্যৌবন প্রাপ্তির ফলে নদী নীচে কেটে বসে যায় বলে পূর্বেকার নদী উপত্যকার সমতল মেঝে (প্লাবনভূমি) নদীর দুপাশে কিছুটা উর্ধ্বে মঞ্চের

আকারে বিরাজ করে। একে নদী মঞ্চ বলে। নিক্‌বিন্দুর সঙ্গে নদী মঞ্চের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র 3.11)।

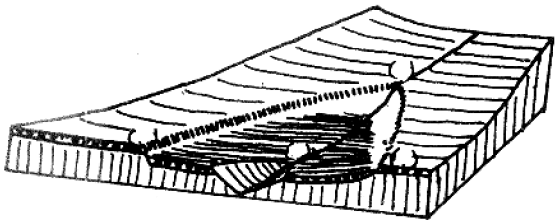

চিত্র 3.11 : নদীর আড়াআড়িভাবে প্রস্থচ্ছেদে ( ) ও ( ) স্থলে নদীমঞ্চ এবং
নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর পার্শ্বচিত্রে ( ) ও ( ) স্থলে 'নিক্ পয়েন্ট' গঠন

নদীমঞ্চ প্রধানত দুই প্রকারের হয়। (A) চক্রীয় নদীমঞ্চ (Cyclic Terrace) এবং (B) অচক্রীয় নদীমঞ্চ (B) অ-চক্রীয় নদীমঞ্চ (Non-cyclic Terrace) সমপাড়বিশিষ্ট হয় ; কিন্তু অচক্রীয় নদীমঞ্চ (বিশেষতঃ নদী-বাঁক অঞ্চলে অসম পাড় বিশিষ্ট হয়। (চিত্র 3.12)

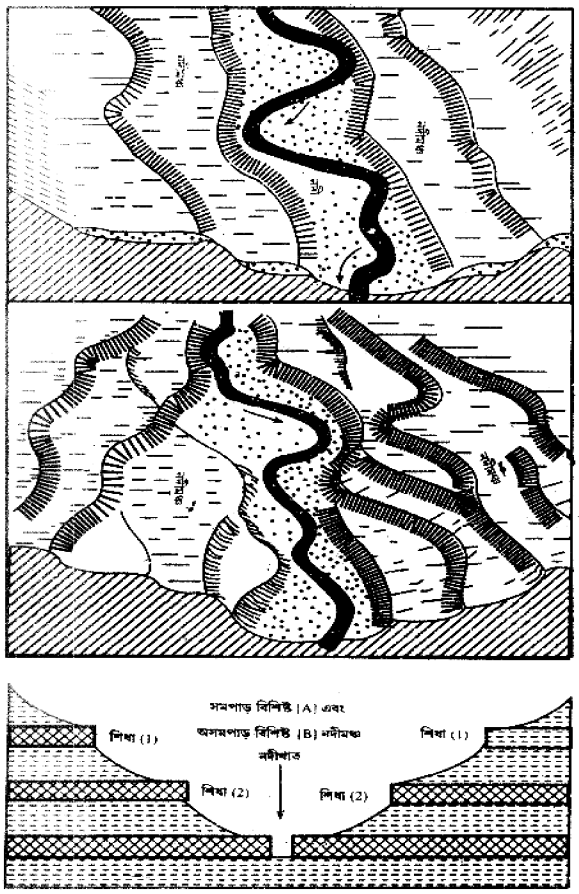

ক্ষয় প্রতিরোধকারী শিলাস্তর শিখা = শিলা গাঠনিক ধাপ

কোমল শিলাস্তর

চিত্র 3.12

3.7 নদীর সঞ্চয়কার্য

প্রক্রিয়া ঃ যে যে প্রধান অবস্থার মধ্যে নদী সঞ্চয়কার্য করে থাকে তাদের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট কারণের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। যেমন— (a) নদীর পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া এবং (b) নদীবক্ষে অতিরিক্ত বোঝার আগমন ও বিভিন্ন পর্যায়ে বোঝার সংযোজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রথম কারণ অর্থাৎ পরিবহন ক্ষমতার তারতম্য দুভাবে ঘটতে পারে ; যথা—(i) ভূমির ঢাল ও নদীর বেগের হ্রাস (ii) নদীর জল ক্ষরণের মাত্রা হ্রাস। দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ অতিরিক্ত বোঝার আগমন ও সংযোজন সম্পর্কিত কয়েকটি পরিস্থিতি আলোচনা করা হল।

আরম্ভেই বলা প্রয়োজন যে, নদী তার নির্দিষ্ট আয়তন ও নির্দিষ্ট গতিবেগে একটা নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণ পলি বহনের ক্ষমতা রাখে। পলির পরিমাণ এর (বন ক্ষমতার) বেশী হলে সঞ্চয় হয়। যে নদী এরকম প্রায় সর্বোচ্চ পরিমাণ পলি পরিবহন করছে, তার সঙ্গে পার্শ্বধৌত হয়ে অতিরিক্ত পলির সংযোজন ঘটলে নদীবক্ষে স্বভাবতই সঞ্চয় ঘটে। হিমবাহ জলধারা সঞ্চিত বহির্ধৌত সমভূমিতে আলগা (ঝুরো) পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকায় এই অঞ্চল অতিক্রম করার কালে পার্শ্বধৌত হয়ে নদীতে এরূপ অতিরিক্ত পলির সংযোজন হয়। আবার যেখানে খুব বেশী মাটির ক্ষয় হয় সেখানেও এই পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে।

উপরিউক্ত প্রধান কারণ ছাড়াও নদীর বিভিন্ন অংশে গতিবেগের তারতম্যের জন্য সঞ্চয়ের হারের পার্থক্য হতে পারে। আবার এক অংশে সঞ্চয় ও অন্য অংশে ক্ষয়কার্যও ঘটতে পারে। নদীর সঞ্চয়কার্যের বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশিষ্ট কারণও বিশেষভাবে জড়িত। নদীবক্ষের প্রকৃতির বিভিন্নতা ও গভীরতার পার্থক্য সাধারণতঃ নদীর বিভিন্ন অংশে গতিবেগের পরিবর্তন ঘটায় এবং বিভিন্ন অংশে সঞ্চয়ের প্রকৃতি ও মাত্রার ভিন্নতা আনে। আবার স্বাভাবিক কারণেই বছরের বিভিন্ন ঋতুতে প্রবাহ প্রভৃতি (river regime) ক্ষরণ (Water discharge) বিভিন্ন হয় এবং ভূমি শিলার প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী জলের নিম্নগমন বা তীরবর্তী শিলার মধ্যে অনুপ্রবেশের পার্থক্য নদীর ক্ষরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যেমন সুপ্রবেশ্য, সচ্ছিদ্র, দারণ সমৃদ্ধ বা ফাটল যুক্ত শিলার ওপর দিয়ে প্রবাহকালে ক্ষরণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে।

সঞ্চয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য কারণের মধ্যে নদীগ্রামের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা এরফলে নদীর আয়তন ও ক্ষরণের বিরাট পরিবর্তন হতে পারে। যদি কোন নদীর প্রধান উপনদী অন্য নদী দ্বারা গ্রাস প্রাপ্ত হয় তাহলে প্রথমতঃ নদীর আয়তন ও ক্ষরণের মাত্রার তারতম্য ঘটাতে প্রভাব বিস্তার করে।

আবার নদীর অববাহিকার কোন স্থানে উদ্ভিজ্জ সংস্থান বৃদ্ধি পেলে নদীর জলপ্রবাহ বা আয়তন কমতে থাকে। কারণ উদ্ভিজ্জ আবরণ ভূমিভাগের উপর দিয়ে অকেন্দ্রীভূত জলপ্রবাহকে বাধা দিয়ে জলের অনুস্রবনে তা নিম্নগমনে সাহায্য করে এবং জলের গতি মন্দীভূত করে। তাছাড়া নিজেদের প্রয়োজন উদ্ভিদ স্বল্প পরিমাণে জল সংরক্ষিত করে।

শিলাখণ্ডের আয়তন অনুযায়ী কোন নদীর পরিবহন ক্ষমতা, অনেক সময়ে নির্ভর করে। এটাকে নদীর পরিবহন সামর্থ্য (transporting competency) বলে। যদি শিলাখণ্ডের আকার বড় হয় তাহলে কোন নির্দিষ্ট আয়তন ও গতিবেগ অনুযায়ী এদের পরিবহনে নদীর সামর্থ্য না থাকতে পারে। কিন্তু ঐ একই অবস্থায় নদী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড, শিলাচূর্ণ বা সূক্ষ্ম পলি পরিবহন করতে পারে। এভাবে দানার আকারের ক্রম অনুযায়ী স্বল্প বড় আকারের দানার সঞ্চয় অথচ ক্ষুদ্র দানার পরিবহন সম্ভব হ'তে পারে। এই জন্য কোন বিক্ষুব্ধ ও খরস্রোতা উপনদী বড় আকারের প্রস্তরখণ্ড বা পাথরের চাঁই ও পলি বহন করে আনতে পারে। আবার এই উপনদী যখন প্রধান নদীতে মিলিত হয় তখন এর ধীর গতির জন্য ঐ সকল বড় প্রস্তরখণ্ড পরিবাহিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে যখন প্লাবনভূমিতে নদী কেটে বসতে থাকে, ও কোন এক পর্যায়ে সঞ্চিত স্থূল পলির সম্মুখীন হয় তখন এদের

পরিবহনের ক্ষেত্রে নদীর সামর্থ্য থাকতে পারে। কিন্তু আরও সামান্য নিম্নপ্রবাহে গতিবেগের হ্রাসের জন্য এই সকল পলি নদীবক্ষে সঞ্চিত হতে থাকে।

নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে উদ্ভুত ভূমিরূপ :

বিশিষ্ট ভৌগলিক, ভূ-বিজ্ঞানী, নদী কমিশন ও বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা (সরকারী ও বেসরকারী) বিশ্বের বড় আকারের নদ-নদী উপত্যকা বিশেষভাবে ব-দ্বীপ এবং প্লাবনভূমি অঞ্চলে পলল গঠিত ভূমিরূপের বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের কাজ সমাধা করেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদী (Fisk 1944, 1947, Allen 1965), ভারত-বাংলাদেশে (Chatterjee 1944, Bagchi 1945, Bagchi & Mukherjee K. M. 1978, Vaidyanathan Mukhopadhyay, Dasgupta and other) নিম্ন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, মহানদী ইত্যাদির সঞ্চয়জনিত ভূমিরূপ উদাহরণ হিসেবে বহুলাংশেই উল্লেখ করা হয়।

নদী যে অধঃক্ষেপ বা সঞ্চয় করে, তাকে পলল বলে। ফিস্‌ক্‌-এর (Fisk 1944, 1947) পর্যবেক্ষণ অনুসারে পললকে নীচের কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

যেমন —

(a) গ্রাভেল সমন্বিত সঞ্চয় ও (b) গ্রাভেলহীন সঞ্চয়। অধুনা সঞ্চিত পললের অধিকাংশই অর্থাৎ প্রায় শতকরা 55 ভাগ (55%) দ্বিতীয় শ্রেণীর (গ্রাভেলহীন) পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সঞ্চয়কে আবার চারভাগে বিভক্ত করা যায়।

যেমন—

(1) নদী বাঁক অঞ্চলের সঞ্চয় যার মধ্যে তিন রকমের অর্থাৎ (i) পয়েন্টবার বা বিন্দুবার সঞ্চয়, (ii) পরিত্যক্ত নদীখাতের সঞ্চয় এবং (iii) স্বাভাবিক বাঁধের সঞ্চয় দেখা যায়।

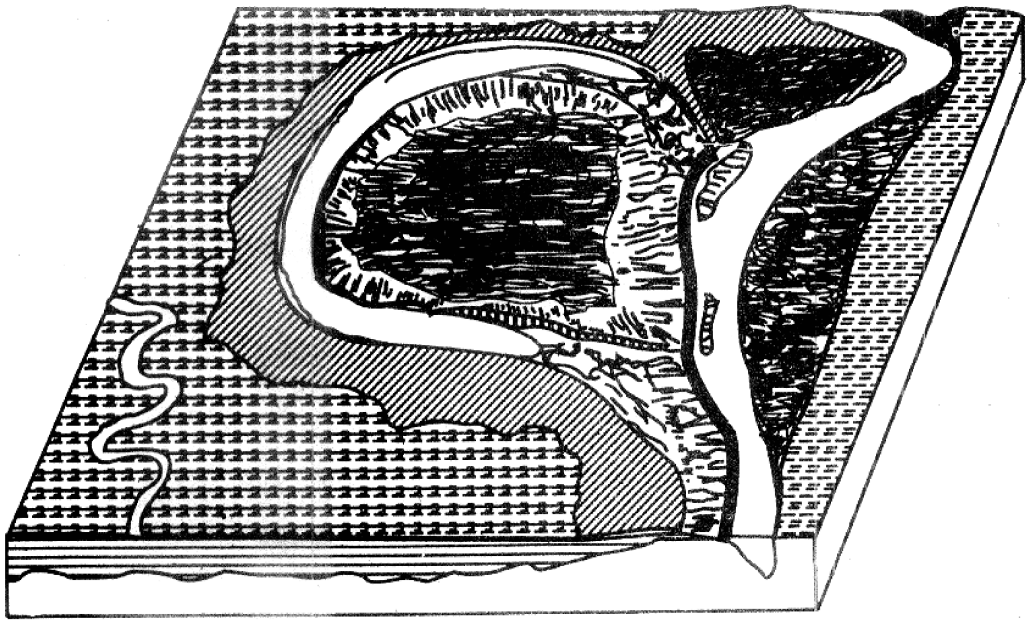

চিত্র 3.13 : নিম্ন মিসিসিপি উপত্যকার বিভিন্ন প্রকারের পলল সঞ্চয়। (এইচ. এন্ ফিস্‌ক্ অবলম্বনে)

(2) পশ্চাৎ জলাভূমি (backswamp depression) সঞ্চয়

(3) বিনুনী নদী সঞ্চয় এবং (4) ব-দ্বীপ সমভূমি সঞ্চয়

এছাড়াও নদীবাহিত পলির যে সমস্ত পদার্থকে অপসারণে অসমর্থ হয় ও সঞ্চয় করে তাদেরকে পশ্চাৎ সঞ্চয় (lag deposit) বলে। কল্যুভিয়াল (Colluvial) বা সহ পলল সঞ্চয় হল ঢালের পাদদেশে জলধারা ধৌত পলল ও অভিকর্ষ তাড়িত ট্যালাসের সংমিশ্রণে। (চিত্র 3.14)। নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে উদ্ভুত বিশিষ্ট ভূমিরূপের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

3.7.1 প্লাবনভূমি (Flood plain)

ক্ষয়জাত প্লাবনভূমির উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বহুসংখ্যক ছোট বড় প্লাবনভূমি মূলতঃ নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এরকম সঞ্চয়জাত প্লাবনভূমি সাধারণতঃ গঠনগত অবনত ভূমি অংশেই গড়ে ওঠে ও এদের বিস্তৃতিও সুবিশাল হতে পারে, যেমন সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি, মিসিসিপি সমভূমি প্রভৃতি। এরকম ক্ষেত্রে নিমজ্জমান পর্যঙ্কের বক্ষে নদী পলি সঞ্চয় করে ও একই সঙ্গে পার্শ্ব ও উল্লম্ব দিকে অবনতভূমির ভরাটের কাজ চলে। উদাহরণ হিসাবে সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করা হল।

প্লাইসটেসিন যুগের শেষভাগে ভূআন্দোলন জনিত তীব্র সংকোচনের পর শিবালিক পর্বতের দক্ষিণ প্রান্তে বহুসংখ্যক সোপান চ্যুতি ঘটে। এর ফলে হিমালয়ের পুরভূমি অঞ্চলের পর্যঙ্ক দুই অসম অংশে বিভক্ত হয়। এর উত্তরের 25-45 কিমি প্রশস্থ অংশ শিবালিক পর্বত গঠন করে ও এর দক্ষিণাংশের 200-850 কিমি প্রশস্থ সিন্ধু গঙ্গা পর্যাঙ্কের উদ্ভব ঘটায়। এই দুই অংশের অন্তবর্তী চ্যুতিকে টি নাকাটা (T. Nakata) হিমালয় সদরস্থ চ্যুতি (Himalayan Frontal Front) ও এ গ্যানসার (A. Gansser) প্রধান সদরস্থ চ্যুতি (Main Frontal Front) নামে অভিহিত করেন। ভূগঠনভাবে হিমালয়ের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে একদিকে যেমন হিমালয়ের উত্থান হতে থাকে, অন্যদিকে হিমালয় ও উপদ্বীপীয় ভারতের বিভিন্ন নদী সিন্ধু গঙ্গা পর্যাঙ্কে অনবিচ্ছিন্ন পলি সঞ্চয় করে, পলির ভারে এই পর্যাঙ্ক নিমজ্জিত হতে থাকে ও ক্রমশঃ ভরাট হতে থাকে। বর্তমানে এই সমভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 30 থেকে 300 মিটার। পলির গভীরতা দক্ষিণাংশে 500 মিটারের কম ও উত্তরদিকে ক্রমশ বেড়ে হিমালয় সদরাহ চ্যুতির কাছে গোরখপুর — মোতিহারী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী 1500 - 2500 মিটারে পর্যবশিত হয়েছে। গঙ্গা পর্যঙ্কে এই ক্রমবর্ধমান পলি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গঙ্গা বদ্বীপ অঞ্চলে পলি আগমন অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায় ও ব-দ্বীপের প্রসারের কাজ ত্বরান্বিত হয়।

প্লাবনভূমি অঞ্চলে বর্তমানে পলল সঞ্চয়ের ফলে উদ্ভুত বিভিন্ন অনুপুঙ্খ ভূমিরূপের বিবরণ নীচে লেখা হল—

নদী বাঁক বলয় সঞ্চয় ঃ—

বিন্দুবার বা পয়েন্টবার বা মিয়েন্ডার বার (Point Bar, Meander bar) এ এক বিশিষ্ট ধরনের সঞ্চয় সাধারণতঃ যেখানে নদীর ধারারেখ প্রবাহের মিলন ঘটে সেখানে ক্ষয় ও যেখানে ধারারেখ প্রবাহের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে সেখানে সঞ্চয় হয়। কারণ, মিলনের অর্থ নদীর গতিবেগ ও অপসারণের বা পরিবহনের সামর্থ্য বৃদ্ধি। বিপরীতক্রমে প্রবাহের বিকেন্দ্রীভবন নদীর গতিবেগ ও পলি পরিবহনের সামর্থ্যের হ্রাস ঘটায়। নদী বাঁক অঞ্চলের বর্হিপ্রান্তদেশে ধারারেখ প্রবাহের মিলন ও অন্তঃপ্রান্তদেশে ধারারেখ প্রবাহের বিকেন্দ্রীভবন হয় ও পূর্বোক্ত অংশে ক্ষয় ও শেষোক্ত অংশে সঞ্চয়ের প্রবণতা থাকে। (নদীখাত দ্রঃ) আবার নদীপ্রবাহ বিক্ষুব্ধ ধরণের হলে সঞ্চয় ন্যূনতম হয়। এক ধরণের বিক্ষুব্ধ প্রবাহে 'হেলিক্যাল' (helical) বা উল্লম্বঞ্চলে আবর্তসহ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এরকম প্রবাহে নদী বাঁকের বহিঃপ্রান্তদেশে বিক্ষুব্ধ এবং তার সঙ্গে নিম্নগামী এক প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এর ফলে এই অংশে নদীর ক্ষয় ঘটে। কিন্তু নদীবাঁকের অন্তর্দেশে জলের এক উর্ধ্বগামী প্রবাহ থাকে ও এটি নদীর বিক্ষুব্ধ প্রবাহকে প্রশমিত করে। স্বাভাবিকভাবেই এই অংশে নদী সঞ্চয় করে এবং নদী বাঁকের অন্তর্দেশে পলির অনুলেপন (প্রলেপ) ঘটে। বাঁকে অন্তর্দেশে এরূপ পলির অনচলেপনকে পয়েন্টবার বা বিন্দুবার (চিত্র 3.8) বলে। এখানে সাধারণতঃ বিভিন্ন আকারের কণার সঞ্চয় হয়।

নদী বাঁক নিম্নপ্রবাহের যেমন সরতে থাকে, তেমন বিন্দুবার বা পয়েন্টবারও প্রসারিত হতে থাকে, কেননা নতুন করে পয়েন্টবার তৈরী হতে থাকে। এছাড়া নদী যখন গতিপথ পরিবর্তন করে তখনও নতুন করে পয়েন্টবারের সৃষ্টি হয়। এরূপ গতিপথ পরিবর্তনের পরিত্যক্ত নদীবাঁক ক্রমশঃ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করে। এই হ্রদের দুধারই কাদা দিয়ে ভরাট হয়ে কর্দম বন্ধমুখের সৃষ্টি করে। মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, পরবর্তীকালে ভরাটপ্রাপ্ত হয়। এরকম পয়েন্টবার সমন্বিত এলাকায় শিরা ও অবনতভূমি (ridge & swale) নামে এক বিশেষ ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। শিরাগুলো সাধারণতঃ বালুকাগঠিত এবং অবনত অংশ সিল্ট ও কাদা গঠিত হয়।

3.7.2 ব-দ্বীপ বার (Delta bar)

যেখানে কোন উপনদী নদীতে এসে মিলিত হয় সেখানে নদীখাতের মধ্যে ঐ উপনদী ব-দ্বীপ ধরনের বাঁধ বা সঞ্চয় তৈরি করে। একে বদ্বীপ বার বলে। সাধারণতঃ উপনদীর প্রবাহ বেশী বিক্ষুব্ধ থাকে বলে এটি স্থূলতর পলল পরিবহনে সমর্থ হয় এবং প্রধান নদীতে মিলিত হবার পর গতিবেগ হ্রাস পায় ও স্থূলতর পদার্থ সঞ্চয়ের ফলে বদ্বীপবার সৃষ্টি হয়।

3.7.3 (ক) স্বাভাবিক বাঁধ (natural levee)

প্লাবনভূমিতে নদীর তীরবর্তী এলাকায় স্বাভাবিক বাঁধ লক্ষ্য করা যায়। নদীর নিকটবর্তী এলাকায় এর উচ্চতা সবচেয়ে বেশী হয় এবং পিছনের দিকে এটি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে যায়। এটা দু কিমি বা তারও বেশী চওড়া হতে পারে। প্লাবনের সময় নদীর পরিবহন ক্ষমতার বৃদ্ধি (হঠাৎ জলপ্রবাহের গতি ও পরিবহন বৃদ্ধি পাওয়ায়) এই স্বাভাবিক বাঁধের উৎপত্তির প্রধান কারণ। প্লাবনের সময় নদীর দুকুল ছাপিয়ে যখন জল পার্শ্বদিকে প্রবাহিত হয় তখন উর্ধ্বকালের দিকে জলের প্রবাহ থাকে বলে জল মধ্যস্থিত পলি নদীর তীরবর্তী এলাকায় সবচেয়ে বেশী ও যতদূরে যাওয়া যায় ততই কম সঞ্চিত হয়। বারংবার প্লাবনের ফলে এরূপ সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে বাঁধের আকার ধারণ করে ও প্লাবনভূমিতে এক বিশিষ্ট ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। (চিত্র 3.13)

নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী নদী স্বাভাবিক বাঁধ প্লাবনভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ক্ষয়ের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। অনেক প্লাবনের সময় নদী স্বাভাবিকভাবে কতকগুলো অগভীর খাত বরাবর প্রবাহিত হয়। এগুলিকে প্লাবনভূমি কর্তিত পথ (Flood plain scour route) বলে। এরা পুরোনো নদীখাতকে বা নতুন নদীখাত সৃষ্টির সূচনাকে উপস্থাপিত করে।

3.7.4 পশ্চাৎ জলাভূমি সঞ্চয় (backswamp deposits)

নদী স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে প্লাবন পর্যঙ্কে পশ্চাৎ জলাভূমির সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। সিল্ট ও কাদা দিয়ে এই সুবিস্তৃত সঞ্চয় গঠিত হয়। পশ্চাৎ জলাভূমি সঞ্চয় এলাকায় বন্ধুরতা খুবই কম— সাধারণতঃ দু'মিটারেরও কম থাকে। এই এলাকায় প্রাচীন নদী উপত্যকার অংশ বিশেষ অবশিষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তী পৌনঃপুনিক প্লাবনের ফলে এই চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। (চিত্র 3.13)

3.7.5 বিনুনী - নদী সঞ্চয় (braided stream deposits)

বৃহৎ পরিমাণ পলিবহনকারী অনেক বড় নদী প্রবাহ কালে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত এবং পুনর্লিখিত হবে বিনুনীর মত খাত সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত পলি পরিবহনের ফলেই নদীতে এ'ধরনের জটিল খাতের সৃষ্টি হয়। কারণ এই অতিরিক্ত পলি নদী পরিবহন করতে পারে না ও কিছু পরিমাণ পলি নদীগর্ভে সঞ্চিত করে এদের উন্নত করে তোলে এবং কালক্রমে নদীকে দ্বিধা, ত্রিধা ও আরও বেশী ভাগে বিভক্ত করে। পর্বত থেকে সমভূমিতে পড়ার পরেই ঢালের পরিবর্তনের জন্য নদীর গতিবেগ হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে পলি পরিবহনের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। ফলে

অতিরিক্ত বোঝা নদীগর্ভের স্থানে স্থানে সঞ্চিত হয়ে এ ধরনের বিনুনী নদীখাত নদী সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। বিনুনী নদী সঞ্চয়ের উদাহরণ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। উত্তরবঙ্গো (দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাংশ, জলপাইগুড়ি, কোচবিচার ইত্যাদি জেলায়) ও উত্তর বিহার সংলগ্ন হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে তিস্তা, জলধাকা, সংকোশ, তোর্ষা, কোশী প্রভৃতি নদীতে এ ধরনের বিশিষ্ট বিনুনী প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ভারতের উত্তর হিমালয় পর্বতের হিমবাহ সংলগ্ন বহির্ধৌত সমভূমির (outwash plain) সঞ্চয় এ'রকম অতিরিক্ত বোঝার সংকোচন করে বিনুনী নদী প্রবাহের সৃষ্টি করছে বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, কাবেরী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার ও অন্যান্য নদনদীর খাতের এ ধরনের বার গঠিত হয়েছে। একটি উদাহরণ হিসাবে আসাম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর মাজুলা দ্বীপের উল্লেখ করা যায় যা বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ (1250 কিমি)। মিসিসিপির বিনুনী নদীখাত অংশে যে সঞ্চয় রয়েছে সেগুলি লেসের মত দেখতে। প্রধানত বালি, বড় নুড়ি ও গ্রাভেল দিয়ে তৈরী। এখানে কাদা ও সিল্টের অভাব থেকে ধারণা করা হয় যে এই পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ নদী পরিবহন করতে সক্ষম হয়।

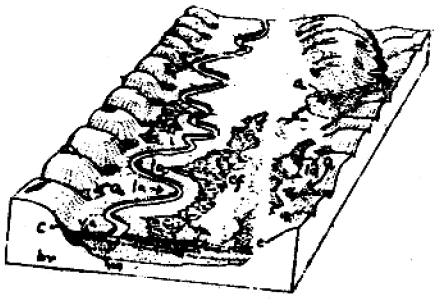

চিত্র 3.14 : C—উপত্যকার মেঝের পার্শ্বদেশে সহপলল (কল্যুভিয়া), Vs—শীর্ষদেশীয় অনুলেপন, Is —পশ্চাৎ সঞ্চয়, s — পলল শঙ্কু, Is— পার্শ্বদেশীয় অনুলেপন, Cs—পরিত্যক্ত নদীখাত সঞ্চয়, Is—ভমিশিলা

3.7.6 বদ্বীপ সমভূমি সঞ্চয়

যখন কোন নদী কোন সাগরে, হদে বা অন্য কোন জলাশয়ে শেষ পর্যায়ে এসে মিলিত হয় তখন নদী পরিবাহিত পলি ঐ অংশে মাত্রাহীন 'ব'-এর গ্রীক্ আকারে সঞ্চিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এর আকারের প্রকৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে নদীবাহিত পললের পরিমাণ, গঠনও যেখানে পলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর। বিভিন্ন ধরনের বদ্বীপ চিত্র (3.15 A – D) তে দেখান হল।

চিত্র 3.15(A) গঙ্গার ব-দ্বীপ

ব-দ্বীপের উৎপত্তি

নীল নদী, গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদীর মত অধিকাংশ নদীর ব-দ্বীপ 'ব'-র আকার হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নদী যখন সাগরে বা হ্রদে পড়ে তখন এর বেগ ভীষণ কমে যায়। অথচ জলে প্রচুর পলি থাকে। ফলে নদীগর্ভে পলি সঞ্চিত হয় ও ক্রমশঃ ভরাট হবার ফলে নদীগর্ভ বেশ উঁচু হয় পড়ে ও দুই বা ততোধিক শাখায় ভাগ হয়ে যায়। দুই শাখার অন্তবর্তী অংশ মাত্রাহীন 'ব'-এর আকার ধারণ করে। প্রথম অবস্থায় এই অংশ নীচু ও জলাময় থাকে। পরবর্তীকালে এখানে সমুদ্রতরঙ্গ ও নদী প্লাবন বাহিত পলি সঞ্চিত হয়। এইভাবে নিম্ন অংশটি ক্রমশঃ ভরাট হতে থাকে। কালক্রমে একই কারণে শাখানদীগুলো উপশাখায় বিভক্ত হয় আর একইভাবে শাখানদী অন্তবর্তী জলাময় স্থলে পলি দিয়ে ভরাটপ্রাপ্ত হয়। শাখানদীগুলো প্রায়শই গতি পরিবর্তন করে সঞ্চয় ও ব-দ্বীপ গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করে। এইভাবে ব-দ্বীপ সমভূমির সৃষ্টি হয়। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলিত 'ব'-দ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে) সম্ভবত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সমভূমি।

একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, ব-দ্বীপের আকার সবসময় Δ এর মত হয় না। যেমন মিসিসিপি নদীর বদ্বীপ পাখীর পায়ের পাতার মত (চিত্র 3.15)। আমাজন নদীর বদ্বীপ বলতে মোহনায় কতকগুলো বড় আকারে দ্বীপকে বোঝায়। প্রথমোক্ত ঃ ক্ষেত্রে নদী যেখানে সাগরে মিলিত হয় সেখানেও নদীর বেগ যথেষ্ট বেশী থাকে। যেহেতু নদীর বেগ তীরবর্তী অংশে অপেক্ষাকৃত কম থাকে যেজন্য নদীর স্বাদু জলের সঙ্গে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের মিশ্রন সহজে হতে পারে ও এই অংশে নদীর জল থেকে পলি অধঃক্ষেপন বেশীর হয় কারণ জলে লবণের পরিমাণ বাড়লে পলি অধঃক্ষেপন দ্রুততর হয়। ফলে নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলে সাগর আগে ভরাটপ্রাপ্ত হয় ও কালক্রমে বাঁধের আকারে সমুদ্রপৃষ্ঠের আকারে সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর ভূমি জেগে ওঠে ও নদী দুই বাঁধের মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রে বিস্তারলাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান নদীপথ দু-একটা শাখায় বিভক্ত হয় ও অনুরূপভাবে বাঁধ দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় উন্মুক্ত সমুদ্রে স্বতন্ত্র সত্ত্ব হিসেবে প্রসারিত হয়। এইভাবে পাখীর পায়ের পাতার মত ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। আমাজন নদীর মত কিছু নদীতে মোহনায় জলস্রোত ও জলের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী থাকে ও পরিবাহিত পলিকে বহুদূরে নিয়ে যায় এবং নদী মোহনা ব-দ্বীপ মুক্ত বা অল্প কয়েকটা দ্বীপের সমাহারে গঠিত হয়।

বদ্বীপ পরিবেশ ঃ উপকূলের গভীর লেগুন, লোনা জলের জলাভূমি ও ডাঙা অঞ্চলের সংমিশ্রনে ব-দ্বীপ পরিবেশ তৈরী হয়। এখানে সামুদ্রিক ও অসামুদ্রিক পলির স্তরগুলো এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢুকে যাবার মত পাশাপাশি থাকে। উঁচু স্বাভাবিক বাঁধের নদী সঞ্চয়ের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অংশের জোয়ার ভাঁটা বাহিত পলিস্তর ঘনিষ্টভাবে সংলগ্ন থাকে। আঙুলের মত ছড়ান পলি অবক্ষেপনকে সমুদ্রের ঢেউ ও স্রোত ভেঙে দেবার চেষ্টা করে ও তার ফলে সূক্ষ্ম দানার পলি সমুদ্র গর্ভে অপসারিত হয় ও বড় দানার পলি উপকূল অঞ্চলে জমা হয়ে সামুদ্রিক বাঁধ ও স্পিট (spit) তৈরী করে এবং উপকূলকে সরলরেখায় পরিণতঃ করতে চেষ্টা করে। পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলার মগরা অঞ্চলে যে বালির খাদ রয়েছে সেগুলো এরকম এক প্রাচীন বাঁধ বা spit কে নির্দেশ করে বলে অনুমান করা হয়।

বদ্বীপ অঞ্চলে নদীবাহিত পলি তিন ধরনের স্তর গঠন করে। অবক্ষেপনের সময় বড় দানা পলি বেশী ঢালযুক্ত স্তরের সৃষ্টি করে। একে পুরোপ্রস্ত অনুস্তর (fore set bed) বলে। সূক্ষ্মদানার পলি আরও দূরে অবস্থাপিত হয়। একে অধেপ্রস্ত অনুস্তর (bottom set bed) বলে। অধোপ্রস্ত অনুস্তরের সূক্ষ্মদানা পলি গভীর জলের দিকে খুব কম ঢালযুক্ত স্তরে অবক্ষেপিত হয় ও পরবর্তীকালে তৈরী পুরপ্রস্ত অনুস্তরে চাপা পড়ে। বদ্বীপের উর্ধ্বাংশে বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে পলি অল্প ঢালযুক্ত হয়ে সঞ্চিত হয় ও ক্রমশঃ পুরোপ্রস্ত অনুস্তরের ওপরে অগ্রসর হতে থাকে। এর ফলে উর্ধপ্রস্ত অনুস্তরের (top set bed) সৃষ্টি করে। প্রায় অনুভূমিক অধোপ্রস্ত ও উর্ধ্বপ্রস্ত অনুস্তরের অন্তবর্তী অংশে বেশী ঢালযুক্ত পুরোপ্রস্ত অনুস্তর তীর্যক স্তরায়ন সৃষ্টি করে।

গঙ্গা বদ্বীপের দক্ষিণাংশে সুন্দরবন ও সংলগ্ন অঞ্চলে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত শাখানদীগুলোর পূর্ববর্তী অংশে সমুদ্রের বাহু অপ্রবিষ্ট রয়েছে। এরূপ দুই অনুপ্রবিষ্ট বাহুর অন্তবর্তী অংশ জলাময় রয়েছে ও জোয়ারের সময় এর অংশবিশেষে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু, লোনামাটি উচ্চ জোয়ারের উর্ধে ভূমিতে ম্যানগ্রোভ জাতীয় বনভূমি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

মিসিসিপি নদীর মতো গঙ্গা বদ্বীপও অবনমিত হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের 9 মিটার নীচে এবং গড় জোয়ার পৃষ্ঠের 3 মিটার নীচে প্রোথিত সুন্দরী গাছের অবশেষ এর সাক্ষ্য বহন করে। ব-দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে নীচের স্তর ও কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে (1835-1840 খ্রীঃ) খোড়া গর্তে 50-56 মিটার ও 91-147 মিটার গভীরতায় নুড়ি সমন্বিত স্তর প্রভৃতি একই বিষয়ে আলোকপাত করে। অনুমান করা হয় গঙ্গা বদ্বীপে বছরে মোটামুটি 5-70 সে.মি. বসে যাচ্ছে (আমেদ 1972)।

এরকম অবনমন সত্ত্বেও বিশাল পরিমাণ পলি অবক্ষেপনের জন্য গঙ্গাবদ্বীপের অগ্রগমন অব্যহত রয়েছে তা বোঝা যায়। ভাঁটার সময় উন্মুক্ত চরগুলো সাধারণভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত অর্থাৎ শাখানদীগুলোর বিস্তৃতির দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দুই শাখানদী অন্তবর্তী অংশে বদ্বীপ অগ্রগমনের নির্দেশ দেয়। অনুমান করা হয় আরও অবক্ষেপনের পর এই চরগুলো প্রথমে দ্বীপের সৃষ্টি করবে ও পরে ব-দ্বীপের সঙ্গে জোড়া লেগে এর প্রসার ঘটাবে। গঙ্গা ব-দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তভাগে এরকম অনেকগুলো দ্বীপ রয়েছে যেমন সাগর ও বঙ্গাদুনী দ্বীপ। এই দ্বীপগুলো মূল ব-দ্বীপ থেকে সামুদ্রিক খাড়ি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। মনে করা যায় যে পলি অবক্ষেপনের ফলে এই খাড়ি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হবে ও এক সময় ব-দ্বীপের সঙ্গে জোড়া লেগে যাবে।

পললশঙ্কু ও বাজাদা (Alluvial fan and bajada) : পার্বত্য নদী যেখানে পর্বত ছেড়ে সমভূমিতে এসে পড়ে সেখানে নদীর বেগ হঠাৎ কমে যাওয়ায় নদী গন্ডশিলা, বালি প্রভৃতি স্থূলতর পদার্থ শঙ্কু বা পাখার আকারে পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত করে (চিত্র 3.14) দ্রঃ। ছোট ও বড় নদীসৃষ্ট এরূপ শঙ্কু আকৃতির সঞ্চয় পরস্পর জোড়া লেগে পাদদেশীয় পলল সমভূমি বা বাজাদার সৃষ্টি করে। হিমালয়ের পাদদেশে ভাবর সমভূমি এরকম সমভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পুরাতন পলিগঠিত সমভূমি (Plain of older alluvium) : কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় যে পলল সমভূমির পলি কিছুটা সংবদ্ধ হয়েছে। এরূপ সমভূমিতে নিম্নধৌতকালে অপেক্ষাকঅত অদ্রাব্য লৌহ অক্সাইডের কম অপসারণ মাটির উর্ধ্বস্তরে এর কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধীকরণ ঘটায় ও ঈষৎ লালচে মাটির সৃষ্টি করে। নদী সন্নিহিত প্লাবন সমভূমিতে নতুন পলির সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। এরূপ পলি সাধারণতঃ দুই নদীর অন্তবর্তী অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে লক্ষ্য করা যায়। অনুমান করা হয় যে এরূপ পলিগঠিত সমভূমি কিছু প্রাচীনকালে সৃষ্টি হয়েছে। গঙ্গা সমভূমির ভাঙ্গার বারিন্দ প্রভৃতি এরূপ প্রাচীন পলিগঠিত সমভূমি।

3.8 ক্ষয়চক্র (Cycle of erosion)

3.8.1 ক্ষয়চক্রের সংজ্ঞা—

W. M. Davis-ই প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্ষয়চক্র ধারণার প্রবর্তন করেন এবং ভূমিরূপের বিবর্তনে এর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে কোন নির্দিষ্ট গঠনযুক্ত অঞ্চল সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হলে এটি ক্ষয়কার্যের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অধীন হয় এবং ঐ প্রাথমিক ভূমিরূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। অনুমান করা হয় যে, ঐ পরিবর্তনের ধারা ধীর গতিসম্পন্ন, ধারাবাহিক ও যথেচ্ছ না হয়ে নিয়মানুগ হয়ে থাকে। পরিশেষে ঐ উন্নত ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সমুদ্রতলের নিকটবর্তী এক সমভূমিতে পরিণত হয়। এইভাবে উত্থিত কোন ভূমি ক্ষয়কার্যের ফলে প্রাথমিক

অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে এক নির্দিষ্ট ধারানুসারে কতকগুলো মধ্যবর্তী অবস্থার মধ্যে দিয়ে শেষ অবস্থায় উপনীত হওয়াকে অর্থাৎ ক্ষয়ের নিম্ন সীমায় পর্যবসিত হওয়াকে ক্ষয়চক্র বলে।

3.8.2 ক্ষয়চক্রের আদর্শ অবস্থা—

ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুযায়ী ভূমিরূপের বিবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার হয়। নদী বা জলধারার দ্বারা। ক্ষয়কার্যের ফলে যে ক্ষয়চক্রের ধারা নির্দিষ্ট হয়, তাকে নদী ক্ষয়চক্র বা স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলে। ক্ষয়চক্র সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনায় নিম্নলিখিত অন্তর্নিহিত রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই ধারণাগুলো হল—

(a) সদ্যোত্থিত ভূমির প্রাথমিক গঠন নানা প্রকার হতে পারে। যেমন— বলিত, চ্যুতি, সমন্বিত, তীর্যকভাবে উন্নীত, উল্লম্বভাবে উন্নীত ইত্যাদি।

(b) নদী ক্ষয়চক্রকালে আবহবিকার, পুঞ্জক্ষয় ও ক্ষয়কার্যের সমবেত প্রক্রিয়ায় ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায়।

(c) এরূপ ভূ-ক্ষয়কার্য বিভিন্ন প্রকার ভূ-আন্দোলন প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে। যেমন—ভূমির উত্থান ধীর বা দ্রুত গতিতে, নিরবচ্ছিন্ন বা সবিরাম গতিতে সম্পন্ন হতে পারে।

(d) আংশিকভাবে ক্ষয়চক্র সম্পন্ন হবার পর পুনরায় ভূমির উত্থান ঘটলে একটি নতুন ক্ষয়চক্রের সূচনা হয়। আবার ক্ষয়চক্রের শেষপর্বে ভূমির পুনরুত্থান ঘটতে পারে এবং দ্বিতীয় ক্ষয়চক্র শুরু হয়। এইভাবে একটি অঞ্চল আংশিক বা বহুসংখ্যক ক্ষয়চক্রের অধীন থাকতে পারে।

(e) ক্ষয়চক্রাকারে ভূমিরূপের বিবর্তন ধারাকে সহজবোধ্য করার জন্য একে কতকগুলো রূপক অবস্থা, যেমন— যৌবন, পরিণত বা বার্ধক্য অবস্থার ভাগ করা হয়। এই প্রধান ভাগগুলোর উপবিভাগের জন্য প্রারম্ভিক, মধ্য বিলম্ব প্রভৃতি পদগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

(f) ক্ষয়চক্র চলাকালে প্রত্যেক অবহার ভূমিরূপের কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়।

(g) ক্ষয়চক্র চলাকালীন কোন এক অবস্থায় ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য গঠন, প্রক্রিয়া এবং অবহার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(h) উত্থিত ভূমির উচ্চতা হ্রাসের শেষ সীমাকে ক্ষয়ের নিম্নসীমা বলা হয়।

(i) ক্ষয়চক্রের শেষে যে প্রায় বন্ধুরতাহীন নিম্নসমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে সমপ্রায় ভূমি বলে।

স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রকালে ভূমিরূপের বিবর্তনের ধারা সহজভাবে বোঝাবার জন্য ডেভিস কতকগুলো সরল ধারণা অনুসরণ করেন। যথা—

(i) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় উল্লম্বভাবে ভূমির উত্থান।

(ii) উত্থানের হার এতই দ্রুত হয় যে উত্থান পর্ব সমাপ্তির পূর্বে ভূমিভাগ বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

(iii) ক্ষয়চক্র চলাকালে ভূমি সুস্থির অবস্থায় থাকে।

3.8.3 ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায় ঃ

এরূপ সরল ধারণা গ্রহণ করে নদী ক্ষয়চক্র চলাকালে বিভিন্ন অবস্থায় ভূমিরূপের পরিবর্তন কিরূপ হয় তা নীচে আলোচনা করা হল—

যৌবন অবস্থা ঃ সদ্যোত্থিত ভূমির সমুদ্রের দিকের প্রাথমিক ঢাল অনুযায়ী কতকগুলো নদীর সৃষ্টি হয়। এদেরকে অনুগামী নদী বলে। একটি অঞ্চলে এরূপ কতকগুলো অনুগামী নদীর উদ্ভব হয়। এই অনুগামী নদী থেকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উপনদী বা খাত ভূমির সৃষ্টি হয় ও এরা মাতকদেশে প্রসারিত হতে থাকে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যৌবন অবস্থায় অল্প কয়েকটি প্রধান নদী ও উপনদী থাকে।

এই পর্যায়ে সমুদ্রতল থেকে ভূমির উচ্চতা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে। স্বভাবতই ভূমির ঢাল ও নদীর নিম্নক্ষয় প্রবল

থাকে বলে 'V' আকৃতির নদী উপত্যকার সৃষ্টি হয়। নদী উপত্যকা গভীর অথবা কম গভীর হবে তা নির্ভর করে ভূমির প্রাথমিক উচ্চতার ওপর (চিত্র 3.17)।

নদীর উভয়পার্শ্ব খাড়া ঢাল দ্বারা আবদ্ধ থাকে বলে নদী বড় বড় বাঁক নিতে পারে না ও সাধারণভাবে প্লাবনভূমি গঠনের অভাব দেখা যায় এবং নদী পার্শ্ব থেকে উপত্যকার ঢাল শুরু হয়। যৌবন অবস্থায় বড় নদী বাঁক থাকতে পারে। তবে এই বাঁক অব্যরচ্ছিন্ন প্রাথমিক ভূমির উপর থাকে। উপত্যকার তলদেশে ক্ষুদ্র বাঁকের সৃষ্টি হয়।

নদী বিভাজিকাগুলো সাধারণভাবে প্রশস্থ থাকে এই অংশে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা উত্তম থাকে না বলে হ্রদ, মালভূমি প্রভৃতি থাকতে পারে। জলবিভাজিকা কোন নির্দিষ্ট রেখা ধারা চিহ্নিত না হয়ে এক সুপ্রশস্থ অংশকে বোঝায় (চিত্র 3.16)।

নদীবক্ষ অপর্যায়িত অবস্থায় থাকে এবং প্রধান নদীগুলোতেও জলপ্রপাত থাকতে পারে। সাধারণ কোমল ও কঠিন শিলার সন্ধিস্থলে এরূপ জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। অবশ্য যৌবনের প্রারম্ভকালেই এরূপ জলপ্রপাত দেখা যায় এবং পরিণত অবস্থায় পৌঁছবার আগেই নদীবক্ষ পর্যায়িত হয় ও জলপ্রপাত অন্তর্হিত হয়। যত সময় যেতে থাকে উপত্যকার প্রশস্তীকরণ ও গভীরীকরণ চলতে থাকে। কিন্তু আদিভূমির অংশ বিশেষ জলবিভাজিকা অংশে অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এরূপ আদিভূমি ক্রমশঃ সংকুচিত হতে তাকে। ফলে সমগ্র যৌবনকালব্যাপী ভূমির বন্ধুরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নদী বক্ষের মতো নদী উপত্যকার পার্শ্বদেশও অপর্যায়িত থাকে। অর্থাৎ উপত্যকার ঢালের অংশ বিশেষ নগ্ন শিলা দ্বারা আবৃত থাকে এবং স্থান বিশেষে গর্তগুলোতে শিলাচূর্ণের সঞ্চয়ও লক্ষ্য করা যায়।

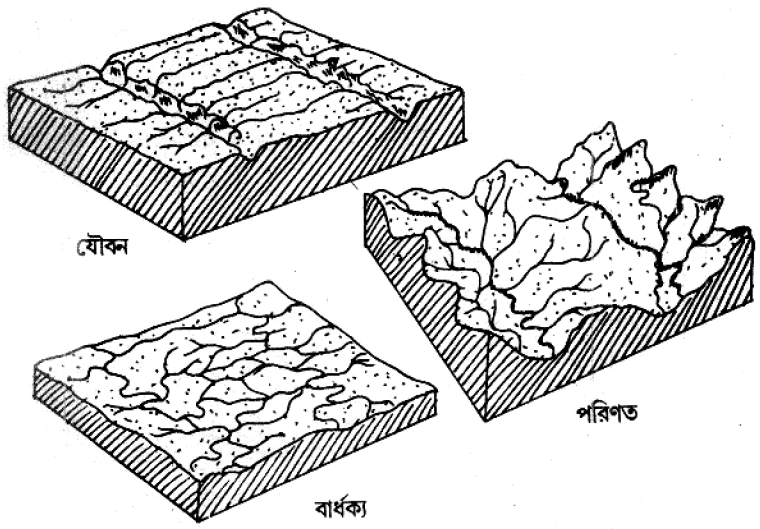

চিত্র 3.16 : ক্ষয়চক্রকালে ভূমি-বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থা

পরিণত অবস্থা

ধারাবাহিকভাবে উপত্যকার প্রশস্তীকরণের ফলে ক্রমশঃ নদী বিভাজিকা অঞ্চলের আদি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হতে থাকে এবং এক সময়ে আদিভূমির শেষ চিহ্নটুকু অবশিষ্ট থাকে। এটাই পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির সূচনা করে।

পরিণত অবস্থায় পৌঁছাবার আগে থেকেই অর্থাৎ যৌবনের শেষ ভাগ থেকেই উপত্যকা গভীরীকরণের সক্রিয়তা হ্রাস পায়। ফলে পরিণত অবস্থার সূচনায় ভূমির বন্ধুরতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। কারণ এই সময় আদিভূমির শেষ

চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে এবং উপত্যকার গভীরীকরণও বেশী হয়। এরপর থেকে উপত্যকার গভীরীকরণের হার বিভাজিকার শীর্ষদেশের উচ্চতা হ্রাসের হার থেকে কম হয়ে থাকে। ফলে পরিণত অবস্থার পরিবর্তী পর্যায়ে ভূমির বন্ধুরতা হ্রাস পেতে থাকে। তবে সামগ্রিকভাবে পরিণত অবস্থায় ভূমির বন্ধুরতা যৌবন বা বার্ধক্য অবস্থা থেকে বেশী থাকে।

এই অবস্থায় জলবিভাজিকা বেশ তীক্ষ্ণ থাকে এবং ভূমিভাগের অধিকাংশ উপত্যকা বা পাহাড়ের ঢাল দ্বারা গঠিত হয়। অল্প পরিমাণ সমভূমি কেবলমাত্র উপত্যকার নিম্নাংশে নদী সন্নিহিত অংশে দেখা যায়।

এই অবস্থায় নদীর জাল বিস্তৃত হয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। তবে সর্বোচ্চ বন্ধুরতা ও সর্বাপেক্ষা ঘন নদীর জাল সাধারণতঃ একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। নদীর জালের সর্বাপেক্ষা ঘন বুনন সাধারণ সর্বোচ্চ বন্ধুরতা অর্জনের পরই সম্পন্ন হয়ে থাকে। নদী জালের ঘন বুনন সাধারণভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবচ্ছিন্ন অবস্থা নির্দেশ করে (চিত্র 3.16 ও 3.17)।

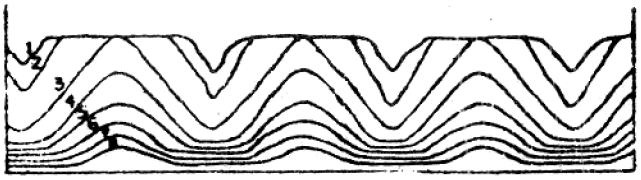

চিত্র 3.17 : নদী ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন উপত্যকার ছেদ। 1 ও 2 যৌবন অবস্থা ; 3 প্রারম্ভিক পরিণত অবস্থা ; 4 ও 5 পরিণত ; 6 বিলম্ব পরিণত ; 7 ও 8 সমপ্রায়ভূমি গঠনের পথে বার্ধক্য অবস্থা

যৌবন অবস্থা থেকে উপনদী কোন অঞ্চলের দুর্বল গঠনযুক্ত স্থানগুলোকে আবিষ্কার করে ও ঐ বরাবর উপত্যকা গঠনের সূচনা করে। এইরূপ নদীকে পরবর্তী নদী (Subsequent river) বলে। কিন্তু যৌবন অবস্থায় গঠনের সহিত নদীর এই সামঞ্জস্য বিধান অসম্পূর্ণ থাকে। পরিণত অবস্থায় এই সামঞ্জস্য বিধান সুসম্পন্ন হয়।

পরিণত অবস্থায় নদীবক্ষের ঢাল পর্যায়িত হবার ফলে জলপ্রপাত হ্রদ প্রভৃতি নদীবক্ষ থেকে অন্তর্হিত হয়। তবে নদীর শীর্ষধারায় এই প্রকার জলপ্রপাত থাকলেও থাকতে পারে।

উপত্যকার ঢাল কমে যাওয়ায় নদী মোটামুটি বড় বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হতে পারে এবং নদী যে প্লাবন-ভূমির সৃষ্টি করে তার উপর এই বাঁকগুলোর স্থান পরিবর্তন করে। তবে উপত্যকার মেঝেতে প্লাবনভূমির প্রশস্থতা নদীবাঁক বলয়ের প্রশস্থতা থেকে খুব বেশী হয় না।

এই অবস্থায় উপত্যকার ঢালও পর্যায়িত অবস্থায় পৌঁছায়। এর অর্থ হল যে, যে পরিমাণ শিলাচূর্ণ উপর থেকে আসে ঠিক সেই পরিমাণ শিলাচূর্ণ নিম্নদিকে স্থানান্তরিত হয় এবং উপত্যকার ঢাল বরাবর না ক্ষয় না সঞ্চয় অবস্থা দেখা যায়। এই অবস্থায় উপত্যকার পার্শ্বদেশ গভীর আবহবিকার প্রাপ্ত শিলাচূর্ণ দ্বারা আবৃত থাকে।

বার্ধক্য অবস্থা ঃ বার্ধক্য অবস্থায় স্বভাবতই ভূমিভাগের ঢাল কমতে থাকে। কারণ নদীবক্ষের গভীরতা পরিণত অবস্থার শেষ ভাগে বহু নিম্নে পৌঁছায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উপত্যকার উচ্চতা খুব অল্পই থাকে। নদীর বিভাজিকাগুলোর উচ্চতাও ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। (চিত্র 3.17)। এই অবস্থায়, বিশেষ করে শেষ পর্যায়ে প্রধানত পুঞ্জ ক্ষয় প্রক্রিয়ায় বিভাজিকার উচ্চতা হ্রাসের হার খুবই ীর গতিতে সাধিত হতে থাকে এবং ক্ষয়চক্রের শেষ পরিণতিতে দীর্ঘায়িত করে।

এই অবস্থায় উপত্যকার ঢাল নদী বরাবর এবং পার্শ্বদিকে উভয়ক্ষেত্রেই মৃদু হয়। ফলে বন্ধুরতা খুবই কম হয়ে থাকে। বার্ধক্য অবস্থায় বন্ধুরতা ক্রমশঃই হ্রাস পেতে থাকায় নদী বিভাজিকার শীর্ষদেশ পরিণত অবস্থার মত তেমন তীক্ষ্ণ বা সুনির্দিষ্ট থাকে না।

নদী বরাবর ও নদীর পার্শ্ব উভয়দিকের ঢালই মৃদু থাকে বলে নদী বড় বড় বাঁক দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে প্লাবনভূমিতে নদী অবাধে এদিক ওকি চলতে পারে এবং সুপ্রশস্থ প্লাবনভূমির সৃষ্টি করে। প্লাবনভূমির প্রশস্থতা নদী বাঁক বলয়ের প্রশস্থতা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বেশী থাকে। প্লাবনভূমিতে হ্রদ, জলাভূমি প্রভৃতি বর্তমান থাকতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে যৌবনে নদী বিভাজিকা অঞ্চলই রূপ হ্রদ বা জলাভূমি লক্ষ্য করা যায়।

পরিণত অবস্থার শেষভাগ থেকে উপনদীগুলো মাতকদেশে প্রসারিত হয়ে জলবিভাজিকার শীর্ষদেশ অতিক্রম করে এবং নদীগ্রাসের ঘটনা ঘটায়। ফলে নদীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এজন্য বার্ধক্য অবস্থায় নদীর সংখ্যা সাধারণভাবে পরিণত অবস্থা থেকে কম থাকে। তবে যৌবন অবস্থা থেকে বেশী থাকে। চিত্র 3.16।

সমগ্র অঞ্চলটিতে গভীর আবহবিকার প্রাপ্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়। ফলে কঠিন ভূমিশিলা শিলাচূর্ণ দ্বারা ঢাকা পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে পরিণত অবস্থায় নদীগুলো যে গঠনগত দুর্বলস্থানগুলো অধিকার করে, সেই গঠন পলির নীচে চাপা পড়ে যায় এবং নদীগুলো অঞ্চলটির মধ্যে সহজেই স্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং ফলস্বরূপ গঠনের সঙ্গে নদীর সামঞ্জস্যবিধান বহুলাংশেই নষ্ট হয়ে যায়।

নদী বিভাজিকার উচ্চতা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে পরিশেষে নিম্নক্ষয় সীমার কাছাকাছি এক তরঙ্গায়িত সমভূমির সৃষ্টি হয়। একে ডেভিস পেনিপ্লেন অর্থাৎ সমপ্রায়ভূমি নামকরণ করেন। এই সমপ্রায়ভূমিতে নদী বিভাজিকার অংশবিশেষ শিলা কাঠিন্যের জন্য অথবা ঘটনাচক্রে কম ক্ষয়প্রাপ্তির জন্য পাহাড়ের আকারে দন্ডায়মান থাকতে পারে। ডেভিস এরকম পাহাড়কে মোনাডনক নামকরণ করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাংশে নিউ হ্যাম্পশায়ার এরূপ অবশিষ্ট পাহাড় মাউন্ট মোনাডনক থেকে এই পদবাচ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

3.8.4 ক্ষয়চক্রের পর্যালোচনা

ডেভিসের মতানুযায়ী ক্ষয়চক্র শেষ হতে পারে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ ক্ষয়চক্র শেষ করার পূর্বে কোন অঞ্চলের এক বা একাধিকবার উত্থান হতে পারে।

(ক) বর্তমান পৃথিবীতে ডেভিসের মতানুরূপ সমপ্রায়ভূমির কোন উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নেই। তবে সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী স্থলভাগের সাধারণ উত্থানের ফলে সমপ্রায়ভূমির এরূপ অভাব থাকতে পারে। সম্ভাব্য প্রাচীন সমপ্রায়ভূমি অর্থাৎ উত্থিত সমপ্রায়ভূমির নিদর্শন আমরা দুভাবে লক্ষ্য করে থাকি—

(a) মালভূমি বা প্রায় সমোচ্চ ও সমতল শিখর বিশিষ্ট ব্যবচ্ছিন্ন ভূমি। এরূপ ভূমিরূপের সহজব্যাখ্যা উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় হতে পারে। তবে মেলার ও স্মিথের মতে এরূপ সমোচ্চ এবং সমতল শিখরদেশে সমদূরবর্তী নদীর অবস্থান ও সমপরিমাণ ক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হতে পারে। টারের মতে, সমোচ্চ বৃক্ষরেখা ক্ষয়ের সীমাকে নিয়ন্ত্রণ করে এরূপ ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। তবে অধিকাংশের মতে স্থানীয়ভাবে এরূপ ঘটতে পারে কিন্তু বিস্তৃত অঞ্চলে সাধারণত এরকম হয় না।

(b) অনেক সময় সমতলের ওপর পাললিক শিলাগোষ্ঠীর সঞ্চয় দেখা যায়। নিমস্থিত সমপ্রায়ভূমির ওপর এদের সঞ্চয় হয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। তবে র‍্যানজে প্রমুখ ভূতত্ত্ববিদেরা এদেরকে সমুদ্রকর্তিত সমতল বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধবাদীরাও আছেন। এদের মতে সমুদ্র দ্বারা উৎপন্ন সমভূমি গঠনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর গতি সম্পন্ন হয়, তুলনায় নগ্নীভবন (denudation) ক্রিয়া অনেক বেশী দ্রুত হয়ে থাকে। গিকির মতে, সমুদ্র দ্বারা ছোট এক ফালি সমভূমি উৎপাদনের ফাঁক নগ্নীভবন প্রক্রিয়ায় সন্নিহিত সমগ্র স্থলভাগই সমুদ্রতলে নিমজ্জিত হবে। তবে অন্য অনেকে মনে করেন যে, এমন হতে পারে যে ক্ষয়চক্রের বার্ধ্যকের শেষ সীমায় অঞ্চলটি সমভূমির নিকটবর্তী অবস্থায় পৌঁছানোর কালে শেষ পরিণতিতে সমুদ্রকর্তনের ফলে এই সমভূমির সৃষ্টি হয়।

(c) ক্রিকমের (Crickmay) মতে বার্ধক্য অবস্থায় নদী বিভাজিকা ক্ষয়ের হার অনেক বেশী ধরা হয়ে থাকে। তাঁর মতে, নদী বাঁক নেওয়ার ফলে যে প্রশস্থ প্লাবনভূমির সৃষ্টি হয় তাদের সমাহারেই বিস্তৃত সমতলভূমির সৃষ্টি হয়।

3.9 সারাংশ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে নদী ভূ-পৃষ্ঠের নিয়ত পরিবর্তন সাধনকারী শক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি হিসাবে কাজ করে। নদীর একটি সুনির্দিষ্ট খাত থাকে যা নদীর শক্তি, জলের পরিমাণ, বোঝার বা প্রবাহিত পদার্থের পরিমাণ, শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু প্রভৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল চালক ও কারণগুলির সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল। এই কারণে নদীর আচরণে একরকম গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়।

ভূ-প্রাকৃতিক ঢাল, শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি ও নদীর শক্তি ও বোঝার তারতম্যে বিভিন্ন প্রকার জলনির্গম প্রণালী ও নদীখাত প্রণালীর সৃষ্টি হয়।

নদীর ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয় প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের উদ্ভব হয়। ক্ষয়জাত ভূমিরূপের মধ্যে জলপ্রপাত, সঙ্কীর্ণ নদী উপত্যকা, নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর পার্শ্বচিত্রে খাড়া ঢাল, মন্থকূপ, প্রাবরিত অভিক্ষিপ্তাংশ, নিক্‌পয়েন্ট, গিরিখাত, নদীগ্রাম, ক্যাভিটেশান জাতীয় গর্ত প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের মধ্যে নদী বাঁক, প্লাবনভূমি, স্বাভাবিক বাঁধ, পললশঙ্কু ও পললপাখা, প্রশস্থ নদী উপত্যকা, গাঠনিক শিলাধাপ বদ্বীপ ও সমভূমি, সমপ্রায়ভূমি, নদীমঞ্চ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত নদীর কার্যের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন ভূমিরূপগুলি উদ্ভবের ক্ষেত্রে ডেভিস ক্ষয়চক্রের উল্লেখ করেন এবং ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্য্যায় অর্থাৎ যৌবন, পরিণত ও বার্ধক্য এই তিন পর্য্যায় ভূমিরূপের উদ্ভব হয়। তবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভূমিরূপ বিশারদগণ ডেভিসের ক্ষয়চক্রের সমালোচনা করেন এবং অচক্রীয় মতবাদ ও গতিশীল ভারসাম্যতত্ত্বের অবতারণা করা হয়।

3.10 প্রশ্নাবলী

A. বিষয়ভিত্তিক / রচনাধর্মী প্রশ্ন : (600 শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে, প্রতিটি প্রশ্নের মান 10 নম্বর)

1. নদীর কার্যের ফলে যে সকল ক্ষয়জাত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, চিত্র সহযোগে তাদের বর্ণনা করুন।
2. নদীর কার্যের ফলে যে সকল সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, চিত্র সহযোগে তাদের বিশ্লেষণ করুন।
3. নদীর জলনির্গম প্রণালী ও নদীখাতের প্রণালী অনুযায়ী নদীর শ্রেণীবিভাগ করুন ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
4. নদীর প্লাবনভূমি ও বদ্বীপ সমভূমিতে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, চিত্র সহযোগে তাদের বর্ণনা করুন।
5. নদীর কার্য অনুযায়ী ডেভিসের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (150 শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে ; প্রতিটি প্রশ্নের মান — 4 নম্বর)

1. নদীর ক্ষয় প্রক্রিয়াগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
2. নদীর পরিবহন প্রক্রিয়াগুলিকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন।
3. নদীর সামর্থ ও ক্ষমতা বলতে কী বোঝায় ?
4. পর্যায়িত নদী ঢাল কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
5. নদীমঞ্চের শ্রেণীবিভাগ করে বিভিন্ন প্রকার নদীমঞ্চের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
6. নদীবাঁক কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
7. গতিপথের উপর পদার্থের প্রকৃতি অনুযায়ী নদীখাতের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

8. বদ্বীপ কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
9. নদীবাঁক প্রণালী ও বিনুনীরূপ প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?
10. ক্ষয়চক্রের আদর্শ অবস্থাগুলি উল্লেখ করুন।

C. অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (25 শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে ; প্রতিটি প্রশ্নের মান ২ নম্বর)

1. নদী কাকে বলে ?
2. নদীর অববাহিকা বলতে কী বোঝায় ?
3. উপনদী ও শাখানদীর মধ্যে পার্থক্য কী ?
4. নিক্‌পয়েন্ট কাকে বলে ?
5. খোদিত নদীবাঁক কখন ও কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
6. বিভিন্ন প্রকার বদ্বীপের শ্রেণীবিভাগ করুন।
7. পললশঙ্কু ও পললশাখার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?
8. সমপ্রায়ভূমি বলতে কী বোঝায় ?
9. মোনাডনক কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
10. প্লাবনভূমিতে কী কী সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় ?

D. নৈর্ব্যক্তিক /অব্‌জেক্‌টিভ্‌ প্রশ্ন : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ নম্বর)

1. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(a) নির্দিষ্ট খাত বরাবর প্রবাহিত জলধারাকে ———— বলে।
(b) মূল নদী, উপনদী ও শাখানদী বিধৌত অঞ্চলকে —— বলে।
(c) লম্ফদান প্রক্রিয়ায় পদার্থের পরিবহনকে —— বলে।
(d) নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর পার্শ্বচিত্রে ঢালের ভাঙনকে —— বলে।
(e) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথম ক্ষয়চক্রধারণার প্রবর্তন করেন ——।

2. ভুল শব্দ কেটে দিন :

(a) নদীর উচ্চগতিতে খাড়া ঢাল / পর্যায়িত ঢাল দেখা যায়।
(b) নিম্নক্ষয়ের ফলে সঙ্কীর্ণ / প্রশস্থ নদী উপত্যকা গঠিত হয়।
(c) স্বাভাবিক বাঁধ প্লাবনভূমিতে / বদ্বীপ সমভূমিতে দেখা যায়।
(d) পয়েন্টবার নদীবাঁকের উত্তল / অবতল পাড়ে গঠিত হয়।
(f) মন্থকূপ নদীর ক্ষয়কার্যের / সঞ্চয়কার্যের দেখা যায়।

3.11 উত্তরমালা

A.1. 2.03.7 দ্রষ্টব্য।
A.2. 2.03.8 দ্রষ্টব্য।
A.3. 2.03.6 দ্রষ্টব্য।
A.4. 2.03.8.1 এবং 2.03..2 দ্রষ্টব্য।
A.5. 2.03.9 দ্রষ্টব্য।
B.1. 2.03.4.1 দ্রষ্টব্য।

B.2. 2.03.4.2 দ্রষ্টব্য।

B.3. 2.03.4-এর অন্তর্গত নদীর সামর্থ ও ক্ষমতা অংশটি দেখুন।

B.4. 2.03.5.1 দেখুন।

B.5. 2.03.7.10 দেখুন।

B.6. 2.03.6.1 দ্রষ্টব্য।

B.7. 2.03.6.2 দ্রষ্টব্য।

B.8. 2.03.8.2 দ্রষ্টব্য।

B.9. 2.03.6.1 এবং 2.03.6.2 অংশ দুটি পড়ে তুলনামূলক ভাবে তাদের পার্থক্যগুলি তৈরী করুন।

B.10. 2.03.7 দ্রষ্টব্য।

C.1. 2.03.3 দেখুন।

C.2. মূল নদী, উপনদী ও শাখানদী বিধৌত অঞ্চলকে নদী অববাহিকা বলে। বিষয়টি 2.03.3 অংশটি দেখুন।

C.3. 2.03.3 অংশটি দেখুন।

C.4. 2.03.7.5 দ্রষ্টব্য।

C.5. 2.03.7.9 দ্রষ্টব্য।

C.6. 2.03.8.2 দ্রষ্টব্য।

C.7. 2.03.8.6 এর অন্তর্গত পললশঙ্কু অংশটি দেখুন।

C.8. নদীর ক্ষয়চক্রের প্রাক্ শেষ পর্যায়ে (2.03.9.3) যে বিস্তীর্ণ পলিসমভূমি গঠিত হয়, তাকে সমপ্রায়ভূমি বলে। এর জন্য 2.03.9.3 অংশটি দেখুন।

C.9. 2.03.9.3 দ্রষ্টব্য।

C.10. 2.03.7.7 দ্রষ্টব্য।

D.1. (a) নদী

D.1. (b) অববাহিকা

D.1. (c) উল্লম্ফন

D.1. (d) নিক্ পয়েন্ট

D.1. (e) W.M. Davis.

D.2. (a) খাড়া ঢাল

D.2. (b) সঙ্কীর্ণ

D.2. (c) প্লাবন সমভূমি

D.2. (d) উত্তল

D.2. (e) ক্ষয়কার্য।

একক 4 ❑ হিমবাহ ও নদী-হিমবাহের যৌথ প্রক্রিয়া

গঠন

4.1 প্রস্তাবনা

4.2 উদ্দেশ্য

4.3 হিমবাহের সংজ্ঞা

4.4 হিমবাহ গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

4.5 হিমবাহের শ্রেণীবিভাগ

4.6 হিমবাহের প্রক্রিয়া

4.7 হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ

4.7.1 ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ

4.7.2 বৃহদাকৃতি ভূমিরূপ

4.8 হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ

4.8.1 অন্তরীভূত ও অবিন্যস্ত ভূমিরূপ

4.8.2 স্তরীভূত ও বিন্যস্ত ভূমিরূপ

4.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

4.10 উত্তরমালা

4.1 প্রস্তাবনা

আগের এককে আপনি ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া এবং উদ্ভুত ভূমিরূপের আলোচনায় নদীর কার্য ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। এই এককে আমরা হিমবাহের কার্য, প্রক্রিয়া এবং উদ্ভুত ভূমিরূপ সম্বন্ধে জানবো। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে ও উচ্চ পার্বত্য বা উচ্চভূমি অঞ্চলে, বিশেষতঃ হিমরেখার উর্ধ্বে হিমবাহের কার্য এবং তার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে যে সকল অঞ্চলে হিমবাহের কার্য দেখা যায় (বর্তমান বা Recent) ভূ-তাত্ত্বিক অধিযুগের আগে পৃথিবীতে আরও তিনবার তিনটি তুষারযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল যথাক্রমে—

(i) প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান, (ii) পার্লো-কার্বনিফেরাস এবং (iii) প্লিসটোসিন ভূতাত্ত্বিক অধিযুগে আবির্ভাব ঘটে। তবে এদের মধ্যে সাম্প্রতিকতম অর্থাৎ প্লিসটোসিন তুষার যুগ এবং তার উপযুগগুলিকে ভূতত্ব ও ভূমিরূপের বিশারদগণ যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্বে ওই সব সময়ে হিমবাহের কার্য এবং ভূমিরূপের সক্রিয়তা ও বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমান ভূতাত্ত্বিক যুগে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ গলতে শুরু করে এবং বরফগলা জল হিমবাহ অধ্যুষিত এলাকায় নতুন করে ভূমিরূপ গঠন করে ও আগেকার ভূমিরূপগুলিকে রূপান্তরিত করে। তাই বর্তমান এককে হিমবাহের কার্য ও ভূমিরূপের সঙ্গে বরফগলা জলের ফলে সৃষ্ট নদী ও হিমবাহের যৌথ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপগুলিকেও (Fluvio-glacial processes and landforms) বিশ্লেষণ করা হবে এবং সমগ্র বিষয়টি ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে আলোচিত হবে।

4.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- হিমবাহ কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
- হিমবাহের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- হিমবাহের কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলিকে যথাযথভাবে সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- হিমবাহ অঞ্চলগুলির দৈশিক (spatial) প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন।
- হিমবাহ ও নদীর যৌথ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

4.3 হিমবাহের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে হিমবাহ বলতে বরফের প্রবাহকে বোঝায়। অর্থাৎ যখন কোন উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বা উচ্চ ভূমি থেকে বরফের প্রবাহ ঘটে, তখন তাকে হিমবাহ বলে। তবে বরফের প্রকৃত প্রবাহ সম্বন্ধে ভূমিরূপ বিশারদ্‌গণ দুই প্রকার প্রবাহকে উল্লেখ করেন, যথা—(ক) মাধ্যাকর্ষণ জনিত প্রবাহ এবং (খ) চাপজনিত প্রবাহ।

▲ **মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রবাহ ঃ** যখন ভূমিভাগের চাপ অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বরফের প্রবাহ ঘটে তখন তাকে মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রবাহ বলে। সাধারণতঃ পৃথিবীর উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে, বিশেষতঃ যেখানে ঢালের পরিমাণ বেশি থাকে, সেই সব স্থানে এই প্রকার প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়।

▲ **চাপজনিত প্রবাহ ঃ** অনেক সময় ক্রমবর্ধমান বরফের নিম্নমুখী চাপের ফলে তলদেশীয় বরফ গলে যায় এবং উপরিস্থিত বরফের স্তর ধীর গতিতে ঢাকা অনুযায়ী প্রবাহিত হয়। এই প্রকার প্রবাহকে চাপজনিত প্রবাহ বা Extrusion Flow বলে।

উপরিউক্ত দুই প্রকার প্রবাহ, অনেক সময়ে ভূমিরূপের ঢাকা বা শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি বা হিম বাজেটের প্রকারভেদে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যথাক্রমে Gravity Flow ও Obstructed Extrusion FLow নামে আরও দুই প্রকার প্রবাহ ঘটে।

4.4 হিমবাহ গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

আমরা জানি যে তুষার পাতের ফলে তুষার কণার উদ্ভব ঘটে। এবং পরবর্তীকালে তুষারকণা থেকেই হিমবাহের সৃষ্টি হয়। ভূমিরূপ বিশারদগণ হিমবাহ গঠনের নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায় উল্লেখ করেন :

(a) **প্রাথমিক পর্যায় : তুষারকণা গঠন—** এই পর্যায়ে তুষার পাতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানে তুষারকণা সঞ্চিত হয়। এই সময়ে তুষারকণার মধ্যে বেশ কিছু ছোট ছোট বায়ুর থলি বা Air Pocker থাকে এবং এই স্তরটি অপেক্ষাকৃত নরম ও শিথিল হয়।

(b) **মধ্যবর্তী পর্যায় : ফার্ণ (Fern) গঠন** — ক্রমাগত তুষারপাত ও তুষার সঞ্চয়ের ফলে বিশেষত নীচের তুষারস্তর বায়ু থলিগুলির বিলুপ্তি ঘটে এবং স্তরটি ক্রমশঃ শক্ত ও কঠিন রূপে অবস্থান করে। তুষারের এই অবস্থাকে ফার্ণ (Fern) বলে। তবে তুষারকণা অপেক্ষা ফার্ণকণার ঘনত্ব ও আয়তন অনেক বেশি হয়।

(c) **চূড়ান্ত পর্যায় : হিমবাহ গঠন** — ফার্ণ গঠনের পর বিশেষতঃ অনুকূল হিমবাহ বাজেটের ফলে

ফার্ণকণাগুলি আরও শক্ত, সুদৃঢ়, কেলাসিত হয় এবং সম্পূর্ণ কঠিন আকারে অবস্থান করে। অর্থাৎ বরফরূপে অবস্থান করে। এই বরফের প্রবাহের ফলেই হিমবাহের সৃষ্টি হয়।

4.5 হিমবাহের শ্রেণীবিভাগ

অধ্যাপক অলম্যান (Ahlmann) [1948] হিমবাহের আয়তন, আকৃতি এবং ভূমিভাগে তার অবস্থান অনুযায়ী যে শ্রেণীবিভাগ করেন, তাকে নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

(a) **মহাদেশীয় হিমবাহ (Continental Glacier) :** মহাদেশের কোন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যখন হিমবাহের গঠন হয় তখন সেই সকল স্থান থেকে বিভিন্ন দিকে হিমবাহের চলন ঘটে।

(b) **পার্বত্য হিমবাহ (Mountain Glacier) :** পৃথিবীর সুউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে বিশেষতঃ হিমরেখার উর্ধ্বে যে হিমবাহ দেখা যায় তাদের পার্বত্য হিমবাহ বলে।

(c) **আইস ক্যাপ (Ice Cap) :** মহাদেশীয় হিমবাহের অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিসরে হিমবাহের অবস্থান ঘটে। তখন তাকে আইসক্যাপ বলে।

(d) **পাদদেশীয় হিমবাহ (Piedemont Glacier) :** উপরিউক্ত মহাদেশীয় পার্বত্য বা আইসক্যাপ অঞ্চলের পাদদেশে সে সকল হিমবাহ দেখা যায় তাদের পাদদেশীয় হিমবাহ বলে।

(e) **উপত্যকা হিমবাহ (Valley Glacier) :** যখন কোন হিমবাহ নির্দিষ্ট উপত্যকা বরাবর অবস্থান করে ও প্রবাহিত হয়, তখন তাকে উপত্যকা হিমবাহ বলে।

হিমবাহের প্রকৃত সংজ্ঞা ঃ

উপরিউক্ত হিমবাহের প্রকার, পর্যায় এবং শ্রেণীবিভাগ থেকে হিমবাহের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপন করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে R. F. Flint-এর সংজ্ঞাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে Glaciers are defined as ''Masses of ice ... formed by recrystallisation of snow and meltwater ... which show evidence of present or past movement। অর্থাৎ যখন কেলাসন প্রক্রিয়ায় বরফের সৃষ্টি হয় এবং তা ভূমিভাগের ঢাল অনুযায়ী কোন সময়ে প্রবাহিত হয় বা তার প্রবাহ বজায় বা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাকে হিমবাহ বলে। হিমবাহের গতিবেগ বা প্রবাহ বা আয়তন প্রধানত নির্ভর করে, (a) হিমবাহের উপর, (b) ভূমিভাগের পরিমাণের উপর, (c) ক্রমবর্ধমান বা ক্রমসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার উপর।

হিমবাজেট — হিমবাজেট শব্দটির অর্থ মোট হিমের আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য বা তারতম্য। অর্থাৎ কোন স্থানে কত পরিমাণ বরফের সৃষ্টি হল এবং কত পরিমাণ বরফ গলে গেল, তার পার্থক্যকে হিমবাজেট (Glacial budget) বলা হয়। যখন বরফের সঞ্চিত পরিমাণ মোট গলনের চেয়ে বেশি হয়, তখন তাকে, **ধনাত্মক হিমবাজেট** বলে। পক্ষান্তরে যখন বরফের গলন বরফের সঞ্চয়ের চেয়ে বেশি হয়, তখন তাকে, **ঋনাত্মক হিমবাজেট** বলে। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য যে ধনাত্মক হিমবাজেটের ফলে হিমসীমান্ত বা Ice Front অগ্রসর হয়। আবার ঋনাত্মক হিমবাজেটের ফলে হিমবাহের পশ্চাৎ অপসরণ ঘটে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে এই হিমবাজেটকে ভিত্তি করে হিমবাহ বিশারদ্‌গণ হিমবাহের দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেন। যথা (i) ধনাত্মক হিমবাজেটের ক্ষেত্রে সক্রিয় হিমবাহ (Active Glacier) এবং (ii) ঋনাত্মক হিমবাজেটের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হিমবাহ বা মৃতপ্রায় হিমবাহ (Inactive or Dead Glacier)।

4.6 হিমবাহের প্রক্রিয়া

হিমবাহ ক্ষয় ও সঞ্চয়কার্য উভয়ই করে এবং কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া হিমবাহ অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষয় প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে অবঘর্ষ (Abrasion) এবং উৎপাটন প্রক্রিয়া (Plucking) বিশেষভাবে দেখা যায়।

অবঘর্ষ — পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তিগুলির মত হিমবাহ অঞ্চলেও অবঘর্ষ প্রক্রিয়া দেখা যায়। সাধারণতঃ বিশাল হিমবাহ, যখন ঢাল অনুযায়ী নীচের দিকে অগ্রসর হয়, তখন যান্ত্রিকভাবে শিলাস্তরের উপরে অবঘর্ষ প্রক্রিয়া কাজ করে। তবে এই পরিমাণ প্রধানতঃ হিমবাহের আয়তন, ভূমিভাগের ঢাল ও শিলাস্তরের গঠনপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

উৎপাটন — কোন অঞ্চলের উপর দিয়ে যখন হিমবাহ প্রবাহিত হয়, তখন সেই হিমবাহের তলদেশে চাপের ফলে, তলদেশীয় বরফের স্তর (Basal Ice layer) গলে যায়। পরবর্তীকালে সেই বরফগলা জল শিলাস্তরে ফাটলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ও কেলাসনের ফলে কঠিন হয় এবং বিচূর্ণীভূত শিলাখণ্ডগুলিকে বিচ্ছিন্ন বা উৎপাটিত করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়াকে উৎপাটন বলে। এই প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করার জন্য আপনারা একটা পরীক্ষা করতে পারেন। একটি পাতলা কাচের খণ্ড সঙ্গে নিন। একটি পাত্রে নরম কাদা স্তর রাখুন। এবার কাচের খণ্ডটি সেই স্তরের উপর বসিয়ে দিন এবং পাত্রটি একটি বার্ণারে গরম করুন। দেখা যাবে, তাপের ফলে নরম কাদার স্তরটি ক্রমশঃ শক্ত হবে। এবার যদি আপনি ঐ কাচের খণ্ডটি তুলতে চান, তাহলে দেখবেন যে ঐ কাচের গায়ে কাদার কিছু উৎপাটিত হয়েছে। অনুরূপ ভাবেই হিমবাহের সঙ্গে শিলাস্তরের ক্ষুদ্রকণা ও বিচূর্ণীভূত শিলার অংশবিশেষ উৎপাটিত হয়। মৃত্তিকা বিশারদ্‌গণ অনুরূপ প্রক্রিয়াকে কলয়েড প্লাকিং (Colloid Plucking) বলেন।

4.7 হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ

হিমবাহ অঞ্চলে বিশেষতঃ সক্রিয় হিমবাহের ক্ষেত্রে ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে উপরিউক্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়ার ফলে যে সকল ভূমিরূপ গঠিত হয়, তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(a) ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ (Small scale landforms)

(b) বৃহদাকৃতি ভূমিরূপ (Large scale landforms)

4.7.1 ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ

হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে নানান ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে—

(i) হিমবাহের আঁচড় কাটার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বা or striation

(ii) দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত বা অনুদৈর্ঘ্য গর্ত (Grooves) এবং

(iii) হিমবাহের ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট ফাটল জাতীয় ভূমিরূপ (Friction Cracks)।

▲ হিমবাহের আঁচড় কাটার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ ঃ

হিমবাহ যখন শিলাস্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সেই শিলাস্তরের উপরে এক প্রকার আঁচড় কাটার দাগের সৃষ্টি হয় (striation)। এই দাগগুলির বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। ভূমিরূপ বিশারদ্‌গণ মনে করেন যে এই দাগগুলিই হল হিমবাহের পথপঞ্জিকা অর্থাৎ হিমবাহের উৎস কোথায়, বা হিমবাহ কোথায় প্রবাহ পথ কেমন বা শিলাস্তরের সহনশীলতা কতখানি ছিল, তারই নিদর্শন এই সব আঁচড় কাটা দাগ। শুধু তাই নয় অনেক সময়ে

শিলাস্তরের উপর একাধিক আঁচড় কাটা দাগ একটি অপরটির উপরে, বা অতিক্রম করে বা বিভিন্ন রেখার আকারে অবস্থান করে, যার থেকে বিশরাদগণ হিমবাহের পর্যায়ক্রম প্রবাহগুলিকে সনাক্ত করতে সমর্থ হন। এইভাবেই বিগত প্লিস্টোসিন অধিযুগে কোয়াটার্নারি হিমবাহের বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে তাঁরা চিহ্নিত করেন। প্লিসটোসিন তুষার যুগে হিমবাহের এই পর্যায়গুলি যথাক্রমে Wiirm (উরম), Riss (রিস্), Mindel (মিনডেল), Gunz (গুনজ্)। এই চারটি মূলতঃ পর্যায় দেখা যায় এবং একটি পর্যায় অপরটি থেকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আন্তঃ হিমবাহ পর্যায়ের দ্বারা বিযুক্ত (Warm Inter glacial phase)। তবে অনেকে এই তুষারযুগের আরও একটি পর্যায় (সর্বশেষ পর্যায়) Donau (ডোনাউ) রূপে চিহ্নিত করেন। তবে এই সকল হিমবাহের পদচিহ্নগুলি প্রকৃত জরিপের ক্ষেত্রে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। এবং প্রকৃত বিশ্লেষণের জন্য অগভীর শিলাস্তরের আঁচড় কাটা দাগ অপেক্ষা গভীর শিলাস্তরের বা নীচেকার শিলাস্তরের আঁচড়কাটা দাগ পরীক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। নচেৎ হিমবাহের প্রকৃত পদচারণ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সৃষ্টি হতে পারে।

▲ দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত বা অনুদৈর্ঘ্য শর্ত ঃ

যখন আঁচড় কাটা দাগ শিলাস্তরের উপর অনেক গভীর ভাবে অবস্থান করে তখন ঐ দাগগুলি গভীর ক্ষত রূপে এক প্রকার দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত গর্তের সৃষ্টি করে, যাকে ভূমিরূপ বিদ্যার পরিভাষায় গ্রুভ্স্ (Gooves) বলে। সাধারণতঃ এই প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ হিমবাহের আয়তন, কোমল শিলাস্তর এবং ঢালের পরিমাণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

▲ হিমবাহের ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট ফাটল জাতীয় ভূমিরূপ ঃ

হিমবাহের অবঘর্ষ এবং উৎপাটন প্রক্রিয়া যখন যৌথভাবে কাজ করে, তখন ঘর্ষণের ফলে এবং উৎপাটন প্রক্রিয়ার নিম্নভিমুখী চলনের ফলে দুর্বল শিলাস্তরে অনেক সময় ফাটল রেখার সৃষ্টি হয়। আবার যদি কোন শিলাস্তরে ফাটল থাকে, তখন এই দুই প্রক্রিয়ার ফলে ফাটল রেখা আড়াআড়ি ভাবে ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ঘর্ষণজনিত ফাটল রেখার উদ্ভব হয়। তবে এই ঘর্ষণ ফাটলের ক্ষেত্রে শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে বরফগলা জলের অনুপ্রবেশ এবং পুনর্কেলাসন প্রক্রিয়া (Recrystallisation) দেখা যায়।

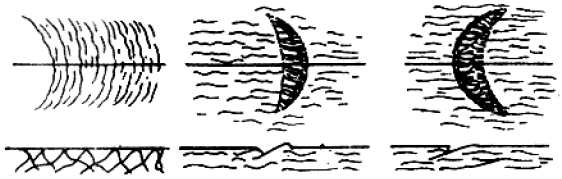

চিত্র 4.1 : হিমবাহের ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার ফাটলজাতীয় ভূমিরূপ

▲ অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ ঃ

উপরিউক্ত তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ ছাড়াও হিমবাহ অধ্যুষিত এলাকায় আরও কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ দেখা যায়। তাদের মধ্যে **রসে মুতানে** (Roche Montonnee) এবং **ক্র্যাগ ও টেল** (Crag and Tail) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রসে মুতানে ঃ

উৎপাটন এবং অবঘর্ষ উভয় প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে যে ভূমিরূপ সৃষ্টি করে তার নাম রসে মুতানে। সাধারণতঃ যে দিকে হিমবাহ প্রবাহিত হয় সেই ঢালে অবঘর্ষের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে তার বিপরীত ঢালে বা প্রতিঘাত ঢালে

বরফ গলা জল এবং কেলাসন প্রক্রিয়া উৎপাটন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এর ফলে মসৃণ অনুবাত ঢাল এবং বন্ধুর অমসৃণ প্রতিবাত ঢালের উদ্ভব ঘটে।

ক্র্যাগ ও টেল ঃ

মরুভূমিতে বাতাসের ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের অনুরূপ হিমবাহ অঞ্চলেও ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্য একই সাথে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ যখন হিমবাহ প্রবাহিত পথে কোন বাধার সম্মুখীন হয়, তখন একদিকে অবঘর্ষের ফলে ভূমিঢাল পরিবর্তিত হয় এবং অন্যদিকে ক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে পুচ্ছ বা **'টেল'** (Tail)-এর সৃষ্টি করে।

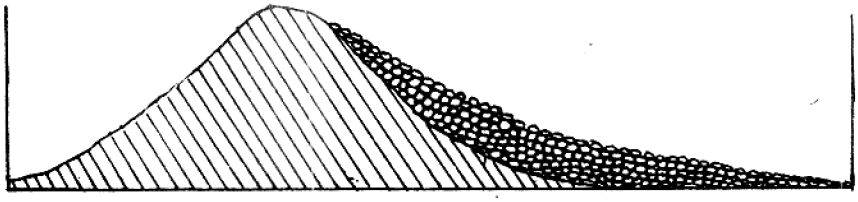

চিত্র 4.4 : ক্র্যাগ ও টেল

4.7.2 বৃহদাকৃতি ভূমিরূপ

হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে কয়েকটি বৃহদাকৃতির ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। তবে সেই সকল ভূমিরূপের উদ্ভব এবং বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করার আগে হিমবাহ অঞ্চলে ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে তিনটি তত্ত্ব বা মতবাদের আলোচনা করা দরকার। যথা—

(a) **ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে আইস-ইরোসনিস্ট (Ice-Erosionist) মতবাদ ঃ**

হিমবাহ বিশারদগণ মনে করেন বরফের প্রবাহ বস্তুত ক্ষয়ের প্রক্রিয়াকে সূচিত ও ত্বরান্বিত করে এবং কোন স্থানে হিমবাহের পরিমাণ, ভূমিভাগ বা শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষয়প্রক্রিয়ার তারতম্য ঘটে, যাকে বিশারদগণ বৈষম্যমূলক ক্ষয় (Differential erosion) নামে অভিষিক্ত করেছেন। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন যে পার্বত্য অঞ্চলে এই বৈষম্য মূলক ক্ষয় প্রক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়জাত ভূমিরূপের উদ্ভব হয়।

দৃষ্টান্ত ঃ ক্ষয় মতবাদকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। যখন কোন পার্বত্য উপত্যকায় মূল হিমবাহ এবং উপহিমবাহ মিলিত হয়, তখন মূল হিমবাহ উপত্যকায় হিমবাহের পরিমাণ বা আয়তন উভয়েই বেশী থাকায় ক্ষয়কার্য্য অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। পক্ষান্তরে উপহিমবাহ অঞ্চলে হিমবাহের পরিমাণ ও আয়তন উভয়েই কম থাকায় ক্ষয়প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর হয়। এর ফলে (বৈষম্যমূলক ক্ষয়ের ফলে) মূল হিমবাহ উপত্যকা অনেক নীচে নেমে যায় এবং উপ হিমবাহ উপত্যকাটি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে না ও এ উপত্যকাটি ঝুলন্তভাবে অবস্থান করে। একে ঝুলন্ত উপত্যকা (Hanging Valley) বলে।

(b) আইস-প্রোটেকসনিস্ট (Ice-Protectionist) মতবাদ ঃ

এই মতবাদটি উপরে দেওয়া মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এই মতবাদে বলা হয় যে, যে কোন স্থানে হিমবাহের অবস্থান মূলতঃ সেই স্থানে পূর্বেকার ভূমিরূপ বজায় রাখতে বা রক্ষা করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ কোন স্থানে হিমবাহ সেই স্থানের আবহবিকার, ক্ষয়ীভবন বা নগ্নভবন প্রভৃতি প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে।

দৃষ্টান্ত ঃ তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য ঝুলন্ত উপত্যকার উদাহরণটিকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেছে নেওয়া হল। এই মতবাদ অনুযায়ী যখন কোন উপহিমবাহ অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতা থেকে মূল হিমবাহ অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন সেই উপহিমবাহ উপত্যকায় হিমবাহের অবস্থান সেই স্থানকে ক্ষয় প্রক্রিয়া থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে মূল উপত্যকা হিমবাহ অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় প্রবাহিত হয় বলে সেই স্থানে হিমবাহের গলন দ্রুত হয় এবং পূর্বেকার ভূমিরূপ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হয় এবং এর ফলে ক্ষয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এইভাবেই উপ হিমবাহ উপত্যকাটি ঝুলন্ত উপত্যকা রূপে অবস্থান করে।

(c) আইস-কমপ্রোমাইজিং স্কুল (Ice-Compromising School) :

ত্রিকার (Tricart) তাঁর ''Geomorphology of Cold Environment'' বইটিতে এই মতবাদের অবতারণা করেন। তাঁর মতে হিমবাহের ক্ষয়জাত ভূমিরূপগুলিকে শুধুমাত্র আইস ইরোসানিস্ট মতবাদ বা আইস প্রোটেকসনিস্ট মতবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ তাঁর মতে হিমবাহের সঠিক অবস্থান কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বেকার ভূমিরূপের রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাই তিনি উভয় মতবাদের এক প্রকার মেলবন্ধন করে এই তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন।

দৃষ্টান্ত ঃ ত্রিকা পার্বত্য হিমবাহের ভূমিরূপ উদ্ভব ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, যে সকল উপহিমবাহ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়, সেই ক্ষেত্রে হিমবাহ পূর্বেকার উপত্যকাকে ক্ষয় প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে যে সকল উপহিমবাহ বিপরীত অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ক্ষয় প্রক্রিয়া ঝুলন্ত উপত্যকা গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নয়।

অতএব হিমবাহ সৃষ্ট ভূমিরূপের যথাযথ বিশ্লেষণ করার জন্য উপরিউক্ত তিনটি মতবাদ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

সির্ক বা করি (Cirque or Corrie) :

পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে যে সকল বৃহদাকৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয়, তাদের মধ্যে সির্ক বা করি অন্যতম। সির্ক (Cirque) শব্দটি একটি ফরাসি শব্দ। স্কটল্যান্ড এই শব্দটি করি (Corrie) নামে পরিচিত। স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে বটন (Botn) এবং জেডেল (Kjedel) ও জার্মানিতে কুম (Cwm) নামে সার্ককে অভিহিত করা হয়।

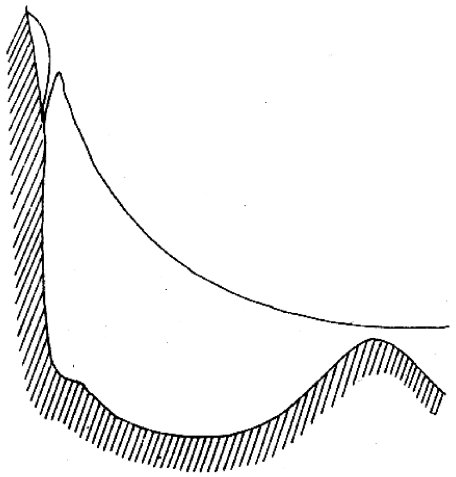

চিত্র 4.4 : করি বা সা

সির্ক বা করি একটি আরামকেদারা আকৃতি বিশিষ্ট ভূমিরূপ। যাকে অনেক সময় অ্যাম্ফিথিয়েটার (amphitheatre)-এর মত একটি অবনমিত এলাকা বলে মনে করা হয়।

সাধারণভাবে সির্ক বা করির তিনটি অংশ থাকে : (ক) খাড়া পশ্চাৎ ঢাল (steep back wall), (খ) অবনমিত অংশ বা বেসিন (basin) এবং (গ) থ্রেসহোল্ড (Threshold)। যেখানে ট্যালাস জাতীয় পদার্থের সঞ্চয় হয়। খাড়া পশ্চাৎ ঢালটি প্রধানতঃ হিমবাহের অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার ফলে গঠিত হয়। অবনমিত অংশে অবঘর্ষ এবং উৎপাটন উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। থ্রেসহোল্ড অঞ্চলে ট্যালাস অবক্ষেপন দেখা যায়। তবে অবনমিত অঞ্চলটি কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে হিমবাহে আবৃত তাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হিমবাহের গলনের ফলে বরফ গলা জল করি হ্রদের (Corrie lake) সৃষ্টি করে।

সির্ক বা করির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ঃ

সির্ক বা করি গঠনের মতবাদ আছে। তবে সর্বজন গ্রাহ্য মতবাদটি W. D. Johnson 1904 সালে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে একটি বরফাবৃত সির্ক-এর মধ্যে এক প্রকার লক্ষণীয় ক্রিভাস (Crevasse) বর্তমান থাকে। একে বার্গস্ক্রুন্ড (Birgschrund) বলে এবং বরফগলা জল ঐ ক্রিভাস-এর ছিদ্র পথ দিয়ে অনুপ্রবেশ করে। পুনরায় বরফে পরিণত হয়ে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও সির্কের পশ্চাৎ প্রাচীরের শিলাস্তরকে বিচূর্ণীভূত করে। কালক্রমে তা আরাম কেদারার আকৃতি নেয়। তবে এই তত্ত্বটির কিছু সমালোচনা আছে।

প্রথমত ঃ সব 'করি' তে বার্গস্ক্রুন্ড থাকে না।

দ্বিতীয়ত ঃ করি পশ্চাৎ প্রাচীরের গভীরতা অনেক ক্ষেত্রে বার্গস্ক্রুন্ডের গভীরতার থেকে বেশি হয়।

তৃতীয়ত ঃ অনেক বার্গস্ক্রুন্ড করির তলদেশে পৌঁছানোর আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

জনসনের এই তত্ত্বটিকে পরবর্তীকালে W.V. Lewis (1938) পরিমার্জন করেন। তাঁর মতে শুধুমাত্র বরফগলা জল নয়, অনেক ক্ষেত্রে বৃষ্টির জলও সির্ক গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এর পর তিনি উত্তর ইউরোপের বিশেষতঃ নরওয়ে অঞ্চলের সির্কগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে, তাঁর তত্ত্বকে আরও পরিমার্জন করেন এবং তিনি উল্লেখ করেন যে একপ্রকার আবর্তনজনিত (Rotational slip) স্খলন সির্ক গঠনে বিশেষত ভূমিকা নেয়। দেখা যায় যে পশ্চাৎ প্রাচীরের খাড়া ঢাল অনুযায়ী যখন অবঘর্ষ কাজ করে তখন বিচূর্ণীভূত শিলাস্তরের অংশ বিশেষ এক প্রকার আবর্তনজনিত পুঞ্জিত ক্ষয় সির্ক গঠনে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, তলদেশীয় গলন (basal melting) অবনমিত অংশের রূপরেখাকে পরিবর্তন করে।

সির্ক বা করি গঠন বিভিন্ন প্রকারের হয়, তবে সাধারণতঃ উপবৃত্তাকার সির্ক লক্ষণীয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একের অধিক সির্ক সম্মিলিত ভাবে যৌগিক সার্ক বা কমপাউন্ড সার্ক (Compound cirque) গঠন করে এবং ভূমিরূপ উদ্ভবের উন্নত পর্যায়কে সূচিত করে।

হবস্ (Hobbs) 1910 সালে সির্কের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পার্বত্য হিমবাহের ক্ষয়চক্রের উন্নত পর্যায়ে (advanced stage) এই ভূমিরূপ গঠিত হয়। তবে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি এবং হিমবাহের ক্ষয় প্রক্রিয়ার স্থানীয় তারতম্যের ফলে সার্কের সামগ্রিক রূপটি পরিবর্তিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে সির্কের গঠন প্রধানতঃ (a) প্রাক্ হিমবাহ উপত্যকার মধ্যবর্তী প্রশস্ত অঞ্চলের উপস্থিতি, (b) তুষার পাতের ফলে বিস্তীর্ণ তুষার ক্ষেত্র ও হিমবাহের গঠন এবং (c) প্রায় সমধর্মী শিলার অবস্থান সির্কের উদ্ভব প্রণালীকে প্রভাবিত করে।

হব্‌সের উপরিউক্ত সির্ক উদ্ভবের বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত চারটি পর্যায়ে দেখানো যেতে পারে।

পর্যায়	বৈশিষ্ট্য
প্রাথমিক বা নবীন পর্যায় (Young stage)	প্রতিটি সির্ক একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে এবং এদের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলির ভূ-প্রকৃতি (আপেক্ষিক ভূ-প্রকৃতি—Relative Relief) অনেক বেশি হয়।
দ্বিতীয় বা কৈশোর পর্যায় (Adolescent stage)	এই সময়ে সির্ক-এর বেসিন বা অবনমিত অংশের আয়তন বৃদ্ধি পায়। পশ্চাৎ প্রাচীরের ক্রম পশ্চাদপসরণের ফলে (বিশেষতঃ সমান্তরাল ঢালের পশ্চাৎ অপসরণ এবং পশ্চাৎ আবহবিকার (Back Weathering) মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলির বিস্তৃতি হ্রাস পায় এবং ক্রমশঃ একে অপরের কাছাকাছি চলে আসে।
তৃতীয় পর্যায় বা পরিণত পর্যায় (Mature stage)	পশ্চাৎ প্রাচীরের ক্রম-পশ্চাদপসরণের ফলে সির্কগুলির পশ্চাৎ প্রাচীর খাড়াই হয় এবং একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। বলা যেতে পারে এই পর্যায়ে সির্কের গঠন সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।
চতুর্থ বা শেষ পর্যায় বা বার্ধক্য পর্যায় (Stage of senility)	এই পর্যায়টি সির্কের বিনাশ এবং ক্রম বিলুপ্তি সূচিত হয়। বিশেষতঃ সাধারণ পশ্চাৎ প্রাচীরের উচ্চতা ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং সমগ্র অঞ্চলটি একটি নিম্ন অবনমিত অংশে পরিণত হয়। শুধুমাত্র মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলিতে অবশিষ্ট পাহাড় বা উচ্চভূমি দেখা যায়।

▲ **এরিটি (Arete) :** পার্বত্য হিমবাহ অঞ্চলে এরিটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ। যখন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী সার্ক অবস্থান করে এবং হিমবাহের অবঘর্ষের ফলে উভয় সার্কের পশ্চাৎ প্রাচীরের ঢালের পশ্চাৎ অপসরণ হয় ও মিলিত হয়ে একটি সাধারণ পশ্চাৎ প্রাচীর গঠন করে, তখন তীক্ষ্ণ শৈলশিরা আকৃতি বিশিষ্ট যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, তাকে এরিটি বলে।

আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রকার এরিটি বিশেষ ভাবে দেখা যায়, যাকে অনেক সময় সিরেট রিজ (serrate ridge) বলে।

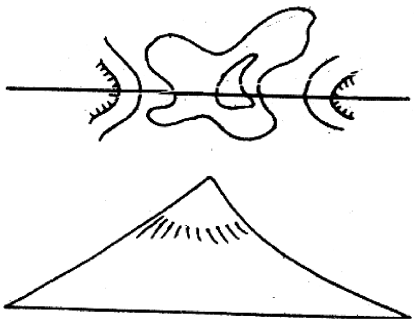

চিত্র 4.5(A) : বিটি

▲ **পিরামিড চূড়া (Pyramidal Peak) :** যখন দুয়ের অধিক বিপরীতমুখী এরিটির সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে একটি সাধারণ পশ্চাৎ প্রাচীর অবস্থান করে। তখন ভূমিরূপটি পিরামিডের আকৃতি নেয়। একে পিরামিড চূড়া বা পিরামিডাল পিক বলে।

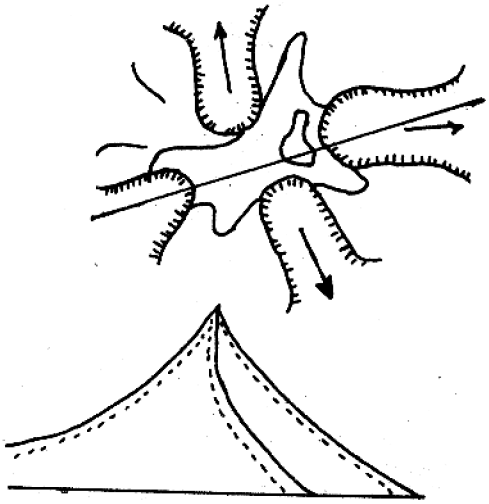

চিত্র 4.5(B) : পিরামিড চূড়া

আল্পস অঞ্চলের মাটারহর্ণ এবং ওয়াইস হর্ণ (Weiss Horn) এই প্রকার ভূমিরূপের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভূমিরূপটি তীক্ষ্ণশৈলশিরার মত দেখতে হয় বলে একে অনেক সময় শৃঙ্গ বা হর্ণ (Horn) বলা হয়।

সির্ক বা এরিটির মত পিরামিড চূড়াও কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হয় এবং তীক্ষ্ণ শৃঙ্গের উচ্চতা বা তীক্ষ্ণতা উভয়ই (Monument) ব মিনার উচ্চভূমির আকৃতি নেয়। যাকে ইংরাজী পরিভাষায় মনুমেন্টাল আপল্যান্ড (Monument Upland) বলে।

▲ **হিমদ্রোনী (Glacial Trough) :** হিমদ্রোনী শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে হিমবাহ উপত্যকা। তবে সাধারণ নদী উপত্যকা থেকে হিমদ্রোনী বা হিমবাহ উপত্যকার আকার অন্য রকম হয়। আপাতদৃষ্টিতে হিমবাহ উপত্যকাকে ইংরাজী '*v*' আকৃতি বিশিষ্ট বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই উপত্যকাটি জ্যামিতিক পরিভাষায় অনেকটা পরাবৃত্তীয় (Parabolic) আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

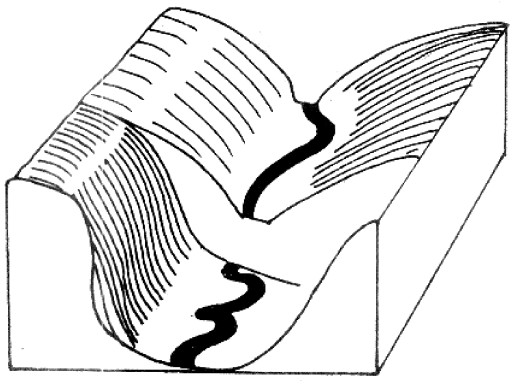

চিত্র 4.6 : নদী ও উপত্যকা হিমবাহ

এ প্রসঙ্গে এমবেল্টন (C. E. Embelton) এবং সি এ এম কিং (C. A. M. King) তাঁদের Glacial Geomorphology নামক প্রামাণিক গ্রন্থে এই প্রকার উপত্যকার গঠন এবং উদ্ভব উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে যখন কোন নদী উপত্যকায় হিমবাহ কাজ করে, তখন উপত্যকার উভয় পার্শ্ব কর্তিত হয়, কিন্তু মূল উপত্যকার 'v' আকৃতিটিও উপরের অংশে বজায় থাকে। এছাড়া উপত্যকার তলদেশ হিমবাহের গলন এবং কেলাসন প্রক্রিয়ায় বরফে রূপান্তর এক প্রকার প্রায় সমতল তলদেশ গঠন করে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে উপত্যকাটি পরাবৃত্তীয় আকার নেয়।

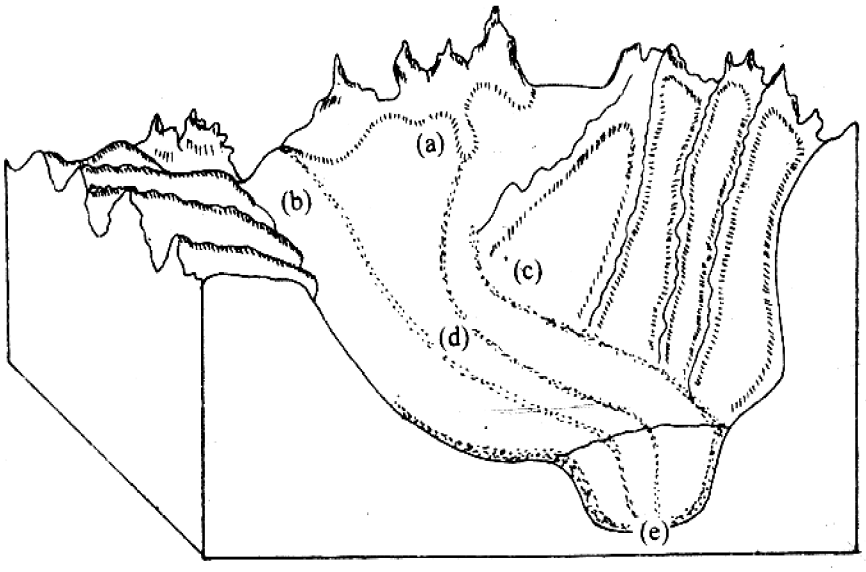

চিত্র 4.7 : হিমদ্রোণী—(a) সার্ক হিমবাহ, (b) হিমবাহ, (c) পার্শ্ব গ্রাবরেখা, (d) মধ্য গ্রাবরেখা, (e) ভূমি গ্রাবরেখা

হিমবাহ উপত্যকার দৈর্ঘ্য বরাবর পার্শ্ব চিত্র পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমগ্র উপত্যকাটি কয়েকটি ধাপে গঠিত। এবং এই ধাপের (steps) তিনটি বিশেষ অংশ হল (a) রাইজার (Riser), (b) ট্রেড (Tread) এবং (c) রিগেল (Riegal)।

প্রতিটি ধাপের নীচের অংশকে রাইজার বলে। হিমবাহ উপত্যকার প্রায় সমতল তলদেশকে ট্রেড বলে এবং একটি ট্রেড ও পরবর্তী রাইজারের সংযোগস্থলে শিলাস্তরের ভগ্নাবশেষ দিয়ে গঠিত 'রিগেল'-এর সৃষ্টি হয়।

▲ **ঝুলন্ত উপত্যকা (Hanging Valley) :** হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষতঃ যখন মূল হিমবাহ উপত্যকার সঙ্গে উপহিমবাহ উপত্যকা মিলিত হয়, তখন সেই সব উপত্যকা হিমবাহ অঞ্চলে ঝুলন্ত উপত্যকার সৃষ্টি হয়। এই ভূমিরূপটি পূর্বেই ভূমিরূপ উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পার্বত্য নদী অঞ্চলে ঢালের যে অভিক্ষিপ্তাংশ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়, যাকে ইন্টারলকিং স্পার (Interlocking spur) বলে। হিমবাহ সেই সকল স্পার বা ঢালের অভিক্ষিপ্তাংশকে অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয় করে এবং কর্তিত স্পার (Truncated spur) গঠন করে। এই কর্তিত স্পার গঠনকে বস্তুতঃ ঝুলন্ত উপত্যকা গঠনের একটি প্রাথমিক শর্ত রূপে গণ্য করা হয়।

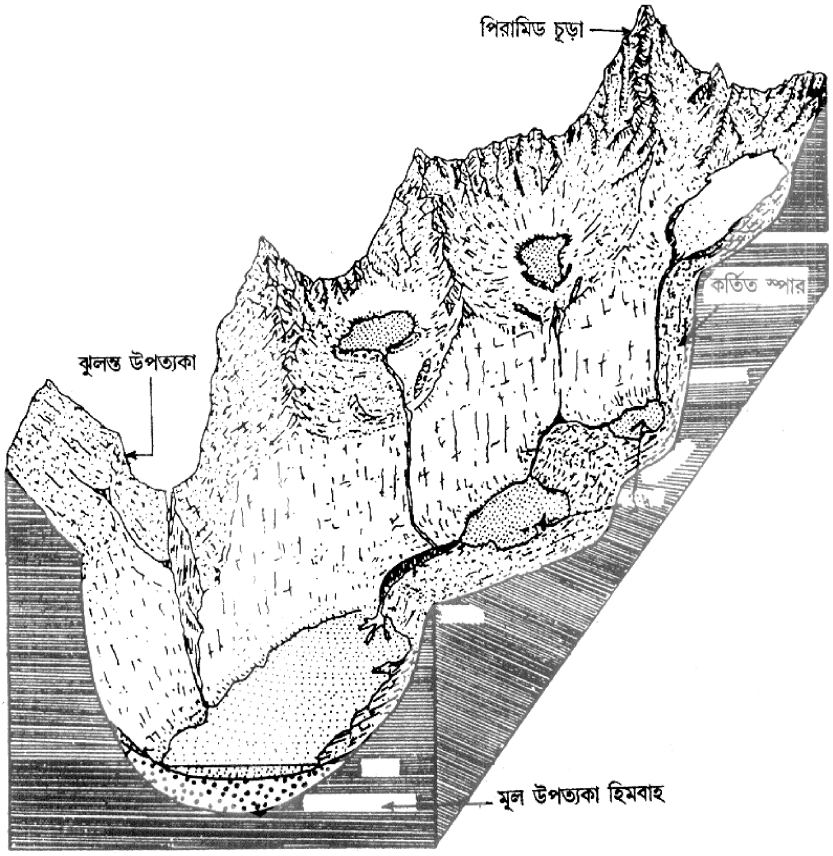

চিত্র 4.8 : বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়জাত ভূমিরূপ

▲ **ফিয়র্ড (Fiord) :** উপকূলবর্তী অঞ্চলে হিমবাহ তার উপত্যকাকে সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা অনেক গভীরে ক্ষয় করলে সেই সকল উপত্যকাগুলি জলমগ্ন হয় এবং ফিয়র্ড এর সৃষ্টি করে। ভূমিরূপ বিশারদগণ এই ফিয়র্ডের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

ফিয়র্ডের প্রকার	বৈশিষ্ট্য
(1) ফিয়র্ড	এই প্রকার ভূমিরূপ সাধারণতঃ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের প্রান্ত দেশীয় খাড়া ঢালে দেখা যায়। বিশেষতঃ যখন পরাবৃত্তীয় হিমবাহ উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের ফলে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয়। তখন এই প্রকার উপত্যকা সৃষ্টি হয়।
(2) ফিয়ার্ড (Fiord)	এই প্রকার ফিয়র্ড-এর আকৃতি অনেকটা উপরিউক্ত ফিয়র্ডের মত হলেও মূলতঃ এই প্রকার ফিয়ার্ড বরফ গলা জলের মাধ্যমে গঠিত হয়। অর্থাৎ যখন বরফগলা নদী তার উপত্যকাকে সমুদ্র পৃষ্ঠ অপেক্ষা অনেক গভীরে কেটে দেয়, তখন ফিয়ার্ডের সৃষ্টি হয়।

(3) ফোর্ডেন (Fohrden)

এই প্রকার ফিয়র্ডের আকৃতি এবং অবস্থান উভয়ই উপরিউক্ত ফিয়র্ড ও ফিয়ার্ডের থেকে আলাদা হয়। সাধারণতঃ নিম্ন হিমবাহ উপত্যকা অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থানের ফলে ফোরডেন-এর সৃষ্টি হয় এবং উপত্যকায় ঢাকা ফিয়র্ড বা ফিয়র্ডের চেয়ে অনেক কম হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফোরডেন উষ্ণ আন্তঃহিমবাহ পর্যায়ে (Warm Interglacial phase) গঠিত হয়।

4.8 হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ (Glacial Depositional Landforms)

পার্বত্য উপত্যকায় যেমন হিমবাহের ক্ষয়কার্য পরিলক্ষিত হয়, নিম্ন সমভূমিতে বা পার্বত্য ঢালের পাদদেশে বিভিন্ন প্রকার হিমবাহের অবক্ষেপন বা সঞ্চয় দেখা যায়। এই সঞ্চয় হিমবাহ দুই ভাবে করে থাকে। প্রথমতঃ যখন হিমবাহ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে নিম্ন অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন বেশ কিছু ক্ষয়জাত পদার্থ হিমবাহের সাথে পরিবাহিত হয়। একে ইংরাজী পরিভাষায় ''Glacial entrainment of debris'' বলে। এই পরিবহনের ক্ষেত্রে অবক্ষেপনে পদার্থ সমূহ তাদের কণার আয়তন ও আকৃতি অনুযায়ী সজ্জিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ নিম্ন সমভূমিতে বিশেষতঃ উচ্চতার হ্রাসের ফলে হিমবাহের গলন এবং বরফ গলা জলের মাধ্যমে পদার্থের পরিবহন অনেক সময় সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের সৃষ্টি করে শুধু মাত্র বরফগলা জলের মাধ্যমে পদার্থের পরিবহন হয় বলে, সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলি পদার্থের কণার আয়তন ও আকৃতি অনুযায়ী সজ্জিত এবং স্তরীভূত হয়। এ প্রসঙ্গে ভূমিরূপ বিশারদ্ লিয়েল (Lyell) উপরিউক্ত দুই প্রকার সঞ্চয়কে যথাক্রমে — (a) অবিন্যস্ত ও অস্তরীভূত সঞ্চয় (unstratified and assorted drift) এবং (b) বিন্যস্ত ও স্তরীভূত সঞ্চয় (Stratified and sorted drift) নামে অভিহিত করেন। (চিত্র নং 4.9)

চিত্র 4.9 : বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ

সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের যথাযথ বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করার আগে সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের একটি শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক। বর্তমানে আলোচনার সুবিধার জন্য এমবেলটন এবং কিং-এর প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ ডি. ই. সাগডেন (D. E. Sugden) পরিমার্জিত শ্রেণীবিভাগটি অনুসরণ করা হল।

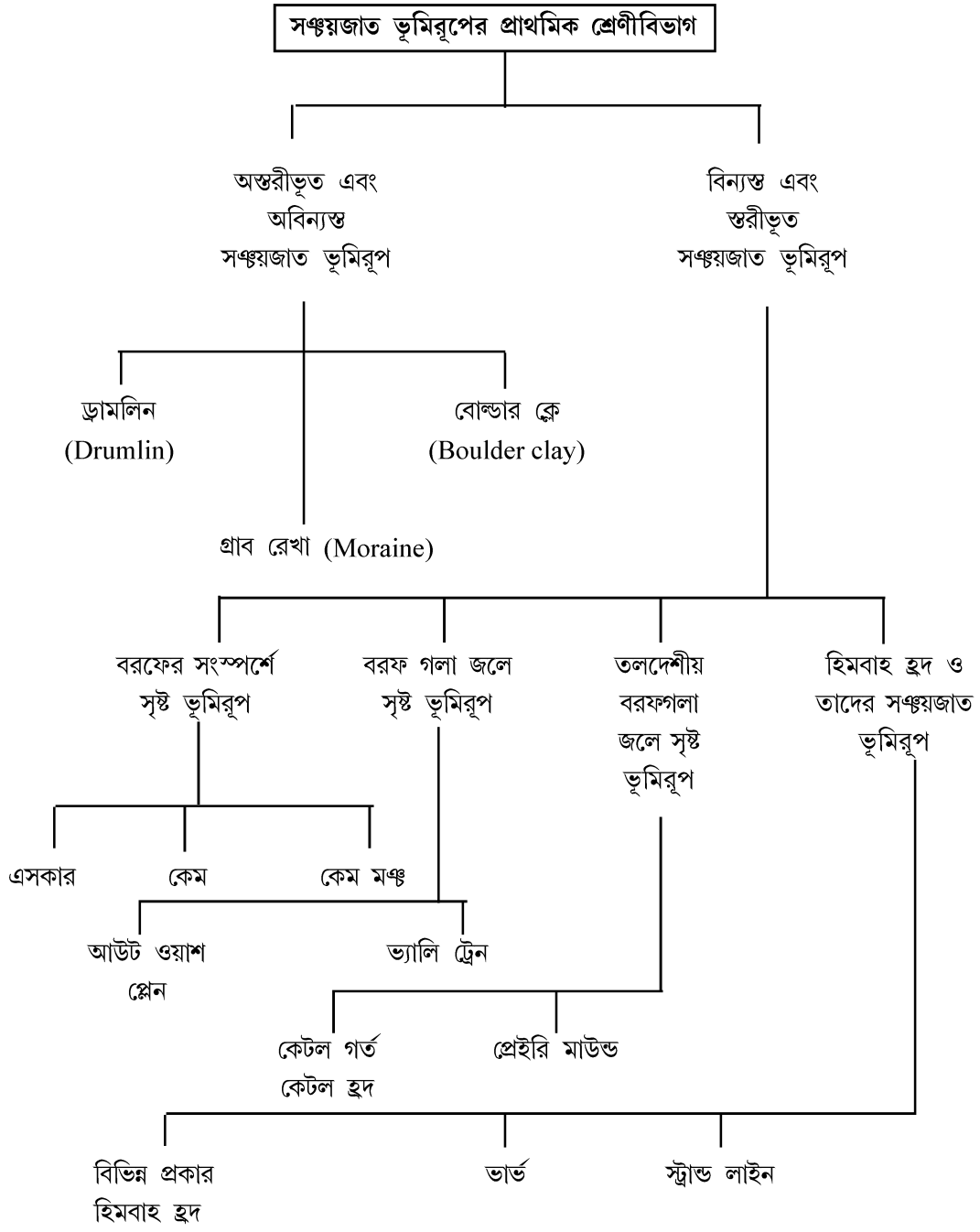

4.8.1 অন্তরীভূত এবং অবি ন্যস্ত সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ ঃ

উপরিউক্ত সারণী থেকে দেখা যায় যে হিমবাহের অবক্ষেপন প্রধানতঃ দুই প্রকার— অন্তরীভূত ও স্তরীভূত। যখন হিমবাহ প্রধানতঃ সঞ্চয়কার্য করে তখন অন্তরীভূত এবং অবিন্যস্ত অবক্ষেপন দেখা যায়। অন্তরীভূত অবক্ষেপনের নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

- এই প্রকার অবক্ষেপণে কোন স্তর দেখা যায় না।
- এই প্রকার অবক্ষেপণে পদার্থগুলি অবিন্যস্ত থাকে।
- এই প্রকার অবক্ষেপণে **গ্রথনের** (Texture) **ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনে** (frequency distribution) **দুটি শীর্ষ** (bi-modal) দেখা যায়।
- পদার্থগুলির উপর হিমবাহের **আঁচড় কাটা দাগ** (Striation) দেখা যায়।
- পদার্থগুলির একপ্রকার **কৌণিক আকৃতি** (angular shape) লক্ষ্য করা যায়।
- পদার্থগুলি সামগ্রিক ভাবে অমসৃণ হয়।

অন্তরীভূত অবক্ষেপণের ক্ষেত্রে পদার্থগুলির আয়তন অপেক্ষাকৃত কম হয়। কারণ এই সকল পদার্থ অনেক দূর থেকে হিমবাহ পরিবহন করে আনে এবং যার ফলে হিমবাহের সঙ্গে এই সকল পদার্থের ক্রমাগত ঘর্ষণ হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে (যখন ঘর্ষণ প্রক্রিয়া কাজ করতে সক্ষম হয়) পদার্থগুলির আয়তন ও কৌণিক পরিমাণ উভয়েই বেশি হয়। যেমন, ইরাটিক্স (Erratics)।

অন্তরীভূত হিমবাহ অবক্ষেপণের ফলে যে সকল ভূমিরূপের উদ্ভব হয়, তাদের মধ্যে ড্রামলিন, গ্রাবরেখা এবং বোল্ডার ক্লে উল্লেখযোগ্য।

ড্রামলিন (Drumline) : নিম্ন সমভূমিতে হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে উল্টানো নৌকা প্রভৃতি বিশিষ্ট যে ভূমিরূপ গঠিত হয়, তাকে ড্রামলিন বলে। অনেক সময় একে উল্টানো চামচের মতও দেখায়।

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একত্রে অনেকগুলি ড্রামলিন অবস্থান করে এবং এর আকৃতি যেহেতু ডিমের মত (oval) হয়, সেই কারণে অনেক সময় সামগ্রিকভাবে ড্রামলিন সমৃদ্ধ অঞ্চলকে "বাস্কেট অফ এগ্স ট্রোপোগ্রাফি" (Basket of eggs topography) বলে। এক্ষেত্রে আরও লক্ষ্যণীয় যে ড্রামলিনের আড়াআড়িভাবে প্রস্থচ্ছেদ এক প্রকার **অ্যাসিমেট্রিক্যাল** (asymmetrical) বা অপ্রতিসম ঢাল দেখা যায়। অর্থাৎ যে দিক থেকে হিমবাহ অগ্রসর হয়, সেদিকটা অমসৃণ এবং অপেক্ষাকৃত খাড়া থাকে। পক্ষান্তরে তার বিপরীত দিকটি তুলনামূলকভাবে মসৃণ এবং মৃদু ঢাকা যুক্ত হয়। এই কারণে ড্রামলিনকে অনেক সময় **স্টস অ্যান্ড লি** (Stoss and Lee) ট্রোপোগ্রাফি বলে।

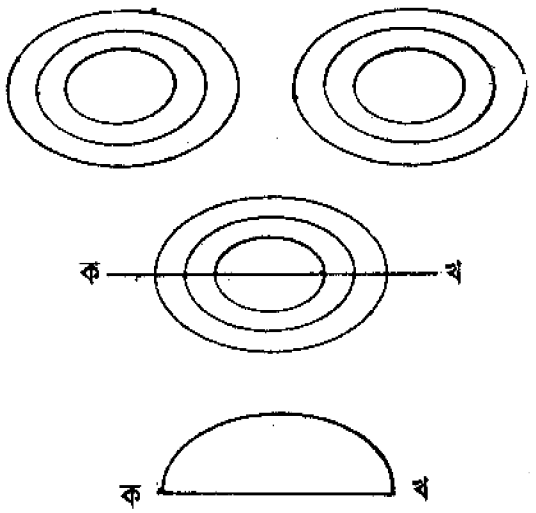

চিত্র 4.10 : ড্রামলিন ও ড্রামলিনের প্রস্থচ্ছেদে উল্টানো নৌকা আকৃতির ভূমিরূপ

ড্রামলিনের দৈর্ঘ্য 10 মিটার থেকে 3000 মিটার পর্যন্ত হয় এবং এর উচ্চতা 5 থেকে 50 মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। সাধারণভাবে ড্রামলিনের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত 2.5:1 থেকে 4 : 1 পর্যন্ত হয়। (চিত্র নং 4.10)

ড্রামলিনের উৎপত্তি ও গঠন নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব আছে। তবে বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি তত্ত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী ড্রামলিন দুটি পর্যায়ে উদ্ভূত হয়। প্রথম পর্যায়ে হিমবাহ পদার্থগুলিকে নিম্নসমভূমিতে শুধুমাত্র জমা করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে হিমবাহ পুনরায় ঐ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সঞ্চিত পদার্থসমূহ ড্রামলিনের নির্দিষ্ট আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে যে যেহেতু দ্বিতীয় পর্যায়ে হিমবাহ আগেকার সঞ্চিত পদার্থসমূহকে

কিছুটা অপসারিত করে ড্রামলিনের সৃষ্টি করে, সেই কারণে এই তত্ত্বটি ড্রামলিনে ক্ষয় (Erosional Theory of Drumlin) তত্ত্ব নামে পরিচিত।

ড্রামলিনের বিভিন্ন পদার্থ খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সমগ্র ভূমিরূপটি সমকেন্দ্রীক (Concentric) স্তরে বিভক্ত এবং তার কেন্দ্রে মূল শিলা অবস্থান করে। এই বৈশিষ্ট্যটি পর্যবেক্ষণ করে ড্রামলিন উদ্ভবের দ্বিতীয় তত্ত্বটি অবতারণা করা হয়। এই তত্ত্বে বলা হয় যে, পর্যায়ক্রমে হিমবাহের আগমন এবং অবক্ষেপণের ফলে এই সমকেন্দ্রীক সমান্তরাল স্তরগুলি সৃষ্টি হয় এবং এই কারণে এই তত্ত্বটি ড্রামলিনের সঞ্চয়ণ তত্ত্ব (Depositional Theory of Drumlin) নামে পরিচিত। এই তত্ত্বটি (Hollingwarth (1931) এবং Charlesworth (1957) উপস্থাপনা করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে ড্রামলিনের প্রস্থচ্ছেদে অপ্রতিসম ও প্রতিসম ঢালের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে এল আগাসিস (L. Aghassis) এর ব্যাখ্যাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন যে হিমবাহের চাপের তারতম্যের ফলে এই দুই প্রকার ঢালের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ হিমবাহের চাপ যখন বেশি হয় তখন অপ্রতিসম এবং ভাঙা ঢালের উদ্ভব হয় (blunt stoss side)। পক্ষান্তরে যখন হিমবাহের চাপ কমে যায়, তখন অপেক্ষাকৃত মসৃণ প্রতিসম 'লি' (Lee) ঢালের উদ্ভব হয়। বিষয়টি একটি সহজ উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মুরগীর ডিম পাড়ার বিষয়টি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ডিমের ভোঁতা বা স্টস' (Stoss) অংশটি প্রথমে নির্গত হয় এবং চাপ হ্রাসের ফলে অপেক্ষাকৃত সূচালো মসৃণ "লি" অংশটি বেরিয়ে আসে যেহেতু ড্রামলিনের আকৃতি ডিমের মত সেই কারণে এই প্রসঙ্গে এই উপমাটি দেওয়া হল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ড্রামলিন হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলির মধ্যে একটি অন্যতম ভূমিরূপ এবং এই ভূমিরূপ হিমবাহের গতিবিধি, আগমন পশ্চাৎ অপসরণ, গতিবেগ প্রভৃতি শনাক্ত করতে বিশেষ সাহায্য করে।

গ্রাবরেখা (Moraine) : হিমবাহের অবক্ষেপণের ফলে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ হিমবাহের সম্মুখে, পশ্চাতে, তলদেশে স্তূপাকারে সঞ্চিত হয়। এদের গ্রাবরেখা (Moraine) বলে। যেহেতু এই প্রকার সঞ্চয় মূলতঃ হিমবাহ করে থাকে সেই কারণে সামগ্রিক ভাবে গ্রাবরেখাগুলি অস্তরীভূত এবং অবিন্যস্ত অবস্থায় সৃষ্টি হয়। (চিত্র 4.11)।

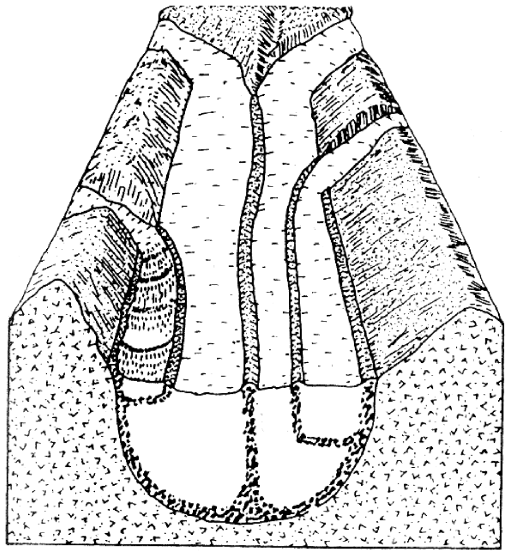

চিত্র 4.11 : বিভিন্ন প্রকার গ্রাবরেখা

গ্রাবরেখাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

- এরা স্তূপাকারে সজ্জিত হয়।
- অনেক সময় এরা শৈলশিরা আকৃতি বিশিষ্ট হয়।
- স্থানীয় ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে এদের খুব সম্পর্ক থাকে না।
- প্রধানত এরা হিমবাহের একক অবক্ষেপণে গঠিত হয়।
- যে কোন নিম্ন হিমবাহ অধ্যুষিত নিম্ন সমভূমিতে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

গ্রাবরেখাগুলিকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। **হিমবাহের অবস্থান** অনুযায়ী গ্রাবরেখাগুলিকে নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণী বিভক্ত করা হয়—

(a) ভূমিগ্রাবরেখা (Ground moraine) :

এই প্রকার গ্রাবরেখা অনেক বেশি বিস্তৃত হয়। তবে এর আকৃতি শৈলশিরা আকৃতি বিশিষ্ট হয় না। সাধারণতঃ হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণের ফলেই এদের দেখা যায়। উত্তর আমেরিকা বা উত্তর ইউরোপের অধিকাংশ হিমবাহ অধ্যুষিত এলাকায় এদের দেখা যায়। সাধারণতঃ এই প্রকার ভূমিরূপ সামগ্রিকভাবে মৃদু তরঙ্গায়িত (rolling topography) ভূমিভাগ গড়ে তোলে।

(b) পার্শ্ব গ্রাবরেখা (Lateral moraine) :

যখন হিমবাহের পার্শ্বদেশে বিভিন্ন পদার্থের অবক্ষেপন হয়, তখন তাকে পার্শ্বগ্রাবরেখা বলে। এই গ্রাবরেখাগুলির পদার্থের গভীরতা হিমবাহের সন্নিকটে সর্বাধিক হয়। এবং ক্রমশঃ এর গভীরতা আড়াআড়ি ভাবে হ্রাস পায়। অনেক সময় হিমবাহ উপত্যকা এবং পার্শ্বগ্রাবরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট হ্রদের সৃষ্টি হয় এবং বিশেষতঃ যে সকল অঞ্চল মহাদেশীয় হিমবাহে আবৃত ছিল, সেই সকল অঞ্চলে পার্শ্বগ্রাবরেখা অধিক পরিলক্ষিত হয়।

(c) মধ্য গ্রাবরেখা (Medial Moraine) :

যখন দুটি হিমবাহ পাশাপাশিভাবে মিলিত হয়, তখন ঐ দুই হিমবাহের পার্শ্ববর্তী গ্রাবরেখাদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় ও মধ্যগ্রাবরেখার সৃষ্টি করে। মোটামুটিভাবে মধ্যগ্রাবরেখা একটি শৈলশিরার আকৃতি নেয় ও দুই হিমবাহের সংযোগস্থলে উচ্চতা সর্বাধিক হয়।

(d) আবদ্ধ গ্রাবরেখা (Englacial moraine) :

অনেক সময় হিমবাহের মধ্যে ফাটল থাকে ও সেই ফাটলের মধ্যে হিমবাহ—পরিবাহিত পদার্থসমূহ সঞ্চিত হয় এবং আবদ্ধ গ্রাবরেখার সৃষ্টি করে। এর আয়তন, গভীরতা ও আকৃতি ফাটলের পরিমাণ, গভীরতা ও আকৃতি অনুযায়ী হয়।

(e) তলদেশীয় গ্রাবরেখা (Sub-glacial moraine) :

অনেক সময় হিমবাহের তলদেশে, বিশেষতঃ বরফগলা জলের মাধ্যমে কিছু পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং গ্রাবরেখার সৃষ্টি করে। একে তলদেশীয় গ্রাবরেখা বলে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে এই প্রকার গ্রাবরেখার সঙ্গে উপরিউক্ত গ্রাবরেখাগুলির একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। অন্যান্য গ্রাবরেখাগুলিকে অন্তরীভূত ও অবিন্যস্ত ভূমিরূপের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তলদেশীয় গ্রাবরেখার মধ্যে পদার্থের স্তর এবং সুবিন্যস্ত রূপ দেখা যায়। কারণ এই প্রকার গ্রাবরেখা বরফগলা জলের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এছাড়া তলদেশীয় গ্রাবরেখার পদার্থ সমূহ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ভাবে অবস্থান করে, কারণ পদার্থগুলি উপরিস্থিত হিমবাহের চাপের ফলে দৃঢ় (Compact) হয়।

(f) ভূমিগ্রাবরেখা (Ground Moraine) :

যখন কোন গ্রাবরেখা হিমবাহের পশ্চাৎ অপসরণের ফলে ভূমিভাগের উপরে অবস্থান করে। তখন তাকে ভূমিগ্রাবরেখা বলে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে কোন পার্শ্ব, মধ্য, আবদ্ধ গ্রাবরেখা পরবর্তী পর্যায় (যখন হিমবাহ পশ্চাৎ অপসারিত হয়) ভূমিগ্রাবরেখার সৃষ্টি করে। তবে ভূমিগ্রাবরেখা ও তলদেশীয় গ্রাবরেখার মধ্যে মূলতঃ কোন অবস্থানগত পার্থক্য না থাকলেও কোন একটি হিমবাহ অধ্যুষিত এলাকায় তাদের যথাযথ ভাবে শনাক্ত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা দরকার :

(i) ভূমিগ্রাবরেখাগুলি অবিন্যস্ত, বিসদৃশ এবং অস্তরীভূত ভূমিরূপ হিসাবে অবস্থান করে ; তলদেশীয় গ্রাবরেখা কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুবিন্যস্ত ও স্তরীভূত হয়।

(ii) ভূমিগ্রাবরেখার ক্ষেত্রে পদার্থগুলি শিথিলভাবে অবস্থান করে, পক্ষান্তরে তলদেশীয় গ্রাবরেখা অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় হয়।

(g) অন্যান্য গ্রাবরেখা ঃ হিমবাহের অবস্থান অনুযায়ী আমরা গ্রাবরেখাগুলিকে উপরিউক্ত ভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। তবে অন্যান্য কারণে বিশেষতঃ শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি, হিমবাহের প্রবাহিত পথের দিক এবং হিমবাহের পরিমাণ অনুযায়ী আরও কয়েকটি গ্রাবরেখা দেখা যায়। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রাবরেখাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(i) **খাত কাটা গ্রাবরেখা (Fluted Moraine) :** যদি হিমবাহের তলদেশে কোন বড় প্রস্তরখণ্ড বা আদিশিলা (Parent Rock) অবস্থান করে তখন বরফের চাপের তারতম্য হয়। এবং এর ফলে গ্রাবরেখাগুলি শিলার আকারে এবং দুটি শিলার মধ্যবর্তী অংশগুলি খাতের আকৃতি নেয়।

(ii) **রোজেন গ্রাবরেখা (Rogen Moraine)** : যখন কোন হিমবাহের আড়াআড়ি ভাবে গ্রাবরেখার সৃষ্টি হয়, তখন তাকে রোজেন গ্রাবরেখা বলে। এই প্রকার গ্রাবরেখাও শিরার আকারে অবস্থান করে এবং উচ্চতায় 10 থেকে 30 মিটার ও দৈর্ঘ্যে 1 (one) Km এর বেশী হয়। এর আকৃতি অনেকটা শিং (horn) বা চাঁদের কলার মত (crescentric) হয় বলে, একে অনেক সময় লুনেট গ্রাবরেখাও (Lunate Moraine) বলে।

(iii) **পশ্চাৎগামী গ্রাবরেখা (Retreating Moraine)** : হিমবাহের ক্রম পশ্চাৎগামীতার ফলে যে গ্রাবরেখাগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত হয় তাদের পশ্চাৎগামী গ্রাবরেখা বলে। তবে পশ্চাৎগামী গ্রাবরেখাগুলি স্থানে স্থানে প্রসারিত (যখন হিমবাহে সাময়িক ভাবে থেমে যায়) এবং সংকুচিত (যখন হিমবাহ পুনরায় গতিশীল হয়) হয়ে থাকে।

▲ **বোল্ডার ক্লে (Boulder Clay) :** হিমবাহের প্রবাহের ফলে যখন নিম্নভূমিতে বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে বড় বড় শিলাখণ্ড এবং অন্যান্য পদার্থ অবিন্যস্ত ভাবে সঞ্চিত হয়, তখন ঐ ভূমিরূপকে বোল্ডার ক্লে বা 'টেল' (Till) বলে। এবং সমগ্র এলাকাটি বোল্ডার ক্লে কান্ট্রি (Boulder Clay Country) বা টিল প্লেন (Till plain) নামে অভিহিত হয়। এই সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(i) পদার্থগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে ;

(ii) পদার্থের কণার মাপ অনুযায়ী বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের পাশাপাশি ছোট ছোট পদার্থ সঞ্চিত হয়।

(iii) বড় প্রস্তরখণ্ডগুলি কৌণিক ও অসমৃণ হয় এবং হিমবাহের উৎসস্থলের শিলাখণ্ড থেকে এই প্রস্তরখণ্ডগুলির সৃষ্টি হয়। হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণের ফলে ও পরবর্তীকালে বরফগলা জলের প্রবাহ এদের স্থানান্তরিত করতে পারে না। এই সব বড় প্রস্তরখণ্ডগুলিকে অনামুক (Erratic) বলে।

4.8.2 বিন্যস্ত এবং স্তরীভূত সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ ঃ

(ক) **এসকার (Esker) :** এটি বরফের সংস্পর্শে সৃষ্ট এবং সাধারণতঃ বালি গ্রাভেলের স্তর সমন্বিত প্রায় সমান্তরাল শৈলশিরা আকৃতির একটি ভূমিরূপ। সমভূমিতে নদী যেমন আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়। এসকারের গঠনও অনেকটা তার মত আঁকাবাঁকা হয়। এস্কারের উচ্চতা 3-10 মিটার এবং দৈর্ঘ্য 50-200 মিটার পর্যন্ত হয়। এর মস্তক দেশ প্রায় সমতল ও পার্শ্বদেশ খুব খাড়াই। (চিত্র নং 4.12)

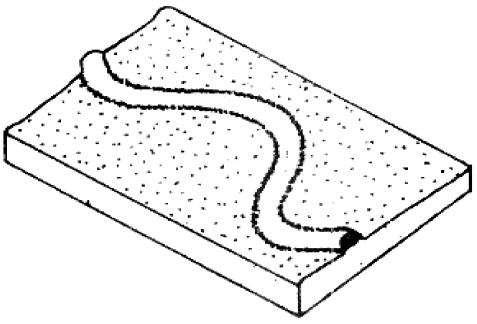

চিত্র 4.12 : এসকার

এস্কারের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। তবে তলদেশীয় গলন তত্ত্ব (Subglacial Melting)। সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। এই তত্ত্বে বলা হয় যে, হিমবাহের সংস্পর্শে ভূমিরূপটির সৃষ্টি হলেও হিমবাহের তলদেশে এক প্রকার সুড়ঙ্গ পথের মাধ্যমে বরফগলা জলের প্রবাহের ফলে বালি ও গ্র্যাভেল সঞ্চিত হয়ে এস্কার গঠন করে।

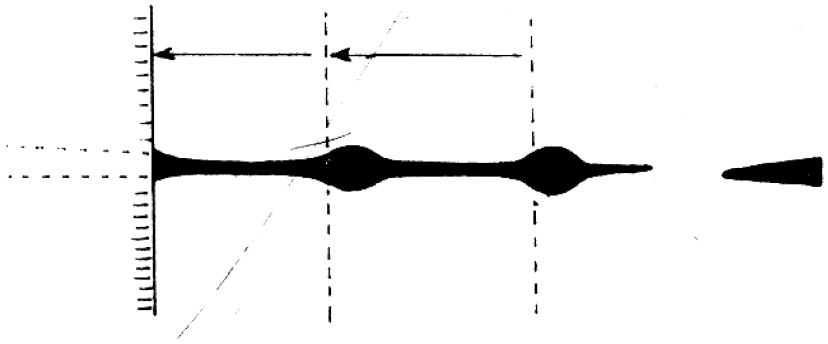

চিত্র 4.13 : পুঁথির আকৃতি বিশিষ্ট এসকার

সাধারণভাবে এস্কার আঁকাবাঁকা শৈলশিরা আকৃতির হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এস্কারের গঠন অনেকটা পুঁথির (Bead) আকৃতি নেয় এর গঠন নির্ভর করে হিমবাহের সাময়িক অবস্থিতি বা বিরতি এবং ক্রমপশ্চাৎ অপসারণের উপর। পূর্বে উল্লেখিত গ্রাবরেখার মত হিমবাহের বিরতি পর্যায়ে এস্কার ক্রমশঃ চওড়া হয় এবং হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণের সময়ে এস্কার অপেক্ষাকৃত সরু হয়। (চিত্র নং 4.13)

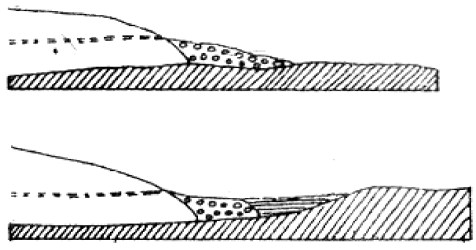

চিত্র নং 4.14 : বিভিন্ন প্রকার কেম

উত্তর পূর্ব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের সুইডেন এবং গ্রীনল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড ও কানাডায় এস্কার দেখা যায়। অনেক সময়ে প্রান্তবর্তী গ্রাবরেখার পশ্চাৎ ভাগে এস্কার গঠিত হয়।

কেম (Kame) : এস্কারের মত কেমও একটি বরফের সংস্পর্শে গঠিত ভূমিরূপ। তবে, এস্কারের সঙ্গে এর আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। কেম একটি স্তরীভূত ঢিবি আকৃতির ভূমিরূপ এবং অনেকটা নদী গঠিত ফ্যান (Fan) বা ব-দ্বীপের আকারে কেম ভূমিরূপটি গড়ে ওঠে। (চিত্র নং 4.14)

নিম্নলিখিত তালিকায় এস্‌কার ও কেম-এর পার্থক্য দেখানো হল।

এস্‌কার	কেম
(1) এটি হিমবাহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত হয়।	(1) কেম হিমবাহের সাথে আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত হয়।
(2) এসকার আঁকাবাঁকা শৈলশিরার মত দেখতে।	(2) কেম ঢিবি আকৃতি বিশিষ্ট হয়।
(3) এস্‌কারের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা অনেক বেশি হয়।	(3) কেম এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত এস্‌-কারের তুলনায় অনেক কম।

J.H. Cook 1946 সালে কেম-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর কোন স্থিতিশীল (stagnant) বরফের ফাটলে বা অবনমিত অংশে প্রাথমিক ভাবে বালি এবং গ্রাভেল সঞ্চিত হয় ও পরবর্তী পর্যায়ে হিমবাহ গলে গেলে ঐ বরফগলা জল সঞ্চিত পদার্থকে পরিবহন করে ঢিবি আকারে কেম গঠন করে।

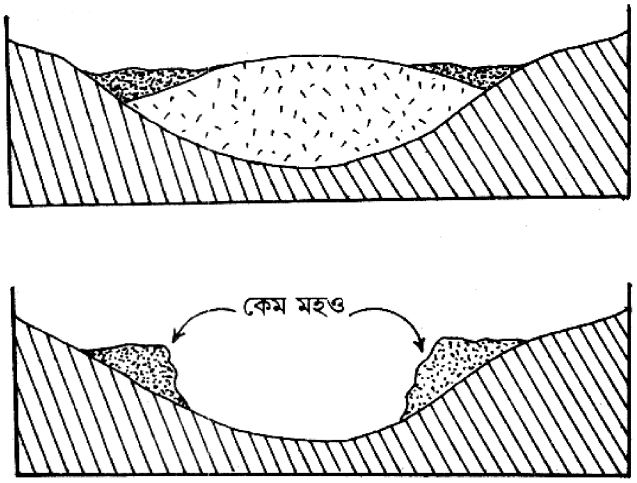

চিত্র নং 4.15 : কেম মহও

কেম মঞ্চ (Kame Terrace) : যখন হিমবাহ উপত্যকায় ধাপের আকারে কেম গঠিত হয়, তখন তাকে কেম মঞ্চ বলে। এটিও হিমবাহের সংস্পর্শে সৃষ্ট একটি ভূমিরূপ। নিম্নলিখিত পর্যায়ে কেম মঞ্চ গঠিত হয়।

(i) প্রথম পর্যয় ঃ হিমবাহ উপত্যকায় যখন কোন হিমবাহ অবস্থান করে তখন পর্বতের ঢাকা এবং হিমবাহের সংযোগস্থলে সূর্য কিরণ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকায় বরফগলা জল প্রাথমিক ভাবে কাজ শুরু করে এবং কিছু পদার্থ সঞ্চিত করে।

(ii) দ্বিতীয় পর্যায় ঃ হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণের ফলে হিমবাহের সংযোগ ঢালে (contact slope) এক প্রকার পদার্থের স্খলন লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে সঞ্চিত স্তরটি বিকৃত অবস্থায় প্রাথমিক ধাপের সৃষ্টি করে। (চিত্র নং 4.15)

আউট ওয়াশ প্লেন (Outwash Plain) :

এটি সম্পূর্ণভাবে বরফগলা জলে সৃষ্ট ভূমিরূপ। হিমবাহের প্রান্তভাগ দিকে সামনের দিকে হিমবাহ পরিবাহিত বিভিন্ন পদার্থ যখন বরফগলা জলের মাধ্যমে রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়ে এক প্রকার সমভূমি গঠন করে তখন তাকে আউট ওয়াশ প্লেন বলে। এই ধরনের সমভূমিকে অনেক সময় স্যানডুর (Sandur) বলে। আবার আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রকার সমভূমিকে ডেকেন সট্টার (Deckenschotter) বলে। (চিত্র নং 4.16)

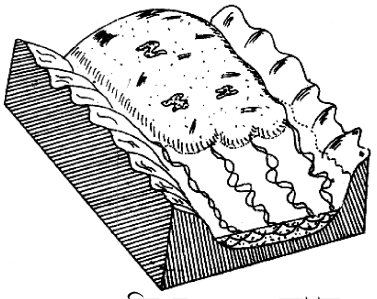
চিত্র নং 4.16 : স্যাণ্ডুর

আউট ওয়াশ প্লেন-এ কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। সর্বাপেক্ষা নীচে পুরানো ডেকেনসট্টার, তার উপরে নবীনতর ডেকেনসট্টার এবং আরও উপরে উচ্চ মঞ্চের গ্র্যাভেল ও সবচেয়ে উপরে নিম্ন মঞ্চের গ্র্যাভেল দেখা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে এই চারটি স্তর মোটামুটি ভাবে হিমবাহের উপযুগগুলিকে সূচিত করে।

আউট ওয়াশ প্লেন পরবর্তী কালে রূপান্তর হয়। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নদীর সঞ্চয়ে গ্লেসিও-ফ্লুভিয়াল (Glacio-fluvial) সমভূমির সৃষ্টি করে। আবার বাতাসের কার্য কোন কোন স্থানে গ্লেসিও লোয়েশ (Glacio-Loess) সমভূমি গঠন করে।

ভ্যালি ট্রেন (Valley Train) :

যখন হিমবাহের বরফগলা জলের মাধ্যমে হিমবাহ উপত্যকায় ধাপের আকারে কোন সঞ্চয় হয় তখন তাকে ভ্যালি ট্রেন বলে। তবে এর গঠন নির্ভর করে হিমবাহের বরফগলা জলের গতি প্রকৃতির উপর। নিম্নলিখিত দুটি পর্যায়ে ভ্যালি ট্রেন গঠিত হয়। (চিত্র নং 4.17)

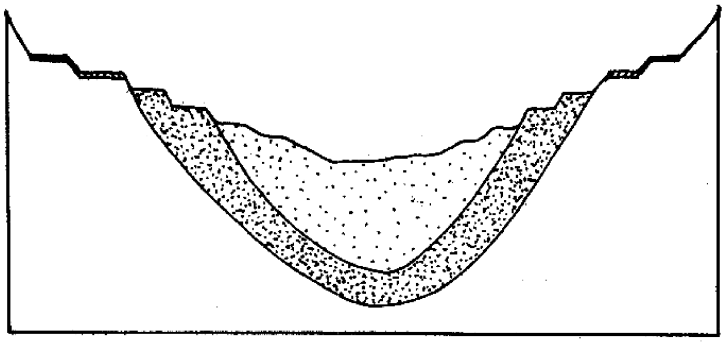

চিত্র নং 4.17 : ভ্যালী ট্রেন

(i) **প্রথম পর্যায়ে** — হিমবাহ উপত্যকায় বরফ গলা জল এক প্রকার সঞ্চিত স্তরের সৃষ্টি করে এবং আনুভূমিক ভাবে কয়েকটি স্তর গঠিত হয়।

(ii) **দ্বিতীয় পর্যায়** পুরাতন স্তরগুলির উপর যখন পুনরায় বরফগলা জল নদীর আকারে প্রবাহিত হয় ও পুরাতন স্তরটিকে যে কর্তিত করে, তখন ধাপের সৃষ্টি হয়। এইভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বারবার ঘটলে সমগ্র হিমবাহ উপত্যকায় বেশ কয়েকটি ধাপ গড়ে ওঠে। এদের সম্মিলিতভাবে ভ্যালি ট্রেন বলে।

এখানে অবশ্যই একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে, আমরা দেখেছি যে কেম মঞ্চ এক প্রকার ধাপ তৈরী করে। আবার ভ্যালি ট্রেনও ধাপ গঠন করে। পর্যবেক্ষণকালে এই দুই ভূমিরূপকে চিহ্নিত করতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নজর দেওয়া দরকার।

নীচের সারণীতে এদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখানো হল —

কেম মঞ্চ	ভ্যালি ট্রেন
(1) এটি হিমবাহের সংস্পর্শে গঠিত হয়। (2) সঞ্চিত স্তরগুলি আনুভূমিকভাবে বিকৃত হয়, কারণ হিমবাহের গলন ও অপসারণের ফলে আনুভূমিক স্তরগুলির স্খলন হয়।	(1) এটি হিমবাহের সংস্পর্শে গঠিত হয় না। (2) সম্পূর্ণ বরফগলা জলের ফলে সৃষ্ট হয় বলে এবং বরফের সংস্পর্শে গঠিত হয় না বলে, স্তরগুলি আনুভূমিকভাবে সমান্তরাল হয়।

▲ কেট্‌ল গর্ত ও কেট্‌ল হ্রদ ঃ

অনেক সময় হিমবাহের সঞ্চয়জাত পদার্থের মধ্যে কিছু কিছু বরফখণ্ড বা বরফের অংশ বিশেষ অবস্থান করে। পরবর্তীকালে ক্রমাগত সঞ্চয়কার্যের ফলে নিম্নমুখী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং নীচের বরফ গলে যায়। এর ফলে উপরের সঞ্চিত স্তর নিচে বসে গিয়ে এক প্রকার গর্তের সৃষ্টি করে। এই ধরনের গর্তকে কেট্‌ল গর্ত (Kettle hole) বলে।

হিমবাহের পশ্চাৎ অপসরণের সময় যখন বরফগলা জল কেট্‌ল গর্তের মধ্যে সঞ্চিত বা আবদ্ধ হয়, তখন এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার হ্রদকে কেট্‌ল হ্রদ (Kettle Lake) বলে।

প্রেইরি মাউন্ড (Prairie Mound) : হিমবাহের সঞ্চয় কার্যের ফলে সঞ্চিত স্তরের উপর অনেক সময় হিমবাহের অংশ বিশেষ অবস্থান করে এবং তলদেশীয় গলনের (basal melting) ফলে সমগ্র স্তরটিতে এক প্রকার প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। একে প্রবাহমান টিল (flow till) বলে। যখন এই প্রকার প্রবহমান টিল তৈরী হয়, তখন অনেক সময় উপরের সঞ্চিত স্তর নীচে বসে যায় এবং ভূমিরূপের ঠিক উল্টানো অবস্থার সৃষ্টি করে (Glacial Inversion of Relief)। উদাহরণস্বরূপ নিম্ন সমভূমিতে যখন কোন হিমবাহ অবস্থান করে, তখন সেই হিমবাহের অবস্থান জনিত নিম্নমুখী চাপের সৃষ্টি হয় এবং নীচের স্তরে এক প্রকার নমনীয় বহির্মুখী প্রবাহ গড়ে উঠে, যার ফলে প্রান্তবর্তী অংশগুলিতে এক ধরনের ঢিবির সৃষ্টি হয়। একে প্রেইরি মাউন্ড (Prairie Mound) বলে। আবার হিমবাহের পশ্চাৎ অপসরণ বা গলনের ফলে নিম্নমুখী চাপ হ্রাস পায় এবং এর ফলে আগেকার ভূমিরূপের পুনঃস্থাপন ঘটে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে যদিও তলদেশীয় গলনের ফলে এই প্রকার ভূমিরূপ অর্থাৎ প্রেইরি মাউন্ডের সৃষ্টি হয়, তবুও বলা যেতে পারে যে এই প্রকার ভূমিরূপ পেরিগ্লেসিয়াল (Periglacial) পরিবেশে বেশি দেখা যায়।

▲ **বিভিন্ন প্রকার হিমবাহ হ্রদ ঃ** হিমবাহ অধ্যুষিত এলাকার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রকার হিমবাহের গঠন। বিগত প্লিসটোসিন যুগে হিমালয়, আল্পস, রকি প্রভৃতি উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কিছু হ্রদের সৃষ্টি হয়, যাদের সঙ্গে হিমবাহের অবস্থান এবং সক্রিয় কার্যকলাপের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে, ভারতের হিমালয় অঞ্চলে বেশ কিছু হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদ দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিমবাহের সঞ্চয় কার্য, হিমবাহের অবস্থান, ভূমিভাগের উপর বিভিন্ন সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের গঠন প্রভৃতি কারণে হিমবাহ হ্রদের (Glacial Lakes) সৃষ্টি হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকার হিমবাহ হ্রদের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা হল।

(a) পার্শ্ব হিমবাহ উপত্যকায় হিমবাহের অবস্থানের ফলে মূল হিমবাহ উপত্যকায় হ্রদের গঠন ;

(b) মূল হিমবাহ উপত্যকায় হিমবাহের অবস্থানের জন্য পার্শ্ব হিমবাহ উপত্যকায় হ্রদের গঠন ;

(c) বিভিন্ন প্রকার গ্রাবরেখা (moraine) বা ড্রামলিনের (drumlin) এর অবস্থানের ফলে মূল বা পার্শ্ব হিমবাহ উপত্যকায় বা নিম্ন সমভূমিতে নানা ধরনের হিমবাহ হ্রদের গঠন ;

(d) অনেক সময় হিমবাহের সম্মুখ প্রান্তে (frontal) সঞ্চিত পদার্থের মাধ্যমে একপ্রকার বাঁধের সৃষ্টির ফল হিমবাহ হ্রদের গঠন ; বা ফ্রন্টাল হ্রদ (Frontal Lake) এর উদ্ভব।

ভার্ভ (Varve) : হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদের গর্ভে সঞ্চিত পদার্থ এক প্রকার স্তরের সৃষ্টি করে। একে হিমবাহ ভার্ভ (Glacial varves) বলে। সাধারণতঃ এই প্রকার ভার্ভে দু'ধরনের স্তর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক ভাবে স্থূল পদার্থসমূহ হ্রদের গর্ভে সঞ্চিত হয়। এর উপরে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ভাসমান পদার্থ সমূহ কালক্রমে সঞ্চিত হয়। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দুটি স্তরকে একত্রে ভার্ভ নামে অভিহিত করা হয়।

হ্রদ অঞ্চলে ভার্ভ হিমবাহের গতিপ্রকৃতি এবং আবির্ভাবের সময় প্রভৃতি শনাক্ত করতে বিশেষ সাহায্য করে। যেমন কোন হ্রদে যদি দুটি বা তিনটি ভার্ভের স্তর দেখা যায়, তাহলে বলা যেতে পারে যে সেই অঞ্চল দু'বার বা তিনবার হিমবাহের আবির্ভাব হয়েছে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, বিগত প্লিসটোসিন যুগে হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদগুলিতে চারটি বা পাঁচটি উপ-হিমবাহ পর্যায়, চারটি বা পাঁচটি ভার্ভের স্তর গড়ে তুলেছে।

স্ট্র্যান্ড লাইন (Strand Lines) : হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল স্ট্র্যান্ড লাইন গঠন। উপকূলবর্তী অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন তরঙ্গ ভূগুদেশে আঘাত করে এবং ক্ষয়রেখার সৃষ্টি করে, অনুরূপভাবে হিমবাহ হ্রদ অঞ্চলেও তরঙ্গের প্রভাবে হ্রদের চারপাশের অবস্থিত প্রাচীরে ক্ষয় রেখা গড়ে তোলে। এদের স্ট্রান্ড লাইন বলে। এদের পর্যবেক্ষণ করেও আমরা হিমবাহের সম্ভাব্য আবির্ভাব ও পশ্চাৎ অপসারণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারি।

4.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. বিষয়ভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্ন (600 শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে)

(1) হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে যে সকল ভূমিরূপ গঠিত হয়, চিত্র সহযোগে সেগুলি বর্ণনা করুন।
(2) হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে যে সকল ভূমিরূপ গঠিত হয়, চিত্র সহযোগে সেগুলি বিশ্লেষণ করুন।
(3) নদী-হিমবাহের যৌথ প্রক্রিয়ার ফলে যে সকল ভূমিরূপ গঠিত হয়, চিত্র সহযোগে সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।
(4) স্তরীভূত ও অস্তরীভূত সঞ্চয়ের ফলে সে সকল ভূমিরূপের উদ্ভব হয়, তাদের বিশ্লেষণ করুন।
(5) হিমবাহসৃষ্ট ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে আইস ইরোসনিস্ট স্কুল, আইস-প্রোটেকসনিস্ট স্কুল এবং আইস কমপ্রোমাইজিং স্কুলের মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (100টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে)। প্রতিটি প্রশ্নের মান—4 (চার)

1. হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে যে সকল ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
2. পার্বত্য হিমবাহ অঞ্চলে যে ক্ষয় প্রক্রিয়া কাজ করে সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।
3. বিগত প্লিসটোসিন অধিযুগের যে যে উপযুগ দেখা যায়, হিমবাহের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
4. বিভিন্ন প্রকার হিমবাহ প্রবাহের শ্রেণীবিভাগ করে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
5. কিভাবে হিমবাহের কার্যের ফলে বৈপরীত্য ভূমিরূপের উদ্ভব হয়, তার ব্যাখ্যা করুন।
6. কিভাবে হিমবাহের কার্যের ফলে নদীখাতের পরিবর্তন হয়, ব্যাখ্যা করুন।
7. হিমবাজেটের সাপেক্ষে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বাজেট সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করুন।
8. সির্ক বা করি উদ্ভবের তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করুন।
9. নদী উপত্যকা ও হিমবাহ উপত্যকার মধ্যে আকৃতিগত ও প্রক্রিয়াগত পার্থক্য উল্লেখ করুন।
10. হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ফিয়র্ডের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।
11. বরফের সংস্পর্শে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, তাদের বিশ্লেষণ করুন।
12. হিমবাহসৃষ্ট হ্রদ অঞ্চলের ভূমিরূপগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
13. স্তরীভূত ও অস্তরীভূত সঞ্চয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখান।
14. কিভাবে হিমবাহ-ভার্ভ গঠিত হয়, ব্যাখ্যা করুন।
15. স্ট্র্যান্ড লাইন কিভাবে সৃষ্টি হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন ও হিমবাহের আগমন শনাক্তকরণে তাদের ভূমিকা উল্লেখ করুন।
16. চিত্র সহযোগে বিভিন্ন প্রকার গ্রাবরেখা ব্যাখ্যা করুন।
17. কেম মঞ্চ ও ভ্যালি ট্রেন-এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়।
18. এস্কার ও কেম এর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?
19. ভূমিগ্রাবরেখা ও তলদেশীয় গ্রাবরেখার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?
20. আঁচড় কাটা দাগ ও ঘর্ষণজাত ফাটলের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

C. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (50 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে) প্রতিটি প্রশ্নের মান—2

(1) হিমবাহ কাকে বলে ?
(2) হিমবাহের শ্রেণীবিভাগ করুন।

(3) হিমবাহ কিভাবে সৃষ্টি হয় ?
(4) হিমবাহের প্রক্রিয়াগুলি কি কি ?
(5) রসে মুতানে কাকে বলে ?
(6) উৎপাটন প্রক্রিয়া কাকে বলে ?
(7) ফিয়র্ড কাকে বলে ?
(8) ক্র্যাগ ও টেল কাকে বলে ?
(9) কেট্‌ল হ্রদ কিভাবে সৃষ্টি হয় ?
(10) রোজেন গ্রাবরেখা কাকে বলে ?

F. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(1) হিমবাহ গঠনের মধ্যবর্তী পর্যায়কে ——— বলে।
(2) পৃথিবীতে শেষ তুষার যুগের নাম———।
(3) রসে মুতানে অনুবাত ঢালে ————— প্রক্রিয়া দেখা যায়।
(4) হিমবাহের সঞ্চয় ও গলনের প্রক্রিয়াকে ——— বলে।
(5) আরামকেদারা আকৃতি বিশিষ্ট ভূমিরূপকে ——— বলে।
(6) ————— ভূমিরূপটি উল্টানো নৌকোর মত।
(7) নিম্ন সমভূমিতে নিমজ্জিত হিমবাহ উপত্যকাকে ——— বলে।

E. সত্য কিংবা মিথ্যা যাচাই করুন

(1) হিমবাহ উপত্যকা 'V' আকৃতির হয়। (সত্য / মিথ্যা)
(2) কর্তিত স্পার হিমবাহ উপত্যকায় দেখা যায়। (সত্য / মিথ্যা)
(3) উৎপাটন প্রক্রিয়ার ফলে আঁচড় কাটা দাগের সৃষ্টি হয়। (সত্য / মিথ্যা)
(4) ঝুলন্ত উপত্যকা হিমবাহের সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত হয়। (সত্য / মিথ্যা)
(5) করির মস্তক প্রাচীরে বার্গস্ত্রুন্ড দেখা যায়। (সত্য / মিথ্যা)
(6) গ্রাবরেখা একটি স্তরীভূত সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ। (সত্য / মিথ্যা)
(7) সিরেট রিজ (সিরেট শিরা) করির একটি বিকল্প নাম। (সত্য / মিথ্যা)

4.10 উত্তরমালা

(ক) বিষয়ভিত্তিক রচানধর্মী প্রশ্ন ঃ

(1) 04.7.1 ও 04.8 দ্রষ্টব্য।
(2) 04.9 দ্রষ্টব্য।
(3) ঝুলন্ত উপত্যকা, কর্তিত স্পার, নদী উপত্যকার রূপান্তর, কেম মঞ্চ, ভ্যালি ট্রেন, আউট ওয়াশ প্লেন দ্রষ্টব্য।
(4) 04.9.1 ও 04.9.2 দ্রষ্টব্য।
(5) 04.8 দ্রষ্টব্য।

(খ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(1) 04.7.1 দ্রষ্টব্য।

(2) 04.6 দ্রষ্টব্য।

(3) 04.7.1 এর 3 নং ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

(4) 04.3 দ্রষ্টব্য।

(5) 04.9.2 এর মধ্যে প্রেইরি মাউন্ড দ্রষ্টব্য।

(6) 04.8 এর মধ্যে হিমদ্রোনী দ্রষ্টব্য।

(7) 04.5 এর মধ্যে হিমবাজেট দ্রষ্টব্য।

(8) 04.8 এর মধ্যে সার্ক বা করি অংশ দ্রষ্টব্য।

(9) 04.8 এর মধ্যে হিমদ্রোণী দ্রষ্টব্য।

(10) 04.8 এর মধ্যে ফিয়র্ড অংশ দ্রষ্টব্য।

(11) 04.9 এর মধ্যে বরফের সংস্পর্শে সৃষ্ট ভূমিরূপ দ্রষ্টব্য।

(12) 04.9.2 এর মধ্যে হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদ দ্রষ্টব্য।

একক 5 ❐ বায়ুর কার্য (Work of Wind)

গঠন

5.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
ভূমিকা
5.2 পৃথিবীর শুষ্ক অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ—
5.3 বায়ুর কার্য ও ভূমিরূপ
বায়ুর ক্ষয়কার্য
বায়ুর ক্ষয়প্রক্রিয়া
বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
5.4 বায়ুর সঞ্চয়কার্য
5.4.1 বায়ুর সঞ্চয় প্রক্রিয়া
5.4.2 বায়ুর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের বিশ্লেষণ
5.5 মরু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার সমতল ভূমিরূপ
5.6 মরু অঞ্চলে ক্ষয়চক্র ও ভূমিরূপের উদ্ভব
5.7 সারাংশ
5.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
5.9 উত্তরমালা
5.10 গ্রন্থপঞ্জী

5.1 প্রস্তাবনা ঃ

আগের এককে আপনি ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া এবং উদ্ভুত ভূমিরূপের আলোচনায় হিমবাহের কার্য ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। এই এককে আমরা বায়ুর কার্য, প্রক্রিয়া উদ্ভুত ভূমিরূপ সম্বন্ধে জানবো। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ভূপৃষ্ঠের এক তৃতীয়াংশ স্থান 'শুষ্ক' (dry or arid) অঞ্চলরূপে পরিগণিত হয় এবং এই সকল অঞ্চল পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় 500 বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণতঃ জয়বায়ু ও ভূপ্রাকৃতিক কারণের জন্য এই সকল শুষ্ক এবং 'প্রায়-শুষ্ক' (semi-arid) অঞ্চলে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান এককে পৃথিবীর শুষ্ক ও প্রায় শুষ্ক অঞ্চলগুলি ভৌগলিক পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করার পর সেই সকল অঞ্চলে ভূমিরূপের স্বাতন্ত্র, ভূমিরূপগঠনকারী প্রক্রিয়ার কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ উদ্ভবের পর্য্যায় আলোচিত হবে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- 'শুষ্ক' ও 'প্রায় শুষ্ক' অঞ্চল বলতে কি বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- শুষ্ক ও প্রায় শুষ্ক অঞ্চলগুলি এবং মরুভূমিগুলিকে ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করতে পারবেন।

- বায়ুর কার্যের ফলে যে সকল ভূমিরূপগঠনকারী প্রক্রিয়া মরু অঞ্চলে কাজ করে তাদের সম্বন্ধে অবহতি হতে পারবেন।
- মরু অঞ্চলে বায়ুর কার্য ছাড়া আর কোন কোন প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রক্রিয়া কাজ করে, তাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।
- শুষ্ক ও আদ্র অঞ্চলে ভূমিরূপ উদ্ভবের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর $\frac{1}{3}$ অংশ জায়গা শুষ্ক বা মরু অঞ্চল রূপে চিহ্নিত। এই সকল মরু অঞ্চলে বায়ুর কার্যের ফলে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম (প্রায় 50 সেঃমি বা তার কম), সেই সকল অঞ্চলে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখানে বায়ুর কার্য প্রধান ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি হিসাবে কাজ করে।

মরু অঞ্চল বা শুষ্ক অঞ্চলের ভূমিরূপের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য (Geomorphic individuality and characteristics of arid regions)

1. ভূমিরূপগঠনকারী শক্তি ও প্রক্রিয়া ঃ মরু অঞ্চলে বাতাসের কার্যই প্রধান এবং বাতাসের বিভিন্ন প্রকার ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

2. আবহবিকারের প্রকৃতি ঃ মরু অঞ্চলে যান্ত্রিক আবহবিকার (Mechanical Weathering) বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আমরা জানি যে শুষ্ক বা মরু অঞ্চলে দিন ও রাতের তাপের তারতম্য অনেক বেশী হয়। দিনের বেলা প্রখর সূর্যকিরণে শিলাস্তর অধিক উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয় ; পক্ষান্তরে, রাতের বেলা দ্রুত তাপবিকিরণের ফলে ভূপৃষ্ঠ অধিক শীতল হয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বরফাঙ্কের (freezing point) নীচে নেমে যায়। এর ফলে শিলাস্তর শীতল ও সঙ্কুচিত হয়। এইভাবে প্রতিনিয়ত প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে শিলাস্তরে টান ও পীড়নের (Stress and strain) সৃষ্টি হয় এবং শিলাস্তর যান্ত্রিকভাবে বিচূর্ণীভূত (Mechanical disintegration) হয়।

এই সকল বিচূর্ণীভূত শিলাখন্ড ও শিলাকণাসমূহ বাতাসের কার্যের ফলে একস্থান থেকে ক্ষয় ও অপসারিত হয়ে অন্যস্থানে সঞ্চিত হয় ও বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

3. জলবায়ুর প্রকৃতি ঃ মরু অঞ্চলে প্রখর সূর্যকিরণের ফলে বাষ্পীভবন (evaporation) ও বাষ্পীয় প্রস্বোদন (evapo-transpiration) উভয়ই খুব বেশী হয়। এর ফলে ভূমিভাগ, প্লায়া, হ্রদ, বিভিন্ন মরুউদ্ভিদ, ও মৃত্তিকার স্তর থেকে জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। এই কারণে মরু অঞ্চলে জলের পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পায় ও মৃত্তিকা ও হ্রদ, প্লায়া বা অন্যান্য জলাশয়ে লবণের কেলাসন প্রক্রিয়া (Formation of Salt Crystals) পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। শুধু তাই নয়, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও (unreliability of rainfall) খুব বেশী ; তবে এই বৃষ্টিপাত যখন হয়, তখন তা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রবল আকারে ঘটে। এরফলে মরু অঞ্চলে হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে একপ্রকার প্লাবন হয়। একে 'স্প্যাসমোডিক' প্লাবন (Spasmodic flood) বলে।

4. অন্তর্বাহিনী নদী (Endoveic streams) ঃ মরু অঞ্চলে অধিকাংশ নদী অন্তর্বাহিনী হয়,অর্থাৎ নদীগুলি সাগরে না পড়ে অভ্যন্তরে মধ্যবর্তী বা অন্তবর্তী জলাশয়ে প্লায়াতে পতিত হয়। ভারতের লুনি একটি অন্তর্বাহিনী নদী।

5. ক্ষয় করার স্থানীয় শেষ সীমা (Local base level of erosion) ঃ মরু বা শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে যেহেতু

অধিকাংশ নদী আভ্যন্তরীন জলাশয়ে পতিত হয়, সেই কারণে সেই সব জলাশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষয় করার শেষ সীমা স্থানীয় ভাবে নির্ধারিত হয়। একে ক্ষয় করার স্থানীয় শেষ সীমা বলে।

6. নদীর প্রকৃতি ঃ মরু অঞ্চলে যান্ত্রিক আবহবিকার অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে যে কোন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পরিবাহিত ক্ষয়জাত পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। এই কারণে মরু অঞ্চলে নদীগুলির বোঝার পরিমান (amount of load) অনেক বেশী হয়। শুধু তাই নয়, নদীর জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয় বা বালির স্তর ভেদ করে দ্রুত মৃত্তিকাস্তরে ও ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করে। এই কারণে মরু অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলের ধারা (Surface run off) বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং নদীগুলি জলের পরিমান কমে যাওয়ায় ও বোঝার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় খুব মন্থর বা শ্লথ গতিতে প্রবাহিত হয়।

7. বায়ুর কার্যের প্রাধান্য ঃ মরু অঞ্চলে প্রাকৃতিক শক্তি হিসাবে বায়ুর কার্য বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। ভূমিরূপ গঠনের ক্ষেত্রে বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় উভয় প্রক্রিয়া সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

5.2 পৃথিবীর শুষ্ক অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ (Classification of different dry regions of the earth)

পৃথিবীর শুষ্ক বা মরু অঞ্চলগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ (ক) মধ্য অক্ষাংশের শুষ্ক অঞ্চল বা শীতল মরু অঞ্চল এবং (খ) নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণ মরু অঞ্চল (চিত্র 5.1)

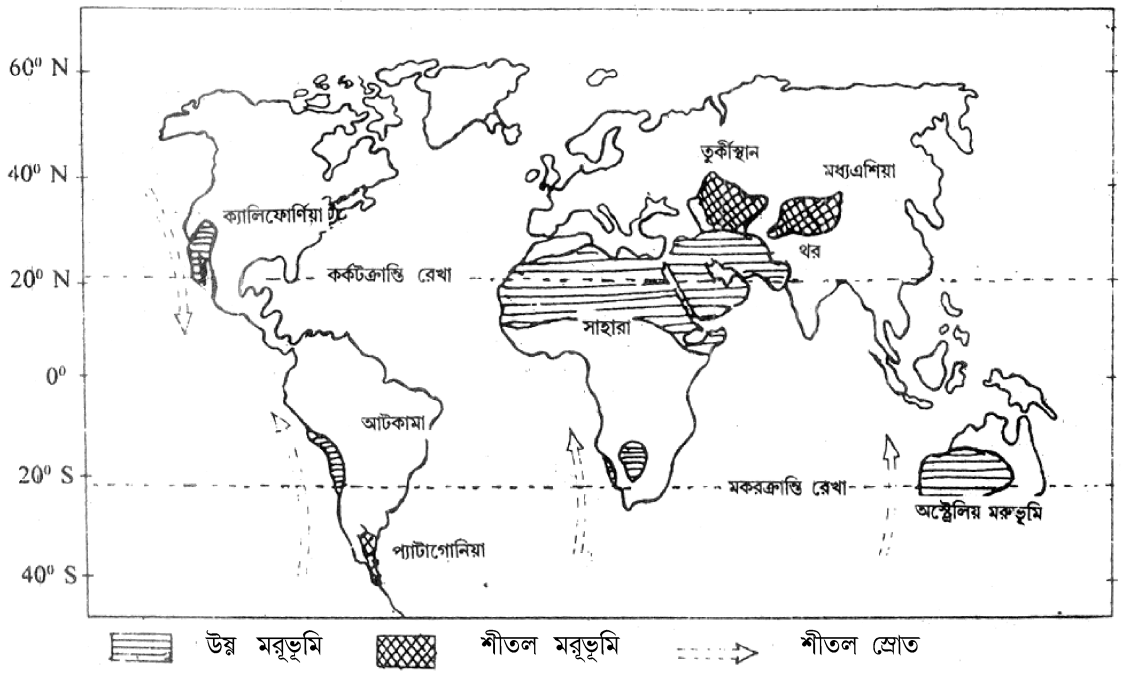

চিত্র 5.1

টীকা ঃ যান্ত্রিক বিচুর্ণীভবনের মধ্যে প্রস্তর-চাঁই এর বিচ্ছিন্নকরণ (Block disintegration), ক্ষুদ্রকণা বিশরণ (Granular distintegration), ডার্ট-ক্র্যাকিং (Dirt cracking), বোল্ডার ক্লাভিং (Boulder cleaving) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

a) মধ্য অক্ষাংশের শুষ্ক মরু অঞ্চল (Mid-latitude Dry Deserts)

পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মরুভূমিগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই মরুভূমিগুলি মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু চরমভাবাপন্ন ও আর্দ্র বায়ু এই সকল অঞ্চলে প্রবাহিত হতে পারেনা, এশিয়া মহাদেশের গোবি, তুর্কিস্তানের মরুভূমি উত্তর আমেরিকার গ্রেট হেবসিন, দঃ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার মরুভূমি, কাশ্মীরের লাডাক ও হিমাচলপ্রদেশের লাহুল-স্পিটি অঞ্চলের মরুভূমি শীতল নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমির অন্তর্গত।

b) নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণ মরু অঞ্চল (Low-latitude Deserts)

ক্রান্তীয় আয়নবাবু বলয় অঞ্চলে মহাদেশগুলির পশ্চিম ভাগে উষ্ণ মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র থেকে আগত বাতাস যখন এই সকল অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন বাতাসে জলীয় বাস্প থাকেনা। এর ফলে উপরিউক্ত অঞ্চলে উগ্র মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। আফ্রিকার সাহারা, কালাহরি, নামিব মরুভূমি, এশিয়ার আরব বা জাগ্রেস, বারাকুম, লুৎ, সিনাই মরু অঞ্চল, উঃ আমেরিকার সোনোরুণ মরুভূমি, দঃ আমেরিকার আটকামা মরুভূমি উষ্ণ নিম্ন অক্ষাংশের মরুভূমির অন্তর্গত।

উপরিউক্ত উষ্ণ ও শীতল মরুভূমিগুলির নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

- দিন ও রাতের অর্থাৎ দৈনিক উষ্ণতার তারতম্য অধিক।
- যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রাধান্য
- স্বল্প বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও আকস্মিক প্রকৃতির।
- ঋণাত্মক জল বাজেট অর্থাৎ বাস্পীভবন অধোক্ষেপণ অপেক্ষা বেশী।
- স্বাভাবিক উদ্ভিদের অপ্রতুলতা
- বায়ু পরিবাহিত পদার্থের উপস্থিতি
- শীতল সমুদ্রস্রোতের প্রভাব

5.3 বায়ুর কার্য ও ভূমিরূপ (Work of Wind and Landform)

বায়ু ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয় এই তিন প্রকার কাজ করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে বায়ুর ক্ষয়কার্য উল্লেখ করা হল।

বায়ুর ক্ষয়কার্য ঃ— বায়ু তিনটি প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কার্য করে থাকে ঃ

a) অবঘর্ষ (Abrasion) : মরু অঞ্চলে শিলাখন্ড, মৃত্তিকা প্রভৃতি আল্গা বা শিথিল থাকে বলে বাতাসের আঘাতে সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রধানত বাতাসের সংঘর্ষে ও আঘাতের ফলে এই প্রকার ক্ষয়কার্য হয় বলে এই প্রক্রিয়াকে অবঘর্ষ বলে। এই অবঘর্ষের ফলে শিলস্তরে আঁচড় কাটার দাগ, গভীর ক্ষতের দাগ বা বিভিন্ন প্রকার ছিদ্রপথের সৃষ্টি হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে বায়ুর গতিবেগের উপর অবঘর্ষ নির্ভর করে। তবে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তরেই অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে 2 মিটারের কম উচ্চতা পর্যন্ত অংশে অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় কাজ করে। অবঘর্ষের ফলে একদিকে যেমন শিলাখন্ড ও শিলাস্তর মসৃণ ও উজ্জ্বল (polished) হয়, অন্যদিকে শিলাস্তর পলকাটা (faceted) হয় এবং শিলাখন্ডে বিভিন্ন ধার বা প্রান্তের (edges) সৃষ্টি হয়।

b) ঘর্ষণ (Attrition) : মরু অঞ্চলে বায়ু প্রবাহের ফলে বিচূর্ণভূত শিলাখন্ড বা অন্যান্য প্রস্তর খন্ড যখন অপসারিত ও স্থানান্তরিত হয়, তখন ঐ সকল পদার্থগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ হয় এবং এর ফলে একপ্রকার

ক্ষয়প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। একে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় বলে। এই প্রক্রিয়ার স্থূল পদার্থকণা এবং বৃহৎ শিলাখন্ড ও বিচুর্ণীভূত শিলার অংশবিশেষ কালক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম কণায় পরিণত হয় এবং মরু অঞ্চলে বিস্তীর্ণ বালুকা সমভূমি ও লোয়েস সমভূমিরও সৃষ্টি করে। বলা যেতে পারে, এই ঘর্ষণ প্রক্রিয়া মরু অঞ্চলে ক্ষয়প্রক্রিয়াকে চুড়ান্ত পর্যায়ে নিতে যেতে সাহায্য করে।

এছাড়া শিলাখন্ডগুলি পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে ক্রমশঃ মসৃণ ও উজ্জ্বল হয় ও অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার মত এই প্রক্রিয়াতেও শিলাখন্ডগুলি পলকাটা ও বহুধার বিশিষ্ট হয়।

c) অপসরণ (Deflation) : যখন অধিক গতিবেগসম্পন্ন বাতাস মরু অঞ্চলে সঞ্চিত বালিকণা ও ক্ষুদ্রকণাসমূহকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং সেখানে সঞ্চিত করে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে অপসরণ বলে। বলা যেতে পারে, এই ক্ষয়প্রক্রিয়া শুষ্ক অঞ্চলের অন্যতম ক্ষয়প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এই প্রক্রিয়ায় কোন এক স্থান নীচু হয় এবং ছোট বড় নানা প্রকার গর্ত ও অবনমিত অংশের সৃষ্টি করে। এদের 'ব্লো-আউট' (Blow out) বলে। রাজস্থানে, এই প্রকার গর্তগুলি 'ধান্ধ' (Dhand) নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য মরু অঞ্চলেও এই প্রকার গর্তের সৃষ্টি হয়। এইভাবেই নীলনদ অঞ্চলে পৃথিবীর বৃহত্তম অপসারণ গর্ত বাতারা 'ব্লো-আউটের' সৃষ্টি হয়েছে। এই অপসারণ প্রক্রিয়াটি ক্ষয় ও সঞ্চয় প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে অপসরণ প্রক্রিয়ার ফলে পর্বত গাত্রে বিভিন্ন প্রকার গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ (Erosional acolian landform)

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুর বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়জাত ভূমিরূপের উদ্ভব হয়। তবে যে সকল কারণ ভূমিরূপ গঠন ও উদ্ভবকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের মধ্যে (a) বাতাসের দিক ও গতিবেগ ; (b) শিলাস্তরের গঠনপ্রকৃতি ; (c) ভূমির ঢাল ; (d) বিভিন্ন প্রকার বাধার (obstruction) অবস্থান (e) মরু অঞ্চলগুলির অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ; (f) আবহবিকারের প্রকৃতি (g) মরুভূমির আগ্রাসন (encroachment of deserts) (h) যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রাধান্য ; (i) পরিবেশের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ ; (j) মরু অঞ্চলের জলধারার কার্য উল্লেখযোগ্য।

নিম্নলিখিত চার্টের মাধ্যমে ক্ষয়জাত ভূমিরূপগুলির বিশ্লেষণ করা হল।

ভূমিরূপ	প্রধান প্রক্রিয়া	শুষ্ক পরিবেশে বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ বৈশিষ্ট্য
ইয়ার্দং (Yardang) ইয়ার্দং চিত্র 5.2	বাতাসের অবঘর্ষ প্রক্রিয়া	উঁচু ও খাঁড়া অসমান পাঁজরার মত এবং তাদের মধ্যবর্তী বিভিন্ন প্রকার গর্ত বিশিষ্ট যে ভূমিরূপ বাতাসের ক্ষয় প্রক্রিয়া, বিশেষত অবঘর্ষের মাধ্যমে তৈরী হয়, তাদের ইয়র্দং বলে। এই প্রকার ভূমিরূপ উচ্চতায় 8 মিটার পর্যন্ত হয় এবং চওড়ায় 8-40 কিমি পর্যন্ত দেখা যায়। সাধারণত কঠিন ও কোমল শিলার পাশাপাশি অবস্থান ও বাতাসের বৈষম্যমূলক ক্ষয় কার্যের ফলে ইয়ার্দং এর সৃষ্টি হয়। কোমল শিলার জায়গায় গর্ত ও কঠিন শিলার জায়গায় অসমান অমসৃণ উঁচুনীচু শৈলশিরা

ভূমিরূপ	প্রধান প্রক্রিয়া	শুষ্ক পরিবেশে বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ বৈশিষ্ট্য
		বিশিষ্ট ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। অনেকসময় শিলাস্তরে দারণ (Joint) বা ফাটল (crack) থাকলেও এই প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। তবে কোন কোন ভূমিরূপবিশারদ যেমন ম্যাক্কলে (Mc Cauley) মনে করেন যে ইয়ার্দং গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষত ইয়ার্দং এর মধ্যবর্তী গর্ত বা অবনমিত অংশ তৈরীর ক্ষেত্রে বায়ুর অপসারণ প্রক্রিয়া ও কাজ করে। ম্যাক্কলে আরো উল্লেখ করেন যে অতি শুষ্ক পরিবেশ, একই দিক থেকে প্রবাহিত শক্তিশালী বাতাস, বালুকণার অপ্রতুলতা এবং গাছপালা বা মরু উদ্ভিদের অনুপস্থিতি ও শিলাস্তরের উন্মুক্ত অবস্থা প্রভৃতি ইয়ার্দং গঠনে বিশেষ সহায়তা করে।
	জাইগেন (Zeugen) অবঘর্ষ প্রক্রিয়া	পৃথিবীর বিভিন্ন মরু অঞ্চলে ইয়ার্দং সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইয়ানের লুৎ, দঃ পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'মোজাভ', লিবিয়ার মরুভূমি, পেরুর ইকা উপত্যকা, তিবেস্থি মালভুমি, চাদ হ্রদ অঞ্চল এবং তাক্লামাকান্ মরুভূমি। এদের মধ্যে তিবেস্তির ইয়ার্দংগুলি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। ব্যাঙের ছাতা আকৃতি বিশিষ্ট উপরের দিকে চওড়া ও চ্যাপ্টা বা টেবিলের মত সমতল অংশ এবং নীচের দিকে সরু হয়ে যে ভূমিরূপ বাতাসের অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়,তাকে জুইগেন (Zeugen) বলে। সাধারণত কঠিন ও কোমল শিলা উল্লম্ব ভাবে অবস্থান করলে নীচের কোমল শিলা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তুলনায় উপরের কঠিন শিলা কম ক্ষয় হয় ও নরম শিলার উপর একপ্রকার সমতল কঠিন শিলার আস্তরণ তৈরী করে। যদিও অবঘর্ষ প্রক্রিয়া জুইগেন গঠনের অন্যতম কারণ, তবুও কোন কোন ভূমিরূপবিশারদগণ মনে করেন যে শিলাস্তরে ফাটলের মধ্যে লবণের কেলাসন প্রক্রিয়া জুইগেন গঠনে সহায়তা করে।

চিত্র 5.3 যুইগেন

ভূমিরূপ	প্রধান প্রক্রিয়া	শুষ্ক পরিবেশে বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ বৈশিষ্ট্য
	গাউর বা "রক্ পেডেস্টাল' বা মাশরুম রক (Mushroom Rock) অবঘর্ষ প্রক্রিয়া	জুইগেনের একপ্রকার বিশেষ আকৃতিক 'গাউর' (Gaur) বলে। এর আকৃতি অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো এবং উল্লম্বভাবে কঠিন ও কোমলশিলা অবস্থান করলে বায়ুর অবঘর্ষ নীচের কোমলস্তরকে দ্রুত ক্ষয় করে এবং অনেক সময় সরু হয়ে যায়। পক্ষান্তর উপরের কঠিন শিলাস্তর দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়ায় চওড়া ও চেপ্টা হয়ে অবস্থান করে। একে গাউর বা 'রক্ পেডেস্টাল' বা মাশরুম রক্ বলে। ব্যাগনল্ড (Bagnold) উল্লেখ করেন যে ভূমি থেকে এক মিটার ঊর্ধ্বে বাতাসের মধ্যে বালুকণা এবং অন্যান্য পরিবাহিত পদার্থ কম থাকে বলে অবঘর্ষের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার ভূপৃষ্ঠের বরাবর বায়ুর বেগ ভূমি কর্ষণ দ্বারা প্রতিহত হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ এবং একমিটারের মধ্যবর্তী স্থানে বালির পরিমাণ এবং বায়ুর গতিবেগ উভয়ই বেশি থাকায় অবঘর্ষজনিত ক্ষয় অনেক বেশি হয়। এই কারণে তিনি মনে করেন যে, উপরিউক্ত মধ্যবর্তীস্থানে অবঘর্ষজনিত বায়ুর ক্ষয় প্রক্রিয়াই গাউর (Gaur) গঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।
ড্রেইকান্টার (Dreikanter)	অবঘর্ষ ও ঘর্ষণ জনিত ক্ষয়	বায়ুর অবঘর্ষ ও ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় প্রক্রিয়ার ফলে শিলাখন্ডে বিভিন্ন প্রকার পলকাটা ধার ও খাঁজের সৃষ্টি হয়, এদের ড্রেইকান্টার বা ডেন্টিফ্যাক্ট বলে। সাধারণত এই প্রকার ভূমিরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি হয় এবং একাধিক তল বিশিষ্ট প্রস্তরখন্ডের সৃষ্টি হয় এবং এক একটি তল পরবর্তীকালের থেকে তীক্ষ্ণ খাঁজ দ্বারা পৃথক হয়। কোন কোন ভূমিরূপবিশারদ বিভিন্ন পলকাটা ধার ও তলের সংখ্যা দ্বারা এই প্রকার ভূমিরূপের শ্রেণীবিভাগ করেন যেমন শিলাখন্ডে তিনটি তল বা ধারের সৃষ্টি হলে, তাকে ড্রেইকান্টার এবং দুইটি তল বা ধারের সৃষ্টি হলে জুইকান্টার (Zweikanter) বলে।

ভূমিরূপ	প্রধান প্রক্রিয়া	শুষ্ক পরিবেশে বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ বৈশিষ্ট্য
ব্লো-আউট (Blow-out) বা অপসারণ গর্ত (Deflation- hollow)	অপসারণ	মরু অঞ্চলে অপসারণ প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন আকৃতিক গর্ত ও অবনমিত অংশের সৃষ্টি হয়, এদের এককথায় ব্লো-আউট বা অপসারণ গর্ত্ত বলে। সাধারণত অপসরণ প্রক্রিয়ার ফলে কোন অঞ্চলের বালুকণা উত্থিত ও সঞ্চালিত হলে, সেই স্থানে একপ্রকার গর্ত বা অবনমিত অংশের সৃষ্টি হয়। নীলনদের পশ্চিম অংশে, সাহারা, কালাহারি এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিকে এইপ্রকার গর্তের সৃষ্টি হয়। বলসন (Bolson) এইরূপ একপ্রকার গর্ত। অনেক সময় মরু অঞ্চলে এইপ্রকার অপসরণ গর্ত সৃষ্টি হলে, সেই স্থানে পরবর্তীকালে ক্ষুদ্রাকৃতি হ্রদেরও সৃষ্টি হতে পারে। মরু অঞ্চলে সাধারণতঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় করার শেষ সীমা উপরে উঠতে থাকে। তবে অপসারণ প্রক্রিয়ার স্থানীয়ভাবে যখন অপসারণ গর্তের সৃষ্টি হয়, তখন স্থানীয় ক্ষয় করার শেষ সীমা নীচের দিকে নেমে যায়। অর্থাৎ ক্ষয় করার শেষ সীমায় একপ্রকার ঋণাত্মক (negative) পরিবর্তন ঘটে (Negative change in the local base-level of erosion)।
উইন্ড কেভ বা বায়ু গহ্বর (Wind cave)	অবঘর্ষ ও অপসারণ প্রক্রিয়া	মরু অঞ্চলে শিলাস্তরে অবঘর্ষ ও অবসারণ প্রক্রিয়া যৌথভাবে কাজ করলে একপ্রকার গহ্বর বা গুহার সৃষ্টি হয়। একে উইন্ড কেভ বা বায়ু গহ্বর বলে। সাধারণত দুটি পর্যায়ে এই প্রকার ভূমিরূপ গঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে অবঘর্ষ প্রক্রিয়া শিলাস্তরে বিভিন্ন ফাটল বা উন্মুক্ত স্থানগুলিকে ক্ষয় করে এবং বিভিন্ন পরিবাহিত পদার্থ ঐ উন্মুক্ত বা ফাটল অঞ্চলে সঞ্চিত করে। পরবর্তী পর্যায়ে বায়ুর অপসারণ প্রক্রিয়া ফাটল অঞ্চল থেকে সঞ্চিত পদার্থগুলিকে অপসারিত করলে এই প্রকার গহ্বরের সৃষ্টি হয়। আকৃতির তারতম্যে বায়ুগহ্বরগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিতি হয়। যেমন ক্ষুদ্রাকৃতি খাঁজগুলিকে 'এ্যালকোভ্' এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ খাঁজগুলিকে নিশ

ভূমিরূপ	প্রধান প্রক্রিয়া	শুষ্ক পরিবেশে বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ বৈশিষ্ট্য
		(Alcoves & Niches) বলে। অনেক সময় গর্তগুলি মৌচাকের মত গর্তবিশিষ্ট হয় তখন তাদের মৌচাক গর্ত (Honey combed cave) বলে। কোন কোন ভূমিরূপ বিশারদ অবশ্য মনে করেন যে এ্যালকোভ্, নিশ, মৌচাক গর্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবঘর্ষ ও অবসরণ প্রক্রিয়া ছাড়াও বৈষম্যমূলক আবহবিকার এবং দ্রবণ প্রক্রিয়া সাহায্য করে।
মরু ব্যাডল্যান্ড ভূ-প্রকৃতি (Arid Badland Topography)	অবঘর্ষ ও অপসারণ প্রক্রিয়া এবং কীট্-প্লাবন প্রক্রিয়া	বায়ুর গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে অবঘর্ষ ও অপসারণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় ও বিভিন্ন শিলাস্তরের উপর ক্ষয় প্রক্রিয়া বিভিন্ন আকৃতির অবয়বের সৃষ্টি করে এবং সমগ্র অঞ্চলটিকে একপ্রকার উঁচু নীচু বন্ধুর ভূ-প্রকৃতিতে পরিণত করে। এদের এককথায় ব্যাডল্যান্ড ভূপ্রকৃতি বলে। এদের মধ্যে গ্যালী ও রিল জাতীয় ভূপ্রকৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাডল্যান্ড ভূ-প্রকৃতি গঠনের ক্ষেত্রে ম্যাকগী (Mc Gee) মনে করেন যে মরু অঞ্চলের হঠাৎ বৃষ্টির (Spasmodic Rain) ফলে একপ্রকার প্লাবনের সৃষ্টি হয়, থাকে সীভ্প্লাবন বলে। এর ফলে বন্ধুর ভূপ্রকৃতি আরও সুস্পষ্ট হয় ও রিল ও গ্যালিগুলি চওড়া হয়।
'ল্যাগ্ডিপোসিট' বা অবশিষ্ট সঞ্চয় বা পশ্চাৎ সঞ্চয় (Lag Deposit)	অপসারণ প্রক্রিয়া	অপসারণ প্রক্রিয়ার ফলে একস্থান থেকে যখন বালুকণা ও অন্যান্য সঞ্চিত পদার্থ উত্তোলিত ও সঞ্চলিত হয়, তখন কিছু শিলার অংশবিশেষ অবশিষ্ট ভূমিরূপে পিছনে পড়ে থেকে, এদের এককথায় ল্যাপডিপোসিট বা মরু-পেভমেন্ট বলে। বিভিন্ন প্রকার মরু পেভমেন্ট দেখা যায়। যখন সঞ্চয়ের মধ্যে বৃহৎ প্রস্তরখন্ড থাকে, তখন তাকে হামাদা বলে। এই প্রকার হামাদা সাহারা মরুভূমিতে দেখা যায়। যখন অবশিষ্ট সঞ্চয়ে নুড়ি জাতীয় পদার্থ বেশি পরিমাণে থাকে, তখন তাকে সেরির বলে। এই প্রকার ভূমিরূপ লিবিয়াতে দেখা যায়। আবার, ল্যাপডিপোসিট যখন বালুভূমির হয়, অর্থাৎ বেশি পরিমাণে বালুকণা থাকে, তখন তাকে আর্গ (erg) বলে।

5.4 বায়ুর সঞ্চয় কার্য (Deposition by wind)

মরু অঞ্চলে বায়ু সঞ্চয় প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠিত হয়। এই সকল ভূমিরূপ বাতাসের গতিশীল আচরণের জন্য সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়। প্রখ্যাত ভূমিরূপ বিশারদ ব্যাগ্‌নল্ড (Bagnold) এর মতে বায়ুপরিবাহিত অবক্ষেপণ প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় :— (a) ভাসমান অবস্থায় বহন (Suspension) (b) লম্ফদান প্রক্রিয়ার পরিবহন (Saltation) এবং (c) ভূমির ওপর দিয়ে ধীরগতিতে পরিবহন (Surface-Creep)।

(a) ভাসমান অবস্থায় বহন—মরু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার শিলাকণা, বালুকণা, প্রভৃতি থাকে। এদের কণার আয়তন অনুযায়ী স্থূল (Coarse), মধ্যম (medium), সুক্ষ্ম (fine) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বালুকণা বা শিলাকণা পরিবহন প্রক্রিয়ার সহজেই এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ভাসমান অবস্থায় পরিবাহিত হয়। যে কোন পদার্থের পরিবহণের ক্ষেত্রে পদার্থকণার আয়তন, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও পরিবহনকারী শক্তির পারস্পরিক ক্ষমতা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। আমরা জানি যে, যখন পরিবহনকারী শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা বেশি হয়, তখন পদার্থের ভাসমান অবস্থায় আনুভূমিক পরিবহন ঘটে। অর্থাৎ বায়ুর গতিবেগ বেশি হওয়ায় যখন পদার্থগুলি ভূপৃষ্ঠে ক্রমে ক্রমে বসে বা গিয়ে ভাসমান অবস্থায় একস্থান থেকে অপর স্থানে নীত হয়। তখন সেই প্রক্রিয়াকে ভাসমান পরিবহন বলে। তবে বায়ুর গতিবেগ ক্রমাগত কর্তনের ফলে বা অন্যকারণে হ্রাস পেলে সেই ভাসমান পদার্থসমূহ ক্রমে ক্রমে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর সঞ্চিত হবে।

b) লম্ফদান প্রক্রিয়ায় পরিবহন— মরু অঞ্চলে বিচূর্ণীভূত শিলাখন্ড ও প্রস্তরখন্ডগুলি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়। অধিক গতিবেগসম্পন্ন বাতাস যখন এই প্রস্তরখন্ডগুলির ওপরে কাজ করে তখন অপসরণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তরখন্ডগুলি উত্তোলিত হয় এবং লম্ফদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং স্থানান্তরিত হয়। এই প্রকার পরিবহন বালুকণা এবং প্রস্তরখন্ড উভয় পদার্থের ওপর হয়ে থাকে (5.3 চিত্রে a ও b)। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে বালুকণা ও প্রস্তরখন্ডগুলি একদিকে যেমন বায়ুপ্রবাহ অনুযায়ী তাড়িত হয়, অন্যদিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রবাহে ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়। তবে এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা অবশ্যই নির্ভর করবে বায়ুর গতিবেগ, পদার্থের আয়তন এবং ভূ-প্রাকৃতিক ঢালের ওপর। দেখা যায় যে যান্ত্রিক আবহবিকারে শিলা বিচূর্ণীভূত হলে এই প্রক্রিয়াই কণার আয়তনকে ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কণায় রূপান্তরিত করে। তবে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবশ্য পারস্পরিক ঘর্ষণ পদার্থ কণার আয়তন হ্রাসকে তরান্বিত করে।

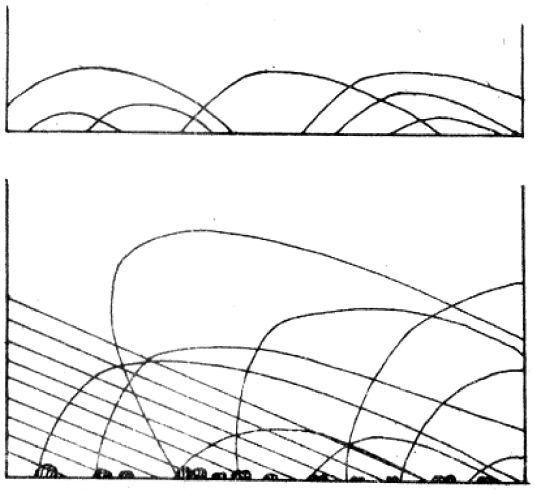

চিত্র 5.4

c) ভূমির ওপর দিয়ে ধীর গতিতে পরিবহন—যখন বাতাসের বেগ প্রবল হয়,তখন লম্ফদান প্রক্রিয়ার পরিবহনের

পরিবর্তে ভূমিভাগের সংস্পর্শে এক প্রকার পরিবহন ঘটে, যাকে ভূমি বিসর্পণ (Surface Creep) বলে। বস্তুতঃ লম্ফদান প্রক্রিয়ায় পদার্থকণাগুলি অগ্রসর হলেও পারস্পরিক সংঘর্ষে ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রবাহে এই উত্তোলন ক্রমশঃ ব্যহত হয়। তবুও অনুভূমিক দিক বরাবর কিছু বল (force) অবশিষ্ট থাকে, যা ভূমিভাগের ওপর দিয়ে পদার্থ থেকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে সাহায্য করে। এইভাবেই মরু অঞ্চলে বালি বিসর্পন (Sand Creep) সংগঠিত হয় ও বিভিন্ন প্রকার বৃহদাকার সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ গঠন করে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, ভূমি-বিসর্পনের পরিমাণ অবশ্যই নির্ভর করবে আনুভূমিক দিক বরাবর বাতাসের গতিবেগের পরিমাণ, ভূমিতলের বা ভূমিপৃষ্ঠের ঢাল, শিলাখন্ডের গঠনপ্রকৃতি, আবহবিকারের পরিমাণ প্রভৃতির ওপর।

5.4.1 বায়ুর সঞ্চয় প্রক্রিয়া—(Process of Aeolian Deposition)

পরিবহন প্রক্রিয়ার পদার্থের স্থানান্তর ঘটে এবং কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় পদার্থগুলি সঞ্চিত হয়। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি উল্লেখযোগ্য।

a) স্তরায়ন (Sedimentation) ঃ— স্তরে স্তরে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বা বিভিন্ন অবনমিত অংশে বা সমতল ভূমির ওপর বা শিলাস্তরের খাঁজে বা ফাটলের মধ্যে পরিবাহিত পদার্থগুলি সঞ্চিত হয়, এদের পদার্থের স্তরায়ন বলে। এইপ্রকার সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ভাসমান বোঝা এবং ভূমি-বিসর্পন সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

b) অনুলেপন (Accretion) ঃ—এই প্রক্রিয়ায় যে সকল ধূলিকণা বা বালুকণা উল্লম্ফন প্রক্রিয়ায় ও ভাসমান অবস্থায় পরিবাহিত হয়, তারা ক্রমে স্থিতাবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

c) ক্রম-অগ্রসরণ (Encroachment) ঃ— যখন বায়ুপ্রবাহর পথে কোন বাধা থাকে, তখন বিসর্পন প্রক্রিয়ার পরিবহন ঘটে না, কিন্তু অন্যান্য পরিবহন প্রক্রিয়াতে অর্থাৎ উল্লম্ফন বা ভাসমান প্রক্রিয়ায় পদার্থগুলি ক্রমশঃ সম্মুখবর্তী দিকে অগ্রসর হয়, একে ক্রম-অগ্রসরণ বলে।

5.4.2 বায়ুর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের বিশ্লেষণ ঃ (Analysis of Depositional Landforms by wind Action)

উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ও সঞ্চয় প্রক্রিয়ার ফলে মরু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ গঠিত হয়। ব্যাগনল্ড সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (a) ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ (Small - Scale Landforms) এবং (b) বৃহদাকৃতি ভূমিরূপ (Large Scale Landforms)।

(a) ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ—সূক্ষ্মবালি তরঙ্গ (Small Scale Sand Ripples)

বাতাসের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম থাকলে বিস্তীর্ণ সঞ্চিত বালির উপরিভাগে ক্ষুদ্রাকৃতি বালিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ উল্লম্ফন ও ভূমি সঞ্চরণ প্রক্রিয়ায় এই প্রকার ভূমিরূপ গঠিত হয় এবং নিম্ন সমতল ভূপ্রকৃতিতে এইপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি তরঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। অসমান ভূমিভাগে বালির আগমন বেশি হলেও বিপরীত ঢালের দিকে বালির আগমন কম হয়, ফলে ঊর্ধ্বঢালে অধিক পরিমাণ বালুকা সঞ্চিত হলে ক্রমশঃ উন্নত বালিতরঙ্গের আকৃতি নেয়। (চিত্র নং 5.5)

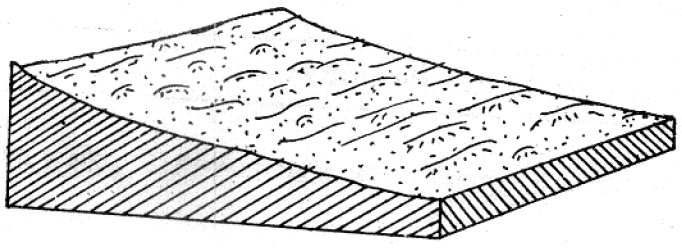

চিত্র 5.5 ক্ষুদ্র বালিতরঙ্গ

ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ-বালুশিরা (Small Scale Sand Ridge)—

বালির মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎকণা অবিন্যস্তভাবে থাকে, পরবর্তী পর্যায়ে এরা কণার আয়তন অনুযায়ী সজ্জিত হয়।

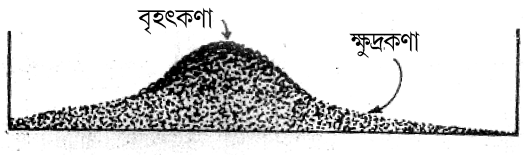

ক্ষুদ্র বালুশিরা
চিত্র 5.6

অনেক সময় লম্ফদান প্রক্রিয়ায় যে সকল স্থূল বালুকণা ও প্রস্তরখন্ড একস্থান থেকে অন্যস্থানে অপসারিত হয়, তখন তারা ক্রমশঃ ভূপৃষ্ঠ বরাবর সঞ্চিত হয়ে একপ্রকার সঞ্চয়ের সৃষ্টি করে। এরপর ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি ভাসমান অবস্থায় পরিবাহিত হয়ে ক্রমে তা স্থিতাবস্থায় প্রাপ্ত হয় ও একপ্রকার আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে। এরপর সেই সকল ক্ষুদ্র বালুকণাগুলি অপসারিত হলে নীচের স্থূল কণাগুলি (যা লম্ফদান প্রক্রিয়ায় পরিবাহিত ও সঞ্চিত হয়েছে) একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি শিরা তৈরী করে। এদেরই বলে বালুশিরা। তবে এরা উচ্চতায় (80 সেমি ও দৈর্ঘ্যে 20 মিঃ পর্যন্ত হতে পারে। (চিত্র নং 5.6)

a) ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিরূপ ঃ লোয়েস (Loess) মরু অঞ্চলে বাতাসের পরিবহনের ফলে বিশেষতঃ ভাসমান প্রক্রিয়ায় বাতাসের সঞ্চয়কার্যের ফলে ক্ষুদ্র বালুকণা, কোয়ার্টজ, ফেল্‌স্‌পার, ক্যালসাইট, প্রভৃতি খনিজে সমৃদ্ধ কর্দমজাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হলে তাকে লোয়েস বলে। সাধারণতঃ এই অঞ্চলে পদার্থের গড় আয়তন 0.01-0.05 মিমি হয় এবং মূল উৎপত্তি স্থল থেকে বহুদূরে সঞ্চিত হয়। দেখা যায় পৃথিবীর জলভাগের প্রায় 10 শতাংশ লোয়েস পদার্থ দ্বারা আবৃত। ভারতীয় উপমহাদেশের কাশ্মীর উপত্যকায় বিশেষত 'কারোয়া' (Karewa) সমৃদ্ধ অঞ্চলে এবং পাকিস্থানের পটওয়ার মালভূমিতে (Potwar Plateau) এই প্রকার লোয়েস সঞ্চিত হয়ে লোয়েস সমভূমি (Loess Plain) গঠন করেছে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার হিমবাহ-অধ্যুষিত ও নদী ও হিমবাহের যৌথ প্রক্রিয়া (fluvio glacial) অঞ্চলে লোয়েসের সৃষ্টি হয়েছে, উত্তর-পূর্ব চীনে লোয়েস মূলত গোবি মরুভূমি থেকে বায়ু তাড়িত সূক্ষ্ম বালুকণা ও কর্দম পরিবহনের ফলে সৃষ্টি হয়েছ।

b) বৃহদাকার সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ (Large-Scale depositional landform) ঃ বাতাসের সঞ্চয়কার্যের ফলে মরু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার বৃহদাকৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয়। ব্যাগনল্ড (1941) বৃহদাকৃতির সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ঃ

1. বালি ছায়া ও বালি সঞ্চরণ (Sand Shadow and Sand Drifts)
2. বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ি (Different types of Dunes)
3. তিমিপৃষ্ঠ বা বালি বাঁধ (Whale back and Sand Levee)
4. বালিতরঙ্গ (undulation)
5. বালি আস্তরণ (Sand Sheet)

বালিছায়া গঠন
চিত্র 5.7

a) বালি ছায়া ও বালি সঞ্চরণ ঃ যখন কোন উন্মুক্তশিলার অংশ বা ভূমিরূপ, ঝোপঝাড়, ভৃগু, প্রভৃতি বায়ুর প্রবাহিত পথে আড়ালের সৃষ্টি করে, তখন বাতাসের গতিবেগ প্রতিহত হয়। এর ফলে এই সকল আড়ালের পশ্চাৎ দেশে অর্থাৎ বাতাসের অনুবাত ঢালে যে সঞ্চয় ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, তাকে বালিছায়া বলে। এইভাবে বাধার পশ্চাৎদেশে সঞ্চয় কার্য চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত সঞ্চয়জাত ঢাল 34^0 কোন অতিক্রম না করে। তবে বালিছায়ার গঠন ও তার

সামগ্রিক বিকাশ নির্ভর করে বাতাসের চলার পথে প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি, বাতাসের গতিবেগ ও ভূমিভাগের ঢালের পরিণমনের উপর। অনেক সময় ভৃগু বা খাড়া ঢালের পশ্চাৎদেশে বায়ুতাড়িত বালুকণা বালিছায়ার সৃষ্টি করে। এদের স্যান্ডফল্‌স্‌ও (Sand falls) বলে। (চিত্র নং 5.7)

b) বালিসঞ্চরণ ঃ দুটি সমান্তরাল বাধার মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশে বায়ুপরিবাহিত যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, তাকে বালি সঞ্চরণ বলে। সাধারনতঃ ফাঁকা অংশটি একপ্রকার ফানেলের মত কাজ করে যার মাধ্যমে বায়ু-পরিবাহিত পদার্থ সমূহ বাধার অনুবাত ঢালে সঞ্চিত হয়। (চিত্র নং 5.8)

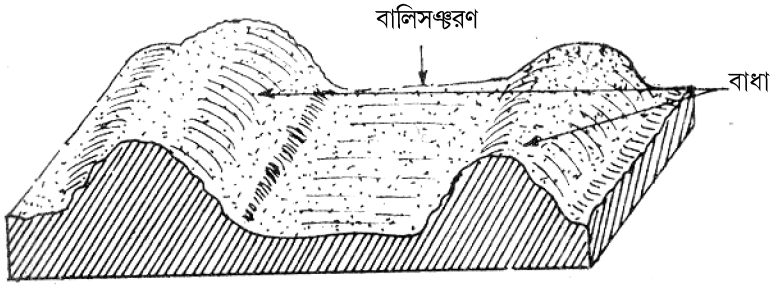

চিত্র 5.8 বালিসঞ্চরণ

বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ি ঃ (Different types of Dunes)

ব্যাগনল্ডের মতে, গতিশীল বালির স্তূপকেই বালিয়াড়ি বলে। "...mobile heap of Sand whose existence is independent of either ground form or fixed wind obstruction." অর্থাৎ এই প্রকার বালির স্তূপ ভূ-প্রকৃতি বা প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরালের সাপেক্ষে নিরপেক্ষভাবে গঠিত হয়।

বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ি দেখা যায়। নিম্নলিখিত সারণীর মাধ্যমে 11 প্রকার বালিয়ারি দেখানো হল ঃ (চিত্র নং 5.9)

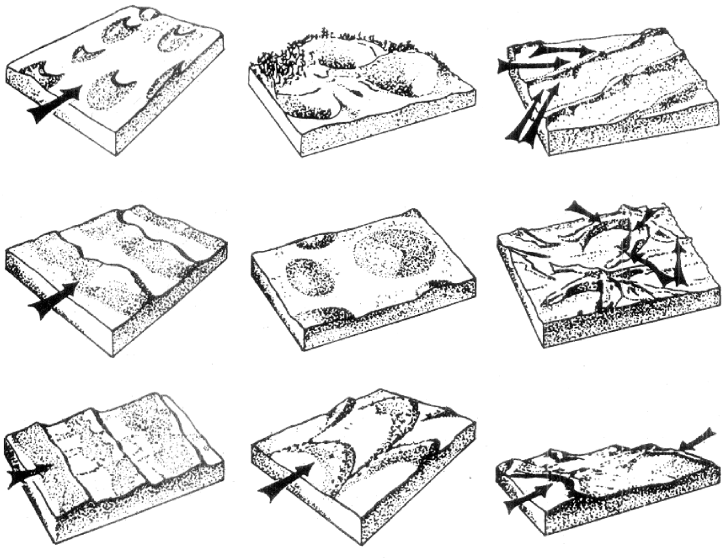

বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ি গঠন

চিত্র 5.9

বালিয়াড়ির শ্রেণীবিভাগ

প্রকার	আকার	তালের/ ঢালের সংখ্যা	গঠনগত বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য
1) বালির আস্তরণজাত বালিয়াড়ি (Drift Dune)	সমান্তরাল স্তরে বালির সঞ্চয় ; তবে এই প্রকার সঞ্চয়ে স্তূপের অভাব দেখা যায়।	লক্ষ্যণীয় কোন তল বা ঢাল নেই	গড় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতার তারতম্য খুবই সামান্য	বালি সঞ্চয়ের উচ্চতাগত তারতম্য সামান্য বলে একে আদর্শ বা প্রকৃত বালিয়াড়ি বলা যায় না।
2) গ্রিন্‌কার (Grienkar)	শীর্ণ, দৈর্ঘ্য-বরাবর বিস্তৃত ভূমিশিলার উপর আচ্ছাদিত রূপ	পলকাটা ধার বা তল নেই	উপরিউক্ত আস্তরণচাত বালিয়াড়ির মত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত	এই প্রকার সঞ্চয়কেও প্রকৃত বালিয়াড়ি বলা যায় না।
3) বার্খান (Barchan)	অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি	এক	গড় দৈর্ঘ্য ; 0.56 মি, গড় প্রস্থ 0.90 মি, এবং গড় তরঙ্গা দৈর্ঘ্য 0.68	বায়ু পরিবাহিত পথের আড়াআড়ি ভাবে অপ্রতিসম ঢাল বিশিষ্ট ভূমিরূপ গঠিত হয়,
4) বার্খান সমৃদ্ধ অনুরূপ বা বার্খান জাতীয় ভূমিরূপ (Barchanoid features)	পরস্পর সংযোগকারী অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালি স্তূপ	নেই	গড় দৈর্ঘ্য ও গড় প্রস্থ যথাক্রমে 1.24 এবং 2.11 মিটার	একের অধিক বার্খান অবস্থান করলে এই প্রকার ভূমিরূপ গঠিত হয় এবং এর অনুবাত ঢালে সুষম ও প্রতিবাত ঢাল খাড়া হয়। অর্থাৎ এই প্রকার ভূমিরূপে অপ্রতিসম ঢালের সৃষ্টি হয়।

প্রকার	আকার	তালের/ ঢালের সংখ্যা	গঠনগত বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য
5) তির্যক বালিয়ারি (Transverse Dune)	অসম শৈলশিরা আকৃতি বিশিষ্ট	একটি	দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য বা তারতম্য নেই।	বালির পরিমাণ বা সরবরাহ বেশী হলে তির্যক বালিয়াড়ি গঠিত হয়।
6) গম্বুজ আকৃতির সঞ্চয় (Dome shaped Deposits)	অর্ধচন্দ্রাকৃতি	একটি	গড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য 2.98 মিটার এবং গড় ব্যাস 1.28 মিটার	পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত বার্খান (Transformed Dune)
7) 'ব্লো আউট' (Blow-out)	বৃত্তাকার বা বেষ্টনীর আকারে সঞ্চয়	এক বা একাধিক	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কোন তারতম্য নেই	বায়ুর অপসারণের ফলে গঠিত হয় এবং উদ্ভিদের অবস্থানের ফলে নিয়ন্ত্রিত হয়
8) পরাবৃত্তীয় বালিয়ারি (Parabolic Dums)	প্রস্থর U আকৃতি বা পরাবৃত্তীয় আকৃতির	এক বা একাধিক	বায়ুপ্রবাহের দিকে বালিয়াড়ি 'শিঙ' (horn) অভিক্ষিপ্ত হয়।	প্রধানতঃ দুই প্রকার বায়ু প্রবাহের দিক থাকার ফলে এই প্রকার ভূমিরূপ গঠিত হয়।
9) অনুদৈর্ঘ্য বা সিফ বালিয়াড়ি (Longitudinal or Seif Dune)	শৈলশিরা আকৃতি বিশিষ্ট ভূমিরূপ	দুটি	সমঢালযুক্ত দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত। গড় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 8.14, 20.14, 30.81 মিটার	উপরিউক্ত পরাবৃত্তীয় বালিয়াড়ির মত দুই প্রকার বায়ুপ্রবাহের দিক।

প্রকার	আকার	তালের/ ঢালের সংখ্যা	গঠনগত বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য
10) উল্টানো বালিয়াড়ি (Reversing Dune)	অসম ঢাল বিশিষ্ট	দুটি	দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও তরঙ্গা দৈর্ঘ্যের তারতম্য কম	তারকা বিশিষ্ট ও তির্যক বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী প্রকৃতির ভূমিরূপ
11) তারকা বালিয়াড়ি (Star Dune)	কেন্দ্র বা মধ্যবর্তী আড়ালে উচ্চশৃঙ্গা আকৃতির ভূমিরূপ	তিনটি বা তার অধিক করে অবস্থান	গড় তরঙ্গাদৈর্ঘ্য ও ব্যাস যথাক্রমে 1.76 ও 0.86	উল্লম্বভাবে গঠিত এবং এর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সংস্করণগুলিকে রাউন্ড (rounds) বলে।

D. S. G Thomas (1997) বায়ুপ্রবাহের দিক, প্রধান নিয়ন্ত্রনকারী কারণসমূহ, বালুর সরবরাহ ও বাতাসের গতিপথের পরিবর্তনশীলতার উপর ভিত্তি করে বালিয়াড়ির শ্রেণী বিভাগ করেন। নীচের সারণীতে তা দেখানো হল।

বালিয়াড়ির স্থূল প্রকার	প্রধান বায়ু প্রবাহের দিক	প্রধান নিয়ন্ত্রনকারী কারণ সমূহ	বালির সরবরাহ	বায়ুর গতিবেগের পরিবর্তনশীলতা
তির্যক বালিয়াড়ি বার্খান বার্খানয়েড বালুশিরা	সাধারনত এক দিক থেকে	বায়প্রবাহ ও বালির সরবরাহ	সীমিত	নুন্যতম পরিবর্তনশীল
রৈখিক বালিয়াড়ি ('সিফ্' ও রৈখিক বালি শিরা)	দুই দিক থেকে	বায়ুপ্রবাহ ও বালির সরবরাহ	নিয়ন্ত্রিত	পরিবর্তনশীল

বালিয়াড়ির স্থূল প্রকার	প্রধান বায়ু প্রবাহের দিক	প্রধান নিয়ন্ত্রনকারী কারণ সমূহ	বালির সরবরাহ	বায়ুর গতিবেগের পরিবর্তনশীলতা
তারকা বালিয়াড়ি	বহুদিক থেকে	বায়ুপ্রবাহ ও বালির সরবরাহ	পর্যাপ্ত	অস্থিতিশীল
পরাবৃত্তীয় বালিয়াড়ি	এক দিক থেকে	উদ্ভিদ	—	—
মস্তক বা পুচ্ছ বালিয়াড়ি	এক দিক থেকে	গন্ড শিলা, উন্মুক্ত শিলা ভূ-প্রাকৃতিক বাধা	—	—

3) তিমি পৃষ্ঠ বা বালিবাঁধ (Whaleback or sand leveau)

সমতল মস্তক বিশিষ্ট বালির পাহাড়কে তিমিপৃষ্ঠ বা বালিবাঁধ বলে কারণ এই ভূমিরূপটি উপর থেকে তিমি মাছের পিঠের মত দেখায়। এই প্রকার ভূমিরূপটি নিজের মত বায়ুপ্রবাহের সমান্তরালে গঠিত হয়। কিন্তু সিফের মত স্থলিত ঢাল থাকে না, এবং সিফের তুলনায় এই ভূমিরূপটি অনেক বড়। প্রস্থ 160 km দীর্ঘ, 30 km চওড়া এবং 45 মিটার উঁচু এই প্রকার ভূমিরূপ সাধারণত আগেকার বালিয়াড়ির অবশিষ্টাংশ থেকে সৃষ্টি হয় ও মিশরের বালিসাগরে (Sand Sea) এদের দেখা যায়। অনেক সময় তিমি পৃষ্ঠের উপর সিফ্ বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়। (চিত্র নং 5.10)

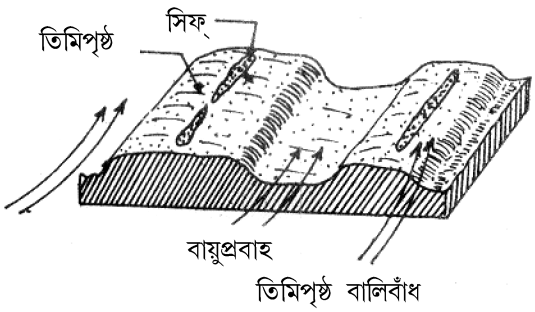

চিত্র 5.10

4) বালিতরঙ্গ (Undulation) এই প্রকার ভূমিরূপ তিমিপৃষ্ঠের মত বালির সঞ্চয় জাত ভূমিরূপ হলেও তিমিপৃষ্ঠ অপেক্ষা ছোট ও তিমি পৃষ্ঠের আকৃতি না হয়ে ঢেউ খেলানো বা তরঙ্গায়িত প্রকৃতির হয়। বলা যেতে পারে এই ভূমিরূপটি সিফ্ ও তিমি পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী একটি রূপ। (চিত্র নং 5.11)

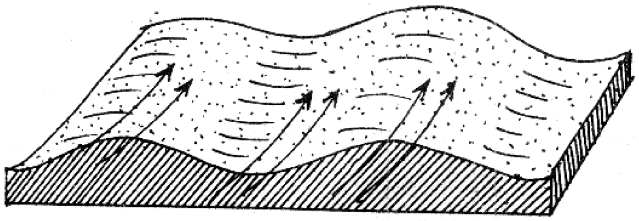

সিফ্ ও তিমিপৃষ্ঠের মধ্যবর্তী একটি রূপ

চিত্র 5.11

5) বালি আস্তরণ (Sand Sheet)

যখন বালির সঞ্চয়ের ফলে বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তখন তাকে বালি আস্তরণ বলে। বালির সঞ্চয়ণের ফলে এইপ্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় বলে একে বালি সঞ্চরণ বলে। বালির আস্তরণের মধ্যে কোন ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র দেখা যায় না, শুধু বিস্তীর্ণ অংশে ক্ষুদ্রাকৃতি বালিশিরা পরিলক্ষিত হয়। লিবিয়া মরুভূমির বিখ্যাত সেলিমা বলা আস্তরণ এই প্রকার ভূমিরূপের উদাহরণ। (চিত্র নং 5.12)

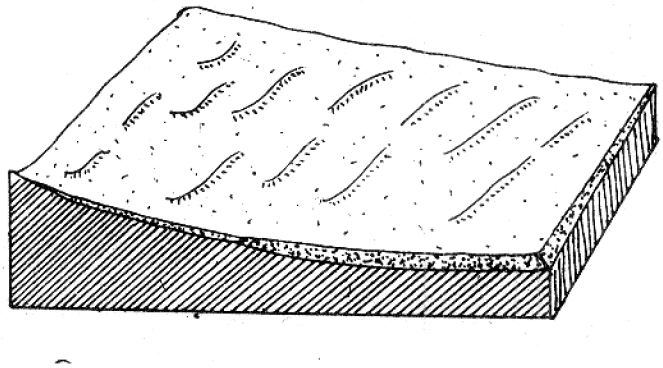

চিত্র 5.12 বৈচিত্রহীন বালির আস্তরণ

5.9 প্রধান প্রধান বালিয়াড়ির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (A short description of major types of sand dunes)

উপরিউক্ত দুটি সারণী থেকে বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ির শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

a) তির্যক বালিয়াড়ি- বায়ু প্রবাহিত পথের সমকোণে অর্থাৎ আড়াআড়ি ভাবে যে বালিয়াড়ি গঠিত হয়, তাকে তির্যক বালিয়াড়ি (Transverse Dune) বলে। তির্যক বালিয়াড়িগুলি যখন অর্ধচন্দ্রাকৃতির হয়, তখন তাকে বার্খান বলে। সিংভি ও কর (Singvi and A. Kar in 1993) উল্লেখ করেন যে ভারতের মরুস্থলী অঞ্চলে বিশেষতঃ বার্মের-

জয়শালমীর-গঙ্গানগর অঞ্চল ও সুজনগড়-রতনগড়-দুঙ্গার গড় অঞ্চলে বাতাসের আড়াআড়ি বেশ কিছু তির্যক বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়েছে। (চিত্র নং 5.13)

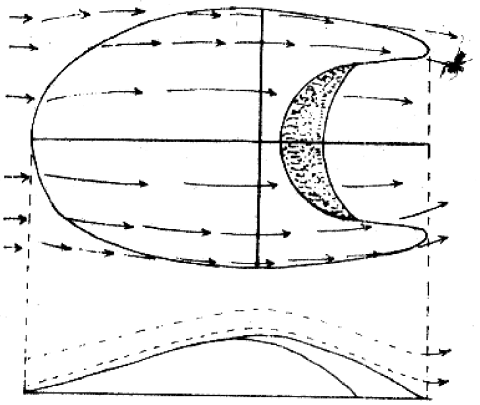

চিত্র নং 5.13

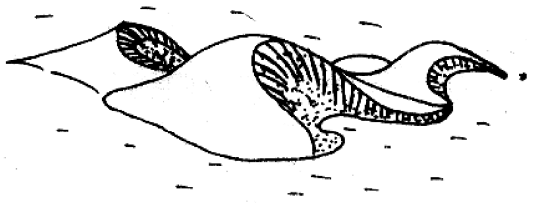

চিত্র 5.14 বার্খান

b) বার্খান :

তির্যক বালিয়ারিগুলির মধ্যে একটি বিশেষ প্রকার হল বার্খান। (চিত্র নং 5.14) পূর্বেই বলা হয়েছে (দুটি সারণী দ্রষ্টব্য) যে বার্খান অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও আড়াআড়ি প্রস্থছেদে অপ্রতিসম ঢাল অর্থাৎ প্রতিবাত ঢালে সুষম ও অনুবাত ঢালে প্রায় খাড়া ঢালের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন একটি বার্খানকে উপর থেকে দেখলে দেখা যায় বায়ু যে প্রবাহিত হচ্ছে সে দিকটা উত্তল প্রকৃতির এবং বায়ুপ্রবাহের অনুবাত ঢাল অবতল প্রকৃতির।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে বার্খানের উচ্চতা কয়েক মিটার থেকে 25 মিটার বা তার বেশী পর্যন্ত এবং বার্খানের দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে প্রায় 400 মিটার পর্যন্ত হয়। বার্খানের দুই প্রান্তের দুটো শিং অনুবাত ঢালের দিকে অভিক্ষিপ্ত থাকে। (চিত্র নং 5.14)

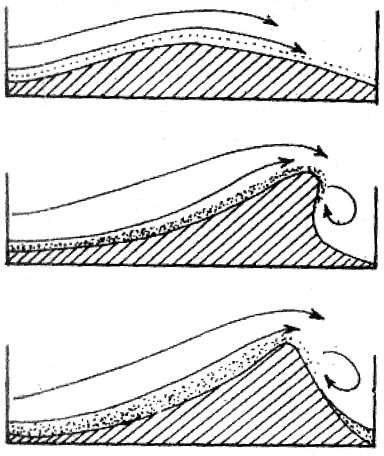

চিত্র 5.15

বাগনল্ডের মতে বার্খান ছোট ছোট বালির স্তূপ থেকে সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন প্রতিবাত ঢালে বাতাসের গতিবেগ বেশী থাকে এবং এর শীর্ষ দেশে ক্রমাগত বালিকণা সঞ্চিত হয়। এইভাবে প্রতিবাত ঢালে থেকে আগত বালিরাশি তখন অনুবাত ঢালের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। অনুবাত ঢালের পরিমাণ 34^0 বেশী হলে তখন ঢালের স্খলন ঘটে এবং অনুবাত ঢালে শিং (horn) এর সৃষ্টি হয় (চিত্র নং 5.15)।

অনেক সময় বার্খান থেকে অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়। বাতাসের দিক পরিবর্তন হলে এক প্রকার রূপান্তর ঘটে। নিম্নলিখিত চিত্রে বার্খান থেকে সিফ্ বালিয়াড়ির উৎপত্তি দেখানো হয়েছে।

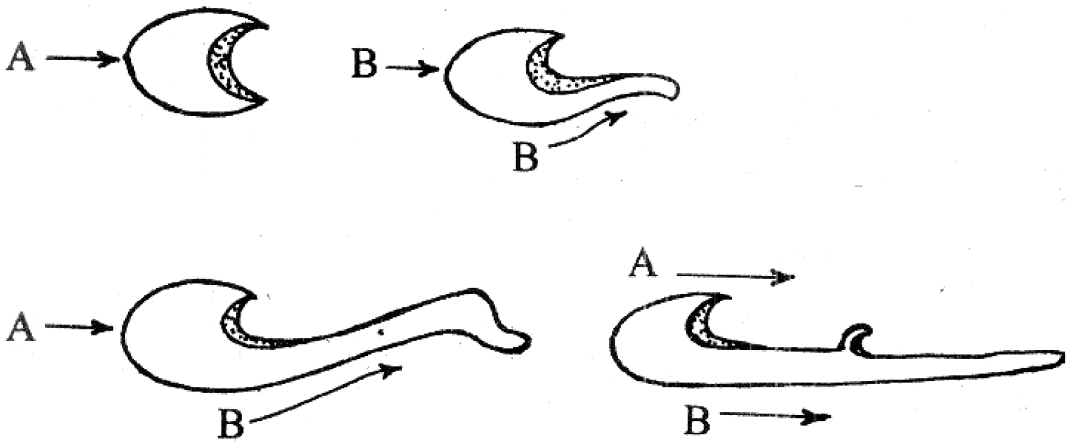

চিত্র 5.16 বার্খান থেকে সিফ্ বালিয়াড়ী গঠন

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে A একটি নিয়মিত বায়ু যা বার্খানের পরিপ্রেক্ষিতে সমকোণে প্রবাহিত। B একটি শক্তিশালী বায়ু যার প্রভাবে বার্খানের শিং দীর্ঘায়ত হয়। এইভাবে শেষপর্যন্ত দেখা যাবে যে বার্খানটি কিন্তু A ও B বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে সমান্তরাল অবস্থান করবে এবং অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি বা সিফ্ বালিয়াড়িতে রূপান্তরিত করবে।

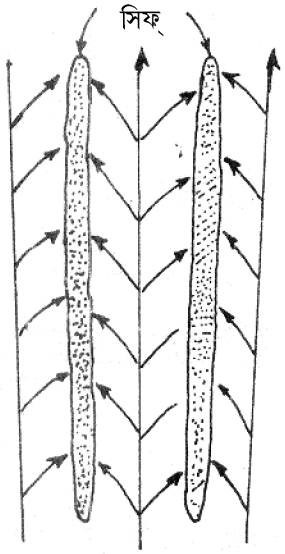

চিত্র 5.17(A)

সিফ্ বালিয়াড়ী

b) অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি বা সিফ্ বালিয়াড়ি (Longitudinal Dune or Seif Dune) ঃ— বায়ুপ্রবাহের সমান্তরালে অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি গঠিত হয়। বাগনল্ডের মতে সিফ্ বালিয়াড়ির প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 6 : 1 এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 300 কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যায়। সিফ্ বালিয়াড়ির শৃঙ্গা বা শীর্ষদেশ ছুড়ির মত তীক্ষ্ণ ও উঁচু-নীচু হয়। সিফ্ বালিয়াড়ির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল শীর্ষদেশের একদিকে মসৃন ও অপরদিক স্খলিত হয়। সংলগ্ন সিফ্গুলির মধ্যে মধ্যে কিছু ফাঁক থাকে যেখানে মরুতলদেশ (desert floor) উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে।

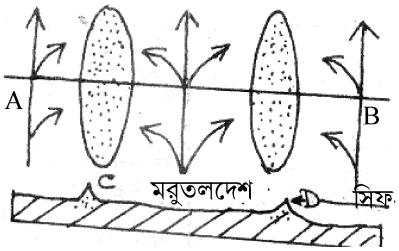

চিত্র 5.17 (B)

সিফ্ গঠন প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সমান্তরাল বায়ুপ্রবাহের ফলে বালি বা অন্যান্য পদার্থসমূহ দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত হয়। কিন্তু

আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত বায়ুস্রোতের ফলে সিফ্ তীক্ষ্ণ শৈলশিরার আকৃতি বিশিষ্ট হয়। (চিত্র নং 5.17 (b) চিত্রে দেখা যাচ্ছে C ও D স্থানে সিফ্ গঠিত হয়েছে। C ও D স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে মরুতলদেশ দেখা যাচ্ছে।

সিফ্ এর উৎপত্তি বিষয়ে বাগনল্ড যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাকে যথাযোগ্য বিবেচনা করে হান্না (Hanna) সিফ্ বালিয়াড়ি গঠনের এক নতুনত্বের অবতারণা করেন। তাঁর মতে একপ্রকার ঘূর্ণায়মান বায়ুপ্রবাহ সিফ্ গঠনে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নেয়। এই প্রকার বায়ু প্রবাহ বা বায়ুস্রোতকে হেলিক্যাল (Helical) বলে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে এই প্রকার ঘূর্ণীর সঙ্গে শীর্ষদেশের ঠিক উলম্ব বরাবর মেঘের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নিম্নলিখিত চিত্রে হেলিক্যাল বায়ুস্রোত ও সিফ্ গঠন দেখানো হল। (চিত্র নং 5.18)

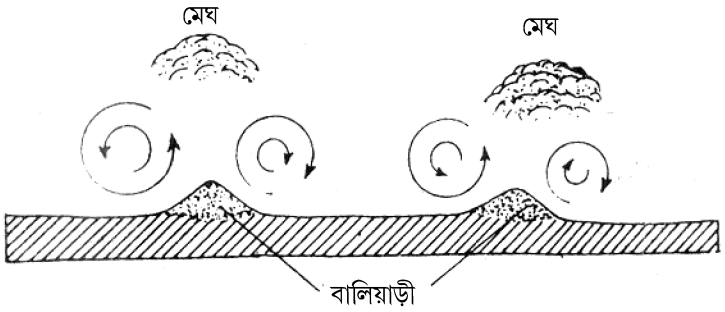

চিত্র নং 5.18

অস্ট্রেলিয়ার লিম্পসন মরুভূমি, মিশরের নেগেভ-সিনাই মরুভূমি দঃআফ্রিকার কালাহরি এবং ইরান ও আরবের বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে সিফ্ বালিয়াড়ি দেখা যায়। জয়শালমীরের পশ্চিম অংশে সিফ্ বালিয়াড়ি গঠিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বার্খান ও সিফ্ উভয়ই বালিয়াড়ি হলেও তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

বার্খান	সিফ্
1. আড়াআড়ি ভাবে একই দিক থেকে বায়ু প্রবাহের ফলে গঠিত হয়।	দৈর্ঘ্য বরাবর সমান্তরাল বায়ুপ্রবাহের ফলে গঠিত হয়।
2. প্রতিবাত ঢাল মন্থন ও সুষম এবং অনুবাত ঢাল খাড়া ও স্খলিত, এরফলে অপ্রতিসম ঢালের সৃষ্টি হয়।	প্রতিবাত ও অনুবাত উভয় ঢালের পরিমান সমান ও অধিক। এর ফলে প্রতিসম ঢালের সৃষ্টি হয়।
3. অর্ধচন্দ্রাকৃতি।	দৈর্ঘ্যবরাবর বিস্তৃত তীক্ষ্ণ শৈলশিরা আকৃতি বিশিষ্ট
4. বার্খানের প্রান্তদ্বয়ে শিং থাকে।	সিফ্ এর প্রান্তদ্বয়ে শিং থাকে না।

বার্খান	সিফ্
5. গড় উচ্চতা—30 মি. গড় প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য 400 মি।	গড় উচ্চতা ও গড় প্রস্থের অনুপাত 1 : 6
6. অনুবাত ঢালে দুর্বল প্রকৃতির ঘূর্ণী।	অনুবাত ও প্রতিবাত উভয় ঢালেই শক্তিশালী ঘূর্ণী।

বার্খান ও পরাবৃত্তীয় বালিয়াড়ি উভয়ই তির্যক বালিয়াড়ির উদাহরণ। তবে এই দুই প্রকার বালিয়াড়ির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে ঃ

বার্খান	পরাবৃত্তীয় বালিয়াড়ি
প্রতিবাত ঢাল সুষম ও ঢালু প্রকৃতির।	প্রতিবাত ঢাল খাড় ও স্খলিত প্রকৃতির
প্রতিবাত ঢাল উত্তল (Convex) প্রকৃতির।	প্রতিবাদ ঢাল অবতল প্রকৃতির (Concave)
অনুবাদ ঢাল অবতল প্রকৃতির।	অনুবাত ঢাল উত্তল প্রকৃতির
বাখানের শিংদ্বয় অনুবাদ ঢালের দিকে অভিক্ষিপ্ত (Projected)।	পরাবৃত্তীয় বালিয়াড়ির শিংদ্বয় প্রতিবাত ঢালের দিকে অভিক্ষিপ্ত
বার্খান সম্পূর্ণভাবে সঞ্চয় জাত ভূমিরূপ।	এই প্রকার বালিয়াড়ি আংশিকভাবে সঞ্চয়জাত ও আংশিকভাবে ক্ষয়জাত।

5.5 মরু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার সমতল ভূমিরূপ (Different types of level surfaces in arid regions)—

ব্ল্যাকওয়েল্ডার-এর মতে বিভিন্ন প্রকার সমতলভূমি হল মরুভূমির অন্যতম প্রধান ভূমিরূপ। তিনি মরুসমতল ভূমিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ঃ ক) নদীর প্লাবন ভূমি খ) গাঠনিক সমভূমি ; গ) প্লায়া সমভূমি ; (ঘ) বাজাদা সমভূমি এবং (ঙ) পেডিমেন্ট।

(a) নদীর প্লাবনভূমি (Flood Plain) ঃ— মরু অঞ্চলে প্লাবনভূমি আপেক্ষিকভাবে কম কারণ শুষ্ক পরিবেশে স্থায়ী নদীর সংখ্যা খুবই বিরল। শুধুমাত্র পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হামবোল্ট ও কলোরেডা নদীতে মরুপরিবেশে লক্ষ্যণীয় প্লাবনভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

(b) গাঠনিক সমভূমি (Structural Plain) ঃ— গাঠনিক সমভূমির মানে হল শিলাস্তরের গঠনপ্রকৃতি অনুযায়ী যখন সমতলভূমি বা সমভূমির সৃষ্টি হবে। ব্ল্যাকওয়েল্ডার অবশ্য নাতি-ঢাল সমভূমিকে (dip slopes) গাঠনিক সমভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কলোরেডো অঞ্চলে এই প্রকার গাঠনিক সমভূমি দেখা যায়।

(c) প্লায়াসমভূমি (Playa Plain) ঃ— মরু অঞ্চলে অংশকে প্লায়া বলে এবং এই প্লায়াতে জল থাকলে তাকে প্লায়া হ্রদ বলে। পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও মেক্সিকোতে এই প্রকার পর্বতবেষ্টিত প্লায়া সমভূমিকে বোলসন (Bolson) বলে।

প্লায়া অঞ্চলে কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী দেখা যায়। এই সকল নদী কালক্রমে প্লায়া হ্রদকে সম্পূর্ণভাবে ভরাট করে। বাষ্পীভবন বা ভৌমস্তরে জলের অনুপ্রবেশ ঘটলে সমগ্র প্লায়া হ্রদটি শুকিয়ে যায় এবং লবণের কেলাসন প্রক্রিয়ায় সেখানে স্যালিনা (Salina) বা 'এ্যালকালী ফ্ল্যাট' (Alkali flat) গঠন করে। অধিক লবণ সমৃদ্ধ নৈভাদা অঞ্চলের ওয়াকার হ্রদ ও কার্সন হ্রদ এর উদাহরণ।

(d) বাজাদা সমভূমি (Bajada or Bahada Plain) ঃ— মরু অঞ্চলে বাতাসের সঞ্চয়জাত প্রক্রিয়ার ফলে যে বিস্তীর্ণ সমভূমি গঠিত হয়, তাকে বাজাদা সমভূমি বলে। একসময় ভাবা হত যে মরুভূমিতে যে সমভূমি দেখা যায়, তা সম্পূর্ণভাবে সঞ্চয়জাত। কিন্তু পরবর্তী-পর্যবেক্ষনের ফলে জানা যায় যে সমতলভূমির নীচের অংশ সঞ্চয়জাত হলেও উপরের অংশ কিন্তু বায়ুর অপসারণ প্রক্রিয়ার ফলে শিলাস্তরে উন্মুক্ত হয়ে সমভূমির সৃষ্টি করলে তাকে পেডিমেন্ট বলে।

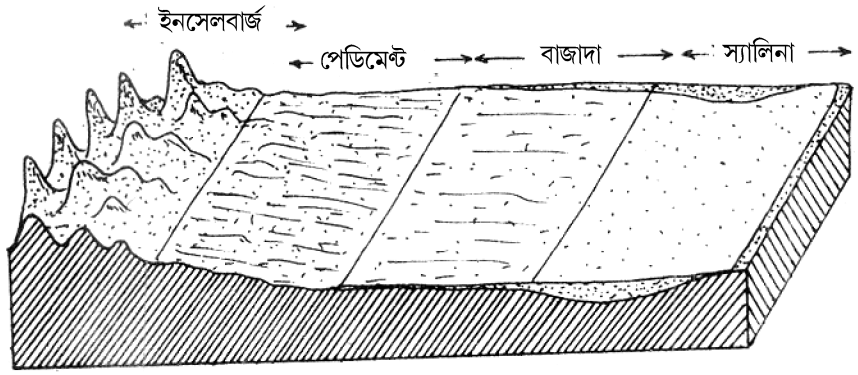

চিত্র নং 5.19

বাজাদা সমভূমির উৎপত্তি প্রসঙ্গে ভূমিরূপকারগণ মনে করেন যে পর্বতের পাদদেশীয় ঢালে নদীর গতিবেগ হঠাৎ হ্রাস পাওয়ায় সেখান পলল-পাখার (alluvial fans) সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন পলল-পাখা একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে বাজাদা-সমভূমির সৃষ্টি করে। বাজাদা সমভূমির পদার্থগুলি নুড়ি মিশ্রিত পলি বা পলি ও কাদার স্তর পর পর সঞ্চিত হয়ে বাজাদা গঠিত হয়।

(e) পেডিমেন্ট (Pediment) ঃ— আগেই বলা হয়েছে যে মরুসমভূমির উপরে অংশে পেডিমেন্ট দেখা যাবে। অর্থাৎ যখন পর্বতের পাদদেশীয় ঢালে উন্মুক্ত শিলাস্তরের উপর সমতল বা প্রায় সমতল বা সামান্য ঢালু বা হেলানো অংশকে পেডিমেন্ড বলে। "inclined or gently sloping land surface bordering desert mountains". তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাতাসের পরিবহন প্রক্রিয়া সক্রিয় হলে উন্মুক্ত শিলাস্তরের উপর হাল্কাভাবে একপ্রকার আস্তরণের স্তর পেডিমেন্ট কে ঢেকে রাখে ও পেডিমেন্টের যথাযথ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

বাজাদা ও পেডিমেন্ট উভয়ই সমতলভূমিরূপ বা সমভূমির প্রকৃতি নির্দেশ করলেও এই দুই প্রকার ভূমিরূপের মধ্যে পার্থক্য আছে ঃ

বাজাদা	পেডিমেন্ট
1. পেডিমেন্টের নীচের সমতল অংশকে বাজাদা বলে।	ইনসেনবার্জ বা পর্বতের পাদদেশীয় অঞ্চলকে পেডিমেন্ট বলে।
2. বাজাদায় সবসময় সঞ্চয়জাত পদার্থের আস্তরণ থাকবে।	পেডিমেন্টে উন্মুক্ত শিলাস্তর দেখা যাবে ; কোন কোন ক্ষেত্রে বায়ু পরিবাহিত পদার্থের হাল্কা ও পাতলা স্তর থাকবে।
3. বাজাদায় ভূমিঢালের পরিমাণ 0^0 ; অর্থাৎ এটি একটি সমতল সমভূমি।	পেডিমেন্টে গড় ঢালের পরিমাণ 5^0–7^0 হয়।
4. একাধিক পললপাখা মিশে গিয়ে বাজাদা গঠন করে।	ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণের ফলে পেডিমেন্ট গঠিত হয়।

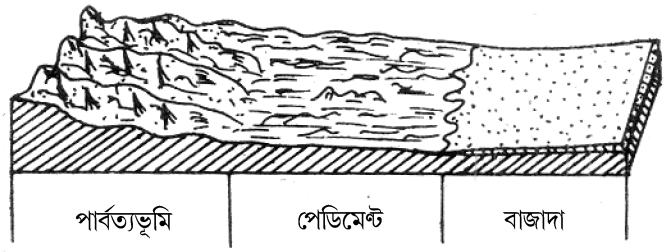

চিত্র নং 5.20

পেডিমেন্ট গঠনের বিভিন্ন তত্ত্ব (Different theories regarding formation of Pediments)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখতে পাই যে পর্বতের পাদদেশীয় ঢালে উন্মুক্ত শিলাস্তরের উপর সামান্য ঢালযুক্ত যে প্রায়সমতল ভূমিরূপ মরু অঞ্চলে দেখা যায় তাকে পেডিমেন্ট বলে। এই পেডিমেন্ট উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্ব আছে।

(a) ম্যাকগীর স্তর প্লাবন বা 'শিটফ্লাড' তত্ত্ব (Sheet flood theory of McGee) ঃ— পেডিমেন্টের ভূপ্রাকৃতিক ঢাল সমতল প্রকৃতির ও মসৃণ বলে ম্যাক্‌গী ধারনা করেন যে জলধারার কার্যের ফলেই এই প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। তবে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে জলধারার কার্য মূলতঃ স্প্যাসমেডিক জলপ্রবাহ বা প্লাবনের ফলে স্তর প্লাবন (Sheet flood) ঘটায় এবং এর ফলে পেডিমেন্ট গঠিত হয়।

b) লসনের সমান্তরাল ঢালের পশ্চাদপসরণ তত্ত্ব (Parallel retreat of mountain front theory by Lawson) ঃ—

লসন পেডিমেন্ট উদ্ভবের একটি নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর মতে পর্বতসীমান্তের (Mountain front) সমান্তরাল পশ্চাদপসরণের ফলেই পর্বতের পাদদেশে পেডিমেন্ট গঠিত হয়।

c) পার্শ্ব সমতলীকরণ তত্ত্ব (Lateral Planation theory) ঃ—

জনসন (Johnson), ব্ল্যাক ওয়েল্ডার (Black welder) গিলবার্ট (Gilbert) বার্কি (Barky) ও মরিস (Moris) প্রত্যেকেই নিজ নিজ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পেডিমেন্ট প্রধানতঃ নদীর পার্শ্বক্ষয় ও পার্শ্ব সমতলীকরণের ফলে গঠিত হয়। তাদের বক্তব্য হল এই যে মরু অঞ্চলে যান্ত্রিক আবহবিকার বেশী থাকায় ও নদীর সংখ্যা কম থাকায় নদীগুলি স্বল্পায়ু ও বোঝাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে নদীগুলি নিম্ন ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় বেশী করে। এই পার্শ্বক্ষয়ের ফলে পর্বতের পাদদেশে 'মধ্যবর্তীমন্ডলে' (Intermediate Zone) পার্শ্বসমতলীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেডিমেন্ট গঠিত হয়। নিম্নে চিত্রে তা দেখানো হল। (চিত্র নং 5.21)

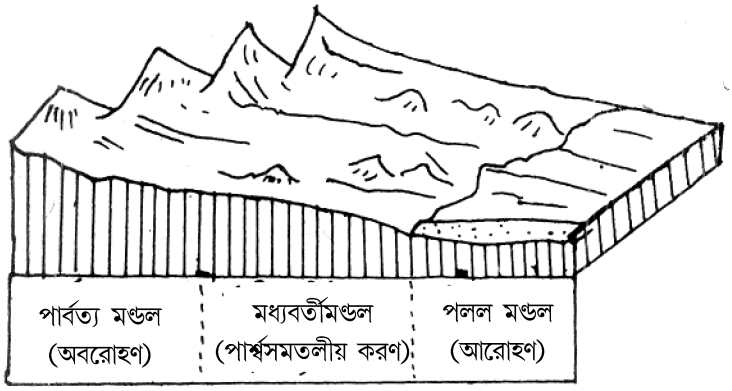

চিত্র নং 5.21

উপরিউক্ত চিত্রটি পেডিমেন্ট গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসনের পার্শ্বসমতলীকরণতত্ত্ব।

d) ডেভিসের যৌগিক তত্ত্ব (Composite theory by W.M. Davis) ঃ— লসন ও ব্রায়ানের পশ্চাদপসরণের মূল বিষয় ও ম্যাকগীর স্তর প্লাবণের বিষয়কে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে ডেভিস একটি যৌগিকতত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর মতে একদিকে যেমন পর্বতসীমান্তের ঢাল বরাবর সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ ঘটে, অন্যদিকে নদীর জলপ্রবাহে স্তর প্লাবন পশ্চাদসরণ অঞ্চলে পেডিমেন্ট গঠন করে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে পর্বতের প্রতিবর্ত অঞ্চলে বেশী থাকায় সেখানে আর্দ্র পরিবেশে নদীর কার্যই প্রধান হয় ; কিন্তু পর্বতের অনুবাত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় ও বায়ুর কার্যই প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করে। এই অনুবাত শুষ্ক অঞ্চলে হঠাৎ প্লাবন একপ্রকার স্তর প্লাবন ঘটায়, যার ফলে পর্বতের পাদদেশে (যেখানে ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ ঘটে) পেডিমেন্টের সৃষ্টি হয়।

e) কিং এর পেডিপ্লেনতত্ত্ব (Pediplanation theory by King)

কিং ও ফেয়ার (Fair) দক্ষিণ আফ্রিকার নাটলের ঢালবিবর্তন পর্যবেক্ষন করার সময় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মরু অঞ্চলের ঢাল চারটি উপাদান দিয়ে গঠিত হয়। চিত্রে তা দেখানো হল ঃ

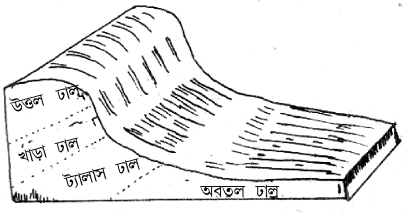

চিত্র নং 5.22

উপরিউক্ত ঢালের চারটি উপাদান একটি সুনির্দিষ্ট ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে দেখা যায় ও ভূমিরূপগঠনকারী প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ এই চারটি উপাদানযুক্ত অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়। নীচের সারণীতে তা দেখান হল।

ঢালের উপাদান	প্রক্রিয়া	ভূমিরূপ
উত্তল ঢাল (Convex Slope)	অবরোহন প্রক্রিয়া বিশেষত, যান্ত্রিক আবহবিকার, ক্ষয়ীভবন প্রভৃতি	ইনসেনাজ, টর অবশিষ্ট পাহাড়, ইত্যাদি
খাড়া ঢাল (Sharp Slope)	সমান্তরাল পশ্চাদপসারণ	খাড়াতল, ভৃগু গঠন ও পর্বত সীমান্ত গঠন
'ট্যালাস' ঢাল (Talus Slope)	পলল পাখা শিলা ও শঙ্কু আকৃতির সঞ্চয়	পলল পাখা ও পলল শঙ্কু
নিম্ন অবতল ঢাল (Lower concave slope)	পার্শ্বসমতলীকরণ ও অন্যান্য অবক্ষেপন	পেডিমেন্ট, বাজাদা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত সারণী থেকে দেখা যায় যে পেডিমেন্ট প্রধানতঃ নিম্ন অবতল ঢালে পার্শ্বসমতলীকরণের ফলেই গঠিত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে কিং এর এই তত্ত্বটি পদভূমিকরণ তত্ত্ব (Pedimentation Theory) হিসাবে পরিচিত এবং এই তত্ত্বটি পেঙ্কের সমান্তরাল পশ্চাদপসারণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

5.6 মরু অঞ্চলে ক্ষয়চক্র ও ভূমিরূপের উদ্ভব (Evolution of landforms and cycle of erosion in arid region)

ডেভিস (W. M. Davis) যে স্বাভাবিক ক্ষয় চক্রের অবতারণা করেন, সেই ক্ষয়চক্র মরু অঞ্চলেও দেখা যায়। ডেভিসের মতে যে কোন ভূমিরূপ শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি, প্রক্রিয়া ও পর্য্যায়ের উপর নির্ভরশীল। ("Landform is a function of structure, process and stage") যদি শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি ও ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া উভয়ই অপরিবর্তিত থাকে, ভূমিরূপগুলি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। একেই ক্ষয়চক্র (Cycle of erosion) বলে।

মরু অঞ্চলে বিভিন্ন পর্য্যায়ে এই ক্ষয়চক্র পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে হলে এবং বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ যথাযথভাবে উদ্ভব ও বিকাশ করার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি আদর্শ অবস্থার প্রয়োজন।

a) প্রাথমিক ভূ প্রকৃতি— ক্ষয় চক্র যেকোন প্রাথমিক ভূ প্রকৃতিতে কাজ শুরু করতে পারে। যেমন সমতল ভূ-প্রকৃতি, উচ্চ-ভূপ্রকৃতি, পর্বত বেষ্টিত অবনমিত অংশ প্রভৃতি। তবে আদর্শ অবস্থা হিসাবে পর্বত বেষ্টিত অবনমিত স্থান বা অববাহিকা উল্লেখযোগ্য।

b) ক্ষয় করার শেষ সীমা (Base level of erosion)

যে কোন ক্ষয় করার শেষ সীমার ক্ষয়চক্র কাজ করতে পারে ; তবে স্থানীয় ক্ষয় করার শেষ সীমাই মরুক্ষয়চক্রের একটি অন্যতম আদর্শ অবস্থা রূপে পরিগণিত হয়।* স্থানীয় ক্ষয় করার শেষ সীমা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়।

* ক্ষয় করার শেষ সীমা হিসাবে

(1) ধীর ক্রমউত্থিতমান ক্ষয় করার শেষ সীমা (slowly-rising local base level of erosion) (2) ধীর ক্রম অবনমিত ক্ষয় করার শেষ সীমা (slowly-sinking local base level of erosion) প্রথমোক্ত প্রকারটি সাধারণতঃ অন্তবর্তী বা মধ্যবর্তী জলাশয় বা প্লায়া হ্রদ বাতাসের পরিবহন ও সঞ্চয়কার্যের ফলে দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকারটি মরু অঞ্চলের অবনমিত অংশে বা জলাশয় বা হ্রদে বাতাসের অপসরণ ও ক্ষয় প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যায়।

c) ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া (Geomorphic Processes)— মরু অঞ্চলে আদর্শ ক্ষয়চক্রের মাধ্যমে পর্য্যায়ক্রমে যে সকল ভূমিরূপের উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশ বা ক্ষয় হয়, তাদের পরিপূর্ণ উদ্ভবের জন্য বাতাসের কার্য এবং জলধারার কার্য উভয়ই প্রয়োজন।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মরু অঞ্চলে আদর্শ ক্ষয়চক্রের জন্য পর্বতবেষ্টিত অববাহিকা অঞ্চল, স্থানীয় ক্ষয়কার্যের শেষ সীমা হিসাবে প্লায়া হ্রদ বা মধ্যবর্তী জলাশয় এবং বাতাস ও জলধারার কার্য বিশেষভাবে আবশ্যক। ভূমিরূপ বিশারদগণ মরু অঞ্চলে ক্ষয়চক্রের চারটি পর্য্যায়ে উল্লেখ করেন ঃ a) প্রাথমিক বা নবীন পর্য্যায় (stage of youth) (b) প্রাক্ পরিণত বা নবীনত্তোর পর্য্যায় (Stage of Late youth or Early Maturity) (c) পরিণত পর্য্যায় (Stage of maturity) এবং (d) বার্দ্ধক্য পর্য্যায় (Stage of senility or old age)

a) প্রাথমিক পর্য্যায় ঃ পার্বত্য ঢাল বেয়ে স্বল্পায়ু নদীগুলি ধৌত ঢালের সৃষ্টি করে এবং নদীগুলি ক্রমশঃ বোঝাপ্রাপ্ত হয় ও শেষ পর্যন্ত প্লায়া হ্রদে পতিত হয়। প্লায়া হ্রদ ক্রমশঃ ভরাট হওয়ার ফলে ক্ষয় করার শেষ সীমা উত্থিত হতে থাকে। তবে এই পর্য্যায় এখনও দুটি পাশাপাশি নদী-অববাহিকার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় না যদিও জল বিভাজিকার উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পায়।

b) নবীনোত্তর বা প্রাক্-পরিণত পর্য্যায় ঃ নবীন পর্য্যায়ের শেষ দিকে অর্থাৎ প্রাক্ পরিণত পর্য্যায়ে প্লায়া হ্রদ প্রায় ভরাট হয়ে আসে ও দুটি পাশাপাশি নদী অববাহিকার মধ্যে একপ্রকার যোগসূত্র স্থাপিত হয় কারণ জলবিভাজিকার উচ্চতা যেমন একদিকে হ্রাস পায়, আবার অন্যদিকে স্থানে স্থানে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে ভেঙে যায়। ক্রমশঃ বৃষ্টিপাত ও ধৌতঢাল প্রক্রিয়া হ্রাস পেতে থাকে ও ক্ষুদ্র স্বল্পায়ু অধিক বোঝা সম্পন্ন নদীগুলির প্রবাহক্ষমতা ও কর্দমক্ষমতা উভয়ই হ্রাস পায়।

c) পরিণত পর্য্যায় ঃ এই পর্য্যায়ের শুরুতে দুটি পাশাপাশি নদী অববাহিকার মধ্যে সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় ও উভয় নদী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি জলনির্মাণ প্রণালীর সৃষ্টি করে। এই সময় পাহাড়ের উচ্চতা হ্রাস পাওয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও হ্রাস পায়। প্লায়া হ্রদ বা মধ্যবর্তী জলাশয় সঞ্চয় কার্যের ফলে ভরাট হওয়ায় আপেক্ষিক ভূ-প্রকৃতিও (relative relief) হ্রাস পায়। এই অবস্থায় মরু অঞ্চলে বায়ুর কার্য অন্যতম ভূমিরূপগঠনকারী শক্তি হিসাবে কাজ করে। এর ফলে বায়ুর বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

d) শেষ পর্য্যায় বা বার্দ্ধক্য পর্য্যায় ঃ শেষ পর্য্যায়ে সমগ্র মরু অঞ্চলটি একটি সমতল ভূমিতে পরিণত হয় যাকে লসন 'প্যানফান' (Panfan) ম্যাক্সন ও অ্যান্ডারসন 'পেডিপ্লেন' (Pediplain) এবং অন্যান্যরা মরু সমপ্রায়ভূমি (Desert Peneplain) নামে অভিহত করেছেন। এই সমতলভূমির তিনটি বিশেষ ভূমিরূপ দেখা যায়— পেডিমেন্ট, বাজাদা ও ম্যালিনা। (মরু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার সমতল ভূমি অনুচ্ছেদে এই তিন প্রকার সমতলভূমির আলোচনা করা হয়েছে)।

শেষ পর্য্যায়ে আরো একটি ভূমিরূপের উদ্ভব হয়। মরু পর্বতগুলি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এবং বায়ুর কার্যের ফলে একপ্রকার প্রায় মসৃণ শৈলশিরা আকৃতি বিশিষ্ট ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় যাকে ইন্সেলবার্জ (Inselberg) বলে। কোন কোন ভূমিরূপ বিশারদের মতে এই ইন্সেলবার্জ ; নদীপ্রধান আর্দ্র অঞ্চলের মোনাড্নকের অনুরূপ এক ভূমিরূপ

হিসাবে পরিগণিত হয়। জার্মান বিশারদগণ অবশ্য উল্লেখ করেন যে, পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে অবশিষ্ট পাহাড় বা মোনাড্‌নক সৃষ্টি হলেও পর্বতের অনুবাত ঢালে ইন্‌সেলবার্জের সৃষ্টি হয়। আবার কোন কোন ভূমিরূপবিশারদগণ বলেন যে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ আর্দ্র পরিবেশ থেকে শুষ্ক পরিবেশের সৃষ্টি হলে মোনাড্‌নক জাতীয় শেষ পর্য্যায়ের অবশিষ্ট ভূমিরূপ ইনসেলবার্জে রূপান্তরিত হয়।

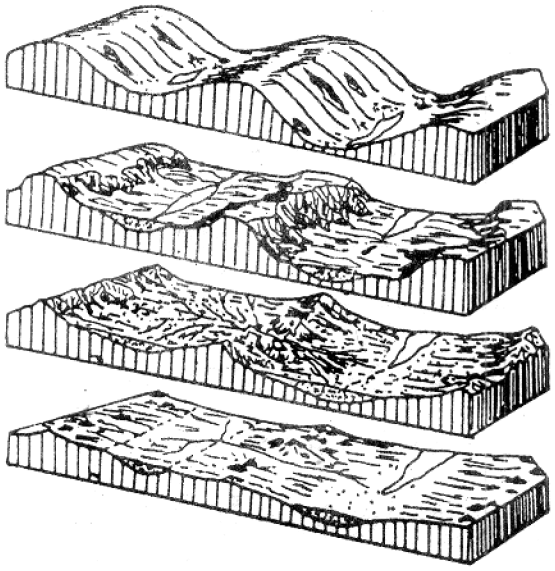

চিত্র ঃ 5.23 মরু অঞ্চলের ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায়

5.7 সারাংশ

শুষ্কতাই মরু বা শুষ্ক অঞ্চলের অন্যতম স্বাতন্ত্র্য এবং বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা, বায়ুর কার্য যান্ত্রিক আবহবিকারে প্রাধান্য ও বালির সঞ্চয় প্রধানত মরু অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয়— এই তিন প্রকার প্রক্রিয়ার ফলেই মরু অঞ্চলে ভূমিরূপের উদ্ভব হয় ; তবে ভূমিরূপগুলি প্রাকৃতিক শক্তির ফলে স্থানান্তরিত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। মরু অঞ্চলে উদ্ভিদের ঘনত্ব আর্দ্র অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম। এর ফলে বায়ুর সক্রিয়তা অনেক বেশী হয়। পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুর কার্যের ফলে নানান্ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে মরু ঝড়, বালি ঝড়, বায়ুর অপসারণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে মরুভূমির আগ্রাসন (encroachment of desert) হয়। পরিবেশের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ পরিবেশ পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে মরু অঞ্চলের অধিকাংশ ভূমিরূপগুলি পরিবর্তনশীল কারণ বায়ুর গতিবেগ। বায়ুর দিক, বালির পদার্থের সরবরাহ, হঠাৎ প্লাবন প্রভৃতি কারণগুলি স্থান, কাল ও ভূ-প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়।

5.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. বিষয়মুখী রচনাধর্মী প্রশ্ন (600 শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান 10)

(1) মরু অঞ্চলে বাতাসের ক্ষয় কার্যের ফলে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, চিত্র সহযোগে তাদের বর্ণনা করুন।

(2) মরু অঞ্চলে বাতাসের সঞ্চয়কার্যের ফলে যে সকল ভূমরূপ গঠিত হয়,চিত্র সহযোগে তাদের ব্যাখ্যা করুন।

(3) মরু অঞ্চল বা শুষ্ক অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার সমতলভূমির বিশ্লেষণ করুন।

(4) মরুভূমি পরিবেশ ভূমিরূপের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(5) পেডিমেন্ট উদ্ভবের যে সকল তত্ত্ব প্রচলিত আছে,তাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা করুন।

(6) ক্ষয়চক্রের মাধ্যমে মরু-অঞ্চলে ভূমিরূপ উদ্ভবের বিভিন্ন পর্য্যায়গুলি বিশ্লেষণ করুন।

(7) বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ির শ্রেণীবিভাগ করে তাদের ব্যাখ্যা করুন।

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (150 শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান - 4)

(1) মরু অঞ্চলে যান্ত্রিক আবহবিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(2) পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কণ করে মরুভূমির অবস্থান দেখান ও মরুভূমি সৃষ্টির কারণগুলি উল্লেখ করুন।

(3) বায়ুর ক্ষয় প্রক্রিয়াগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(4) বায়ুর সঞ্চয় প্রক্রিয়াগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(5) বায়ুর পরিবহন প্রক্রিয়াগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(6) ভূমিরূপের পরিপ্রেক্ষিতে আর্দ্র ও শুষ্ক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

(7) বার্খান ও 'সিফ' বালিয়াড়ির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

(8) বার্খান ও পরাবৃত্তীয় বালিয়াড়ির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

(9) 'পেডিমেন্ট' ও 'বাজাদা'র মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

(10) মোনাড্নক ও ইনসেনবার্জের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

C. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (50 শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2)

(1) অন্তর্বাহিণী নদী কাকে বলে ?

(2) 'স্প্যাসমেডিক প্রবাহ' কাকে বলে ?

(3) ইয়ার্দং কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

(4) মরু অঞ্চলে নদীগুলি স্বল্পায়ু হয় কেন ?

(5) আর্দ্র সমতলীকরণ প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝায় ?

(6) ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ বলতে কি বোঝায় ?

(7) স্তর প্রবাহ কাকে বলে ?

(8) 'ব্লো-আউট' কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

(9) বার্খান কিভাবে 'সিফ্' বালিয়াড়িতে রূপান্তরিত হয় ?

(10) পেডিমেন্ট প্রসঙ্গে কিং-এর তত্ত্বটি কি ?

D. নৈর্ব্যক্তিক বা অব্‌জেক্‌টিভ্‌ প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান — 1 নম্বর)

(1) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(i) মরু অঞ্চলে হঠাৎ বা আকস্মিক প্রবাহকে —— প্রবাহ বলে।

(ii) ভারতের মরুভূমিকে —— বলে।

(iii) রাজস্থানে অপসরণ প্রক্রিয়ার ফলে যে গর্তের সৃষ্টি হয়, তাকে —— বলে।

(iv) বায়ুর অবঘর্ষের ফলে ব্যাঙের ছাতা আকৃতিবিশিষ্ট ভূমিরূপকে —— বলে।

(v) পৃথিবীর বৃহত্তম ব্লো-আউটের নাম——।

(2) সত্য অথবা মিথ্যা টিক্‌ দিন।

(i) সিফ্‌ বালিয়াড়ির সমান্তরালে বায়ুপ্রবাহ হয় (সত্য / মিথ্যা)

(ii) বাজাদা একটি ক্ষয়জাত সমভূমি (সত্য / মিথ্যা)

(iii) মরু অঞ্চলের নদীগুলি স্বল্পায়ু হয়। (সত্য / মিথ্যা)

(iv) মরু অঞ্চলে প্রধানত রাসায়নিক আবহবিকার পরিলক্ষিত হয় (সত্য / মিথ্যা)

(v) ভূমি বিসর্পন একটি ক্ষয় প্রক্রিয়া (সত্য/ মিথ্যা)

(3) উপযুক্ত মিল খুঁজে জোড়া তৈরী করুন।

সিফ্‌	অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়ি
নিচ্‌	অন্তর্বাহিনী নদী
স্যালিনা	ক্ষয়জাত খাঁজ
বার্খান	অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি
লুনি	শুষ্ক ও ভরাট প্লায়া

5.9 উত্তরমালা

A 1. [05.51 দ্রষ্টব্য]

A 2. [05.52 দ্রষ্টব্য]

A 3. [05.6 দ্রষ্টব্য]

A 4. [05.3 দ্রষ্টব্য]

A 5. [05.61 দ্রষ্টব্য]

A 6. [05.8 দ্রষ্টব্য]

A 7. [05.5.2.2 দ্রষ্টব্য]

B 1. [05.3 আবহবিকারের প্রকৃতি ও সংশ্লিষ্ট ফুট নোট দেখুন]

B 2. [0.54 দ্রষ্টব্য]

B 3. [05.5.1.1 দ্রষ্টব্য]

B 4. [05.5.2.1 দ্রষ্টব্য]

B 5. [05.5.2 দ্রষ্টব্য]

B 6. [ভূমিরূপগঠনকারী প্রক্রিয়া, ভৌগোলিক পরিবেশ আবহবিকার, প্রাকৃতিক শক্তি ও ভূমিরূপের সাপেক্ষে আর্দ্র অঞ্চলের নদীর কার্য ও শুষ্ক অঞ্চলে বায়ুর কার্য উল্লেখ করুন]

B 7. [05.5.2.2 অনুচ্ছেদে বার্খান ও 'সিফ' বালিয়াড়ির পার্থক্য দ্রষ্টব্য]

B 8. [05.5.2.2 অনুচ্ছেদে বার্খান ও পরাবৃত্তীয় বালিয়াড়ির পার্থক্য দ্রষ্টব্য]

B 9. [05.6 অনুচ্ছেদে পেডিমেন্ড ও বাজাদার পার্থক্য দ্রষ্টব্য]

B 10. [05.8 অনুচ্ছেদে বার্দ্ধক্য পর্য্যায়ের শেষ অংশ দেখুন]

C 1. [05.3 অনুচ্ছেদে 'অন্তর্বাহিনী নদী' দেখুন]

C 2. [05.3 অনুচ্ছেদে জলবায়ুর প্রকৃতি দেখুন]

C 3. [05.1.2 অনুচ্ছেদে ইয়ার্দং দেখুন]

C 4. [05.3 অনুচ্ছেদে নদীর প্রকৃতি দেখুন]

C 5. [05.6 অনুচ্ছেদে পার্শ্বসমতলীকরণ তত্ত্ব দেখুন]

C 6. [05.6 অনুচ্ছেদে কিং-এর তত্ত্ব দেখুন। এর সঙ্গে পেঙ্কের তত্ত্বটিও ব্যাখ্যা করবেন]

C 7. [05.6 অনুচ্ছেদে স্তর প্লাবন তত্ত্ব দেখুন]

C 8. [05.5.1.2 অনুচ্ছেদে 'ব্লো-আউট' দেখুন]

C 9. [05.5.2.2 অনুচ্ছেদে তির্য্যক বালিয়ারি অংশে বার্খান থেকে 'সিফ্' বালিয়াড়ি গঠনের চিত্র ও ব্যাখ্যা দেখুন]

C 10. [05.7 অনুচ্ছেদে কিং এর তত্ত্ব দেখুন]

D 1. (i) স্প্যাসমোডিক
(ii) থর বা মরুস্থলী
(iii) 'ধান্দ'
(iv) গৌর
(v) কাতারা

D 2. (i) সত্য
(ii) মিথ্যা
(iii) সত্য
(iv) মিথ্যা
(v) মিথ্যা

D 3.

সিফ	—	অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি
নিচ্	—	ক্ষয়জাত খাঁজ
স্যালিনা	—	শুষ্ক ও ভরাট প্লায়া
বার্খান	—	অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়ি
লুনি	—	অন্তর্বাহিনী নদী

5.10 নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(হিমবাহের কার্য)

1. Wooldridge, S W and Morgan, R. S. (1959) : An outline of Geomorphology. The Physical Basis of Geography, Longman, London.
2. Thornbury.W D (1960) : Principles of Geomorphology, Wiley, New York.
3. Small R.J. (1973) : Study of Landforms, Cambridge University Press.
4. Sugden D. E. and John B S (1976) : Glaciers and Landscapes : A Geomorphological Approach, Edward Arnold, London.

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(বায়ুর কার্য)

1. Wooldriges S. W. and Morgan R. S. (1959) : An outline of Geomorphology the Physical Basis of Geography Longman, London.
2. Thornbury, W D (1960) : Principles of Geopmorphology Wiley, New York.
3. Small R. J. (1973) : Study of Landforms Cambridge University Press.
4. Cooke, R. U. and Warren A (1973) : Geomorphology in Deserts.
5. Marbbut, J.A. (1977) : Desert Landforms, Cambridge, Mars, MIT Press.
6. Chorley. R. J. Schumm, S. A., & Sugden, D. E. (1984) : Geomorphology

একক 6 ❐ উপকূল অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনের প্রক্রিয়া ও উদ্ভূত ভূমিরূপ

গঠন

6.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

6.2 উপকূল অঞ্চলের বিবর্তনে জোয়ার-ভাটা, সমুদ্র তরঙ্গ ও সমুদ্র স্রোতের গুরুত্ব

6.2.1 জোয়ার-ভাটা

6.2.2 তরঙ্গ

6.2.3 স্রোত

6.3 উপকূল ও তটভূমির বিভিন্ন অংশের সংজ্ঞা

6.4 উপকূল ও উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিরূপের বিবর্তন

6.4.1 ক্ষয়প্রক্রিয়া ও তার নিয়ন্ত্রক

6.4.2 ক্ষয়কার্যের ফলে উদ্ভূত ভূমিরূপ

6.4.3 সঞ্চয় কার্যের ফলে উদ্ভূত ভূমিরূপ

6.4.4 উপকূল অঞ্চলের পরিবহন কার্য

6.5 সমুদ্রপৃষ্ঠ পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ধারণা

6.6 উপকূল অঞ্চলের পার্শ্বচিত্রের বিবরণ

6.7 উপকূলের শ্রেণীবিভাগ

6.8 সারাংশ

6.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

6.10 উত্তরমালা

6.1 প্রস্তাবনা

উপকূল অঞ্চলে কার্যকরী প্রক্রিয়াগুলি নানা ধরণের তাই তাদের ভূমিরূপের উপর প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন। সেই কারণে উপকূল অঞ্চলে প্রতিটি ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ভূমিরূপের মধ্যে কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত ক্ষয়জাত রূপগুলি অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনশীল কিন্তু সঞ্চয়জাত রূপগুলির প্রায় নিত্য পরিবর্তন হয়।

সমুদ্র পৃষ্ঠের ওঠাপড়া উপকূলবর্তী ভূমিরূপ বিবর্তনে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ কারণ সমুদ্রের জল উপকূলের কতখানি অংশকে প্রভাবিত করবে, তা এর উপর উপকূলবর্তী ভূমিরূপের উদ্ভব ও বিবর্তন নির্ভর করে।

বিভিন্ন ধরণের উপকূলের বিবর্তন ও তার শ্রেণী বিভাগ ভূবৈজ্ঞানিকদের কাছে অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু উপকূল এলাকায় বিবর্তণের প্রক্রিয়াগুলি এত জটিল যে কোনো একটি আদর্শ শ্রেণী বিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

উপকূল অঞ্চলে ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারবেন এবং প্রতিটি প্রক্রিয়া কিভাবে ভূমিরূপের উপর তাদের স্বতন্ত্র ছাপ রেখে যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

- উপকূল অঞ্চলে ভূমিরূপের উদ্ভব জলের দ্বিমুখী প্রবাহের (bi-directional flow) প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- উপকূলবর্তী ভূমিরূপ থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ইতিহাস উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন।

6.2 উপকূল অঞ্চলের বিবর্তনে জোয়ার-ভাটা, সমুদ্র তরঙ্গ ও সমুদ্র স্রোতের গুরুত্ব

উপকূল অঞ্চলের ভূমিরূপের উদ্ভব ও বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি দু-ভাবে আসে—

(A) সৌরশক্তি থেকে ঃ— সৌর শক্তির তাপীয় ফলের (insolation) পরিবর্তনের জন্যই সাধারণভাবে ঋতু পরিবর্তন হয়, জলবায়ু পরিবর্তন হয়, উপকূল অঞ্চলে বায়ু প্রবাহিত হয় ও তরঙ্গ গঠিত হয়।

(B) **সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে ঃ**— সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হয়।

তরঙ্গ ও জোয়ার ভাটার যৌথ প্রভাবে সমুদ্র জলের সঞ্চারণ (drift) হয়ে থাকে, যাকে উপকূলীয় স্রোত (coastal currents) বলা হয়। বস্তুতঃ এদের মিলিত কাজের জন্যেই উপকূল অঞ্চলের যাবতীয় পরিবর্তন হয়।

6.2.1 জোয়ার-ভাটা (tides)

সমুদ্র পৃষ্ঠের দৈনিক পর্যায়ক্রম ওঠা পড়াকে জোয়ার ভাটা বলা হয়। উপকূল অঞ্চলের কতটা অংশ কতক্ষণ সময়ের জন্য সমুদ্র তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হবে সেটা জোয়ার ভাটার উপরই নির্ভর করে। উপসাগর (bay) বা খাঁড়ির (estuary) মুখের কাছে জোয়ার ভাটার জন্যে যে বিপরীতমুখী স্রোতের সৃষ্টি হয় তা উপকূল অঞ্চলে পলি পরিবহনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু পরিবহনই নয়, উপসাগর বা খাঁড়ির মুখের অংশকে পলিমুক্ত রাখতেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণ টানের ফলেই জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হয়। বস্তুত মাধ্যাকর্ষণের টান, মাটি এবং জল উভয়ের উপরই সমান, কিন্তু জলের সান্দ্রতা (viscosity) মাটির থেকে কম বলে তা সহজেই প্রভাবিত হয়।

অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমার সময় যখন পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র সারিবদ্ধ হয় তখন সূর্য ও চন্দ্রের মিলিত মাধ্যাকর্ষন টানের ফলে ভরা কোটাল (spring tide) দেখা যায়। 14 দিন অন্তর এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় (চিত্র 6.1 (a))। অপর দিকে সূর্য ও চন্দ্র যখন পৃথিবীর **পরিপ্রেক্ষিতে** 90^0 কোণ সৃষ্টি করে তখন সূর্য ও চন্দ্রর মাধ্যাকর্ষণ টান দুটি ভিন্ন দিকে কাজ করে। তার ফলস্বরূপ মরা কোটাল (neap tide) দেখা যায়। (চিত্র 6.1 (b))

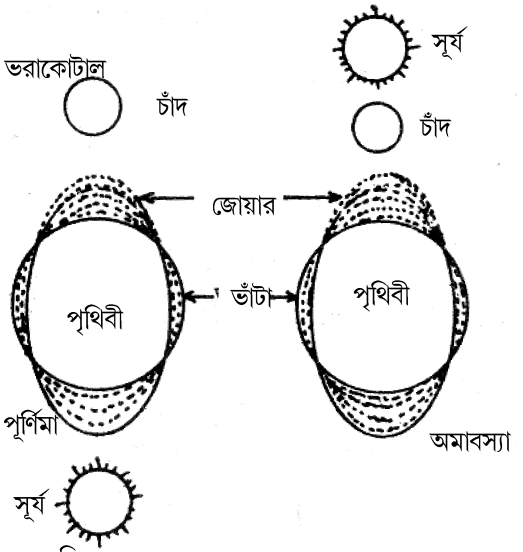

চিত্র নং 6.1 (a)

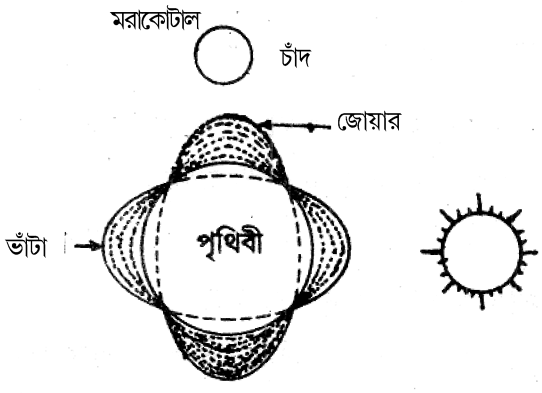

চিত্র নং 6.1 (b)

ভরা কোটালের সময় জোয়ার ভাটার সীমারেখার পার্থক্য সব থেকে বেশী থাকে বলে এই সময় জোয়ারের জল ভূমিভাগের সর্বাধিক অংশ নিমজ্জিত করতে পারে। আবার ভাটার সময় জল নেমে যায় বলে উপকূলের ততধিক অংশ উন্মোচিত হয়। জোয়ার ভাটার সীমারেখার পার্থক্য (tidal range) গভীর সমুদ্রে 50 সেন্টিমিটারের মত এবং মহীসোপানের (continental shelf) উপর অগভীর জলে এই পার্থক্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। জোয়ার ভাটার সীমারেখার পার্থক্য (tidal range) জলের গভীরতা অনুযায়ী কমে বাড়ে। তাই উন্মুক্ত সমুদ্র এবং স্থলভাগের দ্বারা পরিবেষ্টিত সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার সীমারেখার পার্থক্য কখনোই সমান নয়। বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ্য করেছেন যে যদি জোয়ার ভাটার সীমারখোর পার্থক্য উপকূল অঞ্চলে 2 মিটারের কম হয় তাহলে বায়ুচালিত সমুদ্র তরঙ্গের (wind generated waves) গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সে ক্ষেত্রে সৈকত (beaches), স্পিট (spit) ও বাঁধ (barrier) জাতীয় ভূমিরূপের আধিক্য দেখা যায়। অপর পক্ষে জোয়ার ভাটার সীমারেখার পার্থক্য 4 মিটারের বেশী হলে সেখানে জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত ভূমিরূপ যেমন কর্দমতট (mudflat) বা লবণাক্ত জলাভূমি (salt marsh) দেখা যায়।

6.2.2 তরঙ্গ (waves)

উপকূল অঞ্চলে ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস মূলতঃ বায়ু চালিত সমুদ্র তরঙ্গ। এই সমুদ্র তরঙ্গ উপকূল অঞ্চলের স্রোতকে (current) এমনভাবে প্রভাবিত করে যে সমুদ্র সৈকত (beach) বরাবর পলির অপসারণ ঘটে। কাজেই সৈকত গঠনে সামুদ্রিক প্রক্রিয়ার কার্যকলাপ বুঝতে হলে বায়ু চালিত সমুদ্র তরঙ্গ সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বায়ুমন্ডলের গতীয় শক্তি (kinetic energy) যখন বারিমন্ডলে (hydro sphere) সঞ্চারিত হয় তখন সমুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। উপকূল তরঙ্গ ভঙ্গের সময় এই শক্তির অনেকটাই খরচ হয়ে যায়। সমুদ্র তরঙ্গ ঠিক কিভাবে গঠিত হয় তা এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। তবে এ কথা বলা যায় যে বায়ু প্রবাহের ঘর্ষণের জন্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের

ওপরের স্তরে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। কাজেই তরঙ্গ আসলে শুধুমাত্র জলের উপরের স্তরের বাহ্যিক গড়ন। তরঙ্গের মধ্যে জলকণার পরিচলনের প্রকৃত ধরন অনেকটাই আলাদা।

সমুদ্র তরঙ্গের চরিত্রকে বর্ণনা করতে গেলে কয়েকটি প্রচলিত শব্দ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। তরঙ্গের দুটি শীর্ষ বিন্দুর মধ্যে বা দুটি পাদবিন্দুর মধ্যের দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length-λ) বলা হয় এবং তরঙ্গের শীর্ষবিন্দু ও পাদবিন্দুর ব্যবধানকে তরঙ্গ উচ্চতা (wave height, H) বলা হয়। আবার, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে যদি একটি তরঙ্গ শীর্ষ এবং কিছু সময় পরে অপর একটি তরঙ্গ শীর্ষ ছুঁয়ে যায় তাহলে দুই তরঙ্গ শীর্ষের আবির্ভাবের অন্তবর্তী সময়কে তরঙ্গ পর্যায় কাল (wave period (T)) বলে (চিত্র 6.2) যে

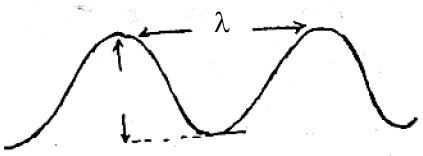

λ=তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
H=তরঙ্গ উচ্চতা

চিত্র নং 6.2

কোনো তরঙ্গের গতিবেগ (c) তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (λ) উপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্কে একটি সহজ সমীকরণের (equation) সাহায্যে বোঝানো যায়—

$$c = \frac{\lambda}{T}$$

তরঙ্গের গতি মন্থর হয়ে গেলে তার দৈর্ঘ্যও কমে যায়। একটি তরঙ্গ পৃষ্ঠের গড়নকে মোটামুটি একটি সাইক্লয়েড (cycloid) হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। সাইক্লয়েড একটি বিশেষ ধরণের বক্ররেখা। তরঙ্গের মধ্যে এক একটি জলকণা বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে একটি সরল রেখায় এগিয়ে যেতে থাকে। এই জলকণার গতিপথটি একটি রেখার সাহায্যে আঁকা যায় তাহলে সেটি একটি সাইক্লয়েড (cycloid) গঠন করবে (চিত্র 6.3)।

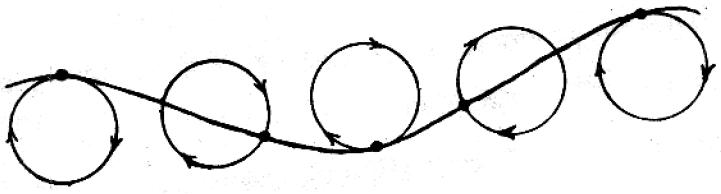

একটি জলকণা বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে যায় ও একটি সায়ক্লয়েড গঠন করে।

চিত্র নং 6.3

জলকণাগুলি যখন বৃত্তাকারে ঘোরে তখন তাদের সম্পূর্ণ বৃত্ত গঠন করেনা। এর ফলে জলকণাগুলি ধীরে ধীরে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে। বায়ু প্রবাহের দিক লক্ষ্য করে জলকণার এই ক্রমান্বয় এগিয়ে যাওয়ার ফলে উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের জল স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে।

উপকূল থেকে দূরে জলকণাগুলি বৃত্তাকারে ঘুরলেও উপকূলের কাছাকাছি এদের কক্ষপথ ক্রমশ ডিম্বাকৃতি হয়ে যায়। আবার, জলের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের ব্যাসও ক্রমশ কমতে থাকে। একেবারে তলদেশের কাছে কক্ষপথ এতই চ্যাপ্টা হয়ে যায় যে জলকণাগুলি আর বৃত্তাকারে না ঘুরে শুধুমাত্র একটি সরলরেখা ধরে সামনে পিছনে চলাচল করে (চিত্র 6.4)

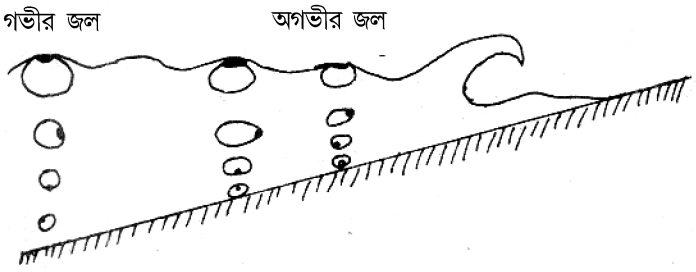

চিত্র 6.4

একটি তরঙ্গ যখন ক্রমশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হয় তখন গভীর থেকে অগভীর জলের দিকে যাবার ফলে তরঙ্গের চরিত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। যখন জলের গভীরতা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে যায় তখন সমুদ্রবক্ষের ঘর্ষণের প্রভাব ক্রমশ তরঙ্গ পাদদেশে অনুভূত হয়। এই ঘর্ষণের ফলে প্রতিটি তরঙ্গের গতি তাদের পিছনের তরঙ্গের গতির চেয়ে মন্থর হয়ে পড়ে। যেহেতু তরঙ্গের গতিবেগ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, গতি মন্থর হতে থাকলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও কমতে থাকবে। এর ফলে তরঙ্গের গতি মন্থর হয়ে পড়ে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় ও তার উচ্চতা ততধিক বৃদ্ধি পায় ও একটি সময় আসে যখন তরঙ্গ শীর্ষ ও তরঙ্গ পাদদেশের গতিবেগের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। ঘর্ষণের ফলে পাদদেশে গতিবেগ হারালেও শীর্ষটি অধিক গতিবেগের সাহায্যে অনেকটা এগিয়ে যায়। তরঙ্গ শীর্ষ যখন নিজের অবলম্বন হারায় তখন ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে ভেঙ্গে পড়ে।

ভেঙ্গে পড়বার সময় তরঙ্গ শীর্ষটি কিছুটা এগিয়ে যায় এবং ফেনিল জলপ্রবাহ (surf) সৃষ্টি করে। শীর্ষ যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন জলকণাগুলি তার কক্ষপথ পরিক্রমণ সমাপ্ত করতে পারে না এবং সমুদ্রের ভূমির ঢাল বরাবর কিছুটা উপরে উঠে যায়। একে উর্ধ্ব ধাবন (swash) বলা হয়। জলের ঊর্ধ্বে ধাবনের সঙ্গে সৈকত অঞ্চলের কিছু পলিও ঢাল বেয়ে উঠে আসে এই জল আবার ঢাল বেয়ে নামতে থাকে যতক্ষণ না পরবর্তী ঊর্ধ্ব ধাবন এসে তার গতিপথ রোধ করে। একে পশ্চাৎ ধাবন (back wash) বলে। ঊর্ধ্ব ধাবনের সময় কিছু জল মাটির মধ্যে অনুস্রবনের (percolation) মাধ্যমে প্রবেশ করে। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই ঊর্ধ্ব ধাবনের থেকে পশ্চাৎ ধাবনে জলের পরিমান কিছুটা কমে যায়। ঊর্ধ্বধাবন বেশী শক্তিশালী হলে সৈকত অঞ্চলে সঞ্চয় বেশী হয় এবং বেশী শক্তিশালী পশ্চাৎ ধাবন সৈকতের পশ্চাৎ অপসারণে (retreat) কার্যকরী হয়।

তরঙ্গের উচ্চতা ও সৈকতের ঢাল অনুযায়ী ভগ্ন তরঙ্গের (breaker) চরিত্র মূলতঃ তিন ধরণের হয় ঃ

(A) আনত তরঙ্গ ভঙ্গ (spilling breaker)

এই ক্ষেত্রে তরঙ্গ শীর্ষ হঠাৎ ওপর থেকে ভেঙ্গে পড়েনা, বরং ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফেনিল তরঙ্গ শীর্ষ সৃষ্টি করে। তরঙ্গের গঠন মোটামুটি না বদলালেও তরঙ্গ উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পায়। খুব অল্প ঢাল যুক্ত সৈকতে (beach) এ ধরণের তরঙ্গ ভঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র নং 6.5 (a))

(a) আনত তরঙ্গ ভঙ্গ

(b) অবনত তরঙ্গ ভঙ্গ

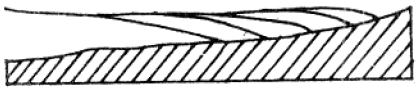

(c) ভগ্ন তরঙ্গের চরিত্র

চিত্র 6.5

(B) অবনত তরঙ্গ ভঙ্গ (plunging breaker)

এই ধরণের তরঙ্গ ভঙ্গে তরঙ্গ শীর্ষ সোজাসুজি ওপর থেকে ভেঙ্গে পড়ে এবং ভাঙ্গাবার পরই ছোট ছোট তরঙ্গে বিশ্লেষিত (distintegrated) হয়ে সৈকতের ঢাল বরাবর উঠতে থাকে। মাঝারি ঢাল যুক্ত সৈকতে এই তরঙ্গ-ভঙ্গ লক্ষ্যনীয়। (চিত্র নং 6.5 (b))

উত্তালিত তরঙ্গ ভঙ্গ (surging breaker)

এই ক্ষেত্রে তরঙ্গের পাদদেশে সৈকতের ঢাল বেয়ে আগে উপরে উঠে যায় এবং তরঙ্গ শীর্ষ পিছিয়ে পড়ে। সৈকতের ঢাল যথেষ্ট বেশী থাকলে এই ধরণের তরঙ্গ ভঙ্গ দেখা যায়। (চিত্র নং 6.5 (C))

একটি তরঙ্গ মালা যে কোনো ভাবেই উপকূলের দিকে অগ্রসর হোক না কেন, তরঙ্গ শীর্ষ (wave crests) রেখার উপকূলের সঙ্গে সর্বদা সমান্তরাল হবার চেষ্টা করে। এই প্রবণতার জন্যেই অগভীর জলের কাছাকাছি এলেই তরঙ্গ শীর্ষ রেখা ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করতে থাকে, যতক্ষণ না তারা উপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে তরঙ্গ প্রতিসরণ (wave refraction) বলে। তরঙ্গ প্রতিসরণ যেহেতু জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে, সেই হেতু সমুদ্র তলের সমোন্নতি রেখার (submarine contours) সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে সব ক্ষেত্রে তরঙ্গ প্রতিসরণ (wave refraction) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে না, অর্থাৎ তরঙ্গ শীর্ষ রেখা সম্পূর্ণ ভাবে উপকূলের সমান্তরাল হবার সুযোগ পায় না। তরঙ্গ প্রতিসরণের জন্যে

উপকূলের মস্তকভাগে (headland) প্রতিসৃত তরঙ্গাগুলি এসে একত্রিত হয় এবং উপসাগরের কাছে এসে তারা পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে মস্তকভাগে তরঙ্গা শক্তির কেন্দ্রভবন (concentration) ঘটে এবং উপসাগরের কাছে বিকেন্দ্রীভবন হয়।

6.2.3 স্রোত (Currents)

সমুদ্র তরঙ্গোর আরও একটি কার্যকারিতার উল্লেখ না করলে উপকূল অঞ্চলের ভূমিরূপ উদ্ভবের সমগ্র প্রক্রিয়াটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমুদ্র তরঙ্গোর প্রভাবে উপকূলের নিকটবর্তী স্থানে সমুদ্র স্রোতের (current) উদ্ভব হয়। সেই স্রোত দু-ধরনের হতে পারে—

(A) উপকূলের সমান্তরাল স্রোত যাকে অনুতটীয় প্রবাহ (longshore current) বলে।

(B) উজান তটীয় স্রোত (ripcurrent) যা উপকূলের থেকে সমুদ্রের দিকে লম্বভাবে প্রবাহিত হয়।

তরঙ্গা ভঙ্গা রেখে উপকূলের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যায় যে ক্রমাগত জল স্তূপীকৃত হবার ফলে এই অঞ্চলে জলের উচ্চতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তট থেকে সমুদ্রের দিকে জলের স্তরের ঢাল বরাবর উজানতটীয় স্রোত (rip current) প্রবাহিত হয়। তরঙ্গা ভঙ্গা রেখার উচ্চতা (breaker height) যেখানে কম থাকে সেখানেই উজানতটীয় স্রোতের প্রাধান্য বেশী। তরঙ্গা ভঙ্গা রেখার উচ্চতা বেশী হলে উজানতটীয় স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বেশী দূর বয়ে যেতে পারে না। যেখানে উপকূল অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে মস্তকভূমি (headland) ও উপসাগর (bay) দেখা যায় সেখানে অনুতটীয় প্রবাহ মস্তকভূমি থেকে উপসাগরের দিকে বয়ে চলে মোটামুটি উপকূলের সঙ্গো সমান্তরাল ভাবে। অপরদিকে উপসাগরের সামনে থেকে উজানতটীয় স্রোত লম্বাভাবে সমুদ্রের দিকে ফিরে যায়। অনুতটীয় ও উজানতটীয় স্রোতের যৌথ প্রভাবে উপকূল অঞ্চলে স্রোতের কোষ সঞ্চালন (cell circulation) দেখা যায়। উপকূল অঞ্চলের পরিবহন কার্যে কোষ সঞ্চালনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (চিত্র নং 6.6)

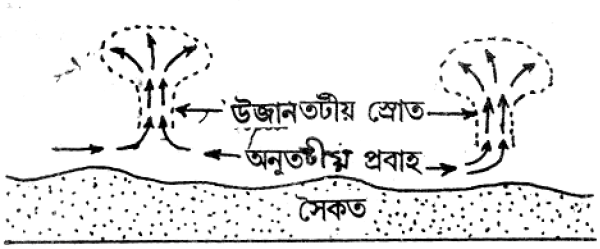

উপকূল অঞ্চলে স্রোতের কোষসঞ্চালন
চিত্র 6.6

6.3 উপকূল ও তটভূমির বিভিন্ন অংশের সংজ্ঞা

উপকূল অঞ্চলের ভূমিরূপের প্রবর্তন সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমেই উপকূল অঞ্চলের বিভিন্ন অংশগুলিকে চিনে নিতে হবে। অনেক সময় 'উপকূল' (coast) ও 'তট' (shore) কথা দুটি প্রায় প্রতিশব্দের মত ব্যবহৃত হয় কিন্তু ডি. ডব্লু জনসনের (D. W. Johnson) মত অনুযায়ী উপকূল ও তট দুটি ভিন্নার্থক শব্দ। সমুদ্র তট ও পশ্চাদভূমির (hinterland) মধ্যে যেখানে সুস্পষ্ট ঢালের পরিবর্তন দেখা যায়, সেই খাড়া ঢাল যুক্ত অংশটিকে

সমুদ্রভৃগু (cliff) বলে। ভৃগুর পশ্চাদবর্তী অংশকে 'উপকূল' (coast) বলে। অপরদিকে, ভাঁটার সীমারেখার (low tide level) থেকে ভৃগুর পাদদেশ পর্যন্ত অংশটিকে 'তট' বলে। জোয়ার ও ভাটার সীমারেখার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তটের সীমারেখার পরিবর্তনও অপরিহার্য। তটীয় অংশকে আবার দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ভাটা ও জোয়ারের সীমা রেখার মধ্যবর্তী অংশকে অগ্রতট (fore shore) বলে এবং জোয়ার সীমা রেখা থেকে ভৃগু পাদদেশ পর্যন্ত অংশকে পশ্চাদ্‌তট (backshore) বলে। আবার ভাটার সীমারেখার থেকে সমুদ্রের দিকের অংশকে প্রতিতট (offshore) বলে। (চিত্র নং 6.7)

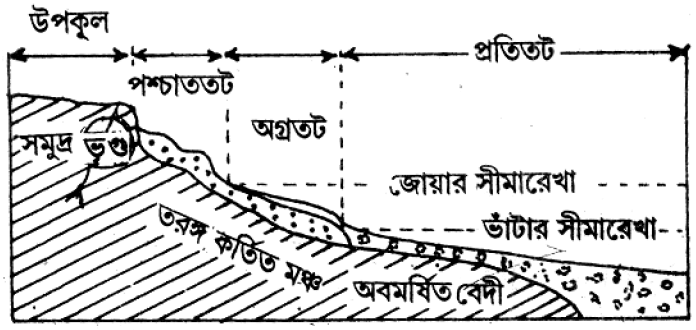

উপকূল ও তটীয় ভূমির বিভিন্ন অংশ
চিত্র 6.7

উপকূল ও তটের এই বিভিন্ন অংশে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ দেখতে পাই। তটীয় অঞ্চলেই আমরা সৈকত (beach) দেখতে পাই যা তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চের (wave cut platform) ওপর সূক্ষ্ম বালুকণার একটি আস্তরণ বিছিয়ে রাখে। সমুদ্রের দিকে যতদূর পর্যন্ত কোনো ঢালের পরিবর্তন হচ্ছে না ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চটি বিস্তৃত হতে পারে ; বা আরও গভীর সমুদ্রের মধ্যে অগ্রসর হয়ে অবঘর্ষিত বেদির (abrasion platform) সঙ্গে মিলিত হতে পারে। অবঘর্ষিত বেদির উপরে বিছিয়ে থাকা সূক্ষ্ম দানাযুক্ত পদার্থের পাতলা আস্তরণটি ধীরে ধীরে পুরু হতে থাকে, যত আমরা গভীর সমুদ্রের দিকে যাই। এই অংশটিকে মহাদেশীয় তটীয় মঞ্চ (continental shore terrace) বলা যেতে পারে। (চিত্র নং 6.7)

6.4 উপকূল ও উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিরূপের বির্বতন

6.4.1 ক্ষয় প্রক্রিয়া ও তার নিয়ন্ত্রক

সমুদ্র তরঙ্গের এক একটি জলকণা কক্ষপথে সমানে ঘুরে চলেছে বলে উপকূলগামী তরঙ্গের মধ্যে শুধু যে গতীয় শক্তি (kinetic energy) আছে তাই নয় ; গড় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার পরিপ্রেক্ষিতে তরঙ্গ শীর্ষের উচ্চতা অনুযায়ী তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তিও (potential energy) আছে। একটি তরঙ্গ যখন কূলে এসে ভাঙ্গে তখন তার প্রচ্ছন্ন শক্তি, গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই শক্তির সাহায্যেই সমুদ্র তরঙ্গ তার যাবতীয় ক্ষয় কার্য করে।

যদিও উপকূল অঞ্চলের ক্ষয় প্রক্রিয়ার জন্য শুধুমাত্র তরঙ্গই দায়ী নয়, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সমুদ্র তরঙ্গের প্রভাবই সব থেকে বেশী। এই ক্ষয় প্রক্রিয়াকে মূলতঃ দুই ভাবে বোঝানো যেতে পারে—

(a) যান্ত্রীক প্রক্রিয়ায় ক্ষয় সাধন
(b) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্ষয় সাধন।

(a) যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (Mechanical erosion)

● জলের আঘাত (hydraulic action)

জলের আঘাতের জন্যে যে ক্ষয় তার দুটি দিক আছে। প্রথমতঃ, সরাসরি তরঙ্গ ভঙ্গের যে আঘাত, তার ফলে ভগ্নোদ্যত তরঙ্গ প্রচন্ড শক্তিতে ভৃগুর দেওয়ালে হাতুড়ির মত আঘাত করে। দ্বিতীয়তঃ, জলের চাপে ফাটল বা দারণের (joint) মধ্যে জমে থাকা বায়ু আকস্মিক ভাবে সংকোচিত হয় ও জলের চাপ হ্রাস পেলে পুনরায় তার আয়তন বৃদ্ধি পায়। বায়ুর এই আকস্মিক আয়তন বৃদ্ধি বিস্ফোরণের মত কাজ করে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে এই প্রক্রিয়াটি সরাসরি তরঙ্গ ভঙ্গের আঘাতের থেকে বহুগুন বেশী কার্যকরী। কোনো একটি সময়ে মাপা আঘাতের পরিমাণ দেখে সন্দেহ হয় যে কি ভাবে কঠিন শিলা এই আঘাতে ভাঙ্গাতে পারে। কিন্তু বারবার যদি এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে কঠিন শিলাও ফাটল বা দারণতল (joint plane) বরাবর সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

● অবঘর্ষ (corrasion)

সমুদ্র ভৃগু (marine cliff) থেকে ভেসে আসা নুড়ি, পাথর বা বালুকণা সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে চালিত হয় এবং ঊর্ধ্ব ধাবনের (back wash) সঙ্গে সমুদ্র উপকূলে এসে পড়ে। পশ্চাৎ ধাবনের (swash) সময় এই ক্ষয়জাত পদার্থকে তরঙ্গ অস্ত্রের মত ব্যবহার করে এবং এর ঘর্ষণে তলদেশের ভূমিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

● ত্বক ক্ষয় (attrition)

তরঙ্গের সঙ্গে ভেসে আসা নুড়ি পাথরগুলি শুধু যে মূল ভূমিভাগকেই ক্ষয়প্রাপ্ত করে তা নয়, পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে তাদের দানাগুলিও মসৃণ ও সুডোল হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে ত্বক ক্ষয় (attrition) বলে। তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চের মধ্যে অবস্থিত মন্থকূপের (pot hole) অবঘর্ষিত দেওয়ালে এবং তার ভিতরে পড়ে থাকা মসৃণ গোলাকৃতি পাথরের উপস্থিতি অবঘর্ষণ ও ত্বক ক্ষয় দুটি প্রক্রিয়ারই প্রমাণ দেয়। ক্ষয় প্রক্রিয়াজাত ভূমিরূপের সঙ্গে মন্থকূপ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। যান্ত্রীক ক্ষয়প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা মূলতঃ দুটি নির্ধারকের উপর নির্ভর করে—

—ভৃগু পাদদেশ থেকে তরঙ্গ ভঙ্গের রেখার (breaker line) দূরত্ব যত কম হবে যান্ত্রীক ক্ষয়ীভবনও তত প্রবল হবে।

—ভৃগুর কতটা অংশ সরাসরি তরঙ্গের সম্মুখীন হচ্ছে (exposure to wave)। ভৃগুর কিছু অংশ যদি উদ্ভিদ্ দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে তাহলে তরঙ্গ ভঙ্গের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে।

(b) রাসায়নিক প্রক্রিয়া (chemical erosion)

সমুদ্রে লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে এসে শীলার রাসায়নিক বিক্রিয়া (corrosion) হয়। উপকূলের যে অংশে ঢেউয়ের প্রভাবে বার বার আর্দ্র হয় সেই অংশে এই ধরণের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই বেশী দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রের জলের ফেনা বা জলের ছিটে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় ততদূর পর্যন্ত রাসায়নিক ক্ষয় হওয়া সম্ভব। জৈব রাসায়নিক (bio-chemical) প্রক্রিয়াতে অ্যালগি (algae), স্পঞ্জ (sponge) বা কম্বোজ (mollusc) জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী দুই সমান ভাবে অংশ নেয়।

যান্ত্রীক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি পৃথক ভাবে আলোচনা করা হলেও কোন উপকূলে কি ধরণের প্রক্রিয়া কতটা সক্রিয় তা মাপা অত্যন্ত কঠিন। উপকূল অঞ্চলের ক্ষয় কার্যে দুটি প্রক্রিয়াই কম বেশী অংশীদার।

6.4.2 ক্ষয়কার্যের ফলে উদ্ভূত ভূমিরূপ

● **সমুদ্র ভৃগু (cliff)**

সমুদ্র ভৃগুকে কোনো একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে বর্ণনা করা সহজ নয়। তবু বলা যেতে পারে যে সমুদ্রতট (shore) ও পশ্চাদ ভূমির (hinterland) মধ্যে সুস্পষ্ট ঢালের পরিবর্তন যেখানে দেখা যায় তাকেই ভৃগু বলা হয়। যে কোনো সক্রিয় ভৃগুর উপর দু-ধরণের প্রক্রিয়া একসাথে কাজ করে (ক) সমুদ্রের ক্ষয় এবং পরিবহন প্রক্রিয়া। (খ) উপবায়বীয় (subaerial) প্রক্রিয়া।

ভৃগুর ঢাল যে কোনো মাপেরই হোক না কেন, উপকূল অঞ্চলে তার অবস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে এই ভূমিরূপ গঠনে সামুদ্রিক প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তবে কোনো একটি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা সম্ভব নয়। এই দুটি প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর নির্ভর করে যে ভৃগুটির চেহারা কি ধরণের হবে। সরাসরি সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় কার্য প্রভাবিত করে ভৃগুর তলেদেশে উপরের অংশ পরিবর্তিত হয় মূলতঃ উপবায়বীয় প্রক্রিয়ার জন্যে। তবে সমুদ্রের নোনা জলের ছিটের জন্যে যে লবণ বিকার (Salt weathering) হয় তা বর্তমান সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার থেকে অনেক উপরে হতে পারে।

ধরে নেওয়া যাক্ যে উপকূল সংলগ্ন ভূখন্ডটি ক্রমশ ঢালু হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। এই ভূখন্ডের পাদদেশে প্রথম সমুদ্র তরঙ্গ তার ক্ষয় কার্য আরম্ভ করবে এবং প্রাথমিক অবস্থায় একটি খাঁজের (notch) সৃষ্টি করবে। যে তরঙ্গাগুলি পাদদেশে এসে ভাঙে তার শক্তি ও মূলের চাপের ফলে এই খাঁজ সৃষ্টি হয়। তবে এই খাঁজের মুখে পড়ে থাকা ক্ষয়জাত পদার্থকে যদি ঢেউ তাড়াতাড়ি সরিয়ে না নিয়ে যেতে পারে তাহলে এই খাঁজের আয়তন বৃদ্ধি পেতে পারবে না। ক্ষয়জাত পদার্থ যদি পাদদেশে জমে থাকে তাহলে খাঁজের নীচের ঢাল অনেক কমে যাবে এবং ঢেউগুলি আর খাঁজের কাছে এসে ভাঙ্গাবার সুযোগ পাবে না। যদি খাঁজটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে একটি বড় গহ্বরের আকার নেবে। এর ফলস্বরূপ গহ্বরের ওপরের অংশ তার নীচের অবলম্বন (basal support) হারাবে ও ভেঙে পড়বে। এই ভাবে মূল ভূখন্ডটির পশ্চাদ্ অপসারণ (recession) ঘটবে এবং একটি খাড়া ঢাল যুক্ত সমুদ্র ভৃগু সৃষ্টি হবে। সমুদ্র ভৃগু তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়গুলি (চিত্র নং 6.8) দেখলে বোঝা যাবে।

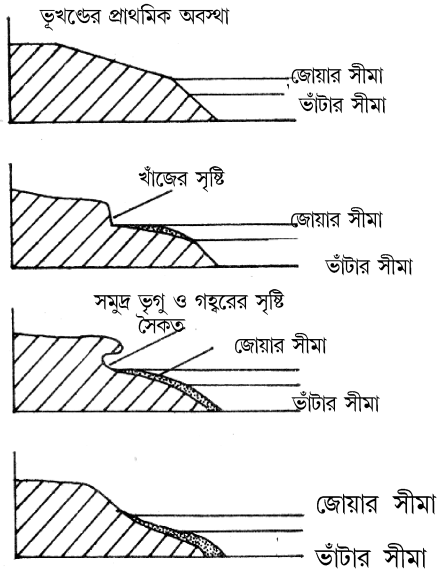

চিত্র নং 6.8

আগেই বলা হয়েছে যে ভৃগুর গঠনে উপবায়বীয় প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রক্রিয়া ভৃগুর উপরের অংশকে প্রভাবিত করে এবং ক্ষয়জাত পদার্থ গড়িয়ে এসে ভৃগুর পাদদেশে জমা হয়। এই ক্ষয়াবশিষ্ট স্তূপকে (debris) সরিয়ে নিয়ে যায় ঢেউয়ের পরিবহন ক্ষমতা। ভৃগুর উপরের ভাগ থেকে যে হারে ক্ষয়জাত পদার্থ পাদদেশে সঞ্চিত হয় সেই হারেই যদি সে গুলি অপসারিত হয় তা হলে ভৃগুর ঢাল খুব বেশী পরিবর্তিত হয় না।

যেখানে সঞ্চয়ের থেকে অপসারণের ক্ষমতা বেশী যেখানে প্রায় 90° ঢাল দেখা যেতে পারে। (চিত্র নং 6.9 (a)); আবার যেখানে অপসারণ প্রক্রিয়াকে সঞ্চয় প্রক্রিয়া ছাড়িয়ে যায় সেখানে ভৃগুর ঢাল কমতে থাকে (চিত্র নং 6.9 (b))।

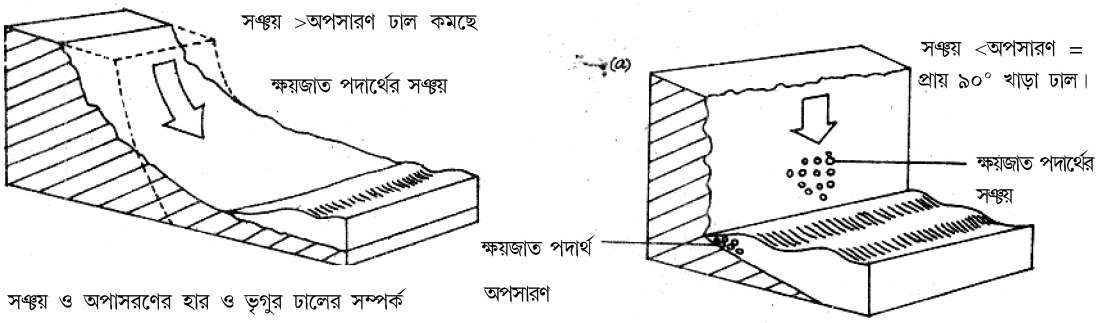

চিত্র 6.9 (a) (b)

সমুদ্র ভৃগুর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ ও তার ক্ষয় কয়েকটি উৎপাদকের (factor) উপর নির্ভর করে ঃ—

(A) **শিলার কাঠিন্য** ঃ— যদি ভৃগুটি কঠিন শিলা দিয়ে গঠিত হয় তাহলে তার ঢাল বেশী মাত্রায় খাড়া হয়, কিন্তু শিলা যদি নরম হয় তাহলে ভৃগুর উপরের ভাগে পুঞ্জিত ক্ষয় (mass wasting) বেশী হবে এবং পাদদেশ ক্ষয়াবশিষ্ট স্তূপ (debris) জমা হয়ে ভৃগুর খাড়া তলের ঢাল কমিয়ে দেবে।

(B) গাঠনিক দুর্বলতা (structural weakness) ও শিলাস্তরের অবস্থান ভঙ্গী (attitude of bed):- স্তরীভূত শিলা দিয়ে গঠিত অঞ্চলে শিলাস্তরের নতি সমুদ্রের দিকে নত হয়ে থাকলে শিলাস্তরগুলি সহজেই স্থানচ্যুত ভেঙ্গে পড়ে। তাহলে ভৃগুর সামনের অংশ অমসৃণ আকার নেয়। অপর পক্ষে শিলাস্তরের নতি যদি সমুদ্রের বিপরীত দিকে হয় তাহলে ভৃগুর ক্ষয় সহজে হয়না এবং সামনের ঢাল অনেক মসৃণ হয় (চিত্র নং 6.10)।

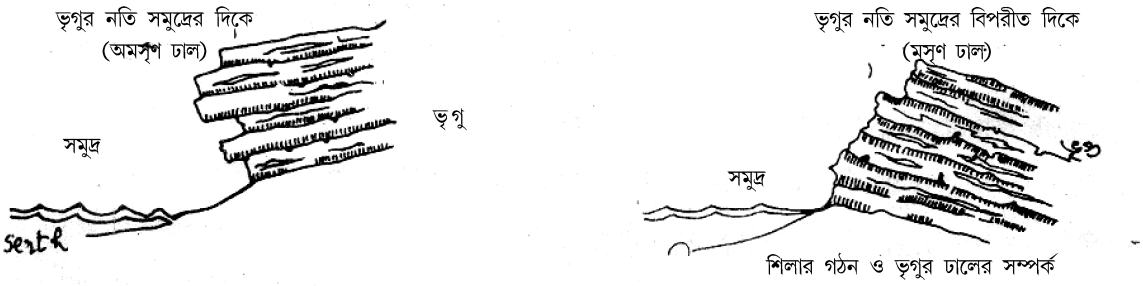

চিত্র 6.10

(C) শিলার দ্রবণীয়তা (solubility of rock) : দ্রবণীয় শিলা যখন সমুদ্রে নোনা জলের সংস্পর্শে আসে তখন ক্ষয়ের হার স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। তবে শুধু সমুদ্রের প্রভাবেই নয়, ক্রান্তিয় আর্দ্র অঞ্চলে উপবায়বীয় ক্ষয়ও দ্রবণীয় শিলা থাকলে বেশী হয়।

(D) উপকূলের রেখার বহিরাকৃতি (configuration of the coastline) : উপকূলের বহিরাকৃতির উপর নির্ভর করে কোন অংশে সমুদ্রে তরঙ্গ লম্বভাবে আঘাত করবে কোন অংশে তির্যক ভাবে আঘাত করবে। ঢেউ যত তির্যক ভাবে উপকূলে আছড়ে পড়ে তার ক্ষয় শক্তি তত দুর্বল হয়।

(E) ঢেউয়ের আঘাতের চরিত্র (nature of wave attack) : অবনত তরঙ্গ ভঙ্গো (plunging waves) ক্ষয় শক্তি যা থাকে তার থেকে আনত তরঙ্গ ভঙ্গো (spilling waves) ক্ষয় শক্তি অনেক কমে যায়। স্বাভাবিক ভাবে ক্ষয়ের হারেরও তারতম্য ঘটে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কলোম্বিয়া অঞ্চলে সমুদ্র ভৃগুর পশ্চাদ্ অপসারণের হার অত্যন্ত কম এবং ভৃগুর ঢলও খুব অল্প। এই অঞ্চলে পুঞ্জিত ক্ষয়ের পরিমাণ বেশী বলে ভৃগুর উপরের ক্ষয় সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়ের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অপর দিকে, শুষ্ক অঞ্চলের দিকে খাড়া ভৃগু দেখা যায়। পুঞ্জিত ক্ষয়ের হার এখানে কম বলে সমুদ্র তরঙ্গের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। ভারতের কাথিয়াবাড় উপকূলের দক্ষিণ পূর্ব অংশে বেশ কিছু স্থানে সমুদ্র ভৃগু দেখা যায়।

সমুদ্র গহ্বর ও তৎসহ সমুদ্র খিলান, স্তম্ভ ও দ্বীপ (sea caves and associated sea arch, stack and stump) : কোনো কোনো উপকূল অঞ্চলে পালাক্রমে ভূখন্ডে অগ্রভাগ (headland) এবং ছোট ছোট অপ্রধান উপসাগরের (minor bays) অবস্থান তটরেখাকে একটি জটিল রূপ এনে দেয়। এই ক্ষেত্রে সমুদ্র ভৃগুর অগ্রভাগ তিন দিক দিয়ে সমুদ্রের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। প্রাথমিক ভাবে দারণ তলগুলিকেই (joint plane) তরঙ্গ বেছে নেয় তার ক্ষয় কার্য শুরু করবার জন্য এবং অগ্রভাগের ধারে গহ্বরের (caves) সৃষ্টি হয়। যতবার সমুদ্র তরঙ্গ অগ্রসর হয় ততবার প্রবল বেগে জল গহ্বরের ভিতরে আছড়ে পড়ে এবং পশ্চাদ্ ধাবন (back wash) যখন ফিরে যায় তখন গহ্বরের ভিতরের দেওয়াল ঘর্ষণ জনিত ক্ষয়ীভবন (abrasion) দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ভাবে গহ্বরের পিছনের দেওয়াল ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে অগ্রভাগের অপর দিক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তখন গহ্বরের পরিবর্তে ওই স্থানে একটি সমুদ্র খিলান্ (sea arch) তৈরী হয়।

সমুদ্র খিলান একবার তৈরী হয়ে গেলে, তার তলা দিয়ে সমুদ্রের তরঙ্গ অবাধে যাতায়াত করতে পারে ; যার ফলে খিলানের ছাদ এবং দুধারের দেওয়ালে ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে যদি এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে তাহলে খিলানের উপরের ছাদ ভেঙ্গো পড়বে এবং খিলানের সামনের অংশ মূল ভূখন্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে। যে অংশটি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে স্তম্ভ (stack) বলে। এই স্তম্ভ গুলি চারধার দিয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে এবং একটি ভগ্নাবশিষ্ট দ্বীপ (residual island) বা স্টাম্প (stump) তৈরি করে। একটি স্তম্ভ বা দ্বীপের অবস্থান দেখে বোঝা যায় যে এক সময় মূল ভূখন্ডের অগ্রভাগ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (চিত্র নং 6.11)।

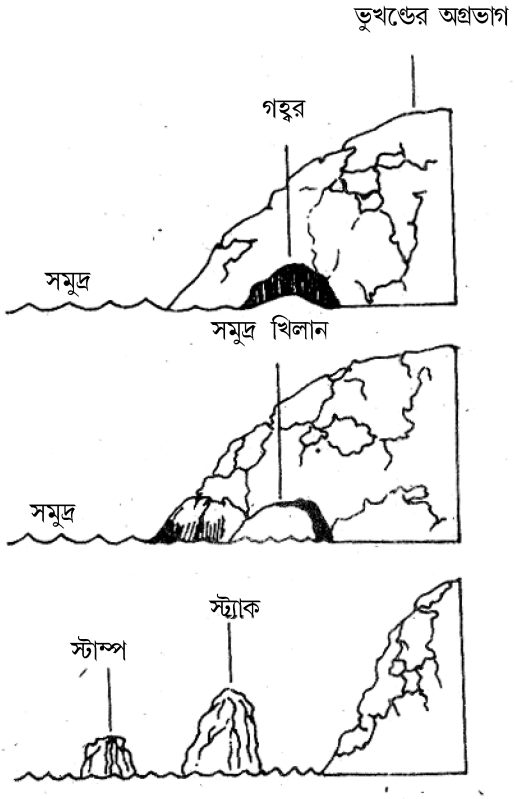

সমুদ্র গহ্বর, খিলান, স্ট্যাক ও স্টাম্পের গঠন (৬.১১)

চিত্র 6.11

ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলে সমুদ্র খিলান ও স্তম্ভের নিখুঁত ভূমিরূপ দেখা যায়। ইতালির ক্যাপ্‌রি দ্বীপেও সমুদ্র খিলান দেখা যায়। ভারতবর্ষের কোঙ্কন উপকূলের উত্তরভাগে ভরঢ়খোল নামক একটি জায়গায় একটি ১৫ ফুট উচ্চতার স্তম্ভ দেখা যায়।

● তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ (wave cut platform)

সমুদ্র ভৃগুর ক্রমাগত ক্ষয় এবং পরবর্তী পর্যায় উপতটীয় স্রোত (near shore current) দ্বারা ক্ষয়জাত পদার্থের অপসারণের জন্যে তটরেখার (shore line) ক্রমান্বয়ে পশ্চাৎ অপসারণ (recession) হতে থাকে। এর ফলে সমুদ্র ভৃগুর পাদদেশে থেকে একটি সামান্য ঢাল যুক্ত মঞ্চ গড়ে ওঠে। সমুদ্র তরঙ্গ জলের তলায় যতদূর পর্যন্ত ক্ষয় করতে পারে ততদূর পর্যন্ত এই মঞ্চটির বিস্তৃতি।

ইদানিংকালে 'তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চর' 'তটীয় মঞ্চ' (shore platform) কথাটি বেশী ব্যবহার করা হয়। প্রথম কথাটি থেকে মনে হয়ে যে শুধুমাত্র সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়ের ফলেই এই ভূমিরূপের উৎপত্তি, কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে শুধু সমুদ্র তরঙ্গ নয় আরও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফল এই তটীয় মঞ্চ। তাই এই পরিভাষার পরিবর্তন। দেখা যাক্ এই তটীয় মঞ্চ বা তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চর উদ্ভবের পিছনে কি কি প্রক্রিয়া কাজ করে।

(A) ঘর্ষণ জনিত ক্ষয়ী ভবন (abrasion)

একটি সময় ছিল যখন 'তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ' এবং অবঘটিত বেদী (abrasion platform) কথা দুটি প্রায় প্রতিশব্দের মত ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রের জলে পরিবাহিত নুড়ি, পাথর ও বালির কণা যখন পশ্চাদ্ ধাবনের (back wash) সঙ্গে ফিরে আসে তখন চিরুণির দাঁড়ার মত নিচেকার ভূমিভাগকে প্রবল ঘর্ষণে ক্ষয় করে যায়। কিছু বৈজ্ঞানিকের মতে জলের তলায় 10 মিটার গভীরতা পর্যন্ত ঘর্ষণজনিত ক্ষয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু যেহেতু বালি, নুড়ি ইত্যাদি পদার্থ বেশীর ভাগ তটের উপরের ভাগেই দেখা যায় এবং ভাটার সীমারেখার (lowtide level) নীচে দেখা যায়না উপরোক্ত মতটি সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে (চিত্র নং 6.7)।

(B) সমুদ্রের জলের দ্বারা যান্ত্রীক ক্ষয়ীভবন (Hydraulic action)

সমুদ্রের ঢেউ যখন আছড়ে পড়ে তখন ঢেউয়ের আঘাত হাতুড়ির মত কাজ করে। শুধু উদস্থিতিক বলই (hydrostatic force) নয়, জল সহজেই গঠনগত দূর্বলতার স্থানগুলি খুঁজে নেয় এবং ফাটল ইত্যাদির মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে। এই ধরণের প্রক্রিয়া ক্ষয় কতটা সফল হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে শিলালক্ষণ (lithology) ও শিলার গঠনের (structure) উপর। শিলালক্ষণের সামান্যতম তারতম্যও সমুদ্রের জলের ক্ষয়শক্তির কাছে ধরা পড়ে যায় এবং তটীয় মঞ্চটির চেহারাও সেই মত রূপ নেয়। এই ধরনের ক্ষয় প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত মঞ্চ জোয়ার ও ভাটার সীমারেখার মধ্যে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যায়। মঞ্চের বিভিন্ন উচ্চতায় ক্ষয় প্রক্রিয়ার তীব্রতার (intensity) উপর নির্ভর করে এই ঢাল গড়ে ওঠে।

(C) জলস্তর সম্পর্কিত আবহবিকার (Water layer weathering)

জোয়ার ও ভাঁটার সময়ে জলের উচ্চতার তারতম্যের জন্যে মঞ্চের কিছু অংশ পালাক্রমে আর্দ্র ও শুষ্ক হয়। এই কারণে আবহবিকারের কিছু জটিল প্রক্রিয়া একসাথে কাজ করতে থাকে। এই সবকটি প্রক্রিয়ার সমষ্টিকে জলস্তর সম্পর্কিত আবহবিকার বলা হয়ে থাকে। এর মধ্যে জলযোজন (hydration) জারণ (oxidation) ও লবণের স্ফটিকীকরণের (salt cystallization) ফলে যান্ত্রীক বিচূর্ণীভবন (disitegration) দেখা যায়। এই ধরণের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত মঞ্চে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় 0° কাছাকাছি ঢাল হয়।

বিভিন্ন প্রকার জৈবিক আবহবিকারও (biological weathering) তটীয় মঞ্চের বিশেষ রূপ এনে দেয়।

(D) দ্রবণ (solution)

চুনাল (calcareous) শিলা দ্বারা গঠিত উপকূল অঞ্চলে মঞ্চর গঠনের ওপর দ্রবণ প্রক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ক্রান্তিয় অঞ্চলে দ্রবণের প্রভাব অধিক মাত্রায় দেখা যায়।

এই সবকটি প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়ে তটীয় মঞ্চের উপর, তাই একে শুধু মাত্র 'তরঙ্গ কর্তিত' বলা উচিত নয়।

জোয়ার ভাঁটার সীমারেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠিত হয় জোয়ার সীমারেখার মঞ্চ (high tide platform) ও ভাঁটার সীমারেখার মঞ্চ (low tide platform)। প্রায় অনুভূমিক (horizontal) ঢাল যুক্ত এই দুটি মঞ্চকে খাড়া ঢাল যুক্ত একটি অংশের দ্বারা পৃথক করা যায়। জোয়ার সীমারেখার মঞ্চটি জোয়ার সীমারেখার গড় উচ্চতার উপরে থাকে এবং শুধুমাত্র জোয়ারের সময় এবং ঝড়ের সময় ব্যতীত অন্য সময় প্রায় শুষ্কই থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জোয়ার সীমারেখার একটি মঞ্চ বর্তমান জোয়ার সীমারেখার অনেক উপরে দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলি দেখে অনেক সময় বুঝে নিতে হয় যে এক সময় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার সীমারেখা আজকের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার থেকে অনেক উপরে ছিল (চিত্র 6.12)।

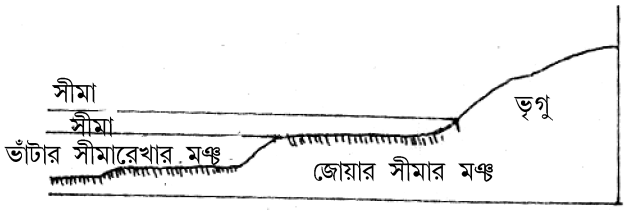

ভাঁটার সীমারেখার মঞ্চ

চিত্র 6.12

● **ফুৎকার বিবর ও গিও (Blow hold and geo)**

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমুদ্র ভৃগুর পাদদেশে যখন গহ্বর সৃষ্টি হয় তখন সমুদ্রের জল প্রথমেই যাবতীয় গঠনগত দূর্বলতাগুলিকে খুঁজে নেয়। গহ্বরটি তখন কোনো ফাটল বা দারণ তল ধরে আকৃতিতে বড় হতে পারে। এই ফাটল বা দারণ বরাবর ক্ষয় হতে হতে গহ্বরটি যখন মাটির ওপর পুনঃ প্রকাশিত হয় তখন তাকে ফুৎকার বিবর বা বায়ু চলাচল গর্ত বলে। সমুদ্রের ঢেউ যখন এই ফাটলের মুখে আঘাত করে তখন ফাটলের মধ্যে আটকে থাকা বায়ু জলের প্রচন্ড চাপে সংকোচিত হয়। আবার ঢেউ যখন ফিরে যায় তখন হঠাৎই বায়ুর চাপ হ্রাস পাওয়ার ফলে বায়ু বিস্ফোরণ সহ আয়তন বৃদ্ধি করে। এর ফলে ক্ষয়কার্য আরও তাড়াতাড়ি হয়। এই ফুৎকার বিবর তৈরী হবার পর, যতবার সমুদ্র তরঙ্গ আছড়ে পড়ে ততবার এই গর্ত দিয়ে বায়ু সহ জলের ফোয়ারা বেরিয়ে আসে এবং সেই জন্যেই এর বিশেষ নাম। ক্ষয় কার্যের অগ্রগতির সঙ্গে বায়ু চলাচলের এই সুড়ঙ্গটির আকৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটি সময় আসতে পারে যখন গহ্বরের উপরের অংশ ভেঙ্গে পড়ে যেতে পারে। তখন ফুৎকার বিবরটি নষ্ট হয়ে যায়। যে জায়গায় গহ্বরটি ছিল সেই জায়গায় সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে একটি ফাঁড়ির মত রূপ নেয়। একেই বলে গিও (geo) (চিত্র নং 6.13)।

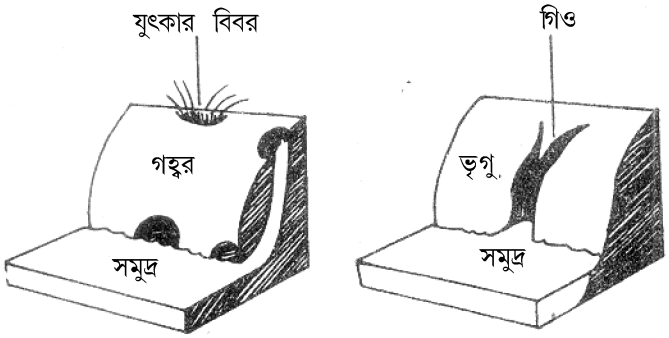

চিত্র 6.13

6.4.3 সঞ্চয় কার্যের ফলে উদ্ভূত ভূমিরূপ

● সমুদ্র সৈকত ও তৎসহ ভূমিরূপ

জোয়ার সীমারেখা ও ভাঁটার সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলে পলি (sediment) সঞ্চিত হয়ে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাকে সমুদ্র সৈকত (beach) বলে। সমুদ্রের তরঙ্গ (waves) এবং অনুতটীয় প্রবাহ (longshore drift) মিলিত ভাবে এই সঞ্চয় কার্য করে। নুড়ি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম বালুকণা পর্যন্ত যে কোনো মাপের পদার্থ দিয়ে সমুদ্র সৈকত গঠিত হতে পারে। বেশীর ভাগ সমুদ্র সৈকত, উপল (shingle) বা বালি দিয়ে গঠিত হয়। তবে উপল দিয়ে গঠিত সৈকত সাধারণত উচ্চ অক্ষাংশে দেখা যায়। হিমবাহ পরিবাহিত পদার্থের উপস্থিতির জন্য এই অঞ্চলে সঞ্চিত পলি মোটাদানার হয়।

সমুদ্র সৈকতের ঢাল কতটা হবে তা অনেকাংশ পলির দানার মাপের উপর নির্ভর করে। খুব মোটা দানার পলির প্রবেশ্যতা স্বাভাবিক ভাবে বেশী হয় এবং তাই পশ্চাদ ধাবনের সময় অনেকটা জল মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। যেটুকু জল ফিরে আসে তা এতই অল্প যে সৈকতের ঢালকে কমাবার মত ক্ষমতা তার থাকেনা। ফলে এই ধরণের সৈকতের ঢাল অত্যধিক খাড়া হয়। সূক্ষ্ম বালুকণা দিয়ে গঠিত সৈকতে পশ্চাদ্ ধাবনের কার্যকারিতা অনেক বেশী এবং এই সৈকতের ঢালও অত্যন্ত অল্প। কর্দম (mud) দিয়ে গঠিত সৈকত উপহ্রাস (lagoon) অঞ্চলে, সেখানে তরঙ্গের উচ্চতা খুব কম সেখানেই একমাত্র দেখা যায়। খোলা সমুদ্রের ধারে এ ধরণের সৈকত দুর্লভ। সুমুদ্র তরঙ্গের প্রবলতা কর্দমের মত সূক্ষ্ম দানার পলিকে প্রলম্বভার (suspension load) হিসেবে রেখে দেয়, সঞ্চিত হবার সুযোগ দেয়না।

সৈকতের পার্শ্বচিত্র শুধু পলির দানা নয় সমুদ্র তরঙ্গের চরিত্রের উপরও নির্ভর করে। অনুকূল আবহাওয়া আনত তরঙ্গ ভঙ্গের (spilling breaker) সৃজনধর্মী চরিত্র, সৈকত অঞ্চলের বালিকে সৈকতের উপরের ভাগে ঠেলে নিয়ে যায় ও বার্ম (berm) বা সৈকত শিরা (beach ridge) তৈরী করে। তরঙ্গ ভঙ্গের সীমার তারতম্যের জন্যে কোনো কোনো সৈকতে একাধিক সৈকত শিরা দেখা যায়। তবে ভাঁটার সময় গঠিত সৈকত শিরা জোয়ারের সময় ভেঙ্গেও যেতে পারে। অপরদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ায়, বিশেষ করে ঝড়ের সময়ে তরঙ্গের উচ্চতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চাদ্ ধাবনের সময় সৈকতের সামনের অংশকে চিরুণির মত ক্ষয় করে দিয়ে যায়। কিছু কিছু সময় এই ক্ষয়জাত পদার্থকে সঞ্চয় করে প্রতিতটীয় (off shore) অঞ্চলে বাঁধের সৃষ্টি হয়। ঝঞ্ঝা তরঙ্গের (storm waves) প্রবলতা খুব বেশী হলে, সমুদ্রে ভৃগুর পাদদেশ থেকে উপল যাতীয় পদার্থকে নিচের দিকে টেনে নিয়ে আসে এবং পরবর্তী ঊর্ধ্ব ধাবন এই পদার্থকে জোয়ার সীমা রেখার (high tide level) উপরে সঞ্চয় করে। একে ঝঞ্ঝা শিরা (strom ridge) বলে। কাজেই বছরের বিভিন্ন সময়ে সৈকতের পার্শ্বচিত্রের তুলনা করলে প্রচুর তারতম্য পাওয়া যায়।

● সমুদ্র সৈকতের 'বাজেট' (Beach budget)

সমুদ্র সৈকত সঞ্চিত পলি দ্বারা গঠিত হয় একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে সৈকতে কতটা পলি বিভিন্ন উৎস থেকে জমা হচ্ছে এবং কতটা পলি সৈকত থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এই দুটির পরিমান যদি জানা যায় তাহলে সৈকতে সঞ্চিত পলির মোট পরিমাপ হিসেব করা যেতে পারে। সমুদ্র সৈকতে জমা পলির উৎস প্রধানতঃ চারটি—

(A) স্থানীয় সমুদ্র ভৃগু বা ভূখন্ডের অগ্রভাগের ক্ষয়জাত পদার্থ।

(B) প্রতিতটীয় অঞ্চলে (off shore zone) প্রায় 10-20 মিটার গভীরতা থেকে বয়ে আসা বালি।

(C) স্থানীয় কোনো নদীর পরিবাহিত পলি।

(D) চুনাল বালি এবং ঝিনুকের ভগ্নাবশেষ যা প্রবাল বা কম্বোজ (Mollusc) দ্বারা গঠিত সৈকতে খুব বেশী দেখা যায়।

এই চারটি উৎস থেকে নেওয়া পলি গঠনকারী খনিজ ও সমুদ্র সৈকতের পলি গঠনকারী খনিজ তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে প্রধান উৎস কোনটি।

সমুদ্র সৈকত থেকে পলি হারিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণগুলি হতে পারে ঃ—

(A) প্রতিতটীয় পরিবহন কার্য (off shore sediment transport)

(B) অনুতটীয় প্রবাহ (longshore drift)

(C) বায়ুর পরিবহন কার্য

(D) প্রতিতটীয় পরিবহন কার্য যার জন্যে পলি অন্তঃসাগরীয় গিরিখাতে (submarine canyon) জমা পড়তে পারে। (চিত্র 6.12)।

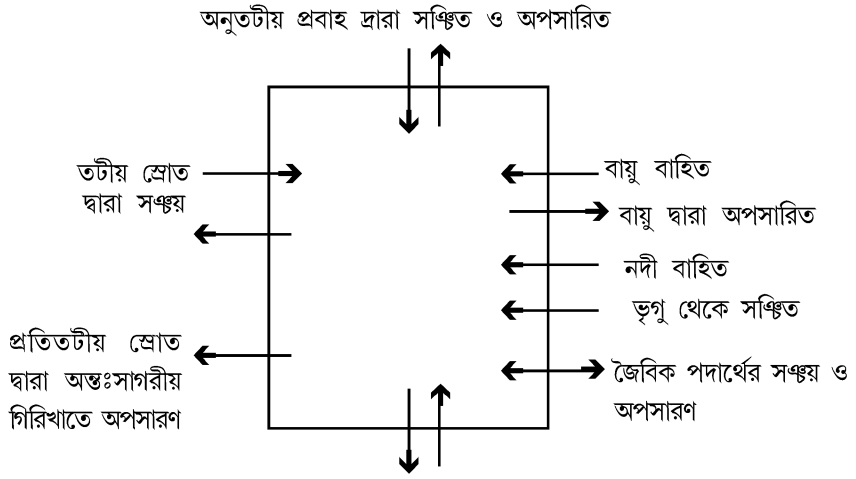

চিত্র 6.14

● **সৈকত কাস্প (beach cusp)**

সাধারণতঃ সৈকত রেখার ধারটি একটি মসৃণ বক্ররেখার মত দেখায় যার অবতল (concave) দিকটি সমুদ্র অভিমুখী হয়। এই ধরণের সৈকত উপসাগরের মস্তক ভাগে (bay head) সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। তবে মুক্ত উপকূল অঞ্চলেও বিরল নয়। এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে সৈকত রেখার চরিত্র মূলতঃ তরঙ্গের প্রতিসরণ (wave refraction) দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রধান তরঙ্গের (dominant waves) শীর্ষ রেখার পর (crest line) সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে গড়ে ওঠে। তবে মাঝে মাঝে এই মসৃণ সমান্তরাল তটরেখার ব্যতিক্রম ঘটে। যখন সমুদ্র সৈকতের সমুদ্র স্রোত লম্বভাবে অগ্রসর হয় তখন তার পশ্চাদ ধাবনও (back wash) একইভাবে ফিরে যায়। একে উজানতটীয় স্রোত (rip current) বলে। এই উজানতটীয় স্রোত ফিরে যাবার সময়ে অর্ধ্বচন্দ্রাকারে সৈকতের কিছু অংশকে ক্ষয় করে নিয়ে যায়। এর ফলে দুটি অর্ধ্বচন্দ্রাকৃতি গর্তর অন্তবর্তী অংশে সূক্ষ্মাগ্র অনুপ্রস্থ ভূমিরূপ দেখা

যায়। একেই কাস্প (cusp) বলে। দুটি কাস্পের মধ্যে দূরত্ব 5 থেকে 600 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের মতে শুধুমাত্র উজানতটীয় স্রোত দ্বারা সৈকত কাস্পের উদ্ভব প্রমাণ করা যায় না, তবে একবার গঠিত হয়ে গেলে এই ভূমিরূপ কিভাবে রক্ষা পায় সেটা উজানতটীয় স্রোতের দ্বারা বোঝানো যেতে পারে (চিত্র 6.15)।

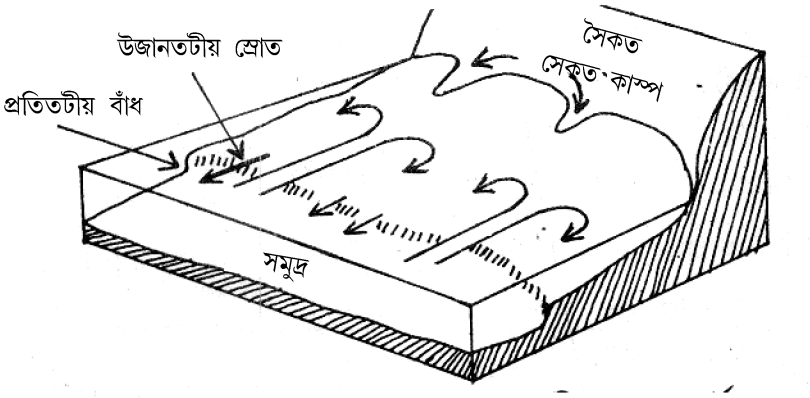

সৈকত কাস্প, প্রতিতটীয় বাঁধ ও উজানতটীয় স্রোতের সম্পর্ক

চিত্র 6.15

● স্পিট (Spit) ও বাঁধ (bar)

লম্বালম্বি ভাবে গঠিত সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ যার একটি দিক উপকূল অঞ্চলের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে তাকে স্পিট বলে। সাধারণতঃ উপকূলের বহিরাকৃতির যেখানে অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটে সেখানেই স্পিট গড়ে ওঠে। অনুতটীয় প্রবাহ (longshore drift) পলির যোগান দেয় ঠিকই কিন্তু স্পিটের প্রকৃত রূপটি নির্ভর করে সমুদ্র তরঙ্গের কার্যের উপরে। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে স্পিট গঠনের জন্যে চাই অগভীর জল ও প্রচুর পরিমানে পলি। সমুদ্র তরঙ্গ যখন তির্যক ভাবে মস্তকভূমির অগ্রভাগে আঘাত করে তখন প্রতিফলিত তরঙ্গ সোজা উপসাগরের কূল বরাবর না গিয়ে খানিকটা সরল পথে অগ্রসর হয়। অপেক্ষাকৃত গভীর জলের সম্মুখীন হওয়ার ফলস্বরূপ তরঙ্গে বেগ অনেকটাই হ্রাস পায় এবং সঞ্চিত পলি স্পিট গঠন করে।

স্পিটের যে অংশ উপকূলের সঙ্গে যুক্ত থাকে না, সেই অংশ তরঙ্গের অগ্রসরের দিক অনুযায়ী রূপ নেয়। যদি স্পিটের মুখের দিকে তরঙ্গের প্রতিসরণ ঘটে তাহলে স্পিটটি সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যায় ও পূর্ণবক্র স্পিট (recurved spit) গঠন করে (চিত্র নং 6.16)।

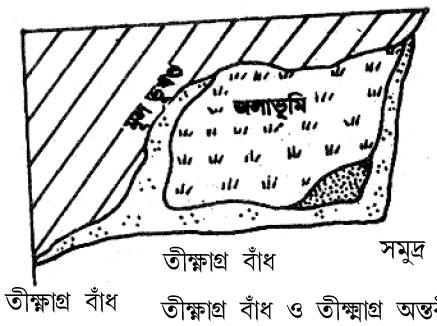

তীক্ষ্ণাগ্র বাঁধ ও তীক্ষ্ণাগ্র অন্তরীপের গঠন

চিত্র 6.17

যদি স্পিট গঠিত হবার পর তার অগ্রভাগ একটি ভিন্ন দিক থেকে আসা তরঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে স্পিটের অগ্রভাগ একটি ভিন্ন দিশায় ঘুরে যায় ও বঁড়শী আকৃতির (hooked spit) তৈরী করে। ভূমির অগ্রভাগের দুই ধারে যখন জলার মত দুটি স্পিট গঠিত হয় তাকে পক্ষযুক্ত মস্তকভূমি (winged head land) বলে। স্পিটের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে পেতে অনেক ক্ষেত্রে উপসাগর বা খাঁড়ির মুখ বন্ধ করে অপর প্রান্ত অবধি বিস্তৃত লাভ করে, তখন তাকে বাঁধ (bar) বলে। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে দুটি স্পিট দুই দিক থেকে এসে সমুদ্রে মিলিত হতে পারে, বা একটি স্পিট স্থল ভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে আবার বেঁকে স্থলভাগে গিয়ে যুক্ত হতে পারে। একে তীক্ষ্মাগ্র বাঁধ (cuspate bar) বলে (চিত্র 6.17)।

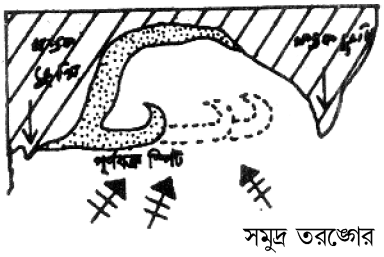

সমুদ্র তরঙ্গের গতিপথ

তরঙ্গ প্রতিসরণ ও স্পিটের দিক পরিবর্তনের সম্পর্ক

পূর্ণবক্র স্পিট গঠন

চিত্র 6.16

মূল ভূখন্ড ও তীক্ষ্মাগ্র বাঁধের মধ্যস্থিত অঞ্চল ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে গিয়ে একটি ত্রিকোণাকৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি করে, যার চওড়া দিকটি ভূখন্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তীক্ষ্মকোণ যুক্ত দিকটি সমুদ্র অভিমুখী হয়। এই ধরণের ভূমিরূপকে তীক্ষ্মাগ্র অন্তরীপ (cuspate foreland) বলে (চিত্র 6.17)।

একটি বাঁধ যখন মূল ভূখন্ড ও একটি দ্বীপকে যোগ করে তাকে টম্বোলো (tombolo) বলে (চিত্র নং 6.18)।

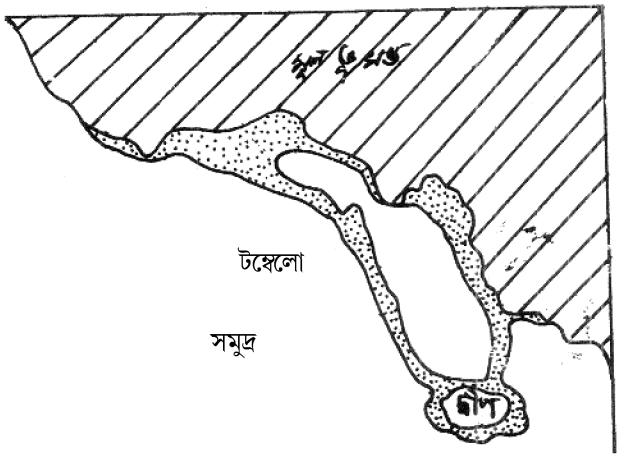

চিত্র 6.18

● **প্রতিতটীয় বাঁধ (offsore bar)**

প্রতিতটীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক পলির সঞ্চয়ের ফলে গঠিত বাঁধকে প্রতিতটীয় বাঁধ (off shore bar) বলে। সাধারণতঃ তাদের পিছনে উপহ্রদ (lagoon) দেখা যায়। প্রতিতটীয় বাঁধ বিভিন্ন ধরণের চেহারা নিতে পারে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এদের উপকূলের সমান্তরাল সরু লম্বা বাঁধ হিসেবে দেখা যায় বা অপেক্ষাকৃত ছোট অর্ধ্ববৃত্তাকার রূপে দেখা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বাঁধের উত্তাল (convex) দিকটি সমুদ্রের দিকে হয়। যে উপকূল সংলগ্ন মহীসোপানের ঢাল খুব অল্প এবং জোয়ার ভাঁটার সীমারেখার পার্থক্য (tidal range) কম সেই রকম অঞ্চলে প্রতিতটীয় বাঁধ গড়ে ওঠাবার সুবিধে রয়েছে।

তবে প্রতিতটীয় বাঁধের উৎপত্তি নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এখনো সন্দেহ রয়েছে। জনসন, ডেভিসের মতকে সমর্থন করে বলেন যে প্রতিতটীয় অঞ্চলে ক্ষয়জাত পদার্থই পরবর্তীকালে স্তূপীকৃত হয়ে প্রতিতটীয় বাঁধ সৃষ্টি করে। সে ক্ষেত্রে বাঁধের সামনের ও পিছনের ঢাল সমান হবে না এবং বাঁধটিকে সমুদ্র পৃষ্ঠের উপরে দেখা যেতে পারে। কিন্তু গিলবার্টের মতে অনুতটীয় প্রবাহ (longshore drift) দ্বারা পরিবাহিত পলিই এই বাঁধ গঠনের জন্যে দায়ী। সে ক্ষেত্রে প্রতিতটীয় অঞ্চলের তলদেশে (offshore bottom) এই বাঁধটি শুধুমাত্র একটি ওপর থেকে বসিয়ে দেওয়া সঞ্চিত ভূমিরূপ মনে হবে এবং বাঁধের সামনের বা পিছনের ঢালের কোনো তারতম্য দেখা যাবে না। তবে অধিকাংশ প্রতিতটীয় বাঁধের পার্শ্বচিত্রে দেখা যায় যে বাঁধের পিছনের ঢালের ও সমুদ্রের দিকের সামনের ঢালের বেশ পার্থক্য আছে। কাজেই জনসনের মতটি যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় (চিত্র নং 6.19)।

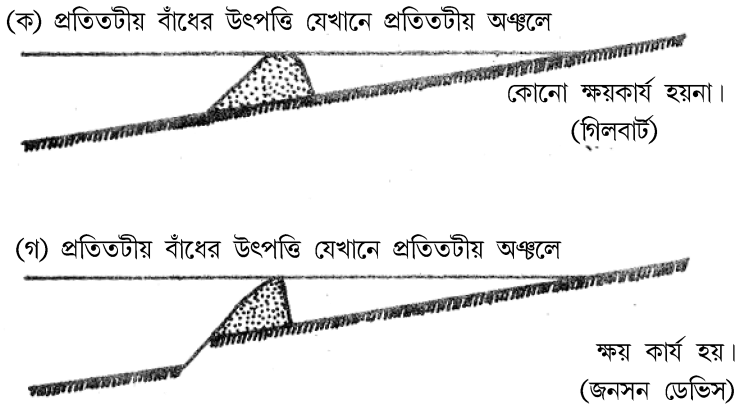

চিত্র 6.19

বাঁধের আয়তন বৃদ্ধি পাবার পর তা যখন সমুদ্রের উপর মাথা তোলে তখন পিছনে অবস্থিত উপসাগরটি প্রায় সমুদ্র তরঙ্গের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং একটি উপহ্রদ তার জায়গা নেয়। সমুদ্র তরঙ্গের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত এই উপহ্রদটি ক্রমশ ভরাট হয়ে যেতে পারে। প্রতিতটীয় বাঁধটি ভূখণ্ডের দিকে ক্রমশ অপসারিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মূল ভূখন্ডের সংলগ্ন হয়ে যেতে পারে (চিত্র নং 6.20)।

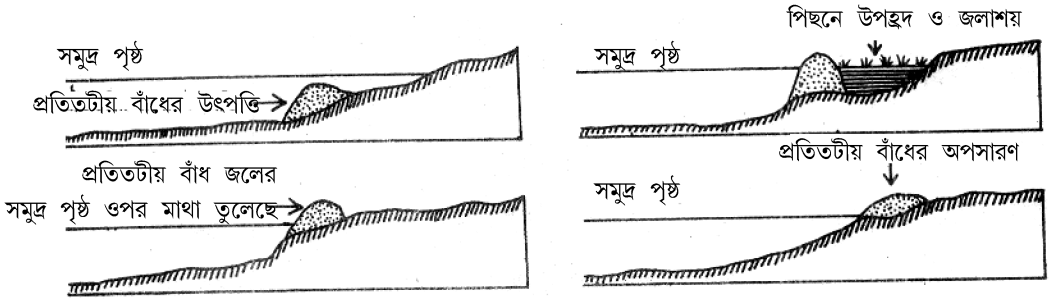

চিত্র 6.20

● **উপহ্রদ, কর্দমতট ও জলাভূমি (lagoons, mudflats and marshes) :**

উপহ্রদ, কর্দমতট ও জলাভূমি হল কাদা ও জৈব পদার্থে সঞ্চিত হবার আদর্শ স্থান। কাদা ও পলির আকারের অতি সূক্ষ্ম দানার পদার্থ সমুদ্রে লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে এসে জমাট বেঁধে যায় (flocculation) এবং প্রলম্বভার (suspended load) হিসেবে আর সমুদ্রে জলে ভেসে থাকতে পারে না। তখন তারা ক্রমশ তলদেশে জমা পড়ে এবং কর্দমতট তৈরী করে। উপহ্রদ কর্দমতট বা উপসাগরের এই কাদা জোয়ারের জলের সঙ্গে বা নদীর জলের সঙ্গে মিশে আসে এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে জমা পড়ে। মুক্ত উপকূল অঞ্চলে তরঙ্গের প্রবলতার ফলে কাদা বা পলি জাতীয় অতি সূক্ষ্ম কণার পদার্থ কখনোই জমা পড়তে পারে না।

কর্দমতটের পরিবৃদ্ধি অনেকটাই জৈব প্রক্রিয়ার ফল। প্রাথমিক পর্যায় অ্যাল্‌গি, তারপর ঘাস এবং তারপর নড়খাগড়া (rushes) জাতীয় উদ্ভিদ্ কর্দমতটের উপর তাদের বসতি স্থাপন করে। এই ভাবেই তারা জমা পড়া কাদাকে আটকে রাখে এবং পরবর্তী সঞ্চয় কার্যে সহায়তা করে। কর্দমতট গুলির উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটি সময়ের পর তারা আর প্রতিদিন জোয়ারের জলে নিমজ্জিত হয় না। তখন সেখানে লবণ সহনীয় (salt tolerant) হ্যালোফাইটিক গাছ ছাড়াও কিছু অন্য গাছও বসতি স্থাপন করে। ক্রান্তিয় ও উপক্রান্তিয় অঞ্চলে কর্দমতটের উপর বসতি স্থাপন করতে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদরা সবচেয়ে সফল। তবে জোয়ার ও ভাঁটার সীমারেখার তারতম্য যদি অত্যাধিক হয় তাহলে সেখানে ম্যানগ্রোভ ভাল ভাবে বাঁচতে পারে না।

চতুর্দিক দিয়ে বাঁধ দেওয়া উপসাগরকে উপহ্রদ (lagoon) বলে। জলের চরিত্র অনুযায়ী উপহ্রদের ভিতরের অংশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় ঃ—

(A) নদীর মিষ্টি জলের সঙ্গে যেখানে উপহ্রদের লবণাক্ত জল মেশে।

(B) সম্পূর্ণ লবনাক্ত জলের এলাকা, যেখানে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব সর্বাধিক।

(C) এই দুটির মধ্যে ঈষৎ লবণাক্ত জলের (brackish water) এলাকা।

উপহ্রদ বেশীর ভাগ সময়েই একটি ক্ষণ-স্থায়ী ভূমিরূপ। বৃহৎ আকৃতির বাঁধ ও **বালিয়াড়ি** থেকে উড়ে আসা বালি ও নদী পরিবাহিত পলি উপহ্রদকে ধীরে ধীরে ভরাট করে দেয়। অচীরেই এই অঞ্চল উপকূলেরই একটি অংশে পরিণত হয়।

● **উপকূল অঞ্চলের বালিয়াড়ি (coastal dunes)**

তটীয় অঞ্চলে সঞ্চিত বালি যখন শুকিয়ে যায় তখন তা সহজেই বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হয়ে সৈকতের পিছনের অংশে গিয়ে জমা পড়ে। জোয়ার ভাঁটার সীমারেখার পার্থক্য যদি বেশী হয় আর যদি সেখানে একটি প্রশস্ত বালুকাময় সৈকত থাকে তাহলে বালিয়াড়ি গড়ে তোলবার উপযোগী প্রচুর বালি সহজেই পাওয়া যায়। উপকূল

অঞ্চলে বালিয়াড়িগুলি এক বা একাধিক সারিতে দেখা যেতে পারে। অগ্রভাগের বালিয়াড়িগুলি প্রকৃত ভাবে সৈকতেরই একটি অংশ। তাই ঝঞ্ঝা তরঙ্গের প্রকোপ থেকে পশ্চাদ্‌ভাগের বালিয়াড়ির সারি রক্ষা পেলেও অগ্রভাগের বালিয়াড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সমগ্র সৈকতের পার্শ্বচিত্রটিই বদলে যায়। পশ্চাদভাগের বালিয়াড়ি গুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। প্রাচীন বালিয়াড়িতে **লোহা**, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ইত্যাদি জমাট বেঁধে যায় ও সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। উপকূল অঞ্চল যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন এই অপেক্ষাকৃত শক্ত স্তরগুলি ক্ষয়কার্যের প্রতিরোধ করে। সৈকত অঞ্চলে সঞ্চিত অতিপ্রাচীন পদার্থ এইভাবে জমাট বেঁধে যেতে পারে। ক্রান্তিয় ও উপক্রান্তিয় অঞ্চলে একে সৈকত শিলা (beach rock) বলে।

- **প্রবাল প্রাচীর (coral reefs)**

কম্বোজ (Mollusc), স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণী মাঝে মাঝে প্রবাল প্রাচীর তৈরী করলেও প্রবাল (coral) ও চুনাল অ্যালগিই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। ক্রান্তিয় অঞ্চলে যেখানে জলের গভীরতা 100 মিটারের কম, শীতকালীন উষ্ণতা 18°C কম নয় এবং তলদেশে একটি কঠিন শিলা দিয়ে গঠিত ভিত পাওয়া যায়, সেখানেই প্রবাল প্রাচীর দেখা যায়। এখানে জল এতই স্বচ্ছ যে প্রবাল গুলি সহজেই সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) করতে পারে। যেখানে নদীর জল ও তার সঙ্গে কাদা এসে সমুদ্রের জলে মেশে সেখানে জলের লবণতা ও স্বচ্ছতা দুই হ্রাস পায় তাই সেইখানে প্রবাল প্রাচীর গঠিত হতে পারে না। ক্রান্তিয় উপকূল অঞ্চলে প্রবাল প্রাচীর একটি আকর্ষনীয় ভূমিরূপ।

6.4.4 উপকূল অঞ্চলের পরিবহন কার্য

উপকূল অঞ্চলের বিবর্তনে সমুদ্রের পরিবহন কার্যের গুরুত্ব অসীম। বিমান বা উপগ্রহ থেকে নেওয়া প্রতিচ্ছবি যেমন পরিবহন কার্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে, তেমনি 'ট্রেসার পর্যবেক্ষণও' (Tracer experiment) সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যবেক্ষণে জলের মধ্যে কিছু ফ্লুরোসেন্ট (fluroscent) রং নিক্ষেপ করে সেই রঙ্গিন জলের গতিপথটি নির্ধারিত করা হয়। সমুদ্র তরঙ্গ পলি পরিবহনে সর্বাধিক কার্যকরী। ভগ্ন তরঙ্গ (breaker) গুলি উর্ধ্বধাবনের (swash) সঙ্গে পরিবাহিত পদার্থকে সৈকতের ঢাল বরাবর ঠেলে তুলে দেয় এবং পশ্চাদ ধাবনের (back wash) সঙ্গে তা আবার নেমে আসে। পরিবাহিত পদার্থের আসা যাওয়ার ফলে সৈকত অঞ্চলে বিশেষ ভূমিরূপের সূচনা হয় (চিত্র নং 6.21)।

সমুদ্রে তরঙ্গের পরিবহন কার্য

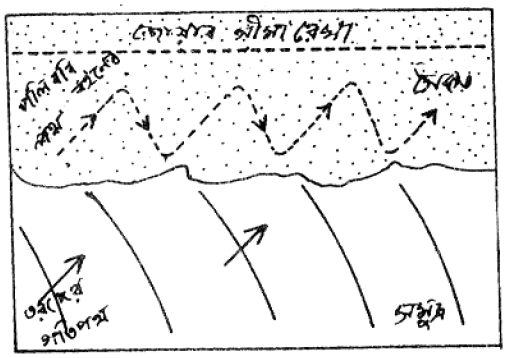

চিত্র 6.21

এছাড়া অনুতটীয় স্রোত (longshore drift) ও বায়ুর পরিবহন কার্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সৈকতের পশ্চাদ্‌ভাগে বালিয়াড়ি ও 'বার্ম' গঠনে বায়ুর পরিবহনকার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

6.5 সমুদ্র পৃষ্ঠ পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ধারণা

ভূপৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্র পৃষ্ঠের পরিবর্তনের উপকূল অঞ্চলের বিবর্তনে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জোয়ার ভাঁটার প্রভাবে দৈনন্দিন সমুদ্র পৃষ্ঠের অল্প বিস্তর পরিবর্তন হয়ে থাকে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতার পরিবর্তন হয় তাকেই প্রকৃত ভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চাবচ গতি (eustatic movement) বলা হয়। ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূখন্ডের উত্থান (upliftment) বা অবনমনের (subsidence) ফলেও তুলনামূলকভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কমতে বা বাড়তে পারে, তবে সেই ধরনের পরিবর্তন কখনো পৃথিবীব্যাপী হয়না। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চাবচ পরিবর্তন দুটি কারণে হতে পারে—

(A) মহাসাগরগুলির আয়তনগত পরিবর্তন (changes in volumes of ocean basins)

(B) সমুদ্রের জলের পরিমানের পরিবর্তন (changes in volume of sea water)

পাত সংস্থান তত্ত্ব অনুযায়ী মহাসাগরগুলির আয়তন এবং গড়ন কোনোটাই স্থায়ী নয়। এই আয়তনগত পরিবর্তন পলি সঞ্চয়ের ফলে, ভূখাত (trench) গঠনের ফলে, মহাসাগর তলেদেশের উত্থানের ফলে বা মধ্যমহাসাগরীয় শৈল শিরার (Mid oceanic ridge) উত্থানের ফলে হতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous) ভূতাত্ত্বিক যুগের পরের দিকে মধ্যে মহাসাগরীয় শৈলশিরার বিস্তৃতির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা 30 মিটারের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে (ভূতাত্ত্বিককাল পরিশিষ্ট)।

সমুদ্রের জলের পরিমান বৃদ্ধির সঙ্গে হিমযুগের একটি নিবীড় সম্পর্ক আছে। হিমযুগের সময় ভূপৃষ্ঠের জলের একটি সিংহভাগ বরফ হিসেবে জমা হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা হ্রাস পায়। আবার অন্তর্হিমযুগে পৃথিবীব্যাপী তুষার স্তরের গলনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার বৃদ্ধি হয় একটি হিমযুগের অন্তে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিকে "Flandrian Transgression বা ফ্ল্যান্ড্রিয়ান অনুপ্রবেশ বলা হয়। উপকূল অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় সমুদ্র সঞ্চিত পদার্থ পাওয়া যায়। এই সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে পাওয়া জৈব পদার্থের কার্বোন বায়োমাপন (Radio carbon dating) করলে সেই জৈব পদার্থের বয়স সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই ভাবে প্রমান সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিকরা বিগত 35000 বছরের মধ্যে সামুদ্রিক অনুপ্রবেশের একটি ধারা গঠন করতে কার্যকরী হয়েছেন। সেই ধারণা অনুযায়ী বিগত 15000 থেকে 7500 বছরের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা 100 মিটার থেকে প্রায় 15 মিটার পর্যন্ত উঠেছে। এখানে বর্তমান সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতাকে শূন্য মিটার হিসেবে ধরা হচ্ছে। এই হিসেব অনুযায়ী প্রতি 100 বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় 1 মিটার করে উঠেছে।

উপকূল অঞ্চলের ভূমিরূপ থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার ওঠা পড়ার সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে পাওয়া তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ অশ্বীভূত সমুদ্র ভৃগু (fossil cliff) বা উত্থিত সমুদ্র সৈকত (raised beaches) দেখে বোঝা যায় যে অতীতে কখনো সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বর্তমানের থেকে বেশী ছিল। আবার, বর্তমান সমুদ্র পৃষ্ঠের নীচে উপকূল অঞ্চলের গাছের অংশ বা জলের তলায় ডুবে থাকা সমুদ্র মঞ্চের (marine terrace) অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে অতীতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বর্তমানের থেকে অনেক নীচে ছিল। তবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার এই পরিবর্তন উচ্চাবচ পরিবর্তনের (eustatic change) ফল না ভূআন্দোলনের ফল, সেটা সঠিক ভাবে বলা কঠিন।

6.6 উপকূল অঞ্চলের পার্শ্বচিত্রের বিবর্তন

উপকূল অঞ্চলের ভূমিরূপের বিশেষ চরিত্রটি বিশ্লেণ করতে গেলে উপকূল রেখার বিবর্তন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। যেকোনো উপকূল একটি প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করে এবং ক্ষয় ও সঞ্চয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমশ যৌবন অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। পরিণত অবস্থার ভূমিরূপ কি রকম চেহারা নেবে সেটা নির্ভর করে উপকূলের প্রাথমিক ভূমিরূপের ওপর। আলোচনার সুবিধার্থে দুধরনের উপকূলকে পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে ঃ—

(1) নিমজ্জিত উপকূল

(2) উত্থিত উপকূল

(1) ধরে নেওয়া যাক যে একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ উপকূল অঞ্চল জলের তলায় নিমজ্জিত হয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার আপেক্ষিক বৃদ্ধির ফলে জল সরাসরি নিমজ্জিত উপকূলের খাড়া ঢাল অবধি উঠে আসবে। প্রাথমিক অবস্থায় উপকূল অঞ্চলের খাড়া ঢাল গভীর জলের মধ্যে সরাসরি নেমে যাবে। সমুদ্র তরঙ্গ তার ক্ষয় কার্য আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঢালের গায়ে খাঁজের (notch) সৃষ্টি করবে এবং সমুদ্র ভৃগুর গঠনের সূচনা করবে। ক্ষয়জাত পদার্থ স্তূপীকৃত হয়ে নিমজ্জিত ঢালের পাদদেশে জমা হবে।

সমুদ্র তরঙ্গ ও উপবায়বীয় প্রক্রিয়ার যৌথ প্রভাবে সমুদ্র ভৃগুর পশ্চাৎ অপসারণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলবে এবং ভৃগু পাদদেশে সমুদ্র কর্তিত মঞ্চের সৃষ্টি হবে। এই মঞ্চটি ক্রমশ অবঘর্ষিত বেদি হিসেবে সমুদ্রের দিকে বিস্তৃত হতে থাকবে। এই সময় উপকূল অঞ্চলে যৌবন অবস্থার চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্তঃ সাগরীয় ক্ষয়াবশিষ্ট স্তূপ (submarine talus) আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চের উপর একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে।

এর ফলে তরঙ্গ শক্তির কিছুটা এই ক্ষয়জাত পদার্থের অপসারণের কাজে খরচ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও যেটুকু শক্তি বাঁচে তা ভৃগু পাদদেশে ক্ষয় কার্য চালিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সময়ে ভৃগু পাদদেশের ক্ষয়ের হার ভৃগুর উপরের অংশের ক্ষয়ের হারকে ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে ভৃগু ঢাল ক্রমশ খাড়া হতে থাকে।

অন্তঃসাগরীয় মঞ্চর বিস্তৃতি অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে তরঙ্গের ক্ষয় শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এই সময় উপবায়বীয় প্রক্রিয়াগুলি বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ভৃগুর উপরের অংশে পশ্চাৎ অপসারণের হার পাদদেশের পশ্চাৎ অপসারণের হারকে ছাড়িয়ে যায়। প্রাথমিক স্তর থেকে যৌবন পর্যন্ত অতিক্রান্ত করতে যে সময় লাগে তার মধ্যে ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চর উচ্চতাও কিছুটা হ্রাস পায়। এমন একটা সময় আসে যখন তরঙ্গের ক্ষয় করবার শক্তি এবং করণীয় কাজের পরিমানের মধ্যে একটি সমতা এসে যায়। এই সময় থেকে উপকূলের পরিণত অবস্থার আরম্ভ। একটি উপকূলের পার্শ্বচিত্র ভৃগু, সৈকত তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ সব কিছু নিয়েই তৈরী হয়। প্রতিটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে চলে তবে যে কোনো মুহূর্তে একটি ঝঞ্ঝা তরঙ্গের ধাক্কায় সমগ্র উপকূলের পার্শ্বচিত্রটি পাল্টে যেতে পারে।

সৈকতের ঢাল পর্যায়ক্রমে তটবৃদ্ধি (progradation) ও পশ্চাদ্ গমন (retrogradation) দ্বারা তার ভারসাম্য (equilibrium) বজায় রাখে। যদি সৈকতের ঢাল অত্যধিক বেশী হয়ে যায়, তাহলে সমুদ্রের দিকে একাধিক সৈকত শিরা যোগ করে তরঙ্গ সৈকতের ঢাল আপনা থেকে কমিয়ে নেবে। একেই তটবৃদ্ধি বলে। অপরদিকে যদি সৈকতের ঢাল প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হয় তাহলে সৈকত শিরার ক্ষয় করে সৈকতের ঢাল আবার বাড়িয়ে নেবে। এই প্রক্রিয়াকে পশ্চাদ্গমন বলে। বার্ধক্য অবস্থায় ভূমির উচ্চতা আরও হ্রাস পায় ও তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ ও অবঘর্ষিত বেদী সমুদ্রের মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তবে কোন উপকূলের ক্ষয় চক্রকে বার্ধক্য পর্যন্ত অগ্রসর হতে গেলে বহু সময় ধরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাকে অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

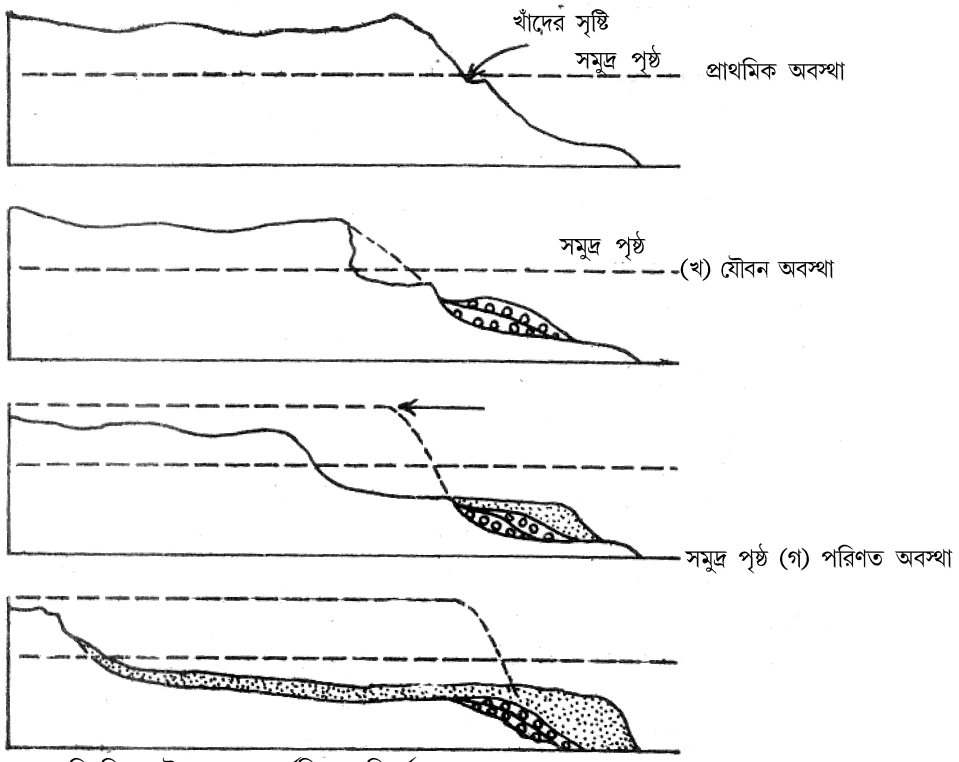

নিমজ্জিত উপকুলের পার্শ্বচিত্রের বিবর্তন

চিত্র 6.22

নিমজ্জিত উপকূলরেখার (coast line) বিবর্তন কি ভাবে হয় তা এবার আলোচনা করা যেতে পারে। ভূমিভাগ নিমজ্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকাগুলিও সম্পূর্ণ জলের তলায় নিমজ্জিত হবে এবং উপসাগরের চেহারা নেবে। কাজেই প্রাথমিক অবস্থায় সমগ্র উপকূলটিতে পালাক্রমে মস্তকভূমি (head land) ও উপসাগর (bay) দেখা যাবে। প্রতিসৃত (refracted) তরঙ্গ মস্তকভাগে ক্ষয় কার্য শুরু করবে এবং পর্যায়ক্রমে ভৃগু, সমুদ্র খিলান, স্তম্ভ ইত্যাদি গঠন করবে। মস্তকভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে ভূখন্ডের অবশিষ্টাংশ দ্বীপ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে। যৌবন অবস্থায় উপকূল রেখা বিভেদকে ক্ষয়ের (differential erosion) জন্যে একটি জটিল চেহারা নেবে। ক্ষয়জাত পদার্থগুলি ক্রমশ উপসাগরের মস্তক ভাগে জমা পড়বে এবং অনুতটীয় প্রবাহের সাহায্যে উপসাগরের মুখের কাছে স্পিট ও বাঁধ তৈরী আরম্ভ হবে। এর ফলে উপকূল রেখার প্রাথমিক জটিলতা খানিকটা সরল আকার ধারণ করবে। এই অবস্থাকে উপপরিণত অবস্থা বলা যেতে পারে। উপসাগরগুলি প্রথমে উপহ্রদে পরিণত হবে এবং লবণাক্ত জলাভূমি গঠন করবে। নদী পরিবাহিত পলি যোগ হলে উপহ্রদগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর ক্রমান্বয়ে উপকূল পশ্চাদ্ গমন করতে করতে যখন উপসাগরের মাথার দিকে চলে যাবে তখন ভূমিরূপটি পরিণত অবস্থায় উপনীত হবে (চিত্র নং 6.23)

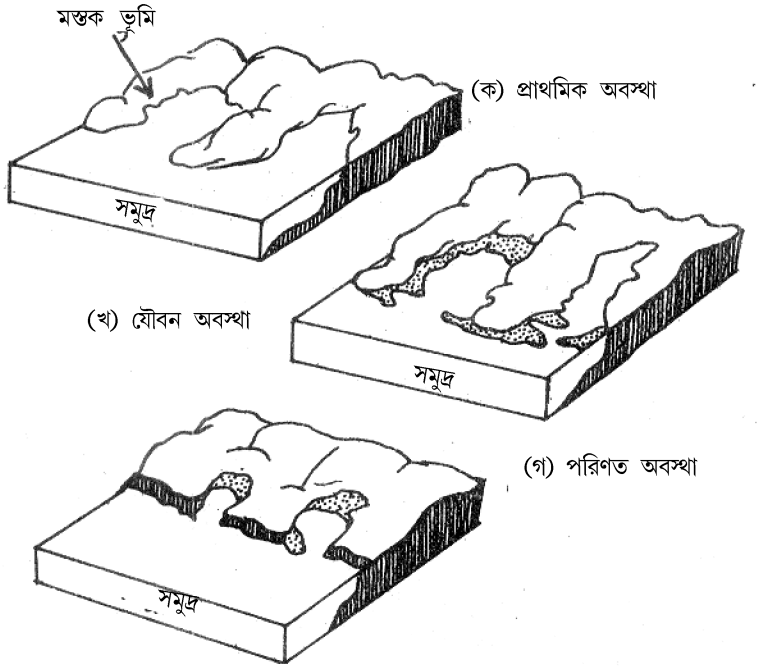

নিমজ্জিত উপকূল রেখার বিবর্তন

চিত্র 6.23

(2) উপকূলের পার্শ্বচিত্রের বির্বতনে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি ধরা যাক। উত্থিত উপকূলের নীচের মৃদু ঢালযুক্ত অংশ উঠে এসে সমুদ্র পৃষ্ঠের পাশাপাশি অবস্থান করবে। সাধারণতঃ পার্শ্বচিত্রের সমতা বজায় রাখতে গেলে উপকূলের যা ঢাল থাকা প্রয়োজন তার থেকে ঢাল অনেক কম থাকে। ফলে সমুদ্র তরঙ্গ ঢাল বাড়াবার জন্যে প্রতিতটীয় অঞ্চলে ক্ষয় করে এবং উপকূলের দিকে সঞ্চয় করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রতিতটীয় বাঁধ (offshore bar) সৃষ্টি হয়। এই বাঁধের পিছনে উপহ্রদ গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন লবণ সহনীয় (salt resistant) উদ্ভিদের উপস্থিতিতে ক্রমশ কর্দম তটের উদ্ভব হয়। কর্দমতট ও প্রতিতটীয় বাঁধের উপস্থিতি প্রকৃত পক্ষে তটবৃদ্ধিরই (progradation) নামান্তর। এই সময় উপকূলের যৌবন অবস্থা বলা যেতে পারে।

এর পরবর্তী পর্যায় প্রতিতটীয় বাঁধটির পশ্চাদ গমন (retrogradation) শুরু হয়। বাঁধটি যত উপকূলের দিকে সরে যেতে থাকে কর্দমতটটিও বাঁধের পশ্চাদগমনের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। ইতিমধ্যে সমুদ্র ভৃগু ও তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চর উচ্চতাও স্বাভাবিক ভাবে অনেকটাই হ্রাস পায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উত্থিত উপকূলরেখা মোটামুটি সরল রেখায় বিস্তৃত থাকে। যদি প্রতিতটীয় অঞ্চলের ঢাল বেশী থাকে তবে শক্তিশালী তরঙ্গ সমূহ উপকূলের কাছাকাছি চলে আসে এবং সরাসরি উপকূলের পশ্চাদ্‌গমনে কার্যকরী হয়। সমুদ্র ভৃগুর সামনের ঢাল ক্রমশ খাড়া হবার ফলে ভৃগুর উচ্চতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। নদীগুলি পুনরুজ্জীবিত (rejuvenated) হবার ফলে তাদের উপত্যকা গুলি নতুন করে ক্ষয় করতে থাকে। অপেক্ষাকৃত ছোট নদীগুলি পর্যায়িত ঢাল (graded profile) গঠন করতে সক্ষম হয় না বলে ঝুলন্ত উপত্যকার (hanging valley) সৃষ্টি হয় (চিত্র নং 6.24)।

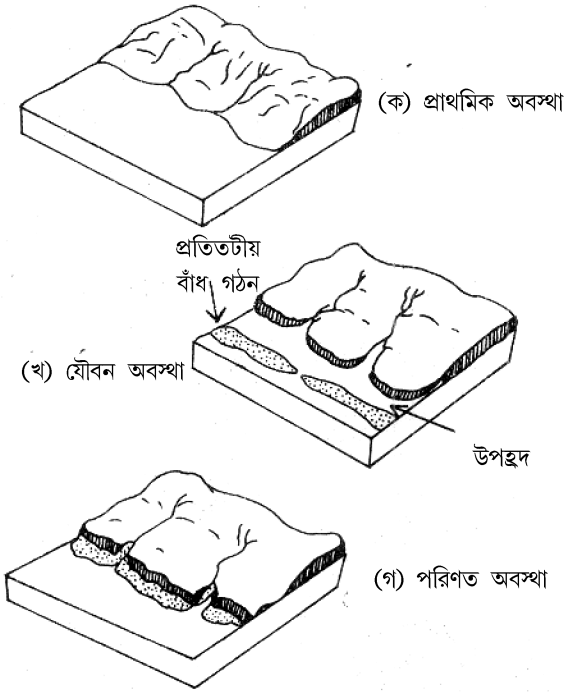

উত্থিত উপকূল রেখার বিবর্তন

চিত্র 6.24

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিতটীয় অঞ্চলের ঢাল অল্প হওয়ার ফলে তরঙ্গাগুলি উপকূল থেকে অনেক দূরে ভাঙ্গে এবং সেই জায়গায় প্রতিতটীয় অন্তঃসাগরীয় বাঁধের (submarine offshore bar) সৃষ্টি করে। এই বাঁধ ক্রমশ জলের উপরে প্রতিতটীয় বাঁধ হিসেবে দেখা যায়। প্রতিতটীয় বাঁধের গঠন সম্পূর্ণ হলে বলা যায় যে উপকূলটি যৌবন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এরপর প্রতিতটীয় বাঁধটি যখন পশ্চাদগমন করে মূল ভূখন্ডের কাছে চলে আসে তখন উপূকলের পরিণত অবস্থা বলা যেতে পারে।

6.7 উপকূল অঞ্চলের শ্রেণী বিভাগ (classification of coastline)

উপকূল অঞ্চলের বিবর্তনের নির্ধারকগুলি এত বিভিন্ন ধরণের যে এই গুলির উপর ভিত্তি করে উপকূল অঞ্চলের শ্রেণী বিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এখনও অবধি কোনো একটি শ্রেণী বিভাগকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করে যায়নি। এর মধ্যে কিছু শ্রেণী বিভাগ উপকূলের উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে (genetic classification), আবার কিছু নিছক বর্ণনামূলক। সাধারণত তিনটি নির্ধারককে (criteria) সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়—

- সমুদ্র ও ভূমিভাগের সংযোগ স্থলের চরিত্র (land sea contact zone)
- সমুদ্র পৃষ্ঠের আপেক্ষিক পরিবর্তন (relative change of sea level)
- সামুদ্রিক প্রক্রিয়াগুলির প্রভাব (effect of marine process)

ই. সুয়েস (E. Suess) (1888) প্রথম দুটি নির্ধারকের ভিত্তিতে পৃথিবীর উপকূল অঞ্চলকে 'আটলান্টীয়' (Atlantic type) ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়' (Pacific type) দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এর পর জনসন, শেপার্ড, ডেভিস, গালিভার অনেকেই উপকূলের শ্রেণী বিভাগ করেন।

এই শ্রেণীবিভাগ গুলির মধ্যে জনসনের দেওয়া শ্রেণী বিভাগটিই সব থেকে জনপ্রিয়। তাঁর প্রদত্ত শ্রেণী বিভাগটি নিচে উল্লেখ করা হলঃ—

ডি. ডব্লু জনসন (1919)

		উদাহরণ
(1) নিমজ্জিত উপকূল (submergence coasts)	(a) রিয়া উপকূল (Ria coast)	দক্ষিণ পশ্চিম আয়ারল্যান্ড
	(b) ফিয়র্ড উপকূল (Fiord Coast)	পশ্চিম নরওয়ে
	(c) ড্যালমেসিয়ান উপকূল (Dalmatian coast) (বাঁধ সহ) (with barrier)	যুগোস্লাভিয়ার অ্যাডরিয়াটিক উপকূল
(2) উত্থিত উপকূল (emergences coasts)		
(3) প্রশম উপকূল রেখা (Neutral coast)	(a) বদ্বীপ সহ উপকূল (Delta coast)	বলটিক সাগরের উপকূল মিসিসিপি বদ্বীপ
	(b) পলি গঠিত সমভূমি সৃষ্ট উপকূল (Alluvial plain coast)	উত্তর পশ্চিম ভারতীয় উপকূল
	(c) হিমান্ত পলিভূমি সৃষ্ট উপকূল (outwash plain coast)	দক্ষিণ পূর্ব আইসল্যান্ড
	(d) আগ্নেয়গিরি সহ উপকূল (Volcano coast)	হাওয়াই দ্বীপের উপকূল
	(e) প্রবাল প্রাচীর দ্বারা সৃষ্টি উপকূল (coral reef cost)	
	(f) চ্যুতি রেখা বরাবর গঠিত উপকূল (Fault coast)	অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ্ নিউজিল্যান্ডের উত্তরাংশ
(4) যৌগিক উপকূল (compound coast)	উপরোক্ত তিনটি ধরণের মিশ্রণ	

নিমজ্জিত উচ্চভূমি দ্বারা গঠিত উপকূল (submerged upland coast) তিন ধরণের হতে পারে ঃ—

a) **রিয়া উপকূল** ঃ যদি এমন কোন ভূমিভাগ নিমজ্জিত হয় যেখানে পর্বতমালা ও নদীগুলি উপকূল রেখার সঙ্গে লম্ব ভাবে অবস্থিত তাহলে রিয়া উপকূল গড়ে ওঠে। পূর্বের নদী উপত্যকাগুলি নিমজ্জিত হবার ফলে এর মাথার দিকে একটি নদী সাধারণতঃ সে পড়ে। রিয়ার গভীরতাও ক্রমশ মাথার দিকে কমতে থাকে। উত্তর পশ্চিম স্পেনের উপকূল ও গুজরাটের কচ্ছ উপকূলে নিমজ্জনের প্রভাব দেখা যায়।

b) **ফিয়র্ড উপকূল** ঃ হিমবাহ দ্বারা সৃষ্ট উপত্যকা (glacial trough) নিমজ্জনের ফলে এই ধরণের উপকূলের সৃষ্টি হয়। হিমবাহ উপত্যকার আকৃতি ও চরিত্র ফিয়র্ড উপকূলের মধ্যে দেখা যায়। ফিয়র্ডের ঢোকবার মুখে একটি বাঁধ (barrier) দেখা যায় ও গভীরতা অত্যন্ত বেশী থাকে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে প্রান্তীয় গ্রাব (terminal moraine) এই বাঁধ গঠন করে। নরওয়ের সমগ্র উপকূলটিই ফিয়র্ড উপকূল।

c) **ড্যালমেসিয়ান উপকূল** ঃ যে অঞ্চলে পর্বতমালাগুলি উপকূলের সমান্তরাল ভাবে রয়েছে সেই অঞ্চল যখন নিমজ্জিত হয় তখন ড্যালমেসিয়ান উপকূল সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল এই পর্যায় পড়ে।

কোনো সমতল ভূমি নিমজ্জিত হলে সেই উপকূলের ঢাল অত্যন্ত অল্প হয় এবং সমুদ্রের জল নদী উপত্যকার মধ্যে ঢুকে খাড়ি (estuary) গঠন করে।

উত্থিত উপকূল অঞ্চলে উত্থিত সৈকত ভূমি (raised beaches) বা উত্থিত তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ (wave cut platform) চোখে পড়ে। কোঙ্কন উপকূলের উত্তরাংশে এই ধরণের উপকূল বিরল নয়।

জনসনের শ্রেণী বিভাগের বিরোধিতা করে শেপার্ড (F. P. Shepard) বলেন যে সব উপকূলই কম বেশী উত্থান ও নিমজ্জন দ্বারা প্রভাবিত কাজেই সে ক্ষেত্রে সব উপকূলই যৌগিক (compund) উপকূলের অন্তর্ভুক্ত। শেপার্ড (1963) উপকূল অঞ্চলের একটি নতুন শ্রেণীবিভাগ করেন। তিনি উপকূল গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। নীচে শেপার্ডের শ্রেণী বিভাগটি সংক্ষেপে দেওয়া হল।

এফ. পি. শেপার্ড (1963) :

I. প্রাথমিক উপকূল (Primary Coasts) যা সমুদ্রকার্যের দ্বারা প্রভাবিত নয়ঃ—

(a) ভূমি ক্ষয়ের জন্যে গঠিত উপকূল (land erosion coasts)

(b) উপবায়বীয় সঞ্চয় প্রক্রিয়ার দ্বারা গঠিত উপকূল (subaerial depositional coast)

(c) অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা প্রভাবিত উপকূল (volcanic coast)

(d) ভূ-আন্দোলন দ্বারা সৃষ্ট উপকূল (shaped by diastrophic movement)

II. গৌন উপকূল যেগুলি প্রধানত সমুদ্র কার্যের দ্বারা প্রভাবিত ঃ—

(a) সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট উপকূল

(b) সমুদ্রের সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট উপকূল

(c) জৈবিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত উপকূল

কটন (C.A. Cotton) (1952) উপকূল অঞ্চলকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করেন—ভূগঠনগত দিক দিয়ে স্থির অঞ্চলের উপকূল ও ভূগঠনগত দিক দিয়ে অবস্থিত অঞ্চলের উপকূল (coasts of stable regions and coasts of mobile regions)। সর্বশেষে ডেভিসের (W. M. Davis) প্রদত্ত শ্রেণী বিভাগটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন উপকূল অঞ্চলে সমুদ্র তরঙ্গের প্রভাবের তারতম্য অনুযায়ী মোট চারটি ভাগে পৃথিবীর উপকূলকে ভাগ করেছেন- ঝঞ্ঝা তরঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত উপকূল (storm wave environment), পশ্চিম উপকূলের তরঙ্গ স্ফীতি (wave swell) দ্বারা প্রভাবিত উপকূল (west-coast swell), পূর্ব উপকূলের তরঙ্গ স্ফীতি দ্বারা প্রভাবিত উপকূল (east-coast swell) ও চারিদিক থেকে সুরক্ষিত উপকূল (protected sea)।

6.4 সারাংশ

এই এককের মধ্যে প্রথমে উপকূলবর্তী প্রক্রিয়াগুলির কথা আলোচনা করা হয়েছে। জোয়ার, সমুদ্র তরঙ্গ, সমুদ্র স্রোত ও বায়ু ছাড়াও উপকূলবর্তী নদীগুলির প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের ক্ষয় প্রক্রিয়াতে প্রতিটি প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক গুরুত্বগুলি তুলে ধরা হয়েছে। সমুদ্র ভৃগু, তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ ও তৎসহ ভূমিরূপগুলির উদ্ভবের পিছনে কি ভাবে একাধিক প্রক্রিয়া একসঙ্গে কাজ করে চলেছে তার কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলির বিবর্তনে সৈকত অঞ্চলের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের স্পিট, বাঁধ ও কর্দমতট ইত্যাদির উদ্ভবও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সমুদ্রের জলপৃষ্ঠের উচ্চাবচ গতি ও বর্তমান ভূমিরূপের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ উপকূলের পার্শ্বচিত্রের বিবর্তন ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

6.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান 1)

1. তরঙ্গ ও জোয়ার ভাঁটার প্রভাবে সমুদ্র জলের সঞ্চারণকে কী বলা হয় ?
2. পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র সারিবদ্ধ হবার ফলে যে জোয়ার আসে তাকে কী বলা হয় ?
3. তরঙ্গের গতিবেগ, দৈর্ঘ্য ও তরঙ্গ পর্যায় কালের সম্পর্ক একটি সমীকরণের সাহায্যে দেখান।
4. তরঙ্গ ভঙ্গ হবার পর যখন সমুদ্রের জল ভূমির ঢাল বরাবর কিছুটা উপরে উঠে যায় তাকে কী বলা হয় ?
5. উপকূলের সমান্তরাল স্রোতকে কী বলা হয় ?
6. উপকূল থেকে সমুদ্রের দিকে লম্বভাবে প্রবাহিত স্রোত কে কী বলা হয় ?
7. ভৃগুর পশ্চাদবর্তী অংশকে কী বলে ?
8. ভাঁটার সীমারেখা থেকে ভৃগুর পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে কী বলে ?
9. লোনা জলের ছিটের জন্যে যে আবহবিকার হয় তাকে কী বলে ?
10. ভৃগু পাদদেশ থেকে ক্ষয়জাত পদার্থ অপসারণের হার যেখানে সঞ্চয়ের থেকে বেশী সেখানে ভৃগুর ঢাল কেমন হয় ?
11. সমুদ্র ভৃগুর যে অংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে কী বলে ?
12. সৈকতের পিছনের ভাগ সঞ্চিত বালি দিয়ে গঠিত ভূমিরূপকে কী বলে ?
13. তরঙ্গ প্রতিসরণের ফলে স্পিটের মুখ সম্পূর্ণ ঘুরে গেলে তাকে কী বলে ?
14. মস্তক ভূমির দু-ধারে ডানার মত স্পিট গঠিত হলে তাকে কী বলে ?
15. কর্দমতটে লবণ সহনীয় যে গাছ দেখা যায় তাদের কী বলে ?
16. চর্তুদিকে পরিবেষ্টিত উপসাগরকে কী বলে ?
17. বর্তমান সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে অবস্থিত সমুদ্র ভৃগুকে কী বলে ?
18. সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতার পরিবর্তনকে কী বলে ?
19. একটি হিমযুগের অন্তে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিকে কী বলে ?
20. ই. সুয়েস পৃথিবীর উপকূলের কী কী শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন ?

B. সংজ্ঞামূলক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান-2)

1. সমুদ্র তরঙ্গ কী ভাবে গঠিত হয় ?
2. ঊর্ধ্ব ধাবন ও পশ্চাদ ধাবন কাকে বলে ?
3. সাইক্লয়েড কাকে বলে ?
4. উপকূল অঞ্চলে কোষ সঞ্চালন কাকে বলে ?
5. মহাদেশীয় তটীয় মঞ্চ কাকে বলে ?
6. অবঘর্ষ প্রক্রিয়া কী ?
7. সমুদ্র খিলান কাকে বলে ?
8. টম্বোলো কাকে বলে ?
9. সৈকত শিলা কাকে বলে ?

10. সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চাবচ গতি কাকে বলে ?
11. অবনত তরঙ্গা ভঙ্গা কাকে বলে ?
12. তরঙ্গা প্রতিসরণ কাকে বলে ?
13. আনত তরঙ্গা ভঙ্গা কাকে বলে ?
14. উপকূলের কোন অংশকে তট বলে ?
15. তরঙ্গা কর্তিত মঞ্চ কাকে বলে ?
16. প্রতিতটীয় বাঁধ কাকে বলে ?
17. তীক্ষ্মাগ্র বাঁধ কাকে বলে ?
18. রিয়া উপকূল কাকে বলে ?
19. ড্যালমেসিয়ান উপকূল কাকে বলে ?
20. কটন মূলতঃ কী কী ভাগে উপকূল অঞ্চলকে ভাগ করেছেন ?

C. ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নঃ— (প্রতিটি প্রশ্নের মান 4)

1. তরঙ্গের উচ্চতা ও সৈকতের ঢাল অনুযায়ী ভগ্ন তরঙ্গের চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।
2. সমুদ্র স্রোত ও উপকূল অঞ্চলের কোষ সঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লিখুন।
3. সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়ের যান্ত্রীক প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে লিখুন।
4. সমুদ্র ভৃগুর রূপ ও তার ক্ষয় কী কী উৎপাদকের (factor) উপর নির্ভর করে ?
5. সমুদ্র গহ্বর খিলান ও স্তম্ভর উৎপত্তি কী ভাবে হয় ?
6. তরঙ্গা কর্তিত মঞ্চর উদ্ভবের পিছনে কী কী প্রক্রিয়া কাজ করে ?
7. ফুৎকার বিবর ও গিও সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
8. সমুদ্র সৈকতের উৎপত্তি কী ভাবে হয় ?
9. সমুদ্র সৈকতের বাজেটের অর্থ কী ?
10. স্পিট ও বাঁধের উদ্ভব কী ভাবে হয় ?
11. প্রতিতটীয় বাঁধের উৎপত্তি সম্পর্কে জনসন ও গিলবার্টের মতামত কী ?
12. উপকূলবর্তী কর্দমতটের চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।
13. উপকূল অঞ্চলের বালিয়াড়ি কি ভাবে গঠিত হয় ?
14. উপকূল অঞ্চলের পরিবহন কার্য কম্পর্কে টীকা লিখুন।
15. সমুদ্র পৃষ্ঠের পরিবর্তন কী কী কারণে হতে পারে ?
16. উপকূল অঞ্চলের শ্রেণী বিভাগ জনসন কিভাবে করেছেন ?

D. রচনা ধর্মী প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান 10)

1. সামুদ্রিক ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ চিত্রসহযোগে আলোচনা করুন।
2. সামুদ্রিক সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের বর্ণনা দিন।
3. উপকূল অঞ্চলের বিবর্তনে জোয়ার ভাঁটা ও সমুদ্র তরঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
4. উপকূল অঞ্চলের পার্শ্বচিত্রের বিবর্তন কীভাবে হয় ?

6.10 উত্তরমালা

A. সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক

1. উপকূল অঞ্চলের স্রোত (coastal current)
2. ভরা কোটাল (spring tide)
3. $C = \frac{\lambda}{T}$
4. উর্ধ্ব ধাবন (swash)
5. অনুতটীয় প্রবাহ (longshore current)
6. উজানতটীয় স্রোত (rip current)
7. উপকূল (coast)
8. তট (shore)
9. লবণ বিকার (salt weathering)
10. প্রায় 90°
11. স্তম্ভ (stack)
12. বার্ম (berm) বা সৈকত শিরা (beach ridge)
13. পূর্ণবক্র স্পিট (recurved spit)
14. পক্ষযুক্ত মস্তক ভূমি (winged headland)
15. হ্যলোফাইটিক গাছ
16. উপহ্রদ (lagoon)
17. অশ্বীভূত সমুদ্র ভৃগু (fossil cliff)
18. সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চাবচ গতি (eustatic movement)
19. ফ্ল্যান্ড্রিয়ান অনুপ্রবেশ (flandrian transgression)
20. 'আটলান্টীয়' ও 'প্রশান্ত মহাসাগরীয়' উপকূল

B. সংজ্ঞামূলক

1. 6.2.2 অংশে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন
2. 6.2.2 অংশে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দেখুন
3. 6.2.2 অংশে চতুর্থ অনুচ্ছেদ দেখুন
4. 6.2.3 অংশে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন
5. 6.3 অংশে শেষ অনুচ্ছেদ দেখুন
6. 6.4.1 অংশে দেখুন
7. 6.4.2 অংশে দেখুন
8. 6.4.3 অংশে দেখুন
9. 6.4.3 অংশে দেখুন
10. 6.5 অংশে দেখুন

11. 6.4.2 অংশে দেখুন
12. 6.4.2 অংশে দেখুন
13. 6.4.3 অংশে দেখুন
14. 6.4.3 অংশে দেখুন
15. 2.6.3 অংশে দেখুন
16. 6.4.3 অংশে দেখুন
17. 6.4.3 অংশে দেখুন
18. 6.7. অংশে দেখুন
19. 6.7 অংশে দেখুন
20. 6.7 অংশে দেখুন

C. ব্যাখ্যামূলক

1. 6.2.2 অংশে দেখুন (৭ম অনুচ্ছেদ)
2. 6.3.3 অংশে দেখুন
3. 6.4.1 অংশে দেখুন
4. 6.4.2 অংশে দেখুন
5. 6.4.2 অংশে দেখুন
6. 6.4.2 অংশে দেখুন
7. 6.4.2 অংশে দেখুন
8. 6.4.2 অংশে দেখুন
9. 6.4.3 অংশে দেখুন
10. 6.4.3 অংশে দেখুন
11. 6.4.3 অংশে দেখুন
12. 6.4.3 অংশে দেখুন
13. 6.4.3 অংশে দেখুন
14. 6.4.4 অংশে দেখুন
15. 6.5 অংশে দেখুন
16. 6.7 অংশে দেখুন

D. রচনাধর্মী

1. 6.4.2 অংশে দেখুন
2. 6.4.3 অংশে দেখুন
3. 6.2 অংশে দেখুন
4. 6.6 অংশে দেখুন

একক 7 ❐ কার্স্ট অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপের উদ্ভব

গঠন

7.1 প্রস্তাবনা
7.2 উদ্দেশ্য
7.3 কার্স্টের সংজ্ঞা ও তার ঐতিহাসিক বিবর্তন
7.3.1 পৃথিবীর বিভিন্ন কার্স্ট অঞ্চলের বন্টন
7.4 কার্স্ট ভূমিরূপগঠণকারী শিলাসমূহ
7.5 কার্স্ট ভূমিরূপগঠনে অনুকূল শর্তসমূহ
7.6 কার্স্ট প্রক্রিয়া
7.7 কার্স্ট ভূমিরূপের উদ্ভব
7.7.1 ভূপৃষ্ঠের রূপ
7.7.1.1 ছোট আয়তনের ভূমিরূপ
7.7.1.2 বৃহৎ আয়তনের ভূমিরূপ
7.7.1.3 কার্স্ট অঞ্চলের নদীর ক্ষয়কার্য ভূমিরূপ
7.7.2 ভূ-আভ্যন্তরীন রূপ
7.7.2.1 চুনাপাথর অঞ্চলে ভৌমজলের প্রবাহ
7.7.2.2 চুনাপাথর অঞ্চলের গহ্বর
7.8 কার্স্টীয় অঞ্চলের ক্ষয়চক্র
7.9 সারাংশ
7.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
7.11 উত্তরমালা

7.1 প্রস্তাবনা

কার্স্ট ভূমিরূপ বিদ্যার জনপ্রিয়তার আরম্ভ যুগোস্লাভিয়াতে। চুনাপাথর, ডলমাইট বা চক্ জাতীয় শিলায় এই ভূমিরূপ উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। দারণ তল যুক্ত, কার্বোনেট খনিজ দ্বারা গঠিত শিলা ও আর্দ্র জলবায়ু কার্স্ট ভূমিরূপ উদ্ভবের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কার্স্ট অঞ্চলের ভূমিরূপগুলি কিছু ভূপৃষ্ঠে ও কিছু ভূ-অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে। কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনকে একটি ক্ষয়চক্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

7.2 উদ্দেশ্য

এই এককে চুনাপাথর অঞ্চলে ভূমিরূপ উদ্ভবের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে। যে কোনও ভূমিরূপ উদ্ভবে, কার্যকরী প্রক্রিয়া ও শিলার গঠন দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

- কার্স্ট অঞ্চলের বিস্তৃতি সমগ্র পৃথিবীতে যদিও সীমিত কিন্তু শিলার গাঠনিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে এই অঞ্চলের ভূমিরূপ উদ্ভবের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।
- কার্স্ট অঞ্চলে জলপ্রবাহও বিশেষ ধরনের। আর কোনও অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনে ভৌমজল প্রবাহ এমন স্বক্রিয় ভূমিকা নেয় না।
- কার্স্ট অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলিও বিশেষ ধরনের। বেশীর ভাগ নদীর উৎপত্তিই চুনাপাথর অঞ্চলের বাইরে।
- কার্স্ট ভূমিরূপ প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে দ্রবণ নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কোনও ভূমিরূপের গঠনে দ্রবণ এত কার্যকরী হয় না।

7.3 কার্স্টের সংজ্ঞা ও তার ঐতিহাসিক বিবর্তন

কার্স্ট এক বিশেষ ধরনের ভূমিরূপের সমষ্টি। এখানে জলের কাজও বিশেষ ধরনের। কার্স্ট ভূমিরূপের উদ্ভব শিলার দ্রবণীয়তা (solubility) এবং সচ্ছিদ্রতার (porosity) উপর নির্ভরশীল। ফোর্ড এবং উইলিয়মের মতে "Karst is a terrain with distinctive hydrology and landforms arising from a combination of high rock solubility and well developed secondary porosity (Ford and William 1889)"। এই সংজ্ঞার মাধ্যমে শুধু ভূমিরূপই নয়,তার উদ্ভবের পিছনে কার্যকরী ভৌমজলের (groundwater) প্রক্রিয়া এবং শিলার বিশিষ্টতার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। শিলার দ্রবণীয়তা একাধারে যেমন আবহবিকারে সহায়তা করে তেমনি আবহবিকার প্রভাবিত ভূপৃষ্ঠ থেকে দ্রবণের মাধ্যমে অপসারণেও সাহায্য করে।

যুগোস্লাভিয়া এবং এ্যাডরিয়াটিক সাগরের উপকূল সংলগ্ন ইতালির কিছু অংশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ চুনাপাথর দ্বারা গঠিত মালভূমি থেকে 'কার্স্ট' কথাটি এসেছে। জার্মান ভাষায় অনাবৃত শিলা (bare rock) দ্বারা গঠিত ভূপৃষ্ঠকে কার্স্ট বলে এবং কার্স্ট অঞ্চলের বিভিন্ন ভূমিরূপের নামকরণও স্থানীয় ভাষা থেকে নেওয়া। এই অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে জলপ্রবাহ প্রায় দেখাই যায় না এবং সমগ্র অঞ্চলটি অসংখ্য গর্ত ও গভীর খাদ (ravine) দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় থাকে। মাটির নীচে ভৌমজলপ্রবাহের প্রক্রিয়ার ফলে গর্ভস্থ গুহা (underground caves) ও বিভিন্ন সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ দেখা যায়। পেঙ্ক (Penck) প্রথম উত্তর পশ্চিম যুগোস্লাভিয়াতে কার্স্ট অঞ্চলের উপর কাজ করেন এবং পরবর্তীকালে পেঙ্কের ছাত্র সিভিজিক (Cvijic) কার্স্ট ভূমিরূপ বিদ্যাকে (Karst geomorphology) জনপ্রিয় করে তোলেন।

7.3.1 পৃথিবীর বিভিন্ন কার্স্ট অঞ্চলের বন্টন

যুগোস্লাভিয়া ছাড়া দক্ষিণ ফ্রান্সের কসে (Causses) অঞ্চল, মেক্সিকোর ইউক্যাটান (Yucatan) এবং ট্যাবাস্কো (Tabasco) অঞ্চল, জ্যামাইকা, পোর্টোরিকা ও পশ্চিম কিউবাতেও কার্স্ট অঞ্চল দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার মিসৌরি, মধ্য ফ্লোরিডা, ইন্ডিয়ানা, কেন্টাকি, পেনসিলভেনিয়ার "গ্রেট ভ্যালি" (Great Valley), মেরিল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলেও কার্স্ট ভূমিরূপ দেখা যায়। এছাড়া তানজানিয়া (আফ্রিকা) ও ইংলন্ডের চক্ (chalk) অঞ্চলে কার্স্ট ভূমিরূপ গড়ে উঠেছে। ভারতে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে, বিহারের রোটাস মালভূমি, কুমায়ুন হিমালয়ের আলমোড়া অঞ্চল, জম্মু কাশ্মীর ও মেঘালয়ে কার্স্ট ভূমিরূপ দেখা যায়।

7.4 কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনকারী শিলাসমূহ

কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনকারী শিলার মধ্যে চুনাপাথর নিঃসন্দেহে অন্যতম। যে শিলার 50 শতাংশের বেশী কার্বোনেট খনিজ দ্বারা গঠিত তাকেই চুনাপাথর বলা হয়। কার্বোনেট খনিজগুলির মধ্যে ক্যালসাইট ($CaCO_3$) সবথেকে বেশী দেখা যায়। অন্যান্য কার্বোনেট খনিজের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট ($MgCO_3$), অ্যারাগোনাইট (Aragonite) ও ডলোমাইট (Dolomite) উল্লেখযোগ্য। চুনাপাথরের মধ্যে কিছু কোয়ার্টর্স (quartz) ও কর্দম খনিজও (clay minerals) পাওয়া যায়।

নিম্ন ও মধ্য অক্ষাংশে অপেক্ষাকৃত গভীর সমুদ্র তলে ক্যালসাইট সঞ্চিত হয়, যেখানে সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ চুনাসমৃদ্ধ পদার্থ (calcareous material) গঠন করে। অপরদিকে অগভীর সমুদ্রে অ্যাল্‌গি ও প্রবালের সঙ্গে ভূখণ্ড থেকে বয়ে আসা সূক্ষ্মকণাযুক্ত পদার্থও জমা পড়ে।

ডলোমাইটে 50 শতাংশ কার্বোনেট খনিজ পাওয়া যায়, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশী ডলোমাইট ($CaMg(CO_3)_2$) দিয়ে গঠিত। তবে $MgCO_3$ এর পরিমাণ সমুদ্রজলের উষ্ণতার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। কাজেই যে কোনও কার্বোনেট শিলায়, ক্যালসাইট ও ডলোমাইট, এই দুইটি খনিজই সবথেকে বেশী দেখা যায়। শিলার রাসায়নিক গঠন ছাড়াও, সচ্ছিদ্রতার (porosity) তারতম্য, বা শিলার মধ্যে দারণ তলের (joint plane) উপস্থিতি কার্স্ট অঞ্চলের ভূমিরূপকে অনেকটাই প্রভাবিত করে।

7.5 কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনে অনুকূল শর্তসমূহ

পৃথিবীর বেশ কিছু এলাকায় চুনাপাথর, ডলোমাইট বা চক থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র একইভাবে কার্স্ট ভূমিরূপের উদ্ভব সম্ভব হয় না। আদর্শ কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনের জন্যে চারটি অনুকূল পরিস্থিতি থাকা প্রয়োজন।

প্রথমত ঃ মাটির উপরে বা মাটির কাছাকাছি চুনাপাথর জাতীয় দ্রবণীয় শিলা থাকা প্রয়োজন। ডলোমাইটের উপস্থিতিও কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনে কার্যকরী হয়, তবে ডলোমাইট চুনাপাথরের মত সহজে দ্রবীভূত হয়না।

দ্বিতীয়ত ঃ এই দ্রবণীয় শিলা চুনাপাথর, ডলোমাইট বা চক যাই হোক না কেন, তার ঘনত্ব (density) যথেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শিলার মধ্যে যদি দারণ তলের আধিক্য থাকে (highly jointed) বা স্তরায়ন তলগুলি (bedding plane) যদি সরু হয় তাহলে দ্রবণ প্রক্রিয়া দ্রুত কাজ করে। এখানে বলা যায় যে, শিলার প্রবেশ্যতা (permeability) যদি দ্রবণীয় শিলার সর্বত্র, সমান থাকে তাহলে বৃষ্টির জল সব জায়গায় সমানভাবে শিলার মধ্যে প্রবেশ করে। সেক্ষেত্রে আদর্শ কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনে তা সবসময় সহায়তা করে না। কিন্তু বৃষ্টির জল যদি দারণ তল বরাবর শুধুমাত্র প্রবেশ করতে পারে, তাহলে দ্রবণ প্রক্রিয়ার প্রভাব স্বভাবতই দারণতা সংলগ্ন এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং আদর্শ কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনে সাহায্য করে।

তৃতীয়তঃ কোনও নদী যদি উপরের দারণতলযুক্ত চুনাপাথর স্তরকে কেটে নীচে অবস্থিত অপ্রবেশ্য শিলার উপর দিয়ে বয়ে যায় তাহলে এই নদীর প্রবাহ দ্রবণের কাজকে ত্বরান্বিত করে। এখানে উল্লেখ্য যে জলের প্রবাহ বা পরিসঞ্চালন (circulation) দ্রবণ প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরী। স্থির জলের মাধ্যমে দ্রবণ প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকরী হয় না।

চতুর্থতঃ চুনাপাথর এলাকাটি মোটামুটি আর্দ্র (moderately humid) জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত হতে হবে। শুষ্ক বা প্রায় শুষ্ক (arid or semi arid) অঞ্চলে কার্স্ট ভূমিরূপ গঠন সম্ভব হয় না, কারণ বৃষ্টির অভাবে শিলার দ্রবণ থমকে যায়।

7.6 কার্স্ট প্রক্রিয়া

কার্স্ট অঞ্চলে মূলতঃ ক্যালসাইট ও ডলোমাইট খনিজ দ্বারা গঠিত শিলা পাওয়া যায়, যা কার্বোনিক অ্যাসিড (Carbonic Acid) মিশ্রিত জলে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে যায়। চুনাপাথরের দ্রবণ প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার (Chemical reaction) মাধ্যমে বোঝানো যায়।

$$CaCO_3 + H_2CO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO^3$$

$$Ca\ Mg\ (CO_3)_2 + 2H_2CO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + Mg^{2+} + 4HCO^3$$

বায়ুমণ্ডলের CO_2 যখন জলের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে তখন কার্বনিক অ্যাসিড গঠন করে

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \text{ (Carbonic Acid)}$$

জলে কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) দ্রবণীয়তা মূলতঃ কয়েকটি জিনিষের উপর নির্ভরশীল :

বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের আংশিক চাপ *(partial pressure)* প্যাস্কাল এককে *(Pascal)* মাপা হয়। যেখানে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের আংশিক চাপ মাত্র 30 প্যাস্কাল, যেখানে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ($CaCO_3$) দ্রবণীয়তা মাত্র প্রতি লিটারে 63 মিলিগ্রাম। কিন্তু মাটির নিচে যেখানে মুক্ত অক্সিজেনের অভাব রয়েছে সেখানে কার্বনডাই অক্সাইডের আংশিক চাপ 30 কিলো প্যাস্কেল পর্যন্ত বাড়তে পারে। স্বাভাবিকভাবেই ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ($CaCO_3$) দ্রবণীয়তাও বেড়ে প্রতি লিটারে 700 মিলিগ্রাম হয়ে যায়। (চিত্র নং 7.1)।

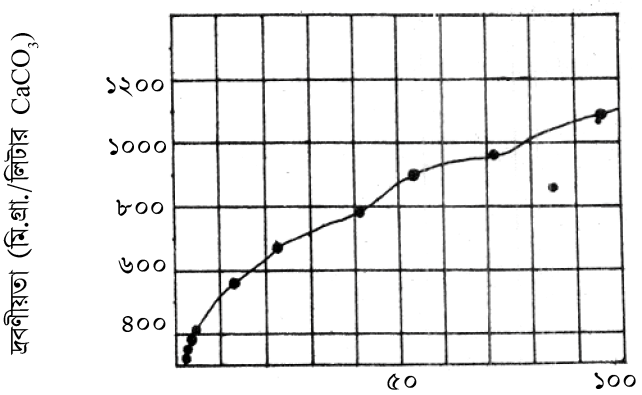

কার্বোন-ডাই-অক্সাইডের আংশিক চাপ ও জলের $CaCO_3$ দ্রবণ ক্ষমতার সম্পর্ক।

চিত্র নং 7.1

এছাড়াও উদ্ভিদ ও জীবাণু সরাসরি চুনাপাথরের রাসায়নিক অবক্ষয় (corrosion) করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে ফোক (Folk) এবং আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক "ফাইটো কার্স্ট" (Phytokarst) ভূমিরূপের উল্লেখ করেছেন। চুনাপাথরের উপরের স্তরে কিছু নীল সবুজ এ্যালগি (blue-green algae) থাকে, যাদের দেহ থেকে নির্গত আম্লিক পদার্থ (acidic material) ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য গর্ত সৃষ্টি করে, ফলে সমগ্র এলাকাটি স্পঞ্জের মত দেখতে হয়ে যায়।

জলের তাপমাত্রা যত কম থাকে, তার কার্বন ডাই অক্সাইডকে দ্রবীভূত করবার ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পায়। 30° সেলসিয়াসে জলের দ্রবণ করবার যা ক্ষমতা তার থেকে 10° সেলসিয়াসে জলের দ্রবণ ক্ষমতা তিনগুণ বেড়ে যায়।

তাই চুনাপাথর অঞ্চলে দ্রবণের মাধ্যম হিসেবে উষ্ণ জলের থেকে ঠাণ্ডা জল অনেক বেশী কার্যকরী। শীতল অথচ আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। তবে শীতল অথচ উদ্ভিদ বিহীন চুনাপাথর এলাকায় কার্স্ট ভূমিরূপের উদ্ভব হয় না। কাজেই বলা যেতে পারে যে তাপমাত্রার তারতম্যের থেকে চুনাপাথরের দ্রবণের উপর জৈবিক প্রক্রিয়ার প্রভাব অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ভূপৃষ্ঠের জলপ্রবাহ যখন মাটির ভিতরে প্রবেশ করে নীচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন উদস্থিতিক চাপের *(hydrostatic pressure)* ফলে তার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আরও বেশী মাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্রবণের মাধ্যমে অপসারিত হয়। প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখা যায় ভৌমজল প্রবাহ মৃত্তিকা স্তর ছেড়ে যখন শিলার গভীরে প্রবেশ করে তখন তার আংশিক চাপ (partial pressure) বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু শিলাস্তরের মধ্যে দ্রবণের জন্য যথেষ্ট পরিমান কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় না। যদি কোনও কারণে উদস্থিতিক চাপ *(hydrostatic pressure)* আকস্মিকভাবে হ্রাস পায় তাহলে জলের দ্রবণ করবার ক্ষমতাও হ্রাস পায় এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ($CaCO_{3)}$ অধঃক্ষেপন *(precipitation)* ঘটে। এই কারণে ভূ-অভ্যন্তরীন গহ্বরের *(underground cave)* মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের অধঃক্ষেপন চোখে পড়ে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাটির নীচে দুটি ভিন্ন ধর্মী জলের মিশ্রণ ঘটে। ধরে নেওয়া যাক যে দুটি জলই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্বারা সম্পৃক্ত *(saturated)* অবস্থায় রয়েছে কিন্তু দুটি জলের কার্বন ডাই অক্সাইডের আংশিক চাপের মান আলাদা। এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির জলের মিশ্রণ ঘটলে একটি অসম্পৃক্ত *(unsaturated)* জলপ্রবাহের সৃষ্টি হয় যা আরও বেশী মাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত করতে সক্ষম। আবার জলপ্রবাহের গতিবেগ যদি অত্যন্ত মন্থর হয় তাহলে তা সহজেই সম্পৃক্ত (saturated) অবস্থায় পৌঁছে যায়। অপরদিকে খরস্রোত বা জলের দ্রুত প্রবাহ অসম্পৃক্ত (unsaturated) অবস্থায় থাকে। ফলে বেশী পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত করবার ক্ষমতা রাখে।

7.7 কার্স্ট ভূমিরূপের উদ্ভব

চুনাপাথর বা চক্ অঞ্চলে অবস্থিত দারন যুক্তশিলা (jointed rock) ও তার উপর ভৌম এবং ভূপৃষ্ঠের জলপ্রবাহের ফলে নানাধরণের ভূমিরূপ দেখা যায়। যে কোন ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট ধরনের ভূমিরূপ ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে একটি অন্য ধরণের ভূমিরূপের চেহারা নেয়। কাজেই কার্স্ট অঞ্চলেও বেশ কিছু ভূমিরূপ দেখা যায় যার উদ্ভবের পিছনে কার্যকরী প্রক্রিয়াটি হয়তো মূলতঃ একই কিন্তু তাদের মধ্যে আয়তনগত পার্থক্য (differences in scale) রয়েছে। কার্স্ট ভূমিরূপকে মূলতঃ দুই ভাগে এখানে আলোচনা করা হল—

ভূপৃষ্ঠের রূপ (surface landforms) ও ভূঅভ্যন্তরীণ রূপ (underground features)।

7.7.1 ভূপৃষ্ঠের রূপ

চুনাপাথর অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত ছোট, বড় নানা ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। ছোট আয়তনের ভূমিরূপগুলি সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠে শিলার দ্রবণের ফলে সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, নানা মাপের আবদ্ধ নিম্নভূমি (enclosed depressions) গুলি মূলতঃ বড় আয়তনের ভূমিরূপ। প্রথমে অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের ভূমিরূপগুলি আলোচনা করা হল।

7.7.1.1 ছোট আয়তনের ভূমিরূপ (minor landforms)

টেরা রসা (Terra Rossa) ঃ ভূপৃষ্ঠের উপর প্রবাহিত জলধারা যখন ভূপৃষ্ঠের উপরে বা অল্প নিচে দ্রবণ কার্য সম্পন্ন করে, তখন মাটির উপরে লালচে রঙের একটি কর্দম স্তর (Clayey layer) গড়ে ওঠে। একে টেরারসা বলে। এই কর্দম স্তর উন্মুক্ত দারণ তল (joint plane) বরাবর মাটির নীচে কিছু দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের লালচে কাদামাটি সাধারণত নিচু ও মাঝারি চালযুক্ত এলাকার চোখে পড়ে এবং কিছু কিছু অঞ্চলে নীচের শিলাস্তরকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ল্যাটেরাইট (laterite) মৃত্তিকার সঙ্গে টেরা রসার কিছু মিল পাওয়া যায়।

ল্যাপিস (Lapies) ঃ ভূমির ঢাল যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং যেখানে চুনাপাথরের উপর টেরা রসার আস্তরণ নেই, সেখানে শিলার দূর্বল অংশগুলি (দারণ,ফাটল ইত্যাদি) সহজেই দ্রবণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর ফলে গভীর আঁচড় কাটা (grooved) বা খোদাই করা (etched) একটি বন্ধুর (rugged) ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টি হয়। এই ধরণের ভূমিরূপকে ল্যাপিস (Lapies) বা ক্যারেন (Karren) বলা হয়। (চিত্র নং 7.2) ক্যারেন বা ল্যাপিসের আয়তন কয়েক মিলিমিটার থেকে আরম্ভ করে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

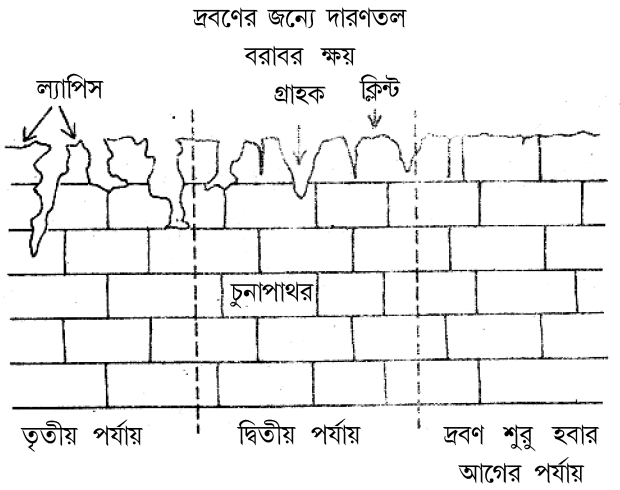

চিত্র নং 7.2

শিলাস্তরের উপরে যেখানে মৃত্তিকা বা উদ্ভিদের আস্তরণ থাকে সেখানে ল্যাপিসের ধারগুলি বা কিনারাগুলি সুডোল ও মসৃণ হয়। নতুবা ঐ ধারগুলি খাড়া ও কাটা কাটা হয়। ল্যাপিসের চেহারা ঠিক কি ধরণের হবে সেটা শিলার প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা শুষ্ক জলবায়ুতে ল্যাপিস্ ভালভাবে গড়ে ওঠে না।

অনুভূমিক ঢাল (Horizontal) মুক্ত অনাবৃত শিলাস্তরের উপর বৃষ্টির জল পড়লে 1 থেকে 2 সেন্টিমিটার ব্যাসের ছোট ছোট গর্ত সৃষ্টি হয়। এই ধরণের গর্তকে 'রেন পিট্' (Rain pit) বলে। বৃষ্টির জল যদি কোন স্থানে জমে থাকে তাহলে এই জল জমে থাকা 'রেন পিটের' চারিধারে দ্রবণের ফলে সূক্ষ্ম আঁচড়ের (grooves) মত খাঁজ সৃষ্টি করে। আকৃতি অনুসারে ক্যারেন মোটামুটি চার ধরণের, যেমন—

(A) **রিলেন ক্যারেন (Rillen Karren) ঃ** মাঝারি ঢালযুক্ত চুনাপাথর অঞ্চলে উপরের মৃত্তিকার সঙ্গে

অপসারিত হলে, সূক্ষ্ম এবং অগভীর খাঁজের সৃষ্টি হয়। অতি ক্ষুদ্র জলধারার (rill) দ্রবণের ফলে এই দ্রবণ খাঁজ (solution flute) গুলি সৃষ্টি হয়।

(B) **রিনেন ক্যারেন (Rinnen Karren)** এই ধরণের খাঁজগুলিকে রিলেন ক্যারেনের বৃহৎ সংস্করণ বলা যেতে পারে। এদের গভীরতা প্রায় 50 সেন্টিমিটার পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্য 60 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ভারি বর্ষণের পর জলে ভরে গেলে রিনেন ক্যারেনগুলি ছোট ছোট নদীর আকার ধারণ করে।

(C) **রান্ড ক্যারেন (Rund Karren)** মৃত্তিকা স্তরের নিচে গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গড়ে ওঠা ভূমিরূপকে রান্ড ক্যারেন বলে। কোনও অঞ্চলে উপরের মৃত্তিকা স্তর অপসারিত হলে এই গোলাকৃতি প্রস্তর খণ্ডগুলি মাটির উপর থেকে দেখা যায়। মাটির ভিতরে **অনুস্রবণের** (percolation) ফলে এই ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

(D) **ক্লাফট ক্যারেন (Kluft Karren)** দারণ তল (joint plane) যুক্ত শিলায় সব থেকে বেশী দ্রবণ এই দুর্বল দারণ স্থানগুলিতেই হয়ে থাকে। এর ফলে দারণ তলগুলি ক্রমশ চওড়া হতে থাকে। এই ফাটলগুলিকেই ক্লাফট্ ক্যানের বা গ্রাইক (grikes) বলে। এই ফাটলগুলি 2-4 মিটার চওড়া ও 1-5 মিটার গভীর হতে পারে।

এই ধরণের বৃহৎ আকৃতির ফাটল যার দৈর্ঘ্য 10 মিটার পর্যন্ত হতে পারে, তাকে বোগাজ (Bogaz) বলা হয়। দুটি গ্রাইকের মধ্যবর্তী অংশকে ক্লিন্ট (Clint) বলে, যা ত্রিকোণ চূড়া বিশিষ্ট বা চ্যাপ্টা মাথার হতে পারে। ক্লিন্ট ও গ্রাইক দিয়ে ঢাকা চুনাপাথর অঞ্চলকে 'ক্যারেন ক্ষেত্র' বা ক্যারেন ফিল্ড (Karren field) বলে।

7.7.1.2 বৃহৎ আয়তনের ভূমিরূপ

পরিবেষ্টিত বা আবদ্ধ নিম্নভূমি (enclosed depressions) ঃ

কার্স্ট ভূমিরূপ উদ্ভবে নানা মাপের দ্রবণজনিত গর্তের সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা এই ধরণের গর্তকে অবতরণ গর্ত বা 'সিঙ্ক হোল' (sink hole), সোয়ালো হোল (Swallow hole) ইত্যাদি নামকরণ করলেও 'ডোলিন' (doline) শব্দটিই অধিক ব্যবহৃত হয়। ডোলিনের গর্তগুলি মাটির নীচে বিবিধ আকার ধারণ করতে পারে। যেমন মাটির নিচে কখনও ত্রিকোন আকৃতির চোঙ্গা বা কখনও বাটির আকৃতি ধারণ করে। গর্তের ধারগুলি বা কিনারাগুলি কখনও অনাবৃত শিলা (bare rock) দ্বারা গঠিত হয়। কখনও বা উদ্ভিদের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। গর্তের মুখগুলি সাধারণতঃ গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি হয়। এর গভীরতা 2-1000 মিটার এবং ব্যাস 10-1000 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কোনও চুনাপাথর অঞ্চলে একটি দুটি ডোলিন পৃথকভাবে অবস্থান করলেও সাধারণত ডোলিনগুলিকে দলবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। একসঙ্গে অসংখ্য ডোলিনের উপস্থিতির ফলে ভূপৃষ্ঠ শতছিদ্র (pitted relief) চেহারা নেয়।

ডোলিন গঠনে কি ধরণের প্রক্রিয়া কাজ করছে তার উপর ভিত্তি করে ডোলিনগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যদিও ডোলিনের প্রকৃতি কেমন হবে তা শিলালক্ষণ (lithology) দ্বারাও অনেকটাই নির্ধারিত হয়।

(A) দ্রবণজনিত ডোলিন (solution dolines) ঃ

যেখানে ভূপৃষ্ঠে দারণ তল (joints) গুলি পরস্পরকে ছেদ (intersect) করে, সেইখানে দ্রবণজনিত (solution) ডোলিন গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী। দ্রবণের ফলে দারণ তলগুলি ক্রমশঃ চওড়া হতে থাকে এবং এই ফাটল দিয়ে দ্রবীভূত পদার্থ (solute) ও দ্রবণের অবশিষ্টাংশের (solution residues) নীচের দিকে নেমে আসার একটি প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে ভূপৃষ্ঠে একটি নিম্নভূমির (depression) সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি নীচের দিকে বসে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেইদিকে জলধারাগুলি বইতে থাকে এবং অতিরিক্ত জলপ্রবাহের ফলে ডোলিনগুলির আয়তন বৃদ্ধি পায়। দ্রবণজনিত ডোলিনের ধারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই গাছপালায় আবৃত থাকে

এবং ডোলিনের নিচের দিকে দ্রবণের অবশিষ্টাংশ (solution residues) জমা পড়ে। এই সঞ্চিত পদার্থ যদি অপ্রবেশ্য মৃত্তিকার স্তর গঠন করে, তাহলে ডোলিনের ভিতরে ক্ষণস্থায়ী হ্রদ গঠিত হতে পারে। সাধারণতঃ দ্রবণজনিত ডোলিন বাটির আকার (bowl shaped) নেয়, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ডোলিনের চারপাশের ঢাল সমান হয় না। একে অপ্রতিসম (asymmetric) ডোলিন বলে। (চিত্র নং 7.3.(a))

(a) দ্রবণ জনিত ডোলিন

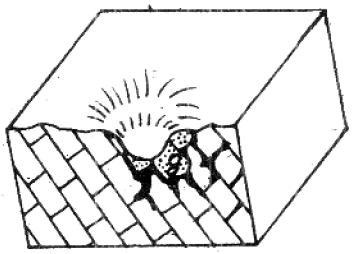

চিত্র নং 7.3 (a)

B) ধ্বংসজনিত ডোলিন (Collapse doline)

চুনাপাথর অঞ্চলে যদি ভূঅভ্যন্তরে গহ্বর থাকে, তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডোলিনগুলি অত্যাধিক নীচে বিস্তৃত হওয়ার ফলে গহ্বরের ছাদ ভেঙে পড়ে এবং ধ্বংসজনিত ডোলিন বা কোল্যাপ্স ডোলিন (Collapse doline) সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে ডোলিনের ধারগুলি খাড়া ঢালযুক্ত হয়। য়ুগোস্লাভিয়াতে ভেলিকা ডোলিন (Velika) একটি এই ধরণের ডোলিন, যার গভীরতা প্রায় 164 মিটার এবং চওড়া প্রায় 500 মিটার। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে ডোলিনের খাড়াচালগুলি বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে। আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে গর্তের চারপাশের ঢাল ক্রমশ চোঙার আকৃতি নেয় (funnel shape)। ভূঅভ্যন্তরে যদি ভৌমজল থেকে থাকে তাহলে গহ্বরের ছাদ ভেঙে পড়বার পর ডোলিনের ভিতরে হ্রদ সৃষ্টি হয় (চিত্র নং 7.3.(b))।

(b) ধ্বংস জনিত ডোলিন

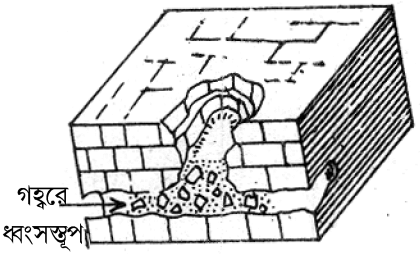

চিত্র নং 7.3 (b)

(C) অবনমনজনিত ডোলিন (Subsidence doline)

চুনাপাথরের উপরে যেখানে মৃত্তিকার একটি পুরু স্তর পাওয়া যায়, সেখানে অবনমন জনিত ডোলিন গড়ে ওঠে। নীচের চুনাপাথর স্তর যখন অবনমিত হয় তখন তার সঙ্গে উপরের মৃত্তিকার স্তরটিও অবনমিত হয়। বস্তুতঃ ভূপৃষ্ঠের উপরে কোন জলপ্রবাহ থাকলে তা এই মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে নিচে চুনাপাথরের দারণতলগুলিকে দ্রবণের মাধ্যমে চওড়া ফাটলে পরিণত করে। ফলে জলের প্রবাহের সঙ্গে উপরের মৃত্তিকাও নিচের দিকে নেমে আসে এবং ফাটল ও দারণের মধ্যে সঞ্চিত হয়। (চিত্র নং 7.3(c))।

(c) অবমন জনিত ডোলিন

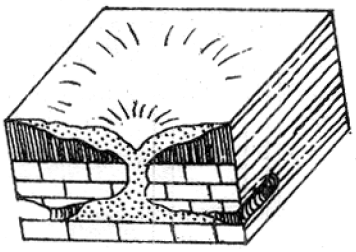

চিত্র নং 7.3 (c)

(D) নিম্নে অবস্থিত কার্স্টীয় ডোলিন (Subjacent Karst doline)

যেখানে চুনাপাথরের উপরে কর্দমশিলা (shale) বা বেলেপাথর (Sandstone) জাতীয় শিলা অবস্থান করে, সেইখানে 'নিম্নে অবস্থিত কার্স্টীয় ডোলিন' বা সাবজেসেন্ট কার্স্ট ডোলিন (subjacent karst doline) দেখা যায়। ভূমধ্যস্থ গহ্বরের ছাদ ভেঙে পড়লে, উপরের শিলাস্তরগুলিও তাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে ভেঙে পড়ে।

কাজেই নিচে চুনাপাথর স্তর থাকলেও ডোলিনের মুখটি অন্য কোনও শিলাস্তরের উপর অবস্থিত থাকে। যেহেতু প্রকৃত কার্স্টীয় ডোলিন মাটির নীচে থাকে, তাই এর এই নাম "নিম্নে অবস্থিত কার্স্টীয় ডোলিন"। (চিত্র নং 7.3.(d))

(d) নিম্নে অবস্থিত কার্স্টীয় ডোলিন

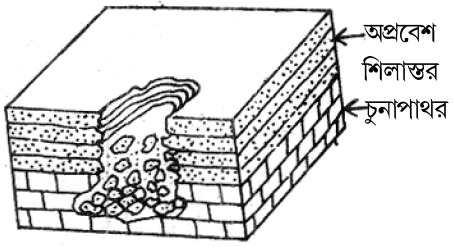

ডোলিন গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া
চিত্র নং 7.3 (d)

(E) নদী অবতরণজনিত ডোলিন (Stream Sink doline)

ভূপৃষ্ঠে পলির আস্তরণকে ভেদ করে কোন নদী যখন ভূ অভ্যন্তরে চুনাপাথর স্তরে প্রবেশ করে তখন নদী অবতরণজনিত ডোলিন (stream sink doline) দেখা যায়। এই ধরনের ডোলিনে, নদীগুলি মাটির নীচে সুড়ঙ্গ বা গহ্বর গড়ে তোলে। (চিত্র নং 7.3 (e)) নদীর জল এখানে শুধু যে দ্রবণে সাহায্য করে তা নয় ; চুনাপাথরের ভাঙা টুকরোগুলিকেও অপসারিত করে গহ্বর ও সুড়ঙ্গ গঠনে সহায়তা করে। এর ফলে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ (shaft) গুলি বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই সুড়ঙ্গগুলি একসঙ্গে মিলিত হয়ে গহ্বরে গিয়ে পড়ে। ডোলিনের সুড়ঙ্গ গুলি যেখানে মিলিত হয় তাকে পোনর (Ponor) বলে। ফরাসী ভাষায় একে "এ্যাভেন্স্' বা আভঁ (Avens) বলা হয়ে থাকে।

(e) নদী অবতরণ জনিত ডোলিন

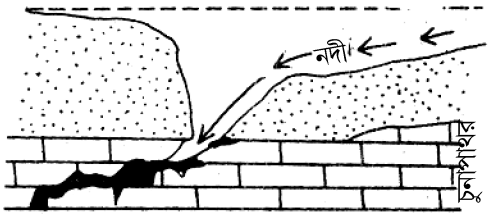

চিত্র নং 7.3 (e)

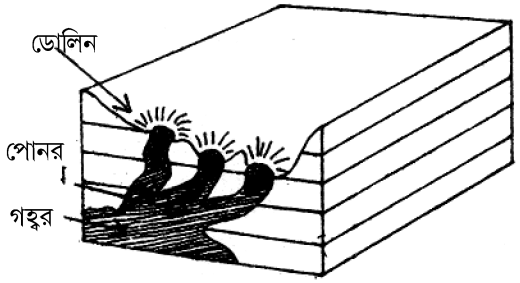

চিত্র নং 7.4

কার্স্টীয় কক্‌পিট (Cockpit Karst)

আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে ডোলিনের গর্তে মুখগুলি গোল না হয়ে তারার আকার (star shaped) নেয়। এদের চারিধারে ছোট ছোট পাহাড় ঘিরে থাকে যাদের শিখরগুলি গোলাকৃতি হয়। এই ধরনের নিম্নভূমিকে 'কক্‌পিট' (Cockpit) বলা হয়। ঘিরে থাকা ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে শঙ্কু (Cone) বা 'কেগেল' (Kegel) বলে। কক্‌পিট (Cockpit) ও কেগেলের (Kegel) সম্বন্বয়ে গড়ে ওঠা ভূমিরূপকে কার্স্টীয় কক্‌পিট্ বা কক্‌পিট কার্স্ট (Cockpit Karst) বলা হয়। জ্যামাইকাতে প্রথম কক্‌পিট লক্ষ্য করা হয়। এখানে কক্‌পিটের গভীরতা প্রায় 100 মিটার এবং

ধারের ঢালগুলি প্রায় 30°- 40° মধ্যে। কক্‌পিটগুলির তলায় মৃত্তিকার স্তর দেখা যায় এবং গর্তের ধারগুলি রাসায়নিক আবহবিকারের ফলে বেশী মাত্রায় দূর্বল হয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কক্‌পিট্‌গুলি নদীর অবতরণ কেন্দ্র বা সিঙ্কিং পয়েন্ট (sinking point) হিসেবে কাজ করে। কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকের মতে সাধারণ ডোলিন গুলিই নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে কক্‌পিটের আকার নেয় (চিত্র নং 7.5)।

কার্স্টীয় কক্‌পিট

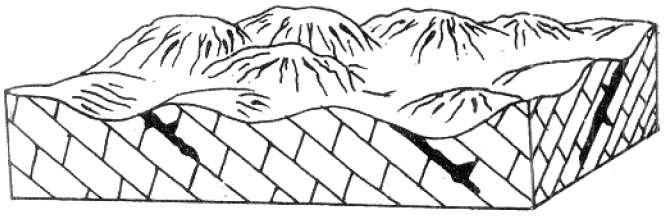

চিত্র নং 7.5

ইউভালা (Uvala) ঃ

চারিধার থেকে পরিবেষ্টিত নিম্নভূমির (closed depression) আর একটি ধরন হল ইউভালা (Uvala)। এই নামটিও য়ুগোস্লাভিয়ার ভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। একাধিক ডোলিন একত্রিত হলে ইউভালা গঠিত হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ ডোলিনের মধ্যে ছোট ছোট ডোলিন গড়ে উঠতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই ইউভালার গঠন ডোলিনের চেয়ে অনেক বেশী জটিল রূপ ধারণ করে। ইউভালার নিচের অংশ উঁচু নিচু হতে পারে, কিন্তু কখনও সমতল হয় না। যেখানে চুনাপাথরের নতি (dip) একদিকে হেলে থাকে, সেখানে ইউভালাগুলি আয়াম (strike) রেখা ধরে বিস্তৃতি লাভ করে। দক্ষিণ-পশ্চিম সার্বিয়াতে সেটেনিস্ট্ (ceteniste) ইউভালা একটি আয়াজ রেখা ধরে বিস্তার লাভ করেছে। অপরদিকে নিউজিল্যান্ডের ওয়াইটোমো উপত্যকার হ্যাগাস হোল (Haggas Hole) ইউভালাটি একটি চ্যুতি রেখা (fault line) বরাবর বিস্তার করেছে। সিভিজিক (Cvijic) মনে করেন যে ভূপৃষ্ঠের দ্রবণ প্রক্রিয়া ইউভালার উৎপত্তির জন্যে দায়ী। কিন্তু টাসমানিয়ার মোল ক্রীক (Mole Creek) অঞ্চলে একটি ইউভালা রয়েছে (ব্যাস 250-300 মিটার, গভীরতা 25 মিটার) যেটি বেসল্টের স্তরকে ভেদ করে নীচের চুনাপাথর স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এখানে নীচের চুনাপাথর স্তর দ্রবণের মাধ্যমে গহ্বর গঠন হলেও উপরের বেসল্ট (Basalt) স্তরটি কিভাবে গর্তর আকার নিল সে প্রশ্ন থেকে যায়। কাজেই দ্রবণ ছাড়াও অন্য কোনও প্রক্রিয়া যৌথভাবে এখানে ইউভালা গঠনে কাজ করেছে।

পোলজে (Polje) বা পোলিয়ে ঃ

য়ুগোস্লাভিয়ার ভাষায় চারিদিকে পরিবেষ্টিত বৃহৎ নিম্নভূমির মধ্যে অবস্থিত সমতল জমিকে পোলজে (Polje) বলে। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের নিম্নভূমির মধ্যে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। পাশের পরিবেষ্টিত খাড়া শিলাস্তর থেকে পোলজের সমতল ভূমিতে নামতে গেলে ঢালের আকস্মিক পরিবর্তন চোখে পড়ে। এই ঢালের পরিবর্তন প্রায় 30° পর্যন্ত হতে পারে। কার্স্ট অঞ্চলে এই ধরণের কোনও নিম্নভূমি থাকলে, যার ভিতরের সমতল জমির ব্যাস কমপক্ষে 400 মিটার, তাকেই শুধু পোলজে বলা হয়ে থাকে। আয়তনে পোলজেগুলি 2 বর্গ কিলোমিটার থেকে শুরু করে 400 বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পোলজে দেখা যায় এবং তাদের স্থানীয় নামও দেওয়া হয়েছে। যেমন মালয়ে 'ওয়্যাং' (Wang), জ্যামাইকাতে 'মধ্যস্থিত উপত্যকা' বা ইন্‌টিরিয়র ভ্যালি (Interior Valley) ইত্যাদি।

পোলজের ভিতরে জল দুইভাবে ঢুকতে পার। **প্রথমতঃ** কিনারা বা ধারের পরিবেষ্টিত শিলাস্তর যদি অপ্রবেশ্য হয়, তাহলে কোনও নদী তার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পোলজের ভিতরে ঢুকতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ** ধারের শিলাস্তরের মধ্যে দিয়ে প্রস্রবণ (spring) হিসেবে পোলজের ভিতরে জল প্রবেশ করতে পারে।

পোলজের মধ্যে অবস্থিত সমতল জমি সাধারণতঃ অপ্রবেশ্য (impermeable) পলির স্তর দিয়ে ঢাকা থাকে এবং মাঝে মাঝে চুনাপাথর দিয়ে গঠিত ছোট ছোট পাহাড়ের অবশিষ্টাংশ (residual hills) এই ভূমিরূপের মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য আনে। পাহাড়ের এই অবশিষ্টাংশগুলিকে হাম্‌স (hums) বলে।

পোলজের উদ্ভব সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা ছিল যে পরিবেষ্টিত নিম্নভূমি (enclosed depression) গুলি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষপর্যন্ত পোলজে গঠন করে। এই ক্রমবর্দ্ধমান পরিবর্তনের শুরু ডোলিন দিয়ে এবং ইউভালা হয়ে এর শেষ পোলজেতে। ইদানিংকালে এই ধারনার পরিবর্তন হয়েছে।

য়ুগোস্লাভিয়ার অধিকাংশ পোলজে শিলার গঠন অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। কখনও তারা ভঙ্গিল শিলাস্তরের (folded strata) ভাঁজের অক্ষ (fold axis) বরাবর গড়ে উঠেছে, কখনও চ্যুতি রেখা (fault line) বরাবর গড়ে ওঠে আবার কখনও প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য (permeable & impermeable) শিলার সংযোগস্থলে গড়ে ওঠে **ডাইনারিয় কার্স্ট** (Dinaric Karst) অঞ্চলে বেশীর ভাগ পোলজে অপ্রবেশ্য শিলা ও চুনাপাথরের সংযোগস্থলে গড়ে উঠেছে। এখানে অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপর দিয়ে বয়ে আসা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবহবিকার ও পার্শ্বক্ষয় (lateral erosion) করে। পোলজের সমতল জমিতে বিছিয়ে থাকা অপ্রবেশ্য পলির আস্তরণের জন্য বেশী জল মাটির নিচে অনুস্রবণের (percolation) মাধ্যমে ঢুকতে পারে না। তাই পোলজের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জলাশয় বা জলাজমি দেখা যায়, যা স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী দুইই হতে পারে। ভৌমজল স্তর যখন বৃষ্টির সময়ে উপরে উঠে আসে তখন সেই জল পোলজের মধ্যে উপছে পড়তে পারে। অপরদিকে জলাশয়ের জল ভূগর্ভে প্রবেশও করতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, যে বিশ্বের সর্বত্রই পোলজের উদ্ভবের পিছনে শিলার গঠন কম বেশী দায়ী (চিত্র নং 7.6)

চিত্র নং 7.6

কার্স্টীয় বুরুজ বা টাওয়ার কার্স্ট (Tower Karst) ঃ

এই ধরণের ভূমিরূপ আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে সব থেকে বেশী দেখা যায়। সুদূর বিস্তৃত সমতল ভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত বুরুজ বা টাওয়ার এই ধরণের ভূমিরূপের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সমতল ভূমিটি প্রায়ই পলিস্তর দিয়ে ঢাকা থাকে এবং বুরুজগুলি উচ্চতায় 30-200 মিটারের মধ্যে হয়। কিছু ক্ষেত্রে বুরুজের ধারগুলি প্রায় খাড়া ঢালযুক্ত হয় এবং শিখরগুলি গম্বুজাকৃতি বা কাটা কাটা (serrated) হয়। এক সময় ভূতাত্ত্বিকরা মনে করতেন যে চুনাপাথরের পুরুস্তরের ওপর অত্যাধিক দ্রবণ প্রক্রিয়ার ফলে এই ধরণের ভূমিরূপের উদ্ভব হয়। চিন, মালয়, কিউবা এবং পোর্টোরিকোতে কার্স্টীয় বুরুজ বা টাওয়ার কার্স্ট দেখা যায়। কিন্তু কানাডার ম্যাকেনজি পর্বতে কার্স্টীয় বুরুজের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে এদের উদ্ভবের পিছনে শিলার গঠণগত গুণ অনেকাংশে দায়ী।

যদি চুনাপাথরে আড়াআড়ি (horizontal) এবং লম্বালম্বি (vertical) দুই দিকেই দারণ তল থাকে, তাহলে দুই দিকেই দ্রবণের ফলে গভীর খাদের বা উপত্যকার সৃষ্টি হবে, যা কার্স্টীয় সড়ক বা কার্স্ট স্ট্রীট (Karst Street) হিসেবে পরিচিত। বস্তুতঃ কার্স্টীয় সড়ক (Karst Street) গুলি ক্রমশ আরও লম্বা হয়ে একে অপরকে ছেদ করে এবং বিভিন্ন কার্স্টীয় সড়কের সমন্বয়ে একটি গোলক ধাঁধার (labyrinth) রূপ নেয়। কার্স্টীয় সড়কগুলি ক্রমশ জলপ্রবাহের পার্শ্বক্ষয়ের ফলে আরও চওড়া হবে এবং তাদের তলদেশ পলির আস্তরণে আচ্ছাদিত হবে। ক্রমশ দুটি

কার্স্টীয় সড়কের মধ্যবর্তী স্থানগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু কয়েকটি অবশিষ্ট অংশ কার্স্টীয় বুরুজ বা টাওয়ার কার্স্ট (Tower Karst) হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। (চিত্র নং 7.7)

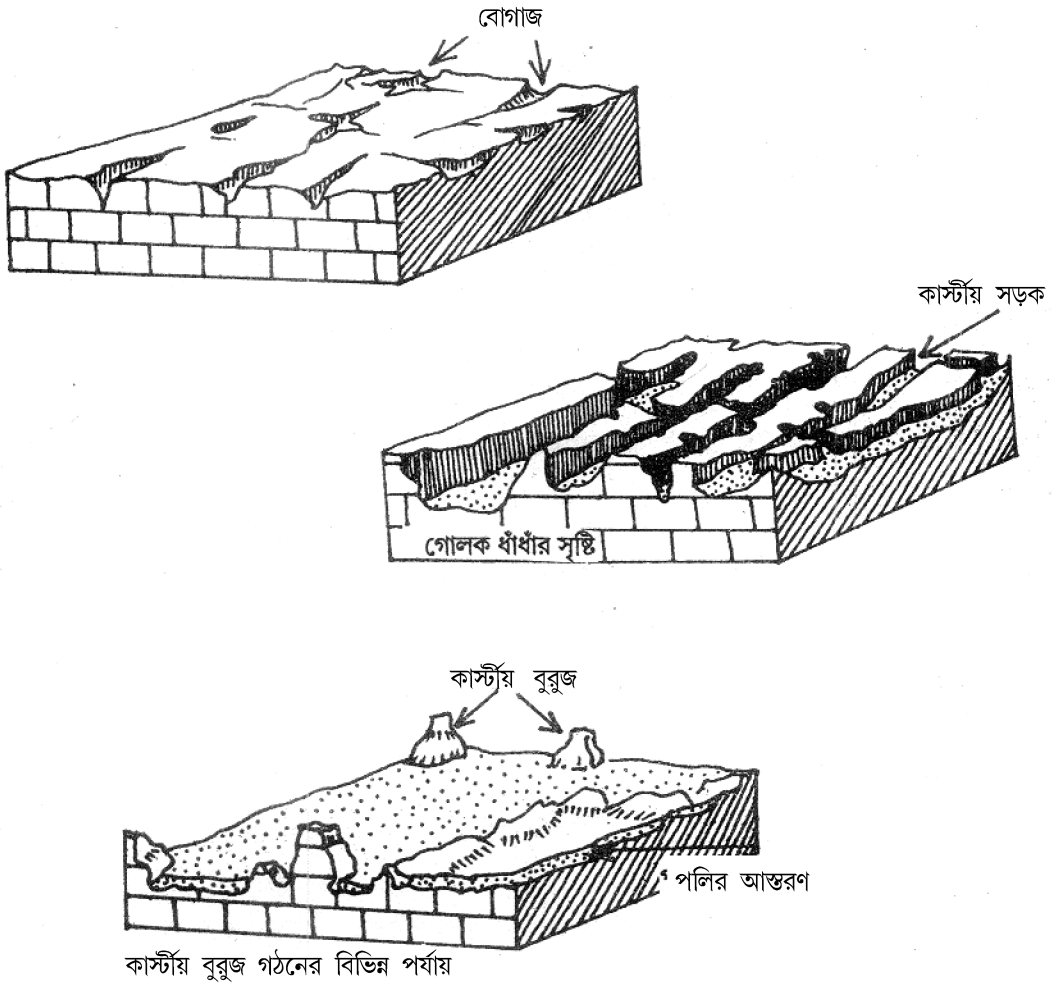

কার্স্টীয় বুরুজ গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

চিত্র নং 7.7

7.7.1.3 কার্স্ট অঞ্চলে নদীর ক্ষয়কার্যজনিত ভূমিরূপ

কার্স্ট অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—

সাধারণত এই নদীগুলি গভীর খাত (gorge) গঠন করে।

নদীগুলির ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে শুষ্ক উপত্যকা (Dry valley) গড়ে ওঠে।

নদীগুলি কোন অপ্রবেশ্য শিলা দ্বারা গঠিত সমতল ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে যদি চুনাপাথর অঞ্চলে প্রবেশ করে তাহলে নদীগুলি ভূঅভ্যন্তরে গহ্বরের মধ্যে ঢুকে যায় এবং চুনাপাথর অঞ্চল শেষ হলে তারা আবার সমতলভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন ভূমিরূপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

চুনাপাথর অঞ্চলের গিরিখাত (gorge in limestone region) ঃ

যদিও নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট গিরিখাত সব ধরণের শিলাতেই দেখা যায়, তবুও চুনাপাথর অঞ্চলে তাদের আয়তন ও আকৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ফ্রান্সের কসে (Causes) অঞ্চলে সমগ্র মালভূমিটি টার্ন, জন্টে লট ইত্যাদি গিরিখাত দিয়ে বিভক্ত (dissected) হয়েছে। গিরিখাতের পার্শ্ববর্তী ঢাল অত্যন্ত খাড়া হয় কারণ পার্শ্বঢাল পরিবর্তনকারী অন্যান্য প্রাকৃতিক (subaerial) প্রক্রিয়াগুলি নদীর নিম্নক্ষয়ের থেকে কম কার্যকরী। নদী রাসায়নিক ও যান্ত্রিক আবহবিকারের সাহায্য নিয়ে উপত্যকার তলদেশের শিলাকে (bed rock) সমানে ক্ষয় করে চলে।

নদীবাঁকে গঠিত গহ্বর (meander caves) কার্স্ট অঞ্চলের নদীর ক্ষয়কার্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ অবঘর্ষ (corrasion) প্রক্রিয়ার ক্ষয় করলে ক্ষয়জাত পদার্থ নদীর ভার বৃদ্ধি করে। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্ষয় (corrosion) করলে ক্ষয়জাত পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে যাবার ফলে তা সরাসরি নদীর ভার বৃদ্ধি করে না। তবে নদীর ভার শৈলপ্রপাত (rockfall) মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। নদীর উত্তল (convex) বাঁকে দ্রবণের ফলে উপত্যকার নিম্নক্ষয় (under cutting) হয়। এর ফলে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে শৈলপ্রপাত (rockfall) ঘটে ও নদীর উপত্যকার পার্শ্বঢাল খাড়া থাকে। (চিত্র নং 7.8)

চিত্র নং 7.8

চুনাপাথর অঞ্চলে গঠিত নদীর শুষ্ক উপত্যকা ও সংযুক্ত (associated) ভূমিরূপ ঃ

যে উপত্যকায় বর্তমানে কোনও নদী দেখা যায় না তাকেই শুষ্ক উপত্যকা বলে। শুষ্ক উপত্যকা শুধুই যে চুনাপাথর অঞ্চলে দেখা যায় তা নয়। তবে চুনাপাথর অঞ্চলে উৎপত্তি বিশেষ কারণে হয়ে থাকে। কার্স্ট অঞ্চলের নদীগুলি বেশীর ভাগই বিজাতীয় (allogenic) প্রবাহ। অর্থাৎ নদীগুলির উৎস চুনাপাথর অঞ্চলের বাইরে। কাজেই চুনাপাথর অঞ্চলে প্রবেশ করবার পর যদি নদী অবতরণ কেন্দ্র (stream sink point) থাকে তাহলে নদীটি তার মধ্যে দিয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে। অবতরণ গর্ত (sink hole) গুলি যথেষ্ট বড় হলে নদীর সিংহভাগই অবতরণ গর্ত মারফৎ মাটির নীচে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে অবতরণ কেন্দ্রে পরে নদী উপত্যকার অংশ শুষ্ক হয়ে যায়। (চিত্র নং 7.11)

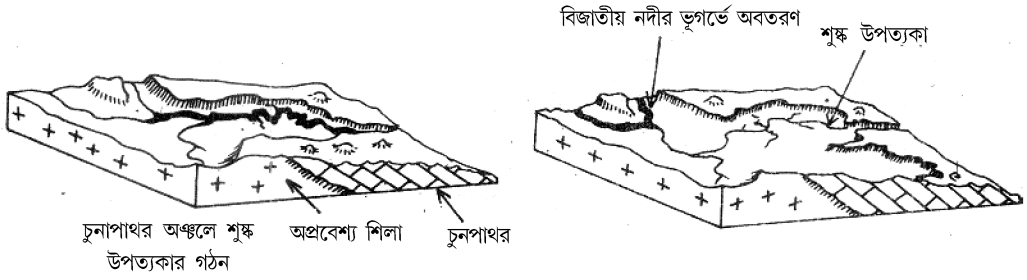

চিত্র নং 7.11

আবার অপর একটি পরিস্থিতিতে নদী এমন একটি ভূখণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় যেখানে চুনাপাথরের উপর কোনও অপ্রবেশ্য শিলাস্তর রয়েছে। দীর্ঘদিনের ক্ষয়ের পরে উপত্যকার কিছু অংশে নীচের চুনাপাথর স্তর অনাবৃত হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত দ্রবণ প্রক্রিয়ার ফলে নদীটি চুনাপাথর অঞ্চলে মাটির নীচে প্রবেশ করে এবং চুনাপাথর অঞ্চল পেরিয়ে নদীর পরবর্তী অংশ জল না পেলে শুষ্ক উপত্যকায় পরিণত হয়।

অবতরণ গর্ত দিয়ে মাটির নীচে প্রবেশ করবার পর নদীটি দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমশ গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। মাঝে মাঝে নদীটি তার ভূগর্ভস্থ উপত্যকা কাটতে কাটতে এত গভীরে চলে যায় যে সে আর কোনও মতেই ভূপৃষ্ঠে উঠে আসতে পারে না। সেই ধরনের উপত্যকাকে বন্ধ উপত্যকা (blind valley) বলে। বন্ধ উপত্যকাগুলি প্রায়শই ভূঅভ্যন্তরীণ গহ্বরে গিয়ে আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে যায় (চিত্র নং 7.9)।

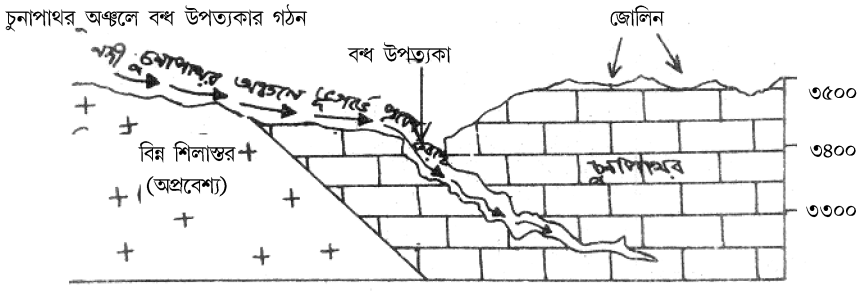

চিত্র নং 7.9

কার্স্টীয় গবাক্ষ (Karst window) ও প্রাকৃতিক সেতু (natural bridge) ঃ চুনাপাথর অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত নদীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ডাইনারিক (Dinaric) কার্স্ট অঞ্চলের উপর দিয়ে যে চারটি নদী অ্যাড্রিয়াটিক উপসাগরে গিয়ে পড়েছে তার সবকটিই বিজাতীয় (allogenic) প্রবাহ। তবে চুনাপাথর অঞ্চলে কিছু স্বজাতীয় (autogenic) প্রবাহও দেখা যায়। এই স্বজাতীয় (autogenic) প্রবাহগুলি চুনাপাথর অঞ্চলে প্রস্রবণ (spring) হিসেবে ভূপৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে এবং কোনও অপ্রবেশ্য শিলাস্তর পেলে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বয়ে যায়। এই নদীগুলির মধ্যে কিছু গিরিখাতের (gorges) মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং কিছু চুনাপাথর অঞ্চলে গহ্বরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। নদীর দ্রবণ প্রক্রিয়ার ফলে গহ্বরের আয়তন ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং কিছু অংশ গহ্বরের

চিত্র নং 7.10

ছাদ ভারসাম্য রাখতে না পেরে ভেঙে পড়ে। ভেঙে যাওয়া অংশগুলির ভিতর দিয়ে নিচের নদী প্রবাহকে ভূপৃষ্ঠ থেকে দেখা যায়। এই বিশেষ ভূমিরূপটিকে কার্স্টীয় গবাক্ষ (karst window) বলা হয়। কোনো বিজাতীয় (allogenic) প্রবাহ যদি ভূপৃষ্ঠ দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে কোনও চুনাপাথর গহ্বরে প্রবেশ করে এবং পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে তাহলে প্রাকৃতিক সেতু (natural bridge) গঠিত হয়। এই প্রাকৃতিক সেতু (natural bridge) দুরকম পরিস্থিতিতে দেখা যায়। যদি চুনাপাথর এলাকার বিস্তৃতি অত্যন্ত অল্প হয়, তাহলে গহ্বরটি এত সরু হয় যে তাকে প্রাকৃতিক সেতুরই নামান্তর বলা যেতে পারে। আবার কখনও কখনও সুদীর্ঘ গহ্বরের ছাদ যদি একাধিক স্থানে ভেঙে পড়ে তাহলে গহ্বরের ছাদের অবশিষ্ট অংশগুলি প্রাকৃতিক সেতু (natural bridge) গঠন করে (চিত্র নং 7.10)।

চুনাপাথর অঞ্চলে নদীর সঞ্চয়কার্য ঃ

চুনাপাথর অঞ্চলের নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে দ্রবীভূত কার্বোনেট বয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু কোনও কারণে যদি কার্বোনডাই অক্সাইডের (CO_2) আংশিক চাপ (partial pressure) হ্রাস পায় তাহলে নদী কার্বোনেট পদার্থ সঞ্চিত করে ও নদীর প্রবাহ পথে ক্যালসাইটের বাঁধ (calcite dam) তৈরী করে। কিছু বিশেষ ধরণের এ্যালগির দেহ থেকে ক্যালসাইট নির্গত হয়েও জমাট বাঁধতে পারে। এই সঞ্চিত পদার্থ যদি সচ্ছিদ্র (porous) হয় তাহলে তাকে টুফা (tufa) বলা হয় এবং স্ফটিকীকরণের (crystallazation) ফলে যদি জমাট বেঁধে যায় তাহলে তাকে ট্র্যাভেরটাইন (travertine) বলা হয়।

7.7.2 ভূ-অভ্যন্তরীন রূপ

7.2.2.1 চুনাপাথর অঞ্চলে ভৌমজলের প্রবাহ

চুনাপাথর অঞ্চলে গহ্বরের উদ্ভব ও ভৌমজল প্রবাহের যেহেতু একটি নিবীড় সম্পর্ক আছে তাই ভূঅভ্যন্তরীন গহ্বরের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ভৌমজল প্রবাহ সম্পর্কে দু-কথা বলা আবশ্যিক।

ভূপৃষ্ঠে মৃত্তিকা স্তর থেকে নিচে অধিশিলা (bedrock) পর্যন্ত জলের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করা যায়। ঠিক ভূপৃষ্ঠের নিচে ভ্যাডোস (Vadose) জলস্তর পাওয়া যায়, সেখানে মৃত্তিকা বা শিলার ছিদ্রগুলির ভিতর বায়ু বা জল থাকে। কৈশিক প্রক্রিয়ায় (capillary action) এবং অনুস্রবনের (percolation) মাধ্যমে **ভ্যাজেস** অঞ্চলে জলস্তর ওঠাপড়া করে। ভ্যাডোস অঞ্চলের নিচে প্রকৃত **ভৌমজল পৃষ্ঠ** (water table) পাওয়া যায়। ভৌমজল পৃষ্ঠের (water table) নিচে ফ্রেটিক (Phreatic) অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলে শিলার যাবতীয় ছিদ্র ও গর্তগুলি সবসময়ে জলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠের কত নীচে অবধি জল পাওয়া যাবে তা শিলার গঠন (structure) ও সচ্ছিদ্রতার (porosity) উপর নির্ভরশীল। পাললিক (alluvial) শিলা দ্বারা গঠিত অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠ থেকে 10-15 কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত জল পাওয়া যায়। যে শিলাস্তরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মানুষের ব্যবহারযোগ্য জল সঞ্চিত থাকে তাকে জলবাহী স্তর (acquifer) বলা হয়। **ভ্যাডোস** (Vadose) অঞ্চলের মধ্যে যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে তাহলে ভৌমজল পৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে উচ্চাসীন জলপৃষ্ঠ (perched water table) গড়ে উঠতে পারে। ভৌমজল পৃষ্ঠের (water table) নীচে জল, ভৌমজল পৃষ্ঠের ঢাল অর্থাৎ চাপ অবক্রম (pressure gradient) অনুযায়ী বয়ে যায় (চিত্র নং 7.12)।

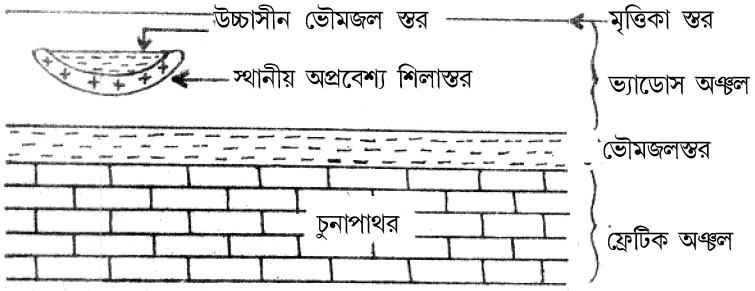

ভূপৃষ্ঠের নিচে ভৌমজল স্তরের অবস্থান

চিত্র নং 7.12

ভৌম জলপৃষ্ঠের ঢাল মোটামুটিভাবে ভূপৃষ্ঠের ঢাল অনুযায়ী গড়ে ওঠে। চক অঞ্চলে ভৌমজলপ্রবাহ মাটির নীচের চাপ অবক্রম (pressure gradient) অনুযায়ী হয় ঠিকই, কিন্তু চুনাপাথর অঞ্চলে দ্রবণের জন্যে প্রচুর গহ্বর ও সুড়ঙ্গের সৃষ্টির ফলে মাটির নীচে চাপের হ্রাস বা বৃদ্ধি কোনও হিসেব মেনে হয় না। কাজেই এখানে চাপ অবক্রম (pressure gradient) অনুযায়ী ভৌমজল প্রবাহকে ব্যাখ্যা না করাই শ্রেয়। মাটির নীচে অসংখ্য জল নির্গম নলের (conduit) গঠনের ফলে, কোনও কোনও স্থানে উদস্থিতিক চাপের (hydrostatic pressure) বৃদ্ধি ঘটে এবং ফলস্বরূপ ভৌমজলপ্রবাহ সম্ভব হয়। জল নির্গম নল (conduit) ও জলপৃষ্ঠের (water table) সম্পর্কটি সঠিক বোঝা যাবে যদি সমগ্র ভৌমজল প্রবাহটিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সমগ্র প্রক্রিয়াটি শুরু হয় যখন উপরের শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চুনাপাথর স্তরটি ভূপৃষ্ঠের জলপ্রবাহের সংস্পর্শে আসে। দ্রবণের ফলে দারণ ও ফাটলের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের জল মাটির নীচে প্রবেশ করে। এই সময় জল নির্গম নল (conduit) গুলির প্রয়োজনীয়তাই সব থেকে বেশী। ক্রমশ সমগ্র শিলাটিই মৌচাকের (honeycombed) মত ছোট বড় গর্তে ভরে যায়। গহ্বরগুলি আয়তনে বড় এবং তাদের মধ্যের জলের স্তরের উচ্চতা মোটামুটি একটা সমতা রক্ষা করে চলে। এর ফলে ভৌমজল পৃষ্ঠটি আবার স্থাপিত হয়।

ভূপৃষ্ঠ থেকে 100 মিটার গভীরতা পর্যন্ত ফ্রেটিক প্রবাহ (phreatic flow) অব্যাহত থাকে। কাজেই ভৌমজল পৃষ্ঠের নিচে ফ্রেটিক অঞ্চলেও রাসায়নিক আবহবিকার (corrosion) কার্যকরী হতে পারে।

7.2.2.2 চুনাপাথর অঞ্চলের গহ্বর (limestone caves)

চুনাপাথর অঞ্চলে ভূঅভ্যন্তরীন গহ্বরের গঠন কতটা সম্ভব তা শিলার রসায়ন ও তার গঠনের উপর নির্ভর করে। অতিরিক্ত দারণ তল (joint plane) ও চ্যুতি থাকলে শিলাটি স্বাভাবিকভাবেই দূর্বল হয়। তার ফলে গহ্বর গঠনে উপযোগী হয়। গহ্বর গঠনের জন্যে প্রচুর পরিমানে জলের প্রয়োজন। কার্স্টীয় গহ্বরগুলি লম্বায় 1-100 মিটার পর্যন্ত হতে পারে ; যেমন কেন্টাকির ফ্লিন্ট রিজ গহ্বর (Flint Ridge Cave)। গভীরতায় গহ্বরগুলি 1300 মিটারের বেশী হতে পারে। গহ্বরগুলির আকৃতিও বিবিধ ধরনের হয়। কখনও মাটির নীচে একটিই গহ্বর থাকে। কখনো একাধিক গহ্বর সুড়ঙ্গ ও জল নির্গম নল (conduit) দ্বারা যুক্ত অবস্থায় থাকে। মাটির নীচে বিভিন্ন মাপের অসংখ্য সুড়ঙ্গ ও গর্তর উপস্থিতি ভূঅভ্যন্তরীন ভূমিরূপকে জটিল চেহারা এনে দেয়। কিছু গহ্বর জলে পরিপূর্ণ থাকে, কিছু শুষ্ক অবস্থায় থাকে এবং কিছু সময় বিশেষে জল পায়।

গহ্বর গঠনকারী প্রক্রিয়া ঃ

সাধারণত চুনাপাথর অঞ্চলের দ্রবণের (solution) ফলেই গহ্বর সৃষ্টি হয়। কিন্তু দ্রবণের পাশাপাশি ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ীভবনও (abrasion) সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ যেখানে চুনাপাথর অঞ্চলে নদীপ্রবাহের সঙ্গে নুরি ও পলি বয়ে আসে। গহ্বরের ছাদ ধসে পড়া (roof collapse) বা শৈলপ্রপাত (rockfall) গহ্বরের আয়তন বৃদ্ধির পিছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ভ্যাডোস অঞ্চলে গহ্বরের গঠন অনেকটাই দারণ তল (bedding plane) ও স্তরায়ন তলের (joint plane) বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

পূর্বে বৈজ্ঞানিকরা ভ্যাডোস তত্ত্বের (Vadose theory) সাহায্যে গহ্বরের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তখন ধারণা ছিল যে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিম্নগামী জলপ্রবাহ দ্রবণের মাধ্যমে ভ্যাডোস (Vadose) অঞ্চলের গহ্বর গঠন করে। জল নির্গম নল (conduit) গুলি যথেষ্ট বড় হলে অধিকাংশ জলই মাটির নীচে নেমে যায় এবং ভূঅভ্যন্তরীণ নদীর (underground stream) সৃষ্টি করে। কিন্তু এই তত্ত্বের মাধ্যমে ফ্রেটিক (phreatic) অঞ্চলে গহ্বরের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ইদানিংকালে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে ভৌমজল পৃষ্ঠের (water table) নীচে সম্পৃক্ত (saturation) অঞ্চলেই গহ্বরের সৃষ্টি সব থেকে বেশী হয়। তাঁদের মতে জলের মিশ্রণের ফলেই ভৌমজলে ক্ষয়শক্তি এত বৃদ্ধি পায়। ফ্রেটিক ও ভ্যাডোস জলের গুণগত প্রচুর পার্থক্য থাকে। বিশেষতঃ ভ্যাডোস জলটি যদি সরাসরি ডোলিন ও জল নির্গমের নল (conduit) দিয়ে নীচে ভৌমজল পৃষ্ঠের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এই দুই ভিন্ন ধর্মের জল অর্থাৎ ভ্যাডোস অঞ্চলের অসম্পৃক্ত (unsaturated) জল ও ফ্রেটি অঞ্চলের সম্পৃক্ত (saturated) জল যদি একত্রিত হয় তখন এই দুইয়ের মিশ্রণের ফলে যে জলপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তা অসম্পৃক্ত (unsaturated)। ফলে এই জলের ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$) দ্রবীভূত করবার ক্ষমতাও বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। কাজেই ভৌমজল পৃষ্ঠের নীচে, বর্ধিত দ্রবণ ক্ষমতার ফলে বৃহৎ আয়তনের গহ্বর গড়ে ওঠে।

গহ্বরের মধ্যে সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ ঃ

গহ্বরের মধ্যে সঞ্চিত পদার্থ বৈজ্ঞানিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলি থেকে গহ্বর গঠনের ইতিহাস এবং অতীতের জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। গহ্বরের মধ্যে দ্রবীভূত কার্বোনেট জমাট বেঁধে আকর্ষণীয় ভূমিরূপ গঠন করে। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। সমষ্টিগতভাবে এই গুলিকে স্পিলিওথেম (speleothem) বলা হয়। এই গুলিকে "ড্রিপ্ স্টোন" (drip stone) ও **"ফ্লো স্টোনও** (flow stone) বলা হয়। দ্রবীভূত কার্বোনডাই অক্সাইড (CO_2), গ্যাস বিভাজন (diffusion of gases) প্রক্রিয়ার ফলে জল থেকে পৃথক হয়ে গহ্বরের বায়ুর সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলস্বরূপ গহ্বরের ভিতরে বিভিন্ন আকর্ষণীয় আকৃতিতে ক্যালসাইট সঞ্চিত হয়।

পূর্বের ধারণা অনুযায়ী গহ্বরের মধ্যে জলের বাষ্পীভবনের (evaporation) ফলে ক্যালসাইট সঞ্চিত হয়। কিন্তু ইদানিংকালে বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বেশীর ভাগ গহ্বরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) প্রায় 100 শতাংশ। এর ফলে বাষ্পীভবনের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

গহ্বরের ছাদের ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে পড়া দ্রবীভূত ক্যালসাইট যখন জমাট বাঁধে তখন তাকে স্ট্যালাকটাইট (stalactite) বলে। গহ্বরের ছাদ থেকে ক্যালসাইট দিয়ে গঠিত সরু সরু ঝুরি নিচের দিকে নেমে আসে। এই ঝুরিগুলির ব্যাস 5 মিলিমিটারেরও কম হতে পারে। স্ট্যাল্যাকটাইটের গা বেয়ে নেমে আসা দ্রবীভূত ক্যালসাইট ফোঁটা ফোঁটা করে মাটির উপরে পড়ে যখন জমাট বাঁধে তাকে স্ট্যাল্যাগমাইট (Stalagmite) বলে। স্ট্যাল্যাগামাইটগুলি মাটির থেকে উপরের দিকে বাড়তে থাকে। কখনও কখনও স্ট্যাল্যাকাটাইট ও স্ট্যাল্যাগমাইট লম্বা হতে হতে পরস্পরকে ছুঁয়ে ফেলে। একে স্তম্ভ (pillar) বা কলাম্ (column) বলে। কখনও কখনও ক্যালাসাইটের স্ফটিকগুলি

(crystals) বিভিন্ন আকারের গহ্বরের দেওয়ালে লেগে থাকে। এই গুলিকে হেলিকটাইট (helictite) বলে। (চিত্র নং 7.13)।

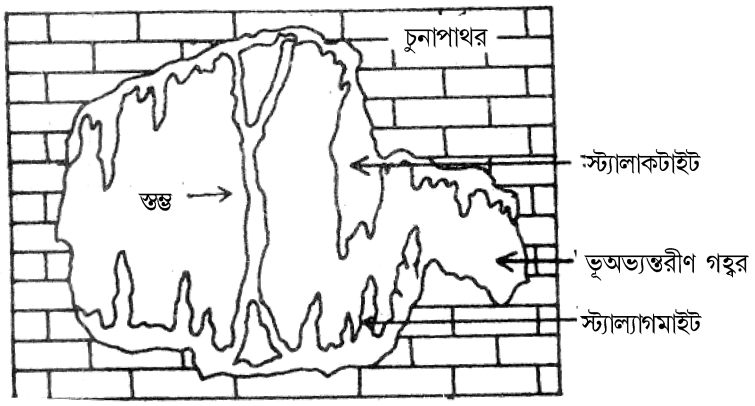

চুনাপাথর অঞ্চলে ভূঅভ্যন্তরীণ গহ্বর ও সঞ্চয় জাত রূপ

চিত্র নং 7.13

7.8 কার্স্টীয় অঞ্চলের ক্ষয়চক্র

চুনাপাথর অঞ্চলে ভূমিরূপ উদ্ভবকে একটি পৃথক ক্ষয়চক্র হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ডব্লু এম. ডেভিসের (W. M. Davis) মত অনুযায়ী কার্স্টীয় ক্ষয়চক্র কোনও পৃথক ক্ষয়চক্র নয়, এটি নদীর স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রেরই (normal cycle of erosion) একটি বিশেষ ক্ষেত্র। এখানে শিলার গঠন (structure) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চুনাপাথর অঞ্চল ভূমিরূপ উদ্ভবের আরম্ভ হয় কোন বিজাতীয় (allogenic) নদীর ক্ষয়কার্যের মধ্যে দিয়ে। চুনাপাথর অঞ্চলে শিলার দ্রবণীয়তাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তাই দ্রবণকেই (solution) মূল প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা যেতে পারে।

চুনাপাথর অঞ্চলে কার্স্টীয় ক্ষয়চক্রের সূচনা দুভাবে হতে পারে— **প্রথমতঃ** কোনও চুনাপাথর অঞ্চল যদি ভূমিক্ষয়ের নিম্নসীমাতলের (base level of erosion) উপরে উত্থিত হয়, তাহলে নদীগুলি তাদের ক্ষয়কার্য আরম্ভ করবে।

দ্বিতীয়তঃ নীচে চুনাপাথর ও উপরে খন্ডজ শিলা (clastic rock) দ্বারা গঠিত ভূখণ্ড যদি ভূমিক্ষয়ের নিম্নসীমাতলের (base level of erosion) উপরে উত্থিত হয় তাহলে নদীর ক্ষয় প্রক্রিয়ার দরুণ উপরের খণ্ডজ শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচের চুনাপাথর স্তর অনাবৃত হয়ে পড়বে। নদীগুলি স্থানীয় ভৌমজল পৃষ্ঠকে (local ground water table) তাদের ভূমিক্ষয়ের নিম্নসীমাতল ধরে নিয়ে ক্ষয়কার্য আরম্ভ করবে। ক্রমশ ভূপৃষ্ঠে অবতরণ গর্ত (sink holes), ডোলিন ইত্যাদি গঠিত হয়, এবং ভূপৃষ্ঠের নদীপ্রবাহ ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

সিভিজিক (Cvijic) কার্স্ট অঞ্চলের ক্ষয়চক্রের ধারণাকে প্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর মত অনুযায়ী সম্পূর্ণ কার্স্ট ক্ষয়চক্রকে **চারটি ভাগে** ভাগ করা হয়েছে। যৌবন অবস্থা (Youth Stage) আরম্ভ হয় যখন নদীগুলি বেশীর ভাগ ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়। ভূপৃষ্ঠে ক্রমশ ল্যাপিস ও ডোলিন গঠিত হতে শুরু করে এবং ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জল

ডোলিনের মধ্যে দিয়ে মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। তবে ভূঅভ্যন্তরীণ গহ্বর বা ভৌমজল প্রবাহ (underground drainage) কোনোটাই এই অবস্থায় ভালভাবে গঠিত হয় না। কার্স্ট চক্রের পরিণত অবস্থায় (maturity) ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ জলই মাটির নীচে প্রবেশ করে এবং ভূপৃষ্ঠে তখন শুষ্ক উপত্যকা (dry valley) বা বন্ধ উপত্যকার (blind valley) সৃষ্টি হয়। ভূঅভ্যন্তরীণ গহ্বরের সর্বাধিক বিস্তার ঘটে পরিণত অবস্থায়।

প্রাক্ পরিণত অবস্থায় (post maturity) গহ্বরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলিকে আংশিকভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে দেখা যায়। এই সময় কার্স্টীয় গবাক্ষ (karst window) ও প্রাকৃতিক সেতু (natural bridge) গঠিত হয়। কার্স্টীয় গবাক্ষগুলি বৃদ্ধি লাভ করে ক্রমশ ইউভালার (Uvala) রূপ নেয়।

কার্স্ট চক্রের বার্ধক্যে (old stage), ভূঅভ্যন্তরে প্রবাহিত নদী আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে এবং পূর্বের চুনাপাথর অঞ্চলের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হাম্ (hums) হিসেবে ইতস্তত এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকে।

7.9 সারাংশ

কার্স্ট ভূমিরূপ বিদ্যা শিলার গঠন ও রসায়ন জনিত বৈশিষ্ট্যের উপর যতটা নির্ভরশীল, দ্রবণ প্রক্রিয়ার উপরও ততটাই নির্ভরশীল। য়ুগোস্লাভিয়ার চুনাপাথর অঞ্চলের ভূমিরূপের নাম থেকে এর নাম কার্স্ট হয়েছে। শিলার রসায়ন ও দ্রবণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের ভূমিরূপগুলির মধ্যে বিভিন্ন মাপের দ্রবণ জনিত গর্ত কার্স্ট অঞ্চলে সব থেকে বেশী দেখা যায়। এছাড়াও নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত গিরিখাত, কার্স্টীয় গবাক্ষ ও স্বাভাবিক বাঁধও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপ। ভূঅভ্যন্তরে গঠিত গহ্বর ও ভৌমজল প্রবাহের প্রভাব কার্স্ট অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। স্ট্যাল্যাকটাইট, স্ট্যাল্যাগমাইট ইত্যাদি সঞ্চয়জাত রূপ গহ্বরের মধ্যে গঠিত হয়। কার্স্টীয় ভূমিরূপকে সিভিজিক একটি বৈশিষ্ট্য ক্ষয়চক্রের রূপ দিয়েছেন, যদিও অনেকের মতে এটি নদীর ক্ষয়চক্রেরই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে।

7.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরপূর্বক প্রশ্ন (প্রতি প্রশ্নের মান 1)

1. কার্স্ট শব্দটির উৎপত্তি কোথায় ?
2. ভারতবর্ষে কার্স্টীয় ভূমিরূপ দেখা যায় এমন একটি জায়গার নাম করুন।
3. চুনাপাথরের মধ্যে সব থেকে বেশী মাত্রায় কোন্ খনিজ পাওয়া যায়।
4. চুনপাথর ছাড়া আর কোন কোন শিলা কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনে সহকারী ?
5. কী ধরণের জলবায়ু কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনের পক্ষে উপযুক্ত ?
6. কার্বোনডাই অক্সাইড ও জলের প্রতিক্রিয়ার ফলে কী গঠন হয় ?
7. কার্বোন ডাইঅক্সাইডের আংশিক চাপ কোন এককের সাহায্যে বোঝানো হয় ?
8. উদ্ভিদ ও জীবানু দ্বারা চুনাপাথরের রাসায়নিক ক্ষয়ের ফলে উদ্ভুত ভূমিরূপকে কী বলা হয় ?
9. জলের তাপমাত্রা যত কম থাকে তার কার্বোনডাই অক্সাইড দ্রবীভূত করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়—উক্তিটি কি সঠিক না ভুল ?
10. চুনাপাথর অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে বিছিয়ে থাকা লালচে রঙের কর্দম স্তরকে কী বলা হয় ?
11. ল্যাপিসের অপর একটি নাম কী ?
12. দুটি গ্রাইকের মধ্যবর্তী অংশকে কী বলা হয় ?

13. ডোলিনের আর একটি প্রচলিত নাম কী ?
14. নীচের চুনাপাথর স্তর অবনমিত হবার ফলে উপরের মৃত্তিকা স্তরের অবনমনের ফলে সৃষ্ট ডোলিনকে কী বলা হয় ?
15. কার্স্টীয় কক্‌পিটের ধারে ঘিরে থাকা ছোট পাহাড়কে কী বলা হয় ?
16. একাধিক ডোলিন একত্রিত হলে কী গঠিত হয় ?
17. চুনাপাথর অঞ্চলে ছোট ছোট পাহাড়ের অবশিষ্টাংশের কী নামকরণ করা হয়েছে ?
18. কার্স্ট অঞ্চলে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে উদ্ভুত দুটি ভূমিরূপের নাম করুন।
19. চুনাপাথর অঞ্চলে প্রবাহিত কোন নদী যার উৎপত্তি চুনাপাথর এলাকার বাইরে তাকে কী বলা হয় ?
20. চুনাপাথর অঞ্চলের গহ্বরের ছাদ থেকে ঝুলে থাকা জমাট বাঁধা কার্বোনেটের ঝুরিকে কী বলে ?

সংজ্ঞামূলক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান 2)

1. কার্স্ট ভূমিরূপের সংজ্ঞা কী ?
2. চুনাপাথরের দ্রবণ প্রক্রিয়াটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখান।
3. ফাইটো কার্স্ট কাকে বলে ?
4. জলের দ্রবণ ক্ষমতা ও জলের তাপমাত্রার সম্পর্ক কি ?
5. ল্যাপিস কাকে বলে ?
6. 'রেন পিট্' (Rain Pit) কাকে বলে ?
7. রিলেনক্যারেন কাকে বলে ?
8. রিনেন ক্যারেন কাকে বলে ?
9. দ্রবণজনিত ডোলিন কাকে বলে ?
10. ধ্বংসজনিত ডোলিন কাকে বলে ?
11. কার্স্টীয় কক্‌পিট কাকে বলে ?
12. 'পোলজে' বলতে কি বোঝায় ?
13. নদী বাঁকে গঠিত গহ্বর (meander caves) কিভাবে গঠিত হয় ?
14. শুষ্ক উপত্যকা কাকে বলে ?
15. চুনাপাথর অঞ্চলে গঠিত নদীর বন্ধ উপত্যকা কাকে বলে ?
16. কার্স্টীয় গবাক্ষ কাকে বলে ?
17. বিজাতীয় (allogenic) ও স্বজাতীয় (autogenic) নদী কাকে বলে ?
18. ট্র্যাভেরটাইন (travertine) কাকে বলে ?
19. 'ভ্যাডোস' জলস্তর কী ?
20. উচ্চাসীন জল পৃষ্ঠ (Perched water table) কাকে বলে ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (প্রতি প্রশ্নের মান 4)

1. কার্স্ট ভূমিরূপ বিদ্যার ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
2. কার্স্ট ভূমিরূপ গঠণকারী শিলা সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
3. কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনের অনুকূল শর্তগুলি কী ?
4. জলে কার্বোন ডাই অক্সাইডের দ্রবণীয়তা ও কার্বোন ডাই অক্সাইডের আংশিক চাপের সম্পর্ক দেখান।
5. বিভিন্ন ধরণের ক্যারেন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

6. বিভিন্ন ধরনের ডোলিনের বর্ণনা দিন।
7. ইউভালার উৎপত্তি কিভাবে হয় ?
8. কার্স্টীয় বুরুজ বা টাওয়ার কাকে বলে ?
9. কার্স্টীয় গবাক্ষ ও স্বাভাবিক সেতু কীভাবে গঠিত হয় ?
10. চুনাপাথর অঞ্চলে ভৌমজল সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
11. চুনাপাথর অঞ্চলে গহ্বর গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলি কী ?
12. ভূঅভ্যন্তরীন গহ্বরে গঠিত সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের বর্ণনা দিন।
13. সিভিজিক (Cvijic) প্রদত্ত কার্স্টীয় ক্ষয়চক্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ (প্রতি প্রশ্নের মান 10)

1. কার্স্ট অঞ্চলে কার্যরত প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ আলোচনা করুন।
2. ভূগর্ভস্থ জলের কাজ ও গহ্বর গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
3. চুনাপাথর অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠে গঠিত বিভিন্ন ভূমিরূপের বিবরণ দিন।
4. কার্স্ট অঞ্চলে নদীর ক্ষয়কার্যজনিত ভূমিরূপ সম্পর্কে লিখুন।

7.11 উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক

1. য়ুগোস্লাভিয়া
2. জব্বলপুর
3. কার্বোনেট
4. ডলোমাইট, চক্
5. মোটামুটি আর্দ্র জলবায়ু (moderately humid)
6. কার্বোনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)
7. প্যাস্কাল (Pascal)
8. ফাইটোকার্স্ট (Phytokarst)
9. সঠিক
10. টেরা রসা (terra rossa)
11. টেরা রসা (Terra rossa)
12. ক্যারেন (Karren)
13. ক্লিন্ট (Clint)
14. অবতরণ গর্ত (sink hole) বা 'সোয়ালো হোল' (swallow hole)
15. অনবমন জনিত ডোলিন (subsidence doline)
16. কেগেল (Kegel)
17. ইউভালা (Uvala)
18. হাম্স (Hums)
19. কার্স্টীয় গবাক্ষ (Karst window) ও স্বাভাবিক সেতু (natural bridge)

20. বিজাতীয় নদী (allogenic)
21. স্ট্যালাকটাইট (Stalactite)

সংজ্ঞামূলক

1. 7.3 অংশ দেখুন
2. 7.6 অংশ দেখুন (প্রথম অনুচ্ছেদ)
3. 7.6 অংশ দেখুন (তৃতীয় অনুচ্ছেদ)
4. 7.6 অংশ দেখুন (চতুর্থ অনুচ্ছেদ)
5. 7.7.1.1 অংশ দেখুন (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)
6. 7.7.1.1 অংশ দেখুন (চতুর্থ অনুচ্ছেদ)
7. 7.7.1.1 অংশ দেখুন (পঞ্চম অনুচ্ছেদ)
8. 7.7.1.1 অংশ দেখুন (ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ)
9. 7.7.1.2 অংশ দেখুন (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)
10. 7.7.1.2 অংশ দেখুন (তৃতীয় অনুচ্ছেদ)
11. 7.7.1.2 অংশ দেখুন (সপ্তম অনুচ্ছেদ)
12. 7.7.1 অংশ দেখুন (নবম অনুচ্ছেদ)
13. 7.7.1.3 অংশ দেখুন (চতুর্থ অনুচ্ছেদ)
14. 7.7.1.3 অংশ দেখুন (পঞ্চম অনুচ্ছেদ)
15. 7.7.1.3 অংশ দেখুন (সপ্তম অনুচ্ছেদ)
16. 7.7.1.3 অংশ দেখুন (অষ্টম অনুচ্ছেদ)
17. 7.7.1.3 অংশ দেখুন (পঞ্চম অনুচ্ছেদ)
18. 7.7.1.3 অংশ দেখুন (নবম অনুচ্ছেদ)
19. 7.7.2.1 অংশ দেখুন (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)
20. 7.7.2.1 অংশ দেখুন (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

ব্যাখ্যামূলক

1. 7.3 অংশ দেখুন
2. 7.4 অংশ দেখুন
3. 7.5 অংশ দেখুন
4. 7.6 অংশ দেখুন (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)
5. 7.7.1.1 অংশ দেখুন
6. 7.7.1.2 অংশ দেখুন (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ)
7. 7.7.1.2 অংশ দেখুন (অষ্টম অনুচ্ছেদ)
8. 7.7.1.2 অংশ দেখুন
9. 7.7.1.3 অংশ দেখুন
10. 7.7.2.1 অংশ দেখুন

11. 7.7.2.2 অংশ দেখুন
12. 7.7.2.2 অংশ দেখুন
13. 7.8 অংশ দেখুন

রচনাধর্মী প্রশ্ন

1. 7.6 ও 7.7 অংশ দেখুন
2. 7.7.2.1 ও 7.7.2.2 অংশ দেখুন
3. 7.7.1 অংশ দেখুন
4. 7.7.1.3 অংশ দেখুন

একক 8 ❐ ঢালের উদ্ভব ও ঢাল বিকাশের তত্ত্ব Evolution of slope and theories of slope development

গঠন

8.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
8.2 ঢালের বৈশিষ্ট্য
8.3 ঢালের শ্রেণীবিভাগ
8.4 পার্বত্য ঢালের ক্ষয়নিয়ন্ত্রণকারী কারণ
8.5 ঢালের পার্শ্বচিত্র বা পরিলেখ বিশ্লেষণ
8.6 ঢালের বিভিন্ন অংশের গঠন
8.7 ঢাল উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্ব
8.8 উপসংহার
8.9 সারাংশ
8.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
8.11 উত্তরমালা
8.12 গ্রন্থপরিচয়

8.1 প্রস্তাবনা

সাম্প্রতিক কালে ভূমিরূপ বিদ্যায় ঢালের উদ্ভব ও বিকাশ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপগুলি এক বা একাধিক ঢালের সমাবেশে উদ্ভুত হয় এবং ভূমিরূপ গঠনের ক্ষেত্রেও ঢালের প্রকৃতি ও মাত্রা বিশেষ ভূমিকা নেয়। পৃথিবীর প্রাথমিক ভূপ্রকৃতি যথা পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি প্রভৃতি ঢালের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সনাক্তকরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ পার্বত্য ভূপ্রকৃতির ঢাল খাড়া ও উত্তল প্রকৃতির (convex) হয় ; মালভূমি সাধারণতঃ সমতল ঢাল বিশিষ্ট হয় যদিও অন্যান্য প্রকার মালভূমিতে ঢালের বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। সমতলভূমির ঢাল সাধারণতভাবে সমতল ও অবতল প্রকৃতির হয়। এছাড়া উপরিউক্ত প্রাথমিক ভূ-প্রাকৃতিক রূপের উপর বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি ও ভূমিরূপগঠনকারী প্রক্রিয়া কাজ করে। এর ফলে প্রাথমিক ঢালের রূপান্তর ও পরিবর্তন হয়। এই সকল ভূমিরূপগুলিকে ঢালের যথাযথ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ ; ঢালের পরিবর্তনশীলতার ফলে ভূমিরূপের যেমন উদ্ভব হয়, আবার তাদের রূপান্তর ও বিনাশও ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য নদীউপত্যকা সঙ্কীর্ণ 'V' আকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং উপত্যকার দুই পাশের ঢাল খুব খাড়া হয়। পরিণত পর্য্যায়ে নদীউপত্যকা প্রশস্ত 'V' আকৃতি বিশিষ্ট হয় ও উপত্যকার উভয় পার্শ্বস্থ ঢাল সুষম প্রকৃতির হয়। ভূমিরূপ উদ্ভবের প্রায় শেষ পর্যায়ে প্রায় সমতল 'V' আকৃতি বিশিষ্ট (nearly flat v shaped valley) হয় এবং ঢাল অবতল প্রকৃতির হয়। অতএব ভূমিরূপ উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশ ও রূপান্তর সম্বন্ধে যথাযথ বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঢাল সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ ঢালের পরিমাণ (কৌনিক বা নতির পরিমাণ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অবরোহন (degradation),

পরিবহন (transportation) এবং আরোহন (aggradation) নির্ভর করে। ঢালের পরিমাণ খাড়া হলে প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সঞ্চালন শক্তি উভয়ই বেশী হয় এবং ক্ষয়প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়জাত ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ঢালের পরিমাণ কম হলে প্রক্রিয়ার অর্ন্তনিহিত শক্তি ও চালিত শক্তি উভয়ই কম হয় এবং এর ফলে পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পায় ও ভূমিরূপগঠনকারী প্রক্রিয়াগুলি সঞ্চয়কার্য করে। অতএব বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির আচরণধর্ম (behaviour) যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য ঢাল সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণার প্রয়োজন। আবার ঢালের পরিমাণ ও প্রকার অনুযায়ী প্রক্রিয়াগুলির উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঢাল খাড়া হলে দ্রুত পুঞ্জিত ক্ষয় (rapid flowage type of mass-wasting) হয় ও ধ্বস, হিমানীসম্প্রপাত প্রভৃতি দেখা যায়। পক্ষান্তরে ঢালের পরিমাণ কম হলে ধীর পুঞ্জিত ক্ষয় (slow flowage type of mass wasting) ও বিভিন্ন প্রকার ক্রীপ বা বিসর্পন (creep) দেখা যায়। অতএব বিভিন্ন প্রকার পুঞ্জিত ক্ষয় সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করার জন্য ঢালের বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়।

চতুর্থতঃ, কোন স্থানের ভূতাত্বিক বিবর্তন ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে ঢালের বিশেষ ভূমিকা আছে এবং ভূমিরূপবিশারদগণও ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে কোন স্থানের ভূমিরূপ বিবর্তন ও ভূতাত্বিক ইতিহাস রচনা করার জন্য ঢালের বিশ্লেষণ বিশেষভাবে সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, শীর্ষদেশীয় সমতল ও উত্তল ঢাল (summit level and summital convexity) পূর্বেকার ক্ষয়চক্রকে সূচিত করে। আবার নদীর আড়াআড়িভাবে প্রস্থচ্ছেদে ঢালের ভাঙন দেখে বলা যেতে পারে সেই অঞ্চলে কতবার সমপ্রায়ভূমি গঠিত হয়েছে এবং বর্তমান ঢাল দেখে সহজেই অনুমান করা সম্ভব এখন ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলটি কোন পর্য্যায়ে আছে।

পঞ্চমতঃ বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের প্রাকৃতিক বিপর্জয় যেমন ভূমিক্ষয়, পূঞ্জিত ক্ষয়, পলল-অবক্ষেপন ও প্লাবন, নদীগতিপথের পরিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ অনুধাবনের জন্য ঢাল সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যক। ঢালের গুরুত্ব আরো অনুভূত হয় যখন পরিবেশের বিপর্জয় রোধ করার জন্য ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিবেশ-পরিকল্পনায় প্রত্যন্ত ঢালের মান নির্দেশ করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যন্ত ঢাল (critical slope) হ'ল এমন একটি ঢাল যার মান বেশী হলে পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার বিপর্জয় হবে, আবার এই মানের কম হলে বিপর্জয় রোধ করা সম্ভব হবে। এই কারণে সাম্প্রতিকালে পরিবেশ-পরিকল্পনায় ঢালের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আবহবিকার, পুঞ্জিতক্ষয়, ভূমিরূপগঠনকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিরূপের উদ্ভব আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে ঢালের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে, দেখা গেছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন অবরোহন প্রক্রিয়া (আবহবিকার, পুঞ্জিতক্ষয় ও ক্ষয়ীভবন) এবং আরোহণ প্রক্রিয়া (সঞ্চয়) প্রভৃতির মাধ্যমে ভূমিরূপের ভাস্কর্য সূচীত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার ঢালের উদ্ভব হয়। তাই ঢালের যথাযথ অনুধাবন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

এই এককটি পাঠ করে আপনি পৃথিবীর প্রাথমিক ভূপ্রকৃতি যথা পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি প্রভৃতি ঢালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সনাক্ত ও চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

- ঢালের পরিবর্তনশীলতার ফলে ভূমিরূপের উদ্ভব এবং তাদের রূপান্তর ও বিনাশ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- ঢালের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকৃতির অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ প্রক্রিয়াগুলিকে কিভাবে নির্দ্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোন স্থানের ভূতাত্বিক বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করার জন্য ঢালের বিশেষ ভূমিকা অনুধাবন করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় যেমন ভূমিক্ষয়, পুঞ্জিতক্ষয়, পলল-অবক্ষেপন, প্লাবন,

ভৌমজলোচ্ছাস, নদীক্ষয়, নদীগতিপথের পরিবর্তন, প্রভৃতি সমস্যাগুলি যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিবেশ পরিকল্পনায় ঢালের অধিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।

- ভূমিব্যবহার পরিকল্পনায় জরীপের মাধ্যমে ভূমিভাগের ঢালের প্রকৃত থাকার ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

8.2 ঢালের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of slope)

8.2.1 ঢালের সংজ্ঞা (Definition of slope)

ভূমিরূপ বিদ্যায় ঢাল শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল এই যে অনুভূমিকতলের (Horizontal plane) সাপেক্ষে ভূপৃষ্ঠের তল যে কোণে অবস্থান করে, তাকে ঢাল বলে।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যখন আনুভূমিক তলের সাপেক্ষে ভূপৃষ্ঠতল সমকোণে (90°) অবস্থান করে, তখন তার ঢাল সম্পূর্ণভাবে খাড়া হয়। যেমন উপকূলবর্তী ভৃগু ঢাল। আবার যখন আনুভূমিকতল ও ভূপৃষ্ঠতল সমান্তরালে অবস্থান করে অর্থাৎ 0° কোণে অবস্থান করে, তখন সরল ঢাল বা সমতল ঢালের সৃষ্টি হয়। যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি সমতলভূমি অথবা 'টেবিলল্যান্ড' ভূপ্রকৃতি বা সতমল মালভূমি। বস্তুতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপগুলি এক বা একাধিক ঢালের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

ঢালের পরিমাণ যত বেশী হবে, প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়প্রক্রিয়া তত বেশী সক্রিয় হবে ; পক্ষান্তরে ঢালের পরিমাণ যত কম হবে, প্রাকৃতিক শক্তির পরিবহন ক্ষমতা তত কম হবে এবং সঞ্চয়কার্য তত বেশী পরিলক্ষিত হবে। ভূমিরূপবিশারদগণ ঢালের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন ঃ

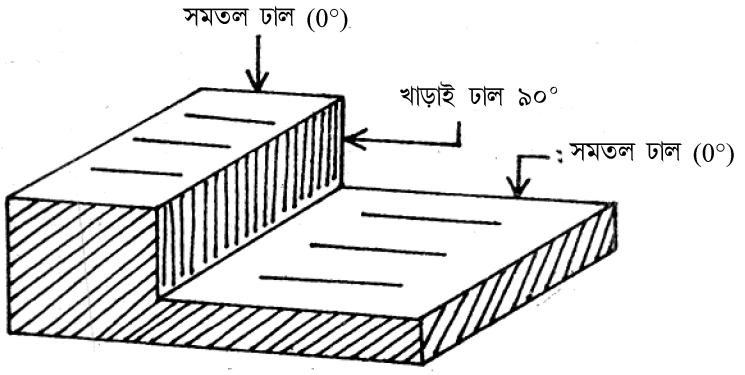

সমতল ঢাল ও খাড়াই ঢাল

(চিত্র 8.1)

8.2.2 ঢালের পরিমাণ (Amount of slope)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে আনুভূমিক তলের সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠতল যে কোণে হেলে থাকে তাকেই ঢালের পরিমাণ বলে। এই ঢালের পরিমাণ বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপে বিভিন্ন প্রকার হয় এবং ঢালের পরিমাণ ভূমিরূপ নির্ধারণে ও প্রক্রিয়ার সনাক্তকরণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

8.2.3 ঢালের পরিবর্তনশীলতা (changing or dynamic nature of slope)

ঢাল পরিবর্তনশীল ; অর্থাৎ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে বা বহিস্থঃ ও অন্তস্থঃ (Exogenous and endogenous) প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে ঢালেরও বিবর্তন, রূপান্তর ও পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, নদীর পার্বত্যগতিতে সঙ্কীর্ণ 'V' আকৃতিবিশিষ্ট ভূমিরূপ গঠিত হলেও পরবর্তীকালে পরিণত পর্য্যায়ে প্রশস্ত 'V' আকৃতিবিশিষ্ট উপত্যকা গঠিত হয়। অনুরূপভাবে উচ্চ ভূ-প্রকৃতির খাড়া ঢাল ক্রমশঃ নিম্ন ভূপ্রকৃতির সমতল বা অবতল ঢালে রূপান্তরিত হয়। আবার আগ্নেয় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ও পূর্বেকার ঢাল সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। বিগত ক্রীটেশাস যুগে ভারতীয় উপদ্বীপের বিস্তীর্ণ অংশে লাভা নির্গত হয়ে লাভা মালভূমি সৃষ্টি করে ও এই অগ্নুৎগম পূর্বেকার ঢালকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করে। বিগত টার্সিয়ারী অধিযুগে গিরিজনি আন্দোলনের ফলে হিমালয় পর্বতের গঠন ও উচ্চভূপ্রকৃতি মূলতঃ ঢালের পরিবর্তনকে সূচিত করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ঢালের পরিবর্তন নানা কারণে সংঘটিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গো নিম্নলিখিত কারণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

(A) শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি ঃ আমরা জানি কঠিন শিলায় ক্ষয়কার্য কম হয় ও কোমল শিলায় ক্ষয়কার্য বেশী হয়। এখন যদি কঠিন ও কোমল শিলা আনুভূমিকভাবে বা পাশাপাশি অবস্থান করে, তাহলে বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যের (Differential erosion) গাঠনিক ধাপের (structural bench) উদ্ভব হয় ও ঢালের পরিবর্তন ও বৈচিত্র দেখা যায় চিত্র 8.2।

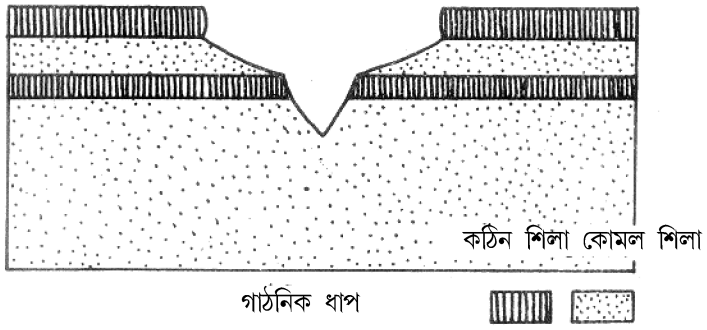

(চিত্র 8.2)

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে কঠিন শিলায় খাড়া ঢাল ও কোমল শিলায় অবতল ঢালের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু শিলার প্রকৃতি নয়, শিলার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ফলেও ঢাল পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ শিলাস্তরে চ্যুতির ফলে ভৃগু ঢালের সৃষ্টি হয়। চিত্র 8.3 শিলাস্তরের দারণ, ফাটল প্রভৃতির ফলেও ঢালের পরিবর্তন হয়।

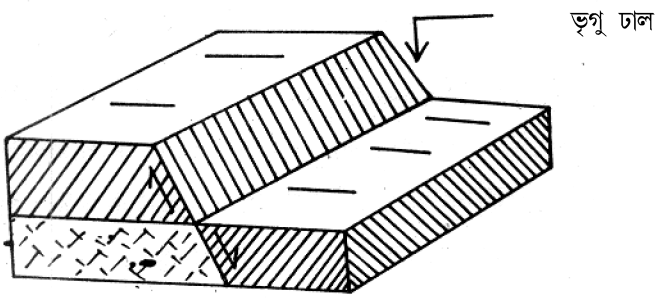

চ্যুতির ফলে ভৃগু ঢালের সৃষ্টি

(চিত্র 8.3)

(B) প্রাকৃতিক শক্তির তারতম্য ঃ প্রাকৃতিক শক্তির তারতম্যের ফলেও ঢালের পরিবর্তন ও রূপান্তর হয়। আমরা জানি যে নদীর বার্দ্ধক্য পর্য্যায়ে সমভূমি ও সমতল ও অবতল ঢালের সৃষ্টি হয়। যদি সমুদ্রপৃষ্ঠ হঠাৎ নীচে নেমে যায় বা ভূমিভাগ হঠাৎ উপরে উঠে আসে, তখন নদী আবার হৃত যৌবন ফিরে পায় ; নতুন করে তার উপত্যকাকে ক্ষয় করতে শুরু করে ও এর ফলে কর্তিত নদী বাঁকের (incised meander) সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ঢালের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের ফলে উপকূলবর্তী বিস্তীর্ন অঞ্চল সমুদ্রের নীচে নেমে যায়। ফলে ঢালের পরিমাণও হঠাৎ হ্রাস পায়।

(C) জলবায়ুর পরিবর্তন ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেও ঢালের পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, বিগত প্লিস্টসিন (pleistocene) যুগে (আজ থেকে 1 মিলিয়ন বছর আগে) পৃথিবীতে হিমযুগ বা তুষারযুগের (Ice Age) আবির্ভাব ঘটে এবং হিমালয়-অঞ্চলে হিমবাহ প্রক্রিয়া কাজ করে। এর ফলে আগেকার 'V' আকৃতির নদী উপত্যকা 'U' আকৃতির বা পরাবৃত্তীয় আকৃতির (parabolic-shaped) উপত্যকায় পরিণত হয়। এর ফলে ঢালেরও রূপান্তর ঘটে।

(D) অন্তস্থঃ প্রক্রিয়া ও ঢালের পরিবর্তন ঃ ভূ আন্দোলন বিশেষতঃ আগ্নেয় অগ্নুৎপাত, মহীভাবক আলোড়ন, গিরিজনি আন্দোলন, চ্যুতি প্রভৃতির ফলে ঢালের পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে।

8.2.4 ঢালের বহুবিধ রূপ (Different types of slope)

ঢালের বহুবিধ রূপ আছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক ভূমিরূপ (পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি) ও আঞ্চলিক ভূমিরূপকে (zonal landform) ঢালের এক বা একাধিক রূপের সমন্বয় হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর পার্শ্বচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে উচ্চগতিতে অর্থ্যাৎ পার্বত্য অবস্থায় ঢাল উত্তল প্রকৃতির হয়, জলপ্রপাত অঞ্চলে ভৃগুঢালে বা খাড়া ঢালের সৃষ্টি হয়, যেখানে নদী পার্বত্য ঢাল থেকে সমভূমি ঢালে প্রবেশ করছে, অর্থাৎ নদী যখন পাদদেশীয় অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছে, তখন পলল-পাখা (alluvial fan) পলল-শঙ্খ (Alluvial cone), স্ক্রী (scree) ও ট্যালাস (Talus) এর সৃষ্টি হয় এবং ট্যালাস ঢালের উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে উপরিউক্ত চার প্রকার ছাড়াও ঢালের আরো রূপ বা আকার আছে এবং বিভিন্ন ঢালে প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষয় ও সঞ্চয় বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। (আগের অনুচ্ছেদে ঢালের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।)

পললপাখা ও পলল শঙ্কু

(চিত্র 8.4)

8.2.5 ঢালের মাত্রা (Rate of inclination of slope)

ভূমিরূপবিশারদগণ ভূপৃষ্ঠতলের হেলানো অবস্থায় কৌনিক হারকেই ঢালের মাত্রা বলেন। তবে এই হার কোন কোন ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল (unstable) হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থিতিশীল (stable) হয়। অস্থিতিশীল ঢাল ক্রমবর্দ্ধমান (waxing) হতে পারে, অথবা ক্রমহ্রাসমান (waning) হতে পারে। যখন ভূপ্রাকৃতিক ঢাল সমানভাবে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং ঢালের নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ অপরিবর্তিত থাকে, তখন ঢালের মাত্রার কোন পরিবর্তন হয়না। সেক্ষেত্রে ঢালের একপ্রকার সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ হয়।

ভূমিরূপ বিদ্যায় ভূ-প্রকৃতি বলতে কোন স্থানের উচ্চতা ও তার বিভিন্ন প্রকৃতিকে বোঝায়। এই ভূপ্রকৃতি দুই প্রকার ঃ (ক) চরম ভূপ্রকৃতি (Absolute relief), ও আপেক্ষিক ভূপ্রকৃতি (Relative relief) চরম ভূপ্রকৃতি বলতে বোঝায় কোন স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত উঁচুতে অবস্থিত। পক্ষান্তরে, আপেক্ষিক ভূপ্রকৃতি বলতে কোন স্থানের সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতার পার্থক্যকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ যদি দেখা যায় কোন স্থানের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 305 মিটার তাহলে এই 305 মিটার হ'ল সেই স্থানের চরম ভূপ্রকৃতি। যদি দেখা যায় যে ঐ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা 305 এবং সর্বনিম্ন উচ্চতা 112 তবে সেই স্থানের আপেক্ষিক ভূপ্রকৃতি (305-112) মিটার হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ঢালের মাত্রার সঙ্গে আপেক্ষিক ভূপ্রকৃতির ধনাত্মক সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটি নদী-অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত তালিকার মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।

পর্য্যায়	আপেক্ষিক ভূপ্রকৃতি	ঢালের মাত্রার প্রকৃতি	ঢালের প্রকার
তরুণ পর্য্যায়	ক্রমবর্ধমান	ক্রমবর্ধমান	উত্তল ঢাল/খাড়া ঢাল
পরিণত পর্য্যায়	সর্ব্বোচ্চ	সর্বাধিক	সরল ঢাল
বার্ধক্য পর্য্যায়	ক্রমহ্রাসমান	ক্রমহ্রাসমান	অবতল/সমতল ঢাল

8.2.6 ঢালের বিবর্তনপ্রণালী (system of slope evolution)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার অবরোহন ও আরোহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঢলের পরিবর্তন ও রূপান্তর হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভূ-আন্দোলন জনিত প্রক্রিয়া, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান (জলবায়ু, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রভৃতি) এবং পরিবেশ মানুষের বিভিন্ন প্রকার হস্তক্ষেপ চক্রাকারে একে অপরকে প্রভাবিত করে। নিম্নলিখিত প্রণালীচিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হল।

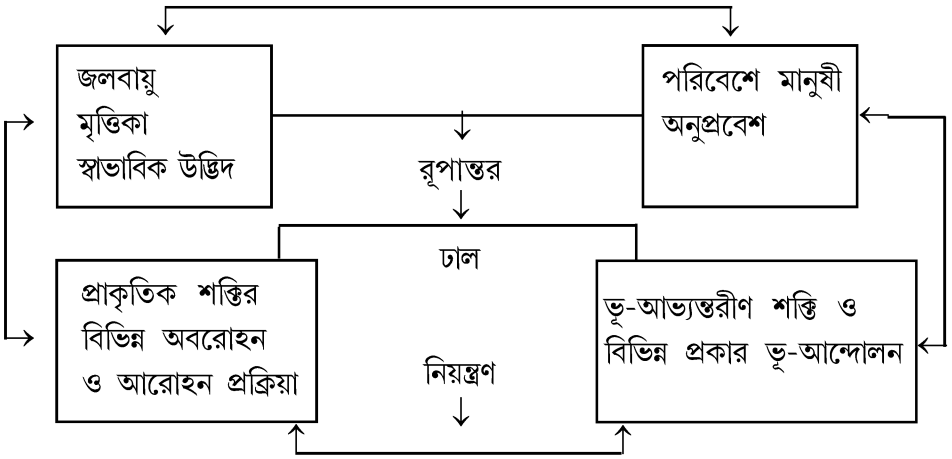

উপরিউক্ত প্রণালী চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিবেশ মানুষের হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন প্রকার অবরোহন ও আরোহণ প্রক্রিয়া ও ভূ-আভ্যন্তরীণ শক্তি ও বিভিন্ন প্রকার ভূ-আন্দোলন একে অপরকে প্রভাবিত করে ; এছাড়া ঢালের রূপান্তর ও নিয়ন্ত্রণেও এদের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। আবার ঢালের পরিমাণ ও প্রকার এবং তাদের পরিবর্তনশীল আচরণও পরিবেশ প্রণালীর বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করে।

8.3 ঢালের শ্রেণীবিভাগ (classification of slopes)

ঢালের বিকাশ ও উদ্ভব সম্বন্ধে সম্যক ধারণার জন্য ঢালের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। ভূমিরূপবিশারদগণ বিভিন্ন প্রকার ভিত্তিতে ঢালের শ্রেণীবিভাগ করেন। ঢালের শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন প্রকার ভিত্তি নিম্নলিখিত ভাবে আলোচিত হল ঃ

8.3.1 ঢালের উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ (Genetic classification of slopes)

বহিঃস্থ (exogenetic) এবং অন্তঃস্থ (endogenetic) প্রক্রিয়ার ফলে ঢালের সৃষ্টি হয়। বহিঃস্থ প্রক্রিয়া বলতে ভূপৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রক্রিয়াকে (আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয়, ক্ষয়ীভবন, নগ্নীভবন, সঞ্চয়) প্রভৃতি বোঝায়। পক্ষান্তরে অন্তঃস্থ প্রক্রিয়া বলতে ভূ-আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রক্রিয়া (যথা ভূ-আন্দোলন জনিত উত্থান ও অবনমন, গিরিজনি আন্দোলন, মহীভাবক আলোড়ন, চ্যুতি, স্রংস প্রভৃতি) বোঝায়।

বহিঃস্থ ও অন্তস্থঃ প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ভূমিরূপবিশারদগণ ঢালের তিন প্রকার উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ করেন ঃ

8.3.1.1 বহিস্থঃ ঢাল (Exogenetic slope)

ভূপৃষ্ঠের উপরে আবহবিকারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (রাসায়নিক, যান্ত্রিক ও জৈবিক) পুঞ্জিত ক্ষয় (ধীর ও দ্রুত পুঞ্জিত ক্ষয়), বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে (নদী, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতি) ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয়কার্যের ফলে যে ঢালের উৎপত্তি হয় তাকে বহিঃস্থ ঢাল বলে।

বহিঃস্থ ঢালকে আবার দুটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ **(A) ক্ষয়িত ঢাল (Erosional slope)** যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ক্ষয়প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত হয়। ভৃগুঢাল, নদীখাতের ঢাল, নদীর জলবিভাজিকার ঢাল, হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট এরিটি, করি, কর্তিতস্পার প্রভৃতির ঢাল, বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ঢাল, উপকূলবর্তী ও সমুদ্রবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের বিনাশকারী তরঙ্গের মাধ্যমে সৃষ্ট ভৃগুঢাল প্রভৃতি ক্ষয়িত ঢালের উদাহরণ।

(B) সঞ্চয়জাত ঢাল (Aggradational or depositional slope) ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে পদার্থের পরিবহন ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে যে ঢালের উৎপত্তি হয়, তাকে সঞ্চয়জাত ঢাল বলে। পলল-ঢাল, কল্যুভিয়াল-ঢাল, ট্যালাস ঢাল, স্ক্রী ঢাল প্রভৃতি সঞ্চয়জাত ঢালের উদাহরণ।

8.3.1.2 মিশ্র বা যৌগিক ঢাল (mixed or compound slope)

বহিঃস্থ ও অন্তস্থঃ প্রক্রিয়া যুগ্মভাবে অনেক সময় ঢালের সৃষ্টি করে। এই প্রকার ঢালকে মিশ্র বা যৌগিক ঢাল বলে। উদাহরণস্বরূপ শিলাস্তরে চ্যুতির ফলে প্রাথমিকভাবে 'চ্যুতিভৃগু-র' (Fault scarp) সৃষ্টি হয়। এরপর প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়প্রক্রিয়ার ফলে প্রথমে সমপ্রায়ভূমির সৃষ্টি হয় এবং এরপর কঠিন ও কোমল পাশাপাশি অবস্থান করলে কোমলা শিলা দ্রুত ক্ষয় হয় এবং পুনরায় ভৃগুঢালের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার ভৃগুঢালকে চ্যুতিরেখাভৃগু (Fault line scarp) বলে (চিত্র 8.5)।

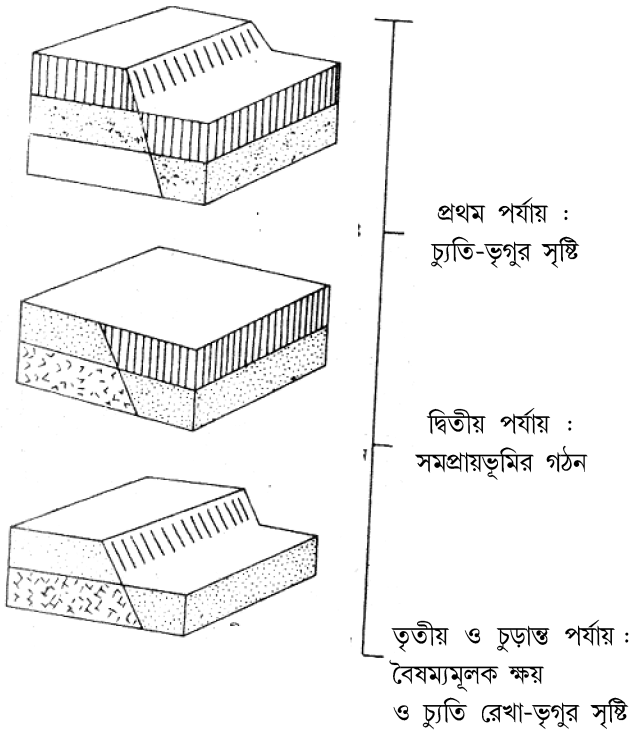

চ্যুতি ভৃগু ও চ্যুতি রেখা ভৃগু : মিশ্র বা যৌগিক ফল

চিত্র 8.5

8.3.2 ঢালের আকারগত শ্রেণীবিভাগ (Morphological classification of slopes)

ঢালের আকার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সাধারণতঃ একটি আদর্শ পার্বত্য ঢালের চার প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে (চিত্র 8.6)

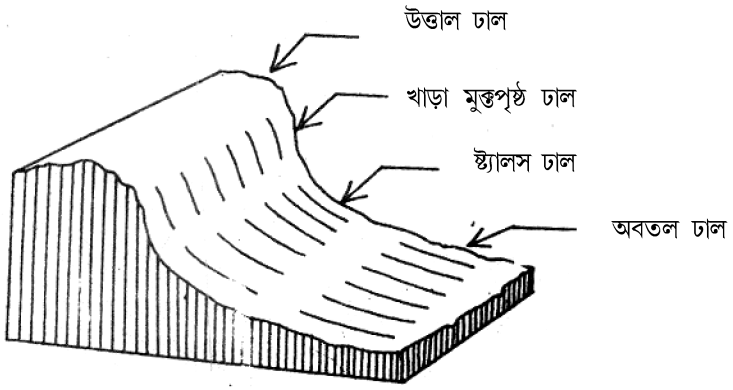

চার প্রকার প্রধান ঢাল

চিত্র (8.6)

8.3.2.1 উত্তাল ঢাল (convex slope)

পার্বত্যঢালের উর্দ্ধ অংশে উত্তল প্রকৃতির ঢাল পরিলক্ষিত হয়।

যখন ঢালের কোণ ঢালর নিম্নদিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, তখন সেই প্রকার ঢালকে উত্তল ঢাল বলে। পর্বতের শীর্ষদেশে এইপ্রকার ঢাল দেখা যায় বলে একে শীর্ষদেশীয় উত্তল ঢাল বলে (summital convexity)। অনেক সময় দুটি উত্তল ঢাল পরস্পর অভিমুখে মিলিত হয় গম্বুজাকৃতি ভূমিরূপ গঠন কর। ছোটনাগপুর অঞ্চলে 'নীস্' শিলার উপর গঠিত গম্বুজাকৃতির পাহাড় এই প্রকার ঢালের উদাহরণ।

উত্তল ঢালকে ক্রমবর্দ্ধমান ঢাল (waxing slope) বলে। যেহেতু পর্বতের শিখর ঢালের পরিমাণ ঢালের দৈর্ঘ্যে বরাবর ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সেই কারণে এই প্রকার ঢালকে ক্রমবর্দ্ধমান ঢাল বলে।

8.3.2.2 অবতল ঢাল (concave slope)

ঢালের উর্দ্ধ অংশে যেমন উত্তল ঢাল দেখা যায়, তেমন ঢালের নিম্ন অংশে অবতল ঢালের সৃষ্টি হয়। যখন ঢালের কোণ ঢালের নিম্নদিকে ক্রমশঃ হ্রাস পায়, তখন সেই প্রকার ঢালকে অবতল ঢাল বলে। দুটি অবতল ঢাল পরস্পর অভিমুখে মিলিত হলে অবনমিত ভূমিরূপ (depression) সৃষ্টি করে।

অবতল ঢালকে ক্রমহ্রাসমান ঢাল (waning slope) বলে। যেহেতু ভূপৃষ্ঠের কোন অংশের ঢালের পরিমাণ ঢালের দৈর্ঘ্য বরাবর ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশঃ হ্রাস পায়, সেই কারণে অবতল ঢালকে ক্রমহ্রাসমান ঢাল বলে।

8.3.2.3 খাড়াই মুক্তপৃষ্ঠঢাল (Free Face)

উপরিউক্ত উত্তল ও অবতল ঢাল ব্যতিত এই দুই ঢালের মধ্যবর্তী অংশে আরো দুই প্রকার ঢালের সৃষ্টি হয়।

এদের মধ্যে মুক্তপৃষ্ঠঢাল উত্তল ঢালের ঠিক নীচের দিকে দেখা যায়। 'ট্যালাসঢাল' অবতল ঢালের ঠিক উপরের অংশে দেখা যায়। যখন আনুভূমিক তলের সাপেক্ষে ভূপৃষ্ঠের ঢাল প্রায় সমকোণে অবস্থান করে, তখন সেই প্রকার ঢালকে খাড়া ঢাল বা মুক্তপৃষ্ঠ ঢাল বলে। মুক্তপৃষ্ঠ ঢালের উপর শিলাস্তর উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয়, জলপ্রবাহ ক্ষয়ও ক্যাভিটেশন ক্ষয় এই প্রকার ঢালে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে এই প্রকার ঢালকে ব্রায়ান (K. Brayan 1936) ভৃগুঢাল (cliffy face) এই নামে অভিহিত করেছেন এবং এই প্রকার ঢালের কৌণিক তারতম্য 45°-90° হয়। চ্যাল্লিনিয়র (Challinior) এই প্রকার ভৃগুকে 'শৈলভৃগু' (Rocky cliff) বলেছেন। স্যাভিগিয়ার (R. A Savigar. 1952) মনে করেন যে 80° বেশী হেলানো এই প্রকার ঢাল শিলাস্তরে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। তাই এই প্রকার ঢালকে 'পীঠ শিলার' ঢাল (Bed rock slope) বলে। মেল্টনের মতে 36° কোন থেকেই মুক্তপৃষ্ঠ ঢাল শুরু হতে পারে।

8.3.2.4 ট্যালাস ঢাল (Talus slope)

পার্বত্য বা খাড়া ঢাল থেকে হঠাৎ যদি ঢালের পরিমাণ হ্রাস পায়, তখন ঢালের ভাঙন স্থলে (Break of slope) প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পরিবাহিত পদার্থের অবক্ষেপন ঘটে। যে সকল পদার্থ দুই ঢালের সঙ্গমস্থলে সঞ্চিত হয়ে বিশেষ ভূমিরূপের সৃষ্টি করে, তাদের মধ্যে ট্যালাস, স্ক্রী (scree) পলল-পাখা (alluvial fan) ও পলল শঙ্কু (alluvial cone) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ট্যালাস ঢালটি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য বরাবর সরলরেখাকৃতির (rectilinear) হয়।

8.3.3 'রুহের শ্রেণীবিভাগ' (classification by Ruhe)

দৈর্ঘবরাবর ও আড়াআড়িভাবে প্রস্থচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে রুহে (R. V. Ruhe) 1975 সালে ঢালের একটি শ্রেণীবিভাগের মডেল তৈরী করেন। তিনি পরিলেখ ও আকার ও মাত্রার উপর ভিত্তি করে ঢালের শ্রেণীবিভাগের ত্রিমাতৃক মডেল দেখান। তিনি দৈর্ঘ্য বরাবর ও প্রস্থ বরাবর রৈখিক উত্তল ও অবতল এই তিন প্রকার ঢালের সম্ভাব্য নিম্নলিখিত নয়টি ত্রিমাতৃক চিত্র প্রদর্শন করেন। ঃ (চিত্র নং 8.7)

দৈর্ঘ্য বরাবর ও আড়াআড়িভাবে প্রচ্ছ ছেদে ঢালর শ্রেণীবিভাগ
(রুহে, ১৯৭৫)

প্রকার	দৈর্ঘ বরাবর পার্শ্বচিত্রের ঢাল	প্রস্থ বরাবর পার্শ্বচিত্রের ঢাল
A	সরলরেখাকৃতি	সরলরেখাকৃতি
B	সরলরেখাকৃতি	উত্তল প্রকৃতির
C	সরলরেখাকৃতি	অবতল প্রকৃতির
D	উত্তল প্রকৃতির	সরলরেখাকৃতি
E	উত্তল প্রকৃতির	উত্তল প্রকৃতির
F	উত্তল প্রকৃতির	অবতল প্রকৃতির
G	অবতল প্রকৃতির	সরলরেখাকৃতি

(চিত্র 8.7)

8.3.4 ডালরিম্পল্, ব্লং ও কোনাচারের শ্রেণীবিভাগ (classification by Darlymple, Blong and Conacher)

নিউজিল্যান্ডের নাতীশিতোষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের ঢাল পর্যবেক্ষণ করে ডালরিম্পল্, ব্লং এবং কোনাচার ঢালের নয় প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেন। এই শ্রেণীবিভাগটি ঢালের 'নবম একক মডেল' নামে পরিচিত। (চিত্র 8.8) এই মডেল ঢালের নয় প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়, (a) 'দোয়াব' বা জলবিভাজিকা ঢাল (interfluve) (b) 'সিপেজ ঢাল (seepage slope), (c) উত্তল শীর্ষ ঢাল (convex crest slope), (d) পতনমুখী ঢাল (fall face), (e) পরিবহনজাত মধ্য ঢাল (transporational mid-slope), (f) মিশ্র পললজাত পাদদেশীয় ঢাল (colluvial foot slope), (g) পদাঙ্গুলী দেশীয় পলল ঢাল (alluvial toe slope), (h) নদীখাতের পার্শ্বদেশীয় ঢাল (channel wall slope), (i) নদীখাতের তলদেশীয় ঢাল (channel bed slope)। যেহেতু এই মডেলটি পর্বতের শিখরদেশ থেকে নদী উপত্যকার তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, সেইকারণে এই নবম একক মডেলটি পৃথিবীর যে কোন ভূমিরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকার মাধ্যমে ঢালের নবম একক মডেলটি দেখানো হল।

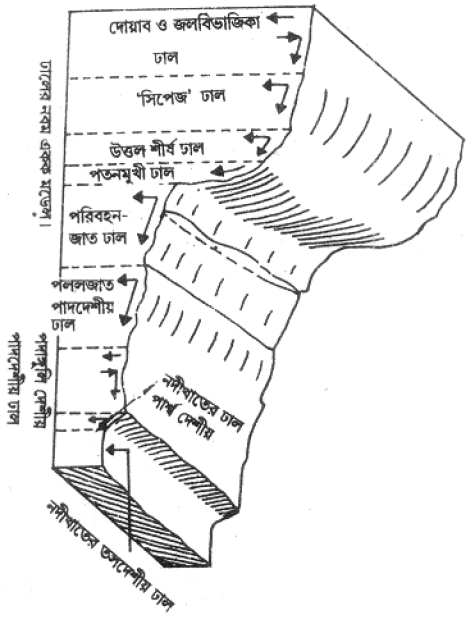

চিত্র নং 8.8

একক বা শ্রেণী সংখ্যা	ঢালের অংশ	ঢালের পরিমান	বৈশিষ্ট্য
1	দোয়াব ঢাল বা জলবিভাজিকা ঢাল	0°-1°	মৃত্তিকা গঠনকারী প্রক্রিয়া ও উল্লম্ব ভৌম জলপ্রবাহ
2	'সিপেজ' ঢাল	2°-4°	যান্ত্রিক ও রাসায়নিক এল্যুভিয়েশনের মাধ্যমে ভৌমজলের পার্শ্ব প্রবাহ
3.	উত্তর শীর্ষ ঢাল	পরিবর্তনশীল	মৃত্তিকা বিসর্পন (soil creep)
4.	পতনমুখী ডাল	45° বিকার	পুঞ্জিত ক্ষয়, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক আবহ
5.	পরিবহন জাত মধ্যে ঢাল	26°-35°	বিভিন্ন প্রকার পুঞ্জিত ক্ষয়ের মাধ্যমে পদার্থের পরিবহন ; ভূপৃষ্ঠ ও ভৌম জলের কার্য।
6.	মিশ্র পললজাত পাদদেশীয় ঢাল	পরিবর্তনশীল	পুঞ্জিত ক্ষয়ের মাধ্যমে পদার্থের পুর্নসঞ্চয় ; পলল পাখার গঠন মৃত্তিকা বিসর্জন ; ভৌম জলের কার্য

একক বা শ্রেণী সংখ্যা	ঢালের অংশ	ঢালের পরিমান	বৈশিষ্ট্য
7.	পদাঙ্গুল দেশীয় পলল ঢাল	0°-4°	পলল সঞ্চয় ও ভৌমজলের বিভিন্ন পরিচালন প্রক্রিয়া
8.	নদীবাহের পার্শ্বদেশীয় ঢাল	পরিবর্তনশীল	ঘর্ষন ক্ষয় (পার্শ্বদেশীয়) ; অবনমন ও পতন
9.	নদীখাতের তলদেশীয় ঢাল	পরিবর্তনশীল	নদীর তলদেশীয় প্রবাহ, অন্যান্য অবক্ষেপন ; পরবর্তী ঘর্ষণ ক্ষয়।

8.4 পার্বত্য ঢালের ক্ষয় ও নিয়ন্ত্রণকারী কারণ সমূহ (Hill slope erosion and factors controling hill slope erosion)

পার্বত্য ঢাল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ক্ষয় হয় এবং এর ফলে প্রাথমিক ঢাল পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত হয়। এদের মধ্যে মৃত্তিকা বিসর্পন, বৃষ্টিপাত জনিত ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহ (overland flow) ও জলনালিকা প্রবাহ বা 'রিল' প্রবাহ (rillwash) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

8.4.1 মৃত্তিকা বিসর্পন (soil creep)

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জাতন সংপৃক্ত মৃত্তিকা (saturated soil) ও পরিবাহিত পদার্থের ধীর প্রবাহকে মৃত্তিকা বিসর্পন বলে। সাধারণত দেখা যায় যে ঢালের গতির পরিমাণ হঠাৎ হ্রাস পেলে ঢালের ভাঙন যুক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ দুই ঢালের সঙ্গামস্থলে এই প্রকার বিসর্পন এক প্রকার রৈখিক ঢাল সৃষ্টি করে যা 'টালাস্ ঢাল' নামে পরিচিত। এই প্রকার ঢালের নতি বা কোণ পদার্থের আয়তন, গ্রথন এবং প্রাকৃতিক শক্তির সক্রিয়তার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

8.4.2 বৃষ্টিপাত জনিত ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহ (overland flow)

ভূপৃষ্ঠে ঢালের যখন সরাসরি বৃষ্টি ঘটে তখন ঐ জলের কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয় ; কিছু অংশ মৃত্তিকার ভিতর উল্লম্ব অনুপ্রবেশ করে বা ঢালের সমান্তরালে ভৌমজলতল বরাবর অন্তপ্রবাহ (Interflow) হয়। বাকী অংশ ভূ মিভাগের ঢালবরাবর প্রবাহিত হয় এবং ঢালকে পরিবর্তিত করে।

8.4.3 বারি বিন্দু পতনজনিত ক্ষয় (rain splash)

বারিবিন্দু বা বৃষ্টির ফোঁটা ভূমির ঢালের উপর সরাসরি পতিত হলে ভূমি ঢালের একপ্রকার ক্ষয় হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে বারিবিন্দুর সরাসরি পতন একটি অন্যতম ক্ষয়কারী শক্তি। মস্‌লে (Mosley) একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে ঢালের কোন 5° হলে বারি বিন্দুপতনের প্রভাবে প্রায় 25° শতাংশ পদার্থ নিম্ন ঢাল অভিমুখে এবং 48 শতাংস পদার্থ ঢালের উর্দ্ধমুখে পরিচালিত হয়। ঢালের পরিমাণ প্রায় 25° কোণ হলে এই অনুপাত পরিবর্তিত হয় এবং প্রায় 95 শতাংশ পদার্থ নিম্ন ঢাল অভিমুখে অগ্রসর হয়।

8.4.4 'রিল' ক্ষয় (rill erosion)

সূক্ষ্মভাবে কর্তিত ক্ষুদ্রাকৃতি নালাকে (''finely-chiselled runnels'') 'রিল্' বলে। ভূমিভাগে শিথিল ও নরম মৃত্তিকা ও অন্যান্য পরিবাহিত পদার্থ থাকলে এবং জলপ্রবাহ শক্তিশালী হলে এই প্রকার প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়া প্রাথমিক পর্য্যায়ের ঢালকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করে এবং ক্ষুদ্রপরিসর স্থানের মধ্যে অসংখ্য নালাকৃতি ভূমিরূপ গঠন করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে বৃহদাকার রিলগুলিকে 'গালী' (Gully) বলে এবং গালী সৃষ্টি হলে নালাগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত ভূপ্রকৃতি একটি উঁচুনীচু ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। এদের 'ব্যাডলান্ড' ভূপ্রকৃতি বলে। চম্বল উপত্যকায় এই প্রকার 'ব্যাডল্যান্ড' গঠিত হয়েছে।

8.4.5 অন্তপ্রবাহ বা 'থ্রু' প্রবাহ (through flow)

ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা প্রাথমিক ঢালের নীচে মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে উল্লম্বভাবে অনুপ্রবেশ করে এবং মৃত্তিকা জলস্তরের (soil water zone) ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়। একে অর্ন্তপ্রবাহ বলে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে মৃত্তিকাস্তরের ভিতর দিয়ে জলের প্রবাহ হলে মৃত্তিকার দ্রুতপতন বা অপসারণ ঘটে এবং ঢালের রূপান্তর হয়। এই প্রকার অর্ন্তপ্রবাহে পদার্থ সমূহ দ্রবণ ও ভাসমান প্রক্রিয়ায় পরিবাহিত হয়। বিশেষত প্রবেশ্য মৃত্তিকা ও শিলাস্তরে এবং দ্রবীভূত শিলায় এই প্রকার অর্ন্তপ্রবাহ শুধু প্রাথমিক ঢালকেই পরিবর্তিত করেনা। উপরন্তু নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ চুনাপাথর সমৃদ্ধ অঞ্চলে এই প্রকার প্রবাহ দ্রবণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে ও ভৌমস্তরে বিভিন্ন প্রকার ভৌম ভূমিরূপের উদ্ভব হয়। যথা বিভিন্ন প্রকার চুনাপাথর গহ্বর।

8.5 ঢালের পার্শ্বচিত্র বা পরিলেখ বিশ্লেষণ (analysis of slope profiles

ঢালের পার্শ্বচিত্র বা পরিলেখ কিভাবে উদ্ভূত হয়, ভূমিরূপবিজ্ঞানে তা সম্বন্ধে ধারণা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, বলা যেতে পারে বিগত পঞ্চাশ বছরের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সত্বেও ঢালের পার্শ্বচিত্র উদ্ভবের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তমূলক ধারণা করা এখনো সম্ভব হয়নি।

যে কোন বৈচিত্র্যমূলক মানচিত্র থেকে বা জরীপের মাধ্যমে ভূমির আড়াআড়ি প্রচ্ছছেদ ঢলের যে চিত্র পাওয়া যায় তাকেই ঢালের পার্শ্বচিত্র বা পরিলেখ বলে। ভূমিরূপ বিদ্যায় সাধারণ নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে ঢালের পরিলেখ বিশ্লেষণ করা যায়।

8.5.1 জ্যামিতিক পদ্ধতি (Geometric method)

কয়েকটি ধারণার উপর ভিত্তি করে ঢালের যে জ্যামিতিক রূপ বা আকার বিশ্লেষণ করা হয় তাকে জ্যামিতিক পদ্ধতি বলে। উড 1942 সালে ঢাল উদ্ভবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঢালের জ্যামিতিক বিশ্লেষণ করেন। প্রাথমিক খাড়া মুক্তপৃষ্ঠ ঢাল থেকে কিভাবে অপরিবর্তিত ঢালে রূপান্তরিত হয়,এবং অপরিবর্তিত ঢাল কিভাবে ধৌত ঢালে wash slope পরিণত হয় তা জ্যামিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

8.5.2 প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Inductive method)

গিলবার্ট ও ডেভিসের সময় থেকেই ঢাল উদ্ভবের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার ভূমিকা এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী ঢালের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণা বা সিদ্ধান্ত উপনীত হবার চেষ্টা চলেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পর্যবেক্ষণগত

বিশ্লেষণ ও আরোহী প্রথার অভিগমন। (inductive approach)

8.5.3 পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical method)

ঢাল উদ্ভবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী কারণের সাপেক্ষ মানচিত্র থেকে বা জরীপের সাহায্যে বা দিতাত্ত্বিক বা পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ করা হয়। কয়েকটি পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ উল্লেখ করা হল।

8.5.3.1 উচ্চতা-ভূপ্রকৃতি অনুপাত (Elevation Relief Ratio)

যে কোন পরিলেখ বা প্রস্থচ্ছেদ বিশ্লেষণে E-R অনুপাত $\frac{E-L}{R}$ যেখানে E = গড় উচ্চতা L = মিডিয়ান উচ্চতা, R = নির্দিষ্ট পরিলেখ অনুযায়ী ভূ-প্রকৃতি। যদি এই অনুপাতের মান 1 হয়, তবে বোঝা যাবে যে অধিকাংশ সমতল অংশ হল বিভাজিকা অংশে বিদ্যমান এবং নদী উপত্যকা সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির হয়। পক্ষান্তরে যদি এর মান O- এর কাছাকাছি হয়। তবে বলা যেতে পারে যে নদী উপত্যকা প্রশস্ত 'V' আকৃতির ও বিচ্ছিন্ন কিছু পাহাড় অবস্থান করে। অর্থাৎ অঞ্চলটি বার্দ্ধক্য পর্যায়ের।

8.5.3.2 অমসৃণতার সূচক (Roughness Index)

ঢাল মসৃণ বা অমসৃণ তা যে সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে অমসৃণতার সূচক বলে। এই সূচকটিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ

$$RI = \frac{N \times M/4}{4} \times 10$$

যেখানে N = দুটি পরস্পর লম্বসৃষ্টিকারী রেখাকে সমোন্নতি রেখা কতবার ছেদ করেছে

M = গ্রিড রেখার মধ্যে দূরত্ব 4 ও 10 ধ্রুবক

8.5.3.3 আপেক্ষিক ভূপ্রকৃতি (relative relief)

Smith সবপ্রথম আপেক্ষিক ভূপ্রকৃতির একটি গাণিতিক ও পরিসংখ্যান-ভিত্তিক মান নির্ণয়ের পদ্ধতি বলেন। সংক্ষেপে কোন স্থানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতার প্রসার বা তারতম্যকেই আপেক্ষিক ভূ-প্রকৃতি বলে।

8.5.3.4 ওয়েন্টওয়ার্থের গড় ঢাল (average slope by Wentworth)

1930 সালে C. K. Wentworth গড় ঢালের সূচক উল্লেখ করেন

প্রতি মাইল বা কিলোমিটারের গ্রিডে

সমোন্নতির কতবার ছেদ বা

$$\frac{\text{অতিক্রম করেছে}}{\text{ধ্রুবক (C)}} \times \text{সমোন্নতিরেখার ব্যবধান}$$

যেখানে C = 3361 দৈর্ঘ্য মাইলে প্রকাশিত হলে এবং C = 6336 দৈর্ঘ্য কিমি প্রকাশিত হলে উপরিউক্ত মানটির উপর ভিত্তি করে গড় ঢাল নির্ণয় করা হয়। তবে এক্ষেত্রে গড় ঢালের মান tan মানে প্রকাশ করা হয়।

8.5.3.5 'হিপ্‌সোমেট্রিক বক্ররেখা' (hypsometric curve)

উচ্চতা ও আয়তনের উপর ভিত্তি করে যে রেখা রৈখিক পদ্ধতিতে অঙ্কন করা হয় তাকে আয়তন-উচ্চতা নির্দেশকারী হিপ্‌সোমেট্রিক বক্ররেখা বলা হয়।

8.5.3.6 ঢাল অঞ্চল মানচিত্র প্রণয়ন (preparation of slope-zone maps)

1960 সালে O. M. Miller ঢাল বিষয়ে A-wood এর জ্যামিতিক বিবর্তনের তত্তকে ভিত্তি করে ঢাল অঞ্চলের মানচিত্র প্রণয়ন করেন। তিনি উড-এর ক্রমবর্দ্ধমান ঢাল, সমান ঢাল মুক্ত পৃষ্ঠ ঢাল, পরিবর্তিত ঢাল এবং ক্রমহ্রাসমান ঢালকে যথাক্রমে (1–cos a), a , sin a এবং $\sqrt{\sin\alpha}$ মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট করেন যেখানে $a =$ ঢালের কোন। এরপর তিনি এর মানকে চারটি অংশে বিভিন্ন করেন এবং বিভিন্ন প্রকার ঢালের নিম্নলিখিত কৌণিক প্রসার উল্লেখ করেন।

ঢালের শ্রেণীবিভাগ	কৌণিক প্রসার
অবতল (ক্রমহ্রাসমান)	0°–3° 35/
অপরিতিত ঢাল	3°35/ – 14°24/
মুক্ত পৃষ্ঠ ঢাল	14° 24/ – 34°14/
ক্রমবর্দ্ধমান ঢাল	34° 14/ – 90°

8.5.3.7 অন্যান্য পরিসংখ্যা পদ্ধতি (other statistical methods)

উপরিউক্ত পদ্ধতি ছাড়া পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে ঢালের অন্যান্য প্রকার বিশ্লেষণ করা যায় এদের মধ্যে Rais ও Henry র গড় ঢাল পদ্ধতি ও ভূমিঢালের গুণাঙ্ক (coefficient of land slope) নির্দ্ধারণ A. H. Robin (1984) ও A. N. Strawler (1956), Pitty (1969) এবং আরো অনেকে ঢাল বিশ্লেষণের গাণিতিক ও পরিসংখ্যান পদ্ধতির উল্লেখ করেন।

8.6 ঢালের বিভিন্ন অংশের গঠন (formation of different segments of slope)

ভূমিরূপ বিশারদগণ মনে করেন যে ঢালের বিভিন্ন অংশের গঠন মূলত অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ প্রক্রিয়ায় ক্ষয় ও সঞ্চয়ের ফলেই সৃষ্টি হয়। ক্ষয় ও সঞ্চয় প্রক্রিয়ার সাপেক্ষে বিভিন্নপ্রকার ঢলের গঠন নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হল ঃ

8.6.1 উত্তল অংশ

8.6.1 ক্ষয়

(A) বিসর্পণ
(B) বৃষ্টি ধৌত প্রক্রিয়া
(C) যান্ত্রিক ও রাসায়ণিক আবহবিকার

(D) চাপ মোচনের ঢালসৃষ্ট দারণ (গম্বুজ গঠন)

(E) দেশীয় ক্ষয় (নদীর পার্শ্বক্ষয়, প্রস্রবণ এর মাধ্যমে তলদেশীয় ক্ষয় এবং যে কোন আবহবিকারের প্রক্রিয়া যা পাদদেশীয় ঢালের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(F) স্বল্প বা মাধ্যম প্রকৃতির ভূ প্রাকৃতিক অঞ্চল একে অপরের থেকে অধিক ব্যবধানে বিস্তৃত স্বল্প ঘনত্ব নদীর মাধ্যমে কর্তন।

8.6.1.2 সঞ্চয়

লোয়েস ও আগ্নেয়ভস্মের দ্বারা ঢালের আচ্ছাদন

8.6.2 অবতল অংশ

8.6.2.1 ক্ষয়

(A) রিল্ ক্ষয়

(B) বিসর্পন

(C) জলপ্রবাহ

8.6.2.2 সঞ্চয়

(A) ঢালের পাদদেশে ট্যালাস সঞ্চয়

(B) ঢালের পাদদেশে কল্যুভিয়াম সঞ্চয়

(C) আগ্নেয় উদ্গিরণের ফলে লিন্ডার শঙ্কুর গঠন

8.6.3 সরল ঢাল অংশ

8.6.3.1 ক্ষয়

(A) বৃষ্টির ধৌত প্রক্রিয়া

(B) মধ্যম বা উচ্চ ভূ প্রাকৃতিক অঞ্চলে পরস্পর কাছাকাছি ব্যবধানে প্রবাহিত অধিক ঘনত্ব নদীর মাধ্যমে কর্তন।

(C) পুঞ্জিত ক্ষয়

(D) তলদেশীয় ক্ষয় (নদীর পার্শ্ব ক্ষয়, তরঙ্গের কার্য, নীচে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিলাস্তরের ক্ষয়।

8.6.3.2 সঞ্চয়

ঢালের ভাঙন অঞ্চলে ট্যালাস,আগ্নেয় সঞ্চয়।

8.7 ঢালউদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্ব (different theories regarding evolution of slopes)

ঢালের উদ্ভব ভূমিরূপবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভূমিরূপ পরিবেশে ঢালের উদ্ভব ও রূপান্তর ঘটে। মূল প্রশ্ন হল এই যে প্রাথমিক ঢাল সময়ের সাথে সাথে কীভাবে বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় বা অপরিবর্তিত থাকে বা সম্পূর্ণ নতুন ঢালের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে ঢাল উদ্ভবের বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব উপস্থাপনা করা হয়। বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ডেভিসের ক্রমহ্রাসমান তত্ত্ব, পেঙ্কের প্রতিস্থাপন তত্ত্ব, কিং-এর সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ তত্ত্ব, উডের জ্যামিতিক বিবর্তন তত্ত্ব স্ট্র্যালারের ঢাল বিবর্তনের ভারস্যাম তত্ত্ব এবং স্যাভিগিয়ারের ঢাল পরিলেখ উদ্ভবের তত্ত্ব আলোচিত হল।

8.7.1 ডেভিসের ক্রমহ্রাসমান ঢাল তত্ত্ব (W. M. Davis)

তাঁর বিখ্যাত ক্ষয়চক্রের তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর মতে ক্ষয়চক্রের (cycle of erosion) বিভিন্ন পর্য্যায়ে প্রাথমিক ঢাল ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। প্রাথমিক পার্বত্য ও তরুণ পর্য্যায়ে নদীর নিম্নক্ষয়ের ফলে প্রাথমিক ঢাল থেকে উত্তল খাড়া ঢালের উদ্ভব হয়। পরিণত পর্য্যায়ে পর্বতের শিখরদেশ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং নিম্নক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় ঢালের কৌণিক পরিমান হ্রাস পায় এবং জলবিভাজিকাগুলি ক্রমশঃ গোলাকৃতি উত্তল ঢালে পরিণত হয়। একই সময় উত্তল ঢালের উচ্চতাও ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। বার্ধক্য পর্য্যায়ে প্রায় সমতল ঢালের উদ্ভব হয় এবং ক্ষয়চক্রের পরিণতি স্বরূপ সমপ্রায় ভূমির সৃষ্টি হয়।

ডেভিস আরো উল্লেখ করেন যে ঢালের উর্দ্ধ উত্তল অংশ মৃত্তিক বিসর্পনের ফলে উদ্ভূত হয় এবং ঢাল বরাবর যতই নীচের দিকে নামা যায়। ততই ভূ-পৃষ্ঠের ধৌত প্রবাহ অধিক গুরুত্ব পায়। ঢালের নিম্ন অংশে বোঝার পরিমাণ (load) বৃদ্ধি পাওয়ায় ও নদীর পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় অবতল ঢালের উদ্ভব হয় এবং কালক্রমে তা পর্য্যায়িত ঢালে রূপান্তরিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় ডেভিসের পর্য্যায়ভিত্তিক ঢালের উদ্ভব ও বিবর্তন দেখানো হল।

পর্য্যায়	ঢালের আকার	ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তির প্রক্রিয়া	ঢালের বৈশিষ্ট্য
তরুণ পর্য্যায়	প্রধানতঃ উত্তল প্রকৃতির	নিম্নক্ষয় পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা বেশী	অপর্য্যায়িত ক্ষয় প্রধান খাড়া ঢালের উদ্ভব
পরিণত প্রধানতঃ সুষম পর্য্যায়	নিম্নক্ষয় ও পার্শ্বক্ষয় সরল রেখাকৃতি	পর্য্যায়িত ঢালের উভয়ই সমান	উদ্ভব
বার্ধক্য পর্য্যায়	প্রধানতঃ অবতল প্রকৃতির	পার্শ্বক্ষয় নিম্নক্ষয় অপেক্ষা বেশী	অপর্য্যায়িত সঞ্চয় প্রধান প্রায় সমতল অবতল ঢালের উদ্ভব

ডেভিস মনে করেন যে তরুণ পর্য্যায় থেকে পরিণত পর্য্যায় পর্যন্ত ঢালের পরিমাণ ও আপেক্ষিক ভূ-প্রকৃতি উভয়ই ক্রমবর্দ্ধমান হয়। পরিণত পর্য্যায় থেকে শেষ পর্য্যায় ঢালের পরিমাণ ও আপেক্ষিক ভূপ্রকৃতি ক্রমহ্রাসমান হয়।

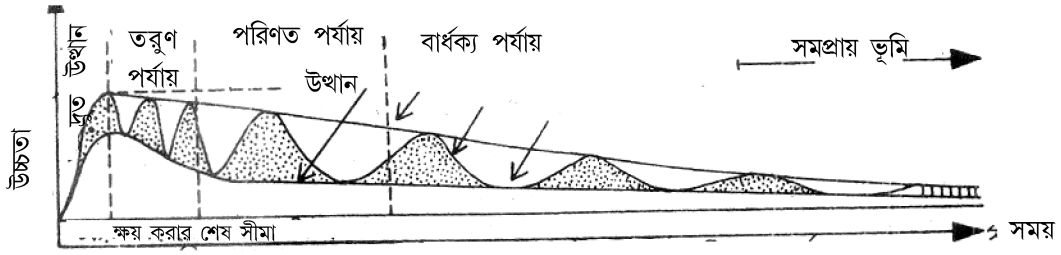

ডেভিসের তত্ত্ব অনুযায়ী ঢাল উদ্ভবের বিভিন্ন পর্যায়

(চিত্র 8.9)

8.7.2 পেঙ্কের ঢাল বিবর্তনের তত্ত্ব

1924 সালে Walther Penck 'Die Morphologische Analysis, পুস্তকে ঢাল উদ্ভবের যে তত্বটির অবতারণা করেন, তা সম্পূর্ণভাবে ডেভিসের তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির একটি তত্ত্ব।

(1) কোন স্থানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতার তারতম্যকে আপেক্ষিক ভূ প্রকৃতি (Relative Relief) বলে।

পেঙ্ক মনে করেন যে বহিঃস্থ (exogenetic) ও অন্তস্থঃ (endogenetic) প্রক্রিয়ার অনুপাতের সাপেক্ষ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপকে ব্যখ্যা করা যেতে পারে। পেঙ্ক আরো উল্লেখ করেন যে ক্ষয়প্রক্রিয়াগুলি নিম্নলিখিত বিশ্বব্যাপী সূত্রের মাধ্যমে কাজ করে যদিও তাদের কাজের হার বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রকার হয়।

(A) স্থানীয় ক্ষয় কার্যের তীব্রতা সেই স্থানের ঢালের পরিমানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

(B) গতিশীল পদার্থের আয়তন ঢালের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করে ;

(C) ভূমিঢালের পরিমান যত বৃদ্ধি পায় ততই অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতি পদার্থ পরিবাহিত হতে পারে ;

(D) যদি ঢালের উন্মুক্ত সকল অংশের উপর আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয় ও ক্ষয়ীভবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমানভাবে কাজ করে, তবে সেই ঢালের এক প্রকার সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ (parallel retreat of slope) হয়।

(E) যদি কোন ক্ষয়জাত পদার্থ পশ্চাদপসরণকারী ঢালের নিম্নাংশে বা পাদদেশে সঞ্চিত হয়,তখন নতুন এক প্রকার ঢালের উদ্ভব হয় ও তার কৌণিক পরিমান অপেক্ষাকৃত কম হয়।

পেঙ্ক বিশ্বাস করেন যে অধিকাংশ উত্থানজনিত ভূ-আন্দোলন ধীরগতিতে আরম্ভ ও শেষ হয় এবং ভূমিঢালের উদ্ভবের ক্ষেত্রে ধীর প্রারম্ভিক উত্থান, ত্বরান্বিত উত্থান, ক্ষীয়মান উত্থান এবং সবশেষে সুস্থিত বা শান্ত অবস্থা—ভূমিরূপের এই চারটি পর্যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

পেঙ্কের মতে, ত্বরান্বিত উত্থানের হার যখন নদীর নিম্নক্ষয় অপেক্ষা অধিক হয়, তখন প্রাথমিক সমপ্রায় ভূমির ('primarriumpf') ঢাল, বর্ধমান উত্তল ঢালে পরিণত হয় এবং আঞ্চলিক গম্বুজাকৃতির ভূমিরূপের উদ্ভব হয়। এরপর সময়ের অবকাশে খাড়া ঢালের অংশ অপেক্ষাকৃত দ্রুত সমান্তরাল পশ্চাদপসরণের ফলে উত্তলীয় ব্যসার্ধের (radius of convexity) পরিমান হ্রাস পায়। এই সময় উত্থানের হার ও নিম্নক্ষয়ের পরিমান সমান হওয়ায় ঢালের পরিমান সমান বা অপরিবর্তিত থাকে। এরপর উত্থানের হার নিম্নক্ষয় চিত্র 8.10 অপেক্ষা কম হলে হ্রাসমান বা ক্ষীয়মান ঢালের উদ্ভব হয়। চিত্র 8.10, 8.11, 8.12

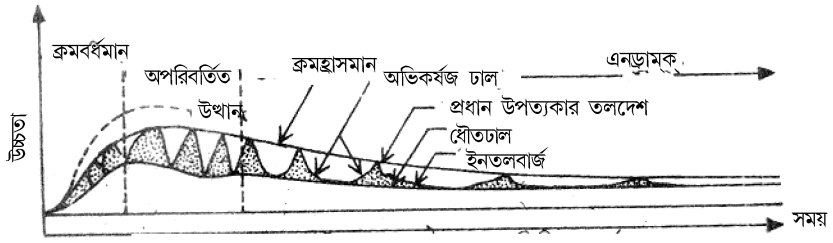

পেঙ্কের তত্ত্ব অনুযায়ী ঢাল উদ্ভবের বিভিন্ন পর্য্যায়।

চিত্র 8.10

নিম্নলিখিত তালিকায় পেঙ্কের পর্যায়ভিত্তিক ঢালের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য দেখানো হল ঃ

ঢাল উদ্ভবের পর্যায়	**ঢালের প্রকৃতি**	**ঢালের বৈশিষ্ট্য**
প্রাথমিক পর্ব-তরুন পর্য্যায় ত্বরান্বিত উত্থান > নিম্নক্ষয়	উত্তল প্রকৃতির (convex)	ক্রমবর্ধমান ঢাল (waxing slope) Aufsteigende Entwickelunge
মাধ্যমিক পর্ব-পরিণত পর্য্যায় ত্বরান্বিত উত্থান = নিম্নক্ষয়	সুষম ও সমপ্রকৃতির ঢাল	রৈখিক বা সরল প্রকৃতির ঢাল (Straight slope) Gleichformige Entwickelunge
অন্তিমপর্ব-বার্ধক্য পর্যায় ত্বরান্বিত উত্থান < নিম্নক্ষয়	অবতল প্রকৃতির (concave)	ক্রমহ্রাসমান ঢাল (waning slope) (abstcigende Entwicklunge)

পেঙ্ক আরো উল্লেখ করেন যে ঢালের ক্রমহ্রাসমান পর্বে উপত্যকার উর্ধ অংশের ঢাল খাড়া হয় এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ (accelrntion due to gravity) বেশী হয় এবং এই অংশের ঢালকে অভিকর্ষজ ঢাল বলে। কিন্তু উপত্যকার নিম্ন অংশে ঢালের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে এবং প্রাকৃতিক শক্তির ধৌত প্রক্রিয়ার ফলে পদার্থের সঞ্চয় হয়। এইপ্রকার ঢালকে ধৌত ঢাল বলে। (চিত্র 8.11)

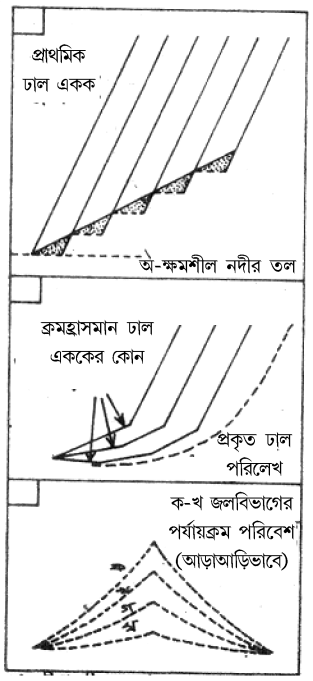

ক্ষয়শীল নদীর দ্বারা অবতল ঢালের ক্রমবিকাশ

(চিত্র 8.11)

8.7.3 উডেল ঢাল উদ্ভবের তত্ত্ব

উড 1942 সালে জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঢালের উদ্ভবতত্ত্ব উপস্থাপনা করেন এবং এই তত্ত্বের সহজ গ্রহণযোগ্যতা একটি বিশেষ গুণ।

উডের মতে, খাড়া উন্মুক্ত শিলাস্তরে আবহবিকার সংঘঠিত হবে ও মুক্তপৃষ্ঠে (Free face) খাড়া ঢালের সৃষ্টি হবে। এই মুক্তপৃষ্ঠের পাদদেশে সক্রীয় বা 'ট্যালাস' জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয় সমপরিমান বা প্রতিসম ঢালের সৃষ্টি করবে। এই প্রকার ঢালকে 'কনস্ট্যান্ট' বা অপরিবর্তিত ঢাল হিসাবে তিনি অভিহিত করেন। এই প্রকার ঢাল সৃষ্টি হবার পর ঢালের সমপরিমান পশ্চাদপসরণ ঘটে। এর ফলে অপরিবর্তিত ঢালের পাদদেশে ধৌত ঢালের সৃষ্টি হয়। যদি অপরিবর্তিত ঢালের পশ্চাদসরণ ব্যাহত হয়,তখন ঢালের উর্ধ অংশের উভয় পার্শ্বে আবহবিকার কাজ করায় গোলাকৃতি ঢাল উত্তল প্রকৃতির হয়। তবে এই প্রকার উত্তলঢালের সঙ্গে পেঙ্কের উল্লিখিত প্রাথমিক পর্বের ও তরুণ পর্যায়ের উত্তল ঢালের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও বস্তুত উদ্ভবের পর্যায় ও প্রক্রিয়া উভয়ই ভিন্ন। উডের ঢালউদ্ভবের চক্রকে নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

উডের ঢাল বিবর্তন তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একটি খাড়া মুক্তপৃষ্ঠ তলের উপরিভাগে উত্তল ঢালের সৃষ্টি হয়। একে শীর্ষদেশীয় উত্তল ঢাল (Summital convexity) বলে। পক্ষান্তরে ঢালের নিম্ন অংশে অবতল ঢালের সৃষ্টি হয়। একে পাদদেশীয় বা তলদেশীয় অবতল ঢাল বলে। এই দুই ঢালের মধ্যবর্তী অংশে অপরিবর্তিত ঢাল সরলরেখাকৃতি (rectilinear) হয়। সময়ের সাথে সাথে পাদদেশীয় অবতল ঢাল ও শীর্ষদেশীয় উত্তল ঢাল উভয়ের

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় ও পক্ষান্তরে সরলরেখাকৃতি ঢালের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ হ্রাস পায়। পরিশেষে অবতল উত্তলীয় (convcavo-convex) ঢালের সৃষ্টি হয় এবং ঢালের কৌণিক পরিমান কম হওয়ায় সমতল প্রকৃতির হয়।

উডেল ঢাল বিবর্তনতত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনকি আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যমূলক ও বিসদৃশ ঢালযুক্ত অঞ্চলেও মুক্ত পৃষ্ঠ তলীয় খাড়া ঢাল (steep slope of free face) বর্ধমান ঢাল (waxing slope) অপরিবর্তিত ঢাল (constants lope) এবং হ্রাসমান বা ক্ষীয়মান ঢালের এক উদ্ভব হয়। কালক্রমে অপরিবর্তিত ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ হয়। ঢালের উর্ধ্ব অংশে উত্তলীয় ঢাল ও নিম্ন অংশে অবতলীয় ঢালের উদ্ভব হয়। পরিশেষে উত্তলীয় ও অবতলীয় ঢালের ক্রমবিস্তৃতি এক প্রকার উত্তল অবতলীয় ঢালের সৃষ্টি করে। কালক্রমে প্রাথমিক খাড়া উন্মুক্ত পৃষ্ঠ তলীয় ঢাল সমতলীয় ঢালে বিবর্তিত হয়। চিত্র 8.13।

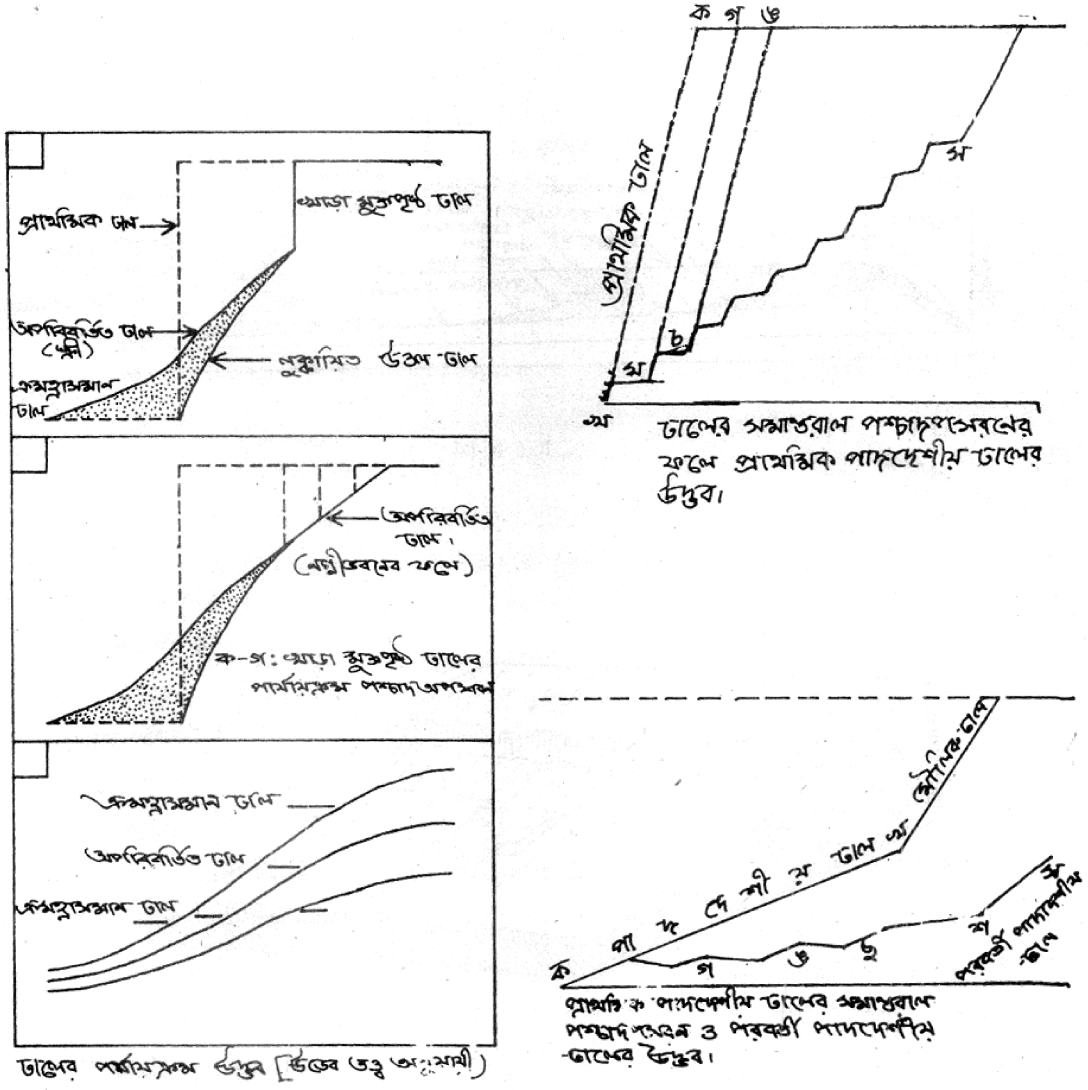

চিত্র 8.13

8.7.4 L. C. King এর সমান্তরাল পশ্চাদপসারণ তত্ত্ব

ভূমিরূপ বিবর্তনের তত্ত্ব প্রসঙ্গে L. C. King 1947 সালে ঢাল উদ্ভবের এক অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করেন। পেঙ্কের সমান্তরাল পশ্চাদপসারণ এবং উডের পার্বত্য ঢালের বিভিন্ন উপাদানের উপর ভিত্তি করে King ঢাল উদ্ভবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে যে কোন প্রাথমিক ঢালের ভৃগুর অস্তিত্ব একটি স্বাভাবিক অবস্থা এবং এই ভৃগুর খাড়া তলের পশ্চাদ্ অপসারণের ফলেই বিভিন্ন প্রকার ঢালের সৃষ্টি হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে প্রাথমিক ভৃগুঢালের পশ্চাদপসারণের ফলে পাহাড়ের উচ্চতা হ্রাস পায় এবং সমতল ভূ-প্রকৃতি এলাকা ও দৈর্ঘ্য উভয়েই বৃদ্ধি পায় এবং পেডিমেন্টের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে বিভিন্ন পেডিমেন্ট একাত্রিত হয়ে বর্ধিত সমভূমির সৃষ্টি করে যাকে কিং 'পেডিপ্লেন' নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রকার পেডিপ্লেনে ঢাল অবতল প্রকৃতির হয়।

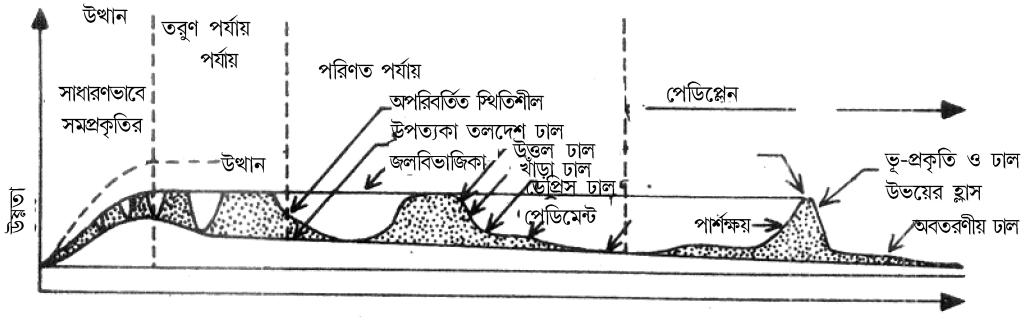

চিত্র 8.14

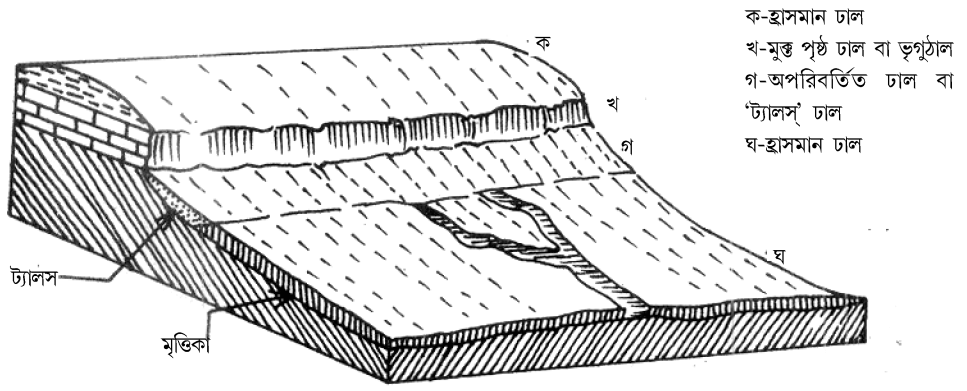

কিং-এর ঢাল বিবর্তনের মডল

চিত্র 8.15

দঃ আফ্রিকা ও শুষ্ক ও প্রায় শুষ্ক ক্রান্তীয় অঞ্চলে ভূমিরূপ ও ঢাল উদ্ভব ও বিশ্লেষণের জন্য কিং উপরিউক্ত ঢালতত্ত্বের উপস্থাপনা করেন ; বস্তুত পরবর্তীকালে কিং এই তত্ত্বের বিশ্বব্যাপী সার্বিক প্রয়োগের জন্য তাঁর বিখ্যাত "Morphology of the Earth" গ্রন্থে 'ইউনিফরমিটোরিয়ান' ধারনার (uniformitarian concept) অবতারণা করেন।

তিনি ভূ-তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে উত্থান কার্যে উত্তলীয় ঢাল বা বর্ধমান ঢাল ; ভৃগুঢালের পশ্চাদপসারণ খাড়া ঢাল, ট্যালাস গঠনের পর্বে রৈখিক ঢাল ও পরিশেষে সমতল পেডিপ্লেন কার্যে অবতলীয় ঢালের এক বিশ্বব্যাপী উদ্ভবের অভিনব তত্ত্ব পরিবেশন করেন।

8.7.5 স্ট্র্যালায়ের তত্ত্ব

1950 সাে পরিসংখ্যান ও গাণিতিক পরিমাপের উপর ভিত্তি করে স্ট্র্যালার এই তত্ত্বের সৃষ্টি করেন। তিনি বিভিন্ন জলবায়ু ভূমিরূপ (climate geomorphic) ও আকারোদ্ভব (morphogenetic) অঞ্চলে ঢালের সর্বোচ্চ পরিমাণ কোণের পর্যপেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে যদি ঢাল গঠনকারী প্রক্রিয়া ও ঢালের বয়স বা একই প্রকৃতির হয়, তাহলে গড় ঢালের কোণ অপরিবর্তিত থাকবে যদিও মূল ঢালের ব্যতিক্রম খুবই নগণ্য হবে। স্ট্র্যালার আরো উল্লেখ করেন যে ঢালের নতি (gradient) অপরিবর্তিত থাকলে প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থকে পরিবহন করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলে ভারসাম্য ঢালের (equilibrium slope) উদ্ভব হয়। এর পর তিনি জ্যাক ও চোলের সহযোগিতায় ভূমিরূপের উদ্ভব ও ঢালের বিবর্তনে গতিশীল ভারসাম্যের তত্ত্বের অবতারণা করেন।

গতিশীল ভারসাম্য তত্বের মাধ্যমে ভূমিরূপ বিদ্যায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বস্তুতঃ এই তত্ত্বের পূর্বে ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে ডেভিসের চক্রীয় মতবাদ (cyclic concept) প্রচলিত ছিল। গতিশীল ভারসাম্যের তত্ত্বে বলা হয় যে প্রাকৃতিক শক্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রথম থেকে ঢালের গতির উপর ভিত্তি করে এক প্রকার ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। প্রকৃত অর্থে ভারসাম্য বলতে ঢাল অনুযায়ী প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয়ের মধ্যে এক প্রকার সমতা আনার চেষ্টাকেই বোঝায় ? যদি ঢালনিয়ন্ত্রণকারী কারণ সমূহ যথা শিলাস্তরের প্রকৃতি, ভূমিরূপ প্রক্রিয়া, জলবায়ু, মৃত্তিকা স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ভূমির প্রাথমিক ঢালের কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ উত্তল ঢাল উত্তলই থাকবে বা অবতল ঢাল অবতলই থাকবে। যদি উপরিউক্ত ঢাল নিয়ন্ত্রণকারী কারণ সমূহের মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক কারণের পরিবর্তন হয়, তখন আগেকার ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে এবং ঢাল উদ্ভবের প্রক্রিয়াগুলি নতুন করে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে। তাই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ডেভিসের তত্ত্বের পরিপন্থী।

8.7.1 স্যাভিগিয়ারে ঢাল পরিলেখ উদ্ভবের তত্ত্ব

1952 সালে দক্ষিণ ওয়েলস্ এর কারমারথেজ উপসাগরের মস্তকদেশের ঢাল পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে পশ্চাদপসারণ বা ঢালনতির ক্রমহ্রাস যৌথভাবে একই সঙ্গে কোন স্থানে কাজ করে। তাঁর পর্যবেক্ষণ অঞ্চলের পূর্বদিকে তিনি তলদেশীয় মুক্ত পৃষ্ঠ ঢাল, মধ্যভাগে রৈখিক ঢাল এবং শিখর দেশে উত্তল ঢাল এই তিনি প্রকার ঢালের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। কিন্তু পশ্চিমদিকে শীর্ষদেশীয় উত্তল ঢাল অনেক বেশি বিস্তৃত হয় ও মধ্যভাগের রৈখিক ঢাল ও নীচের অবতল ঢালের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি লক্ষ করেন যে, পশ্চিমভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠের অনেক আগেই পশ্চাৎদিকে অপসারিত হয়েছে। এই কারণে যতই পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়া যাবে, ঢালের পরিমাণ তত হ্রাস পাবে। তাই পূর্বভাগে ঢাল শুধু খাড়াই হবে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবতল প্রকৃতির হবে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সমুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে স্থলভাগ থেকে দ্রুত পদার্থের অপসারণ হয়। তাই উপকূলবর্তী ভৃগু প্রাথমিকভাবে খাড়া হলেও সমুদ্রপৃষ্ঠের অপসারণের ফলে ঢালের গতি ক্রমশঃ হ্রাস পাবে। অর্থাৎ প্রাথমিক খাড়া ঢাল মৃদু ও সুষম ঢালে রূপান্তরিত হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ঢালের পাদদেশে ঢালের পরিমাণ এবং কার্যকরী শক্তির উপস্থিতির মধ্যে একপ্রকার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসারণের জন্য ঢালের পাদদেশে এই প্রকার শক্তির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। যদি এই শক্তি অনুপস্থিত

থাকে তখন ঢালের পাদদেশে পদার্থের সঞ্চয় হবে এবং সঞ্চয় ঢালকে ক্ষয়কার্য থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু ঢালের উর্ধ্ব অংশে আবহবিকার ও অন্যান্য অবরোহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় ঢালের পশ্চাপসারণ হয়। এই অবস্থার ঢালের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্লাস পেতে থাকে এবং ঢাল আরো সমতল প্রকৃতির হয়। এছাড়া স্যাভিগিয়ার উল্লেখ করেন যে শীর্ষ দেশীয় অবতলটা (Summital convexity) ঢাল বিবর্তনের শেষের দিকে পরিলক্ষিত হয়।

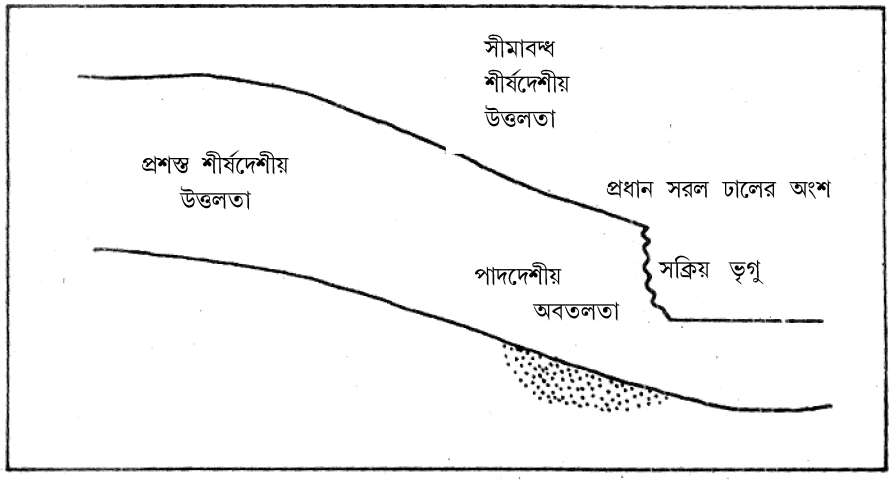

কারমারথেন উপসাগরের নিকটবর্তী ভৃগু পরিলেখ (স্যাভিগিয়ারের তত্ত্ব অনুযায়ী)

চিত্র 8.16

8.8 উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, ঢাল ভূমিরূপবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ঢালের উদ্ভব এবং বিকাশ পৃথিবীর প্রাথমিক ও পরবর্তী ভূমিরূপগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুতঃ শুধুমাত্র ঢালের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর যে কোন ভূমিরূপকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তবে ঢালের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্বন্ধে যে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়, তাতে পাঠক ও গবেষকদের মধ্যে ঢাল সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয় না। তথাপি উপরিউক্ত আলোচনাতে যে ক'টি তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে, প্রতিটি তত্ত্বই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

8.9 সারাংশ

সাম্প্রতিক কালে ভূমিরূপবিদ্যার ঢালের উদ্ভব ও বিকাশ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ বিশ্লেষণ এবং ভূমিরূপ উদ্ভবের পর্যলোচনায় ঢালের সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা থাকা আবশ্যক, দেখা যাক পৃথিবীর যে কোন প্রাথমিক ভূমিরূপ ও তাদের পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত ভূমিরূপগুলি এক বা একাধিক ঢালের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

ভৌগলিক পরিপ্রেক্ষিতে আনুভূমিক তলের সাপেক্ষে ভূ-পৃষ্ঠের হেলানো অবস্থা বা কৌণিক পরিমানকেই ঢাল বলে। ঢালের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঢালের পরিবর্তনশীলতা ও উদ্ভব প্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঢালের যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য ঢালের উৎপত্তিগত শ্রেণী বিভাগ এবং আকারগত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে মূলতঃ উত্তল, মুক্তপৃষ্ঠ খাড়া ঢাল, সরল বা 'ট্যালাস্' ঢাল ও অবতল ঢাল—এই তারতম্যই পৃথিবীর যে কোন ভূমিরূপের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

ভূ-বিদ্যার প্রাকৃতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ভূমিরূপ বিদ্যার আলোচনায় ঢাল কখনই একটি বিচ্ছিন্ন প্রণালী নয়। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক শক্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূ-আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং পরিবেশে মানুষের হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশের সঙ্গে ভূমির ঢাল বিশেষভাবে সম্পর্কিত। পরিশেষে ঢাল উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্বগুলি অনুধাবন করলে ও যে কোন অঞ্চলের ঢাল বিশ্লেষণে তাদের প্রয়োগ করলে উল্লিখিত তত্ত্বগুলির গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করা সম্ভব হয়। বর্তমান আলোচনায় তাই ডেভিস, পেঙ্ক, উড, কিং,স্ট্র্যালার ও স্যাভিগিয়ারের ঢাল উদ্ভবের তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে। ঢালের পর্যালোচনায় জ্যামিতিক পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বিশ্লেষন পদ্ধতি এবং গাণিতিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি তাই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

8.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(1) বিষয়মুখী/ বিশ্লেষণমূলক/ বিবরণমূলক প্রশ্ন ঃ **মান-১০ নম্বর**

A. ঢালের সংজ্ঞা দিন। ঢালের উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্বগুলির বিবরণ দিন।
B. ভূমিরূপ বিদ্যায় ঢালের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
C. ঢাল উদ্ভবের ক্ষেত্রে ডেভিস ও পেঙ্কের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।
D. বিভিন্ন প্রকার ভিত্তিতে ঢালের শ্রেণীবিভাগ করুন।
E. পার্বত্য ঢালের চার প্রকার উপাদান কী কী ? ঢাল নিয়ন্ত্রণে আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয় ও জলবায়ুর ভূমিকা আলোচনা করুন।

(2) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন **মান -4 নম্বর**

A. ক্রমবর্ধমান ঢাল ও ক্রমহ্রাসমান বা ক্ষীয়মান ঢালের মধ্যে পার্থক্য দেখান।
B. বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ ঢালের মধ্যে পার্থক্য দেখান।
C. ঢালের নবম একক মডেলটি চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।
D. ঢালের পার্শ্বচিত্র বা পরিলেখ বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করুন।
E. ক্ষয় ও সঞ্চয় প্রক্রিয়ার ফলে কিভাবে ঢালের বিভিন্ন অংশ গঠিত হয় ?
F. ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ এর ফলে কিভাবে ঢালের বিবর্তন হয়, চিত্র ও তত্ত্ব সহযোগে তার ব্যাখ্যা করুন।

(3) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন

A. 1. মৃত্তিকা বিসর্পন
B. 2. মিশ্র বা যৌগিক ঢাল
C. 3. সরল রেখাকৃতি ঢাল

D. 4. উত্তল ঢাল

E. 5. অবতল ঢাল

F. 6. ট্যালাস ঢাল

G. 7. হিপসোমেট্রিক বক্ররেখা

H. 8. পদাঙ্গুলীদেশীয় পলল ঢাল

I. 9. 'রিল' ক্ষয়

J. 10. অন্তপ্রবাহ

K.11. গতিশীল ভারসাম্য ও ঢালের বিবর্তন

L.13. মুক্তপৃষ্ঠ ঢাল

M.13. 'সিপেজ' ঢাল

N.14. ওয়েন্টওয়ার্থের গড় ঢাল সূচক

O.15. "প্রাইমারাম্ফ"

(4) অব্জেক্টিভ্ প্রশ্ন

A. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. ভৃগুঢালের কৌনিক পরিমাণ সর্বাধিক... হয়।
2. সমতলভূমিতে ঢাল প্রধানত ... প্রকৃতির হয়।
3. ঢালের ভাঙন অঞ্চলে... ঢালের উদ্ভব হয়।
4. চ্যুতিরেখা ভৃগু..... ঢালের উদাহরণ।
5. পর্বতের শিখর দেশে.... ঢালের সৃষ্টি হয়।

B. ভুল শব্দ কেটে দিন ঃ

1. উত্তল ঢাল ক্রমবর্ধমান/ ক্রমহ্রাসমান প্রকৃতির হয়।
2. বৃহদাকার রিলকে গালী/শিট বলে।
3. ক্রমহ্রাসমান ঢালতত্ত্ব ডেভিস/ পেঙ্ক উল্লেখ করেন
4. আবহবিকার একটি বহিঃস্থ/ অন্তঃস্থ প্রক্রিয়া
5. ট্যালাস ঢাল একটি ক্ষীয়মান/কনস্ট্যান্ট ঢালের উদাহরণ।

C. **মিল খুঁজে উপযুক্ত জোড়া তৈরী করুন**

ট্যালাস ঢাল	খাড়া ঢাল
বহিঃস্থ প্রক্রিয়া	ক্রমবর্ধমান ঢাল
অন্তস্থ প্রক্রিয়া সরল ঢাল	
উপকূলবর্তী ভৃগু	পুঞ্জিত ক্ষয়
চ্যুতিরেখা ভৃগুযৌগিক ঢাল	
ক্রম হ্রাসমান ঢাল	অগ্ন্যুৎপাত
উত্তল ঢাল	অবতল ঢাল

8.11 উত্তর মালা

1. (A) 8.12 এবং 8.7
(B) 8.11 এবং 8.2
(C) 8.71 এবং 8.72
(D) 8.3
(E) 8.4
2. (A) 8.3
(B) 8.3.1.1 এবং 8.3.1.2
(C) 8.3.4
(D) 8.5
(E) 8.6
(F) 8.72, 8.73, 8.74
3. A. 8.41
B. 8.3.1.3
C. 8.3.2.1
D. 8.3.2.5
F. 8.3.2.4
G. 8.5.3.5
H. 8.3.6.7.
I. 8.4.4
J. 8.4.5
K. 8.7.5
L. 8.3.2.3
M. 8.3.4
N. 8.5.3.4
O. 8.7.2

8.12 এবং গ্রন্থপরিচয়

1.	Ruhe, R . V	(1975)	Geomorphology, Boston, Mass Publ 1975
2.	Small, R	(1982)	Study of Landforms, Cambridge Univ. Press 1982.
3.	Young, A	(1972)	Slopes, Edinburgh, Oliver and Boyld Pubb
4.	Sparks, B.W.	(1972)	Geomorphology 2nd Edn. London Lonman Ltd.
5.	Ahmed, E	(1991)	Geomorphology, Kalyani Publishers, New Delhi
6.	Dyal, P.	(1990)	A text book of Geomorphology Sukla Book Depot, Patna, 1990
7.	Mc Gullagh, P	(1978)	Modern concepts in Geomorphology, Oxford Univ. Press, London, 1978.

Block - 2

একক 9 ❑ জলচক্র—ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা, বিভিন্ন অংশ ও গুরুত্ব

গঠন

9.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

9.2 জলচক্র

9.2.1 জলচক্রের সংজ্ঞা

9.2.2 বিশ্বব্যাপী জলচক্র

9.2.3 ভূ-মণ্ডল জলচক্র

9.2.4 নদী অববাহিকার জলচক্র

9.2.5 জলচক্রের প্রক্রিয়াসমূহ

9.3 ভূ-তল প্রবাহ বা 'রান্-অফ্'

9.3.1 ভূ-তল প্রবাহ ঃ জলতত্ত্বের একটি অন্যতম উপাদান

9.3.2 ভূ-তল প্রবাহের গুরুত্ব

9.3.3 বিভিন্ন প্রকার ভূ-তল প্রবাহ

9.4 ভূ-তল প্রবাহের নিয়ন্ত্রক সমূহ

9.4.1 জলবায়ু সম্বন্ধীয়

9.4.2 প্রাকৃতিক কারণ

9.4.3 নদী-অববাহিকার বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য

9.4.4 অন্যান্য কারণ

9.5 ভূ-তল প্রবাহ

9.5.1 প্রথম পর্যায়

9.5.2 দ্বিতীয় পর্যায়

9.5.3 তৃতীয় পর্যায়

9.5.4 চতুর্থ পর্যায়

9.5.5 শেষ পর্যায়

9.6 সারাংশ

9.7 প্রশ্নাবলী

9.8 উত্তরমালা

9.9 গ্রন্থপঞ্জী

9.1 প্রস্তাবনা

জলতত্ত্ব ভূবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং জলতত্ত্ব হল ভূ-অভ্যন্তর ভূ-পৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলে জলের অবস্থান, পরিবর্তন, রূপান্তর ও স্থানান্তর সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এই বিষয়টি ভূ-বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখা, বিশেষতঃ ভূ-তত্ত্ব, ভূগোল, জলবায়ুবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে জলতত্ত্ব বায়ুমণ্ডল, ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভ—এই তিনটি স্থান এককের মধ্যে জলের প্রবাহ, জলের সঞ্চারণ, জলের স্থানান্তর প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করে এবং এই আলোচনায় জলচক্র মুখ্য বা প্রধান ভূমিকায় দেখা যায়। জলতত্ত্ব বিশারদগণ মনে করেন যে জলের সঞ্চালন, পরিবর্তন, স্থানান্তর প্রভৃতি জলচক্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। জলচক্র প্রধানতঃ তিনটি মুখ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যথা—(ক) বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন (evaporation and evapo-transpiration), (খ) অধঃক্ষেপন (precipitation) ও ভূতল ও ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারা (surface and subsurface run off)

জলচক্রের মাধ্যমে জলের স্থানান্তর উপরিউক্ত তিনটি প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও পরিবেশ (environment), স্থান একক (spatial unit), সাংস্কৃতিক ও বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ অনুযায়ী বেশ কয়েকটি উপচক্র জলের প্রবাহ পরিচলন ও স্থানান্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

অতএব পৃথিবীর জলের বণ্টন এবং বিভিন্ন স্থান এককের মধ্যে জলের স্থানান্তর সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত করার জন্য জলচক্রের পাঠ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ স্থান ও কাল অনুযায়ী জলবাজেটের পরিবর্তন আলোচ্য জলচক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। ভূমিব্যবহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, জলসম্পদের পূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক সদ্ব্যবহার প্রয়োজন বলে জলচক্র ও ভূ-পৃষ্ঠে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারার বিষয়ে পঠন-পাঠন বিশেষ আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে যে সকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বিশেষতঃ ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া কাজ করে, তারা জলচক্রের প্রকৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

চতুর্থতঃ জলবায়ুর পরিবর্তনকে জলচক্রের মাধ্যমেও অনুধাবন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাষ্পীভবন, বাষ্পীয় প্রস্বেদন, অধোক্ষেপন ও ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারার পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে।

উদ্দেশ্য ঃ

আপনি এই এককটি পড়ে—

(i) জলচক্র, ভূতল প্রবাহ এবং ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন।

(ii) জলচক্র, ভূতল প্রবাহ এবং ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার ভৌগোলিক গুরুত্ব ও নিয়ন্ত্রকগুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

(iii) পরিবেশের উপর জলচক্র ও বিভিন্ন জলধারার প্রভাব সম্বন্ধে অবগত হবেন।

9.2 জলচক্র (Hydrological cycle)

9.2.1 জলচক্রের সংজ্ঞা

পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, স্থলমণ্ডল ও জলমণ্ডলে প্রতিনিয়ত জলের সঞ্চালন ও স্থানান্তর ঘটে। বিভিন্ন আধার উপাদান (storage elements)-এর মাধ্যমে জলের এই স্থানান্তর বা পরিচলনকেই জলচক্র

100 একক = গড় বার্ষিক পৃথিবীব্যাপী অধোঅক্ষেপণঃ 85.7 সেঃ মিঃ বা 23.8 ইঞ্চি

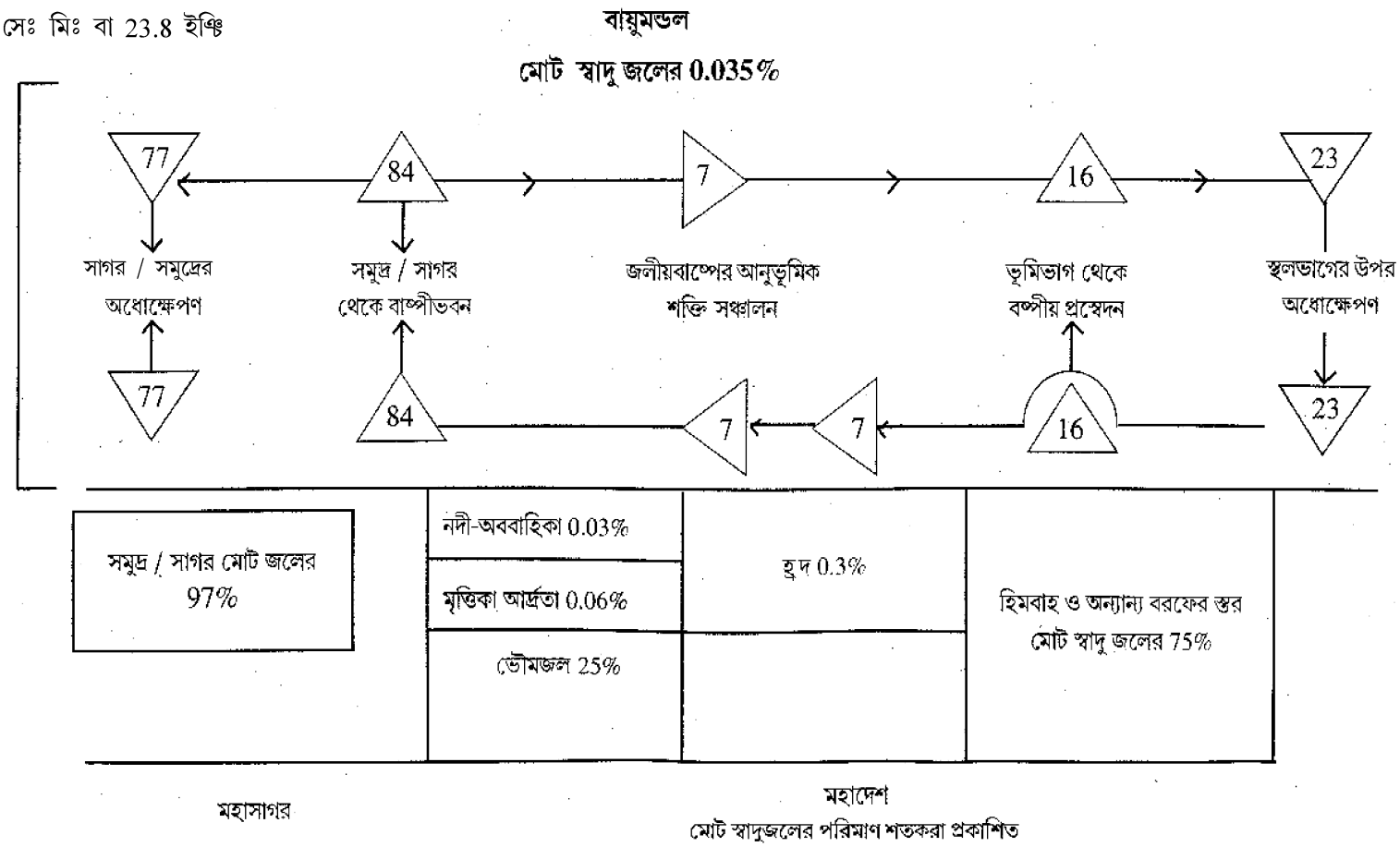

বলে। অধ্যাপক V.T. Chow-এর মতে, ''Hydrological cycle means a simple link but a group of numerous arcs which represent the different paths through which the water in the nature ciraculates and is transformed. These arcs penetrate three parts of the system, atmosphere, hydrosphere and lithosphere and undergo complicated processes of evaporation, precipitation, interception, transpiration, infitration, percolation, storage and run off'' অর্থাৎ জলচক্রের বিভিন্ন বৃত্তচাপের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ গঠনকেই জলচক্র বলে। উল্লিখিত বৃত্তচাপগুলি হল বিভিন্ন প্রকার পরিবাহী পথ যাদের মাধ্যমে জলের স্থানান্তর ও বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ঘটে। এই বৃত্তীয় চাপের মাধ্যমে জল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান এককে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল, স্থলমণ্ডল বারিমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং নির্গত হয়। যে সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলের সঞ্চালন, পরিবর্তন ও স্থানান্তর ঘটে, তাদের মধ্যে বাষ্পীভবন, অধঃক্ষেপন, অধিশোষন প্রস্বেদন, ইনফিলট্রেশন বা উল্লম্ব অনুপ্রবেশ, মৃত্তিকা শিলাস্তরের মাধ্যমে জলের ভূগর্ভে প্রবেশ, বিভিন্ন আধারে জলের সঞ্চয় ও ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীচে একটি মডেলের মাধ্যমে জলচক্রের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কার্যকারিতা তুলে ধরা হল।

9.2.2 বিশ্বব্যাপী জলচক্র (Global hydrological cycle)

পৃথিবীতে বাষ্পীভবন, বাষ্পীয় প্রস্বেদন, অধঃক্ষেপন ও প্রবাহিত জলধারার জলের একটি চক্রাকার আবর্তন সৃষ্টি করে। একে বিশ্বব্যাপী জলচক্র বলে। প্রাকৃতিক পরিবেশে পৃথিবীতে জল তিন প্রকার অবস্থা পাওয়া যায়—তরল, গ্যাসীয় ও কঠিন। স্থলভাগের বিভিন্ন অবনমিত অংশ, জলাশয়, নদী-উপত্যকা, হ্রদ, পুষ্করিনী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাধারে জল তরল অবস্থায় থাকে। সৌরতাপের ফলে প্রতিনিয়ত তরল জল বাষ্পীভূত হচ্ছে ; এছাড়া গাছ পালার মাধ্যমেও তরল জলের বাষ্পীয় প্রস্বেদন হচ্ছে। বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের মাধ্যমে জল বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় অবস্থায় অর্থাৎ জলীয় বাষ্পরূপে অবস্থান করে। এই জলীয় বাষ্প ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত অধঃক্ষেপন হয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। অধঃক্ষেপণের জল উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বা শীতল জলবায়ু অঞ্চলে বরফ বা তুষারের আকারে অর্থাৎ কঠিন অবস্থায় দেখা যায় এবং এই কঠিন জল পুনরায় বাষ্পীভূত হতে পারে বা গলে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। নীচে দেওয়া চিত্রের মাধ্যমে জলের এই তিন প্রকার অবস্থা ও রূপান্তর দেখানো হল ঃ

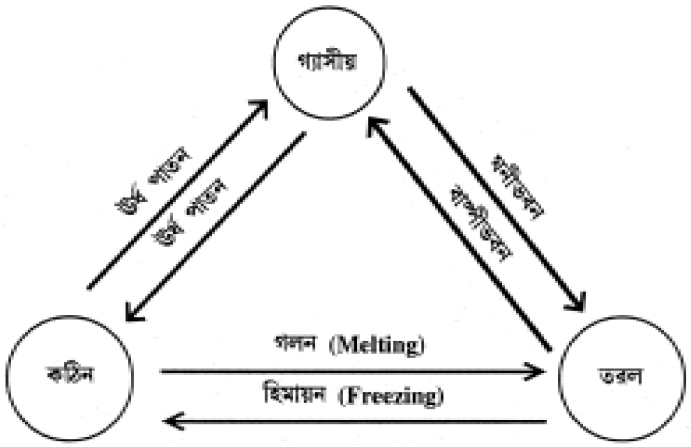

(চিত্র নং. 9.2)

উপরে দেওয়া চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে জল গ্যাসীয় তরল ও কঠিন অবস্থায় সর্বদা রূপান্তরিত হয়। বায়ুমণ্ডল স্থলমণ্ডল ও জলমণ্ডলের মধ্যে অবস্থা অনুযায়ী জলের তিনপ্রকার রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীতে এই তিন প্রকার অবস্থায় প্রায় ১৩৬ কোটি ঘন কিলোমিটার জল যাচ্ছে। এই জলরাশির মধ্যে লোনা জল বা সামুদ্রিক জল প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং স্বাদু জল প্রায় ৩ শতাংশ। মোট জলের শতকরাভিত্তিক বন্টনকে নিম্নলিখিত সারণীতে দেখানো হল।

বিভিন্ন এককে জলের অবস্থান	**মোট জলের পরিমাণ (ঘন কিলোমিটারে)**	**জলের পরিমাণ (শতকরা হিসাবে)**
সমুদ্র/সাগর	1,320,000,000	97.20
চিরতুষারাবৃত	29,000,000	2.15
বায়ুমণ্ডল ও স্থলভাগে		
স্বাদু জল	8,506,000	0.65
মোট	**1,357,506,000**	**100.00**

উপরের সারণীতে দেওয়া শতকরা তিন ভাগ স্বাদু জল পৃথিবীতে বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে রয়েছে। নিম্নলিখিত সারণীতে পৃথিবীতে স্বাদুজলের বিভিন্ন আধার এককে বণ্টন দেখানো হল ঃ

আধার একক (Storage unit)	**জলের পরিমাণ (ঘন মিঃ মি.)**	**শতকরা হিসাব**
ভৌমজলাধার	8,300,000	97.54
বায়ুমণ্ডল	13,000	0.16
মৃত্তিকা জল ও 'সিপেজ' জল	67,000	0.80
হ্রদ, নদী ও প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম		
জলাধার	126,000	1.50
মোট	**8,506,000**	**100.00**

জলতত্ত্ববিদ্‌গণ পরিমাপ করে দেখেছেন যে মোট বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রায় 12.10 শতাংশ স্থলভাগ থেকে এবং 87.90 শতাংশ জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্র/সাগর থেকে নির্গত হয়। আবার মোট অধঃক্ষেপণের পরিমাণের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগে 20.97% এবং সমুদ্র/সাগরে 79.03% পতিত হয়। তাই দেখা যাচ্ছে যে স্থলভাগে (20.97 – 12.10) = 8.87% জল ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা রূপে দেখা যায়। নীচে দেওয়া চিত্রে প্রস্বেদন, বাষ্পীভবন, অধঃক্ষেপন, নদীখাতে জলের প্রবাহ এবং জলধারা প্রবাহ বা রান অফের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হল।

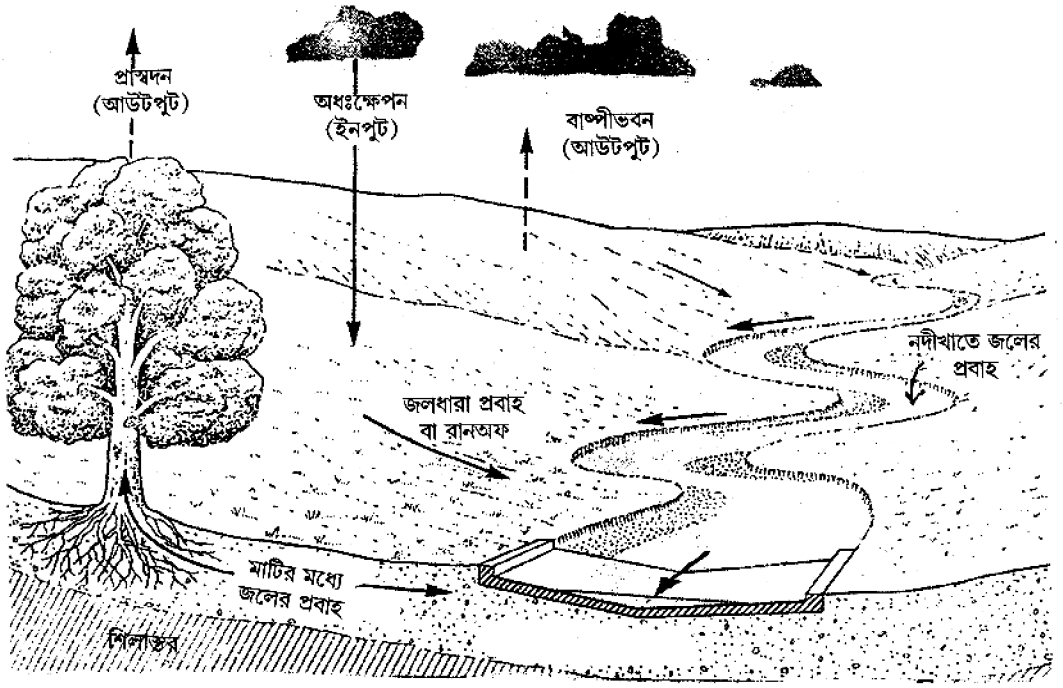

(চিত্র নং. 9.3)

9.2.3 ভূ-মণ্ডলজলচক্র (Hydrological cycle in the earth system)

বিশ্বব্যাপী জলচক্র পর্যালোচনা করার পরে ভূ-মণ্ডল জলচক্র অর্থাৎ কিভাবে ভূপৃষ্ঠের উপর জলচক্র কাজ করে, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হল।

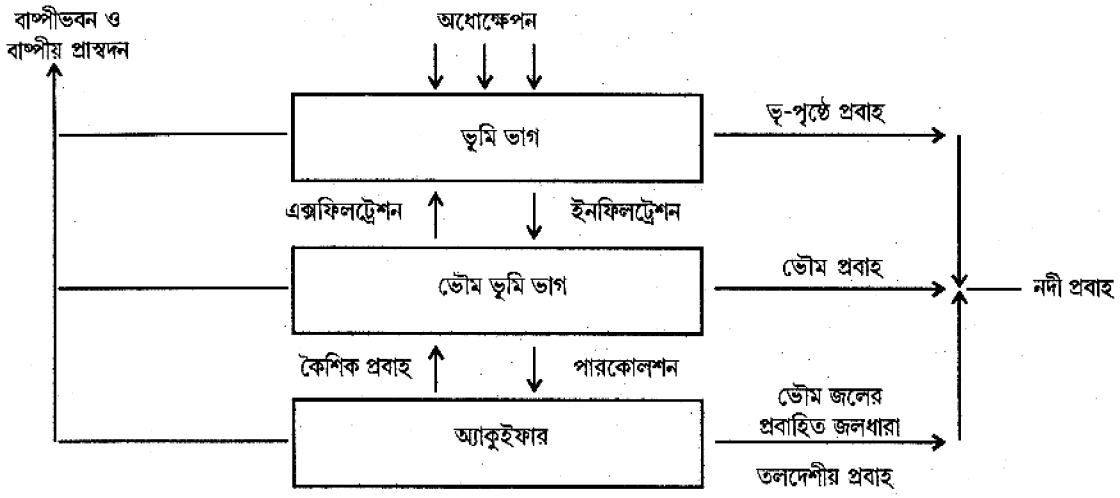

(চিত্র নং. 9.4)

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বব্যাপী জলচক্রের ক্ষেত্রে জলের সঞ্চালন, স্থানান্তর ও রূপান্তর একটি আবদ্ধ প্রণালীর (closed system) সৃষ্টি করে, কিন্তু স্থানীয়ভাবে বিশেষতঃ নদী অববাহিকার ক্ষেত্রে জলচক্রটি মুক্ত প্রণালী গঠন করে। নীচের মডেলে এই মুক্ত প্রণালীটি তুলে ধরা হল।

নদী অববাহিকার ক্ষেত্র জলচক্রের মডেল

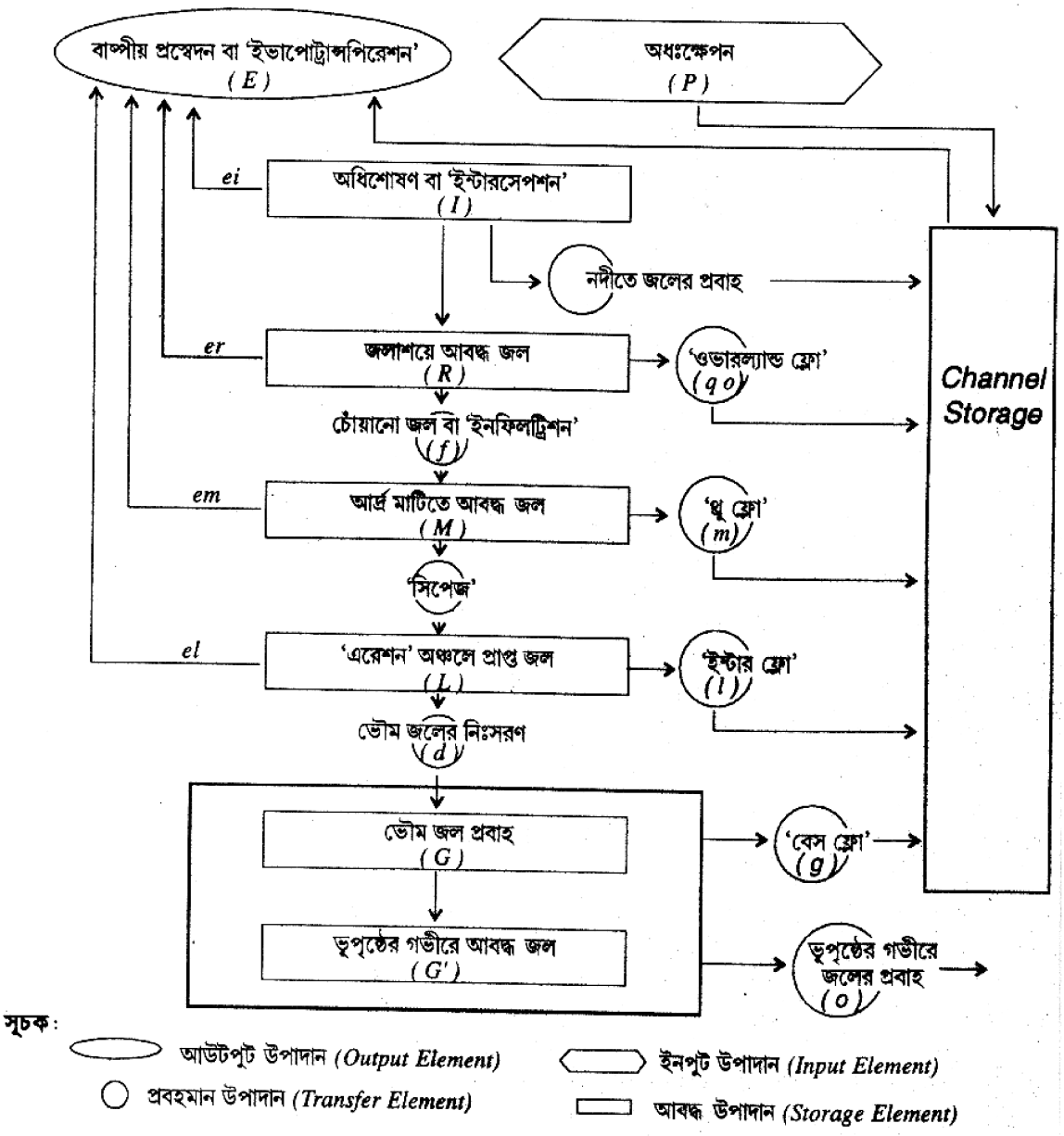

(চিত্র নং. 9.5)

9.2.4 নদী অববাহিকার জলচক্র (Basin hydrological cycle)

স্থলভাগ, জলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলে জলচক্রের মাধ্যমে জলের যে পরিচলন দেখা যায়, একটি নদী অববাহিকাতেও অনুরূপ জলের স্থানান্তর পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে নদী অববাহিকার জলচক্র স্থান ও কাল অনুযায়ী জলের একপ্রকার সমতা বা balance সূচিত করে। নদীর আচরণ, বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুযায়ী নদীর কার্যক্ষমতা এবং বিভিন্ন উপনদী ও মূলনদীর মাধ্যমে গঠিত নদী বিন্যাস এবং সামগ্রিকভাবে নদীর জলধারণক্ষমতা এই জলচক্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। অতএব জলচক্রকে অনুধাবন করার একটি বাস্তব উপযোগিতা আছে।

মূলজলচক্রের তিনটি প্রধান পর্যায় বা প্রক্রিয়া যথা বাষ্পীভবন বা বাষ্পীয় প্রস্বেদন অধঃক্ষেপন ও ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার গতিশীল প্রবাহ, নদী অববাহিকার বিভিন্ন প্রণালী বা system প্রভাবিত করে। এর ফলে জলসঞ্চয়ের প্রকৃতির তারতম্য ঘটে। নিম্নলিখিত তালিকায় জলচক্র এবং জলসঞ্চয়ের বা জলসমতার সম্পর্কটি দেখানো হলো ঃ

জলচক্রের বিভিন্ন পর্যায়	গতিশীল জলধারার বিভিন্ন পর্যায়	জলের ভারসাম্যের প্রকৃতি
(1) বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন	(1) গতিশীল জলধারার প্রথম পর্যায় অর্থাৎ প্রাথমিক শুষ্ক অবস্থা	(1) ধনাত্মক ভারসাম্য (বাষ্পী-ভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন) অধঃক্ষেপন
(2) অধঃক্ষেপন	(2) জলধারাচক্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার অধঃক্ষেপনের শুরু ও ক্রমবর্ধমান প্রকৃতি	(2) ধনাত্মক ক্রমবর্ধমান ভার-সাম্য (অধঃক্ষেপন বাষ্পী-ভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন)
(3) ভূপৃষ্ঠে জলধারার গতিশীল প্রবাহ।	(3) চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান জলপ্রবাহ পুনরায় শুষ্ক অবস্থার শুরু।	(3) ধনাত্মক ক্রমহ্রাসমান ভার-সাম্য (অধঃক্ষেপন) বাষ্পী-ভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন)

জলচক্র ও জলপ্রবাহচক্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নদী আববাহিকার মূল জলচক্রের কয়েকটি উপচক্র অববাহিকার জলের ভারসাম্যকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এই উপচক্রগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হল ঃ

(a) বাষ্পীভবন $\rightarrow$ অধঃক্ষেপন $\rightarrow$ ভূপৃষ্ঠে গতিশীল জলধারা $\rightarrow$ তুষারের আকারে পর্বতগাত্রে জলসঞ্চয় $\rightarrow$ তুষার থেকে পুনরায় বাষ্পীভবন

এই উপচক্রটি নদী অববাহিকার উচ্চ অংশে বিশেষতঃ নদীর উৎস অঞ্চলকে (source region) বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

(b) বাষ্পীভবন $\rightarrow$ অধঃক্ষেপন $\rightarrow$ পুনরায় বাষ্পীভবন

এই উপচক্রটি নদী অববাহিকার স্থানীয় আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে।

(c) বাষ্পীভবন $\rightarrow$ ভূপৃষ্ঠে গতিশীলজলধারার প্রবাহ $\rightarrow$ মৃত্তিকাস্তরে জলের অনুপ্রবেশ $\rightarrow$ প্রবেশ্য শিলা স্তরের মাধ্যমে ভৌমজলের প্রবাহ $\rightarrow$ 'Base flow' বা তলদেশীয় প্রবাহের ফলে নদী অববাহিকার জলের সঞ্চয়।

এই উপচক্রটি নদীর জলের পরিমাণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এবং শুষ্ক ঋতুতেও নদী অববাহিকায় নিত্যবহ নদীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

(d) বাষ্পীভবন → গতিশীল জলধারার প্রবাহ → নদী উপত্যকার প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে জলের অনুপ্রবেশ → নদীর জলতলের উত্থান।

এই উপচক্র নদীর জলধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী জলের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নদী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যাগুলি অর্থাৎ বন্যা, জলোচ্ছাস প্রভৃতি ত্বরান্বিত হয়।

(e) বাষ্পীভবন → অধঃক্ষেপন → উদ্ভিদের মাধ্যমে অধিশোষণ (interception) → ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার হ্রাস।

এই উপচক্রটি নদী জলধারার ধনাত্মক ভারসাম্য সূচীত করে।

নদী অববাহিকার জলচক্র জলসঞ্চয়ের এবং জলের ভারসাম্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন সমীকরণের মাধ্যমে এই ভারসাম্যের পরিমাপ নিরূপন করে নদী অববাহিকায় বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নদী বিন্যাস এবং ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভে সঞ্চিত জলসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অববাহিকার উন্নতিসাধন করা হয়।

9.2.5 জলচক্রের প্রক্রিয়াসমূহ

উপরিউক্ত মূল ও উপজলচক্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জলচক্রের কয়েকটি প্রধান প্রক্রিয়া জলের ভারসাম্য এবং বন্টনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। নিম্নলিখিত তালিকার মাধ্যমে জলচক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি দেখানো হল।

জলচক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া	স্থান একক অঞ্চলে অবস্থান	বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে অবনমিত অংশে জল বিনিময়	মন্তব্য
বাষ্পীভবন (evaporation)	বায়ুমণ্ডলে জলের অবস্থান	সমুদ্র বা নদী বা জলাশয়ের জল	ঋণাত্মক
প্রস্বেদন (transpiration)	জৈবমণ্ডল	স্থলভাগের জৈবমণ্ডল থেকে বায়ুমণ্ডলে জলবিনিময়	ঋণাত্মক
অধঃক্ষেপন (precipitation)	বায়ুমণ্ডলের থেকে ভূপৃষ্ঠে/ভূগর্ভে জল জলবিনিময়	বায়ুমণ্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠে অধঃক্ষেপন	ধনাত্মক
ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ (runoff)	স্থলভাগের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঢাল অনুযায়ী জলপ্রবাহ ; স্থলভাগ থেকে সমুদ্র বা নদী উপত্যকায় জলের অনুপ্রবেশ	ভূপৃষ্ঠ প্রবাহের মাধ্যমে স্থলভাগের থেকে জলভাগে জল বিনিময়	জলবিনিময় বা জলের স্থানান্তর প্রক্রিয়া
ভৌমজলপ্রবাহ (groundwater flow)	ভূগর্ভ	ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভ জলবিনিময়	জলের স্থানান্তর প্রক্রিয়া

জলচক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া	স্থান একক অঞ্চলে অবস্থান	বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে অবনমিত অংশে জল বিনিময়	মন্তব্য
ইনফিলট্রেশন (infiltration)	ভূপৃষ্ঠ প্রবাহের জল মৃত্তিকা স্তর বা ভৌমজলস্তরে প্রবেশ	ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভে	জলের স্থানান্তর প্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণাত্মক ভূগর্ভের পরিপ্রেক্ষিতে ধনাত্মক।
তলদেশীয় প্রবাহ (Baseflow)	ভূগর্ভ	ভূগর্ভ থেকে ভূগর্ভস্থ নদী উপত্যকা	জলের স্থানান্তর প্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণাত্মক, ভূগর্ভের পরিপ্রেক্ষিতে ধনাত্মক
ভূপৃষ্ঠের গভীরে ভৌমজলের প্রবাহ (Deep ground water flow)	ভূগর্ভ	ভূগর্ভ থেকে সমুদ্র বা সাগরে জলবিনিময়	জলের স্থানান্তর প্রক্রিয়া, ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক ও ভূগর্ভের ক্ষেত্রে ধনাত্মক।

এখানে উল্লেখ্য যে জলচক্র নিয়ন্ত্রণকারী কারণ ও উপাদান সমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলচক্রেরও পরিবর্তন হয়। নিম্নলিখিত প্রবাহ চিত্রে জলচক্র পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দেখানো হল।

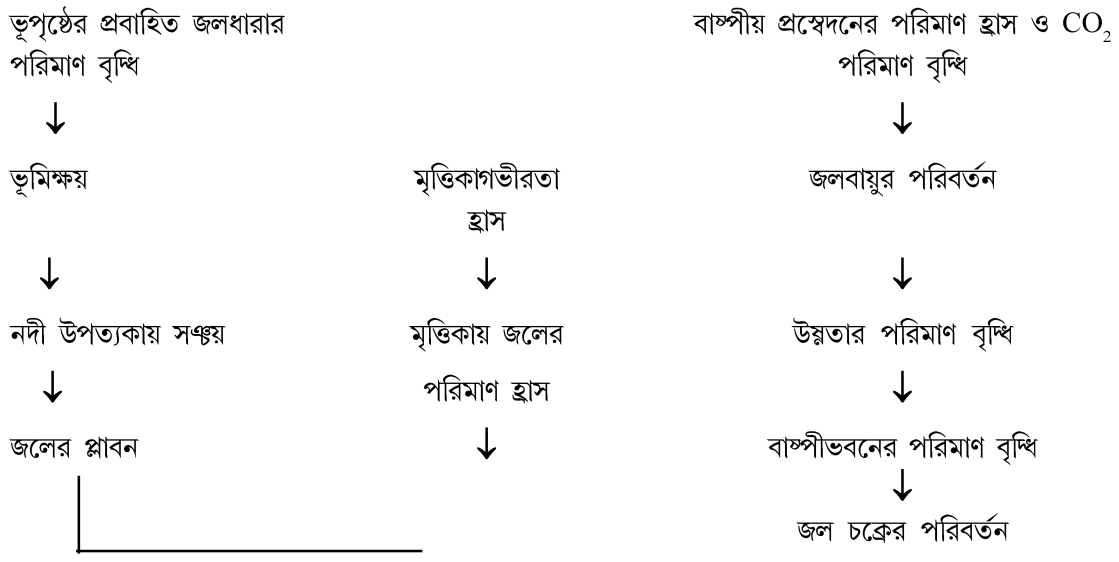

9.3 ভূতল প্রবাহ (Run-off)

9.3.1 ভূতল প্রবাহ ঃ জলতত্ত্বের একটি অন্যতম উপাদান (Runoff as an element of hydrology)

বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রকার অধোক্ষেপনের জল যখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে জলধারার আকারে প্রবাহিত হয়, তাকে ভূতল প্রবাহ বা ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা (run-off) বলে। এই প্রকার জলপ্রবাহ জলতত্ত্বের একটি অন্যতম উপাদান। সাধারণতঃ এই প্রকার জলধারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের ঢাল বরাবর প্রবাহিত হয় এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নালা থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ নদ-নদীর আকারে এই জলধারা প্রবাহিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে স্থলভাগের উপরে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য অধঃক্ষেপনের জল যখন পতিত হয়, তখন তার কিছু অংশ মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করে এবং কিছু অংশ বাষ্পীভবন (evapovation) ও প্রস্বেদন (transpiration)-এর মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। অবশিষ্ট জল ভূপৃষ্ঠে ঢাল বরাবর প্রবাহিত হয়। তাই এই প্রকার জলধারাকে অবশিষ্ট জলপ্রবাহ (residual water flow) হিসাবেও অভিহিত করা হয়।

9.3.1.1 বৃষ্টিপাত ও ভূতল প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য (The difference between rainfall and runoff)

বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রকার অধঃক্ষেপনের ফল স্বরূপ ভূপৃষ্ঠে প্রবাহ দেখা যায়। তবে বৃষ্টিপাত এবং তার পরিমাণ স্থান ও কাল অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় ; কিন্তু ভূপৃষ্ঠে প্রবাহ বা ভূতল প্রবাহ এক প্রকার নিয়মিত প্রবাহরূপে দেখা যায়।

9.3.2 ভূতল প্রবাহের গুরুত্ব (Importance of run-off)

জলতত্ত্বে ও প্রাকৃতিক ভূগোল, বিশেষতঃ নদীবিজ্ঞানে ভূতল প্রবাহের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

প্রথমতঃ ভূতল বা ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ স্থলভাগে মোট জলের পরিমাণকে নির্দেশ করে। তাই জলসম্পদের বৈজ্ঞানিক সদ্ব্যবহার ও যথাযথ পরিকল্পনার জন্য ভূতল প্রবাহ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ ভূতল প্রবাহের ফলে রিল প্রবাহ (Rill flow), স্তর প্রবাহ (sheet flow), গালী প্রবাহ (Guly flow), নদীপ্রবাহ (stream flow) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। তাই এই সকল প্রবাহের উৎপত্তি ও আচরণ বিশ্লেষণ করার জন্য ভূ পৃষ্ঠ প্রবাহ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণার বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহের ফলে 'ইনটার ফ্লো' (Interflow), ইনফিলট্রেশান (infiltration), সীপেজ (seepage) মৃত্তিকা জল (soil-moisture), ভৌমজল ও ভৌমজল প্রবাহ (Ground water and Ground water flow) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এছাড়া ভূতল প্রবাহের তারতম্য অনুযায়ী এই সকল জলপ্রবাহের পরিবর্তন ও তারতম্য ঘটে।

9.3.3 বিভিন্ন প্রকার ভূতল প্রবাহ (Different types of run-off)

সাধারণভাবে বৃষ্টিপাত ও অধোঃক্ষেপনের ফলে যে জলধারার প্রবাহ হয়, তাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

9.3.3.1 ভূ-পৃষ্ঠ জলধারা প্রবাহ (surface run-off)

যখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে জলধারার প্রবাহ হয়, তাকে ভূ-পৃষ্ঠ জলধারা প্রবাহ বলে। 'ওভারল্যান্ড ফ্লো' ও নদীপ্রবাহ এর ফলে সৃষ্টি হয়।

9.3.3.2 ভৌমজলধারার প্রবাহ (sub-surface run-off)

যখন ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল মৃত্তিকা স্তর ভেদ করে ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করে এবং ভৌমজলতলের (water table) ঢাল অনুযায়ী যখন প্রবাহিত হয়, তখন তাকে ভৌমজলধারার প্রবাহ বলে। চুনাপাথর বা 'কার্স্ট' অঞ্চলে

ভূমিরূপ উদ্ভবের ক্ষেত্রে এই প্রকার ভৌম জলধারার প্রবাহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এছাড়া এই ভৌমজল প্রবাহ অনেক ক্ষেত্রে প্রভেদ্য স্তরের মাধ্যমে নদী উপত্যকায় প্রবেশ করে।

জলধারা প্রবাহের উপরিউক্ত দুটি শ্রেণীবিভাগ করা হলেও ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন জলধারক অঞ্চল বা 'ক্যাচমেন্ট' অঞ্চলে (catchment area) প্রবাহিত জলধারার পাঁচটি অংশ লক্ষ্য করা যায়।

9.3.3.3 প্রত্যক্ষ অধঃক্ষেপন (Direct Precipitation)

অধঃক্ষেপন যখন সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অপ্রতিহত অবস্থায় পতিত হয়, তখন তাকে প্রত্যক্ষ অধঃক্ষেপন বলে। বলা যেতে পারে এই প্রত্যক্ষ অধঃক্ষেপনের একটা বড় অংশ প্রবাহিত জলধারার আকার নেয়।

9.3.3.4 ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা (surface run-off)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে জলের প্রবাহকে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা বলে এদের মধ্যে স্তরপ্রবাহ (sheet flow) এবং খাত-প্রবাহ (channel flow) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টিপাত ও অধঃক্ষেপনের জল যখন নির্দিষ্ট গতিপথ ও গতি ছাড়াই ঢাল অনুযায়ী প্রভাবিত হয়, তখন তাকে স্তর প্রবাহ বলে। পক্ষান্তরে যখন প্রবাহিত জলধারা ভূপৃষ্ঠের উপর নির্দিষ্ট গতিপথ ও খাত অনুযায়ী প্রবাহিত হয়, তখন তাকে খাত-প্রবাহ বলে। নিম্নলিখিত সারণীতে স্তর প্রবাহ ও খাত প্রবাহের পার্থক্য দেখানো হল ঃ

স্তর প্রবাহ ও খাত প্রবাহের পার্থক্য ঃ (The difference between sheet flow and channel flow)

স্তর প্রবাহ	খাত প্রবাহ
1. স্তরে স্তরে জল প্রবাহ	নির্দিষ্ট ঢাল অনুযায়ী খাত বরাবর প্রবাহ
2. প্রবাহের নির্দিষ্ট গতিপথ ও খাত থাকে না	প্রবাহের নির্দিষ্ট গতিপথ ও খাত থাকে
3. অপেক্ষাকৃত অনিয়মিত	অপেক্ষাকৃত নিয়মিত
4. শুষ্ক ও প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।	আর্দ্র নদী প্রধান অঞ্চলে বিশেষভাবে দেখা যায়।

অনেক সময় ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার বিকল্প প্রতিশব্দ হিসাবে 'ওভারল্যান্ড ফ্লো' ব্যবহৃত ফলও জলত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বারিবিন্দু পতনের সময় থেকে নদীখাতে জলের অনুপ্রবেশের আগে পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা যে স্তর প্রবাহের সৃষ্টি করে, 'ওভারল্যান্ড ফ্লো' (Overland flow) বলে। জল বিশারদ লিন্সলে (LINSLAY) উল্লেখ করেন যে 'ওভারল্যান্ড ফ্লো' যত বেশী হবে, ততই বেশী এবং দ্রুত নদীখাতের প্রবাহ হবে।

9.3.3.5 'ইনটার ফ্লো' বা অন্তর্প্রবাহ (Interflow)

অনেক সময় বৃষ্টিপাত বা ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার একটি অংশ মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে ভূ-অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রবেশ্য শিলাস্তর মৃত্তিকাস্তরের নীচে অবস্থান করলে ভৌমজলের একপ্রকার পার্শ্বপ্রবাহ হয়। এই প্রবাহকে 'ইনটার ফ্লো' বা অন্তর্প্রবাহ (Inter flow) বলে। অনেকে এই প্রকার ইন্টারফ্লোকে স্টর্ম সিপেজ (storm seepage), মাধ্যমিক তলদেশীয় প্রবাহ (secondary baseflow) ভৌমঝঞ্ঝা প্রবাহ (sub-surface storm flow) নামেও অভিহিত করেছেন। নিম্নলিখিত সারণীতে ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহ ও ইন্টারফ্লো বা অন্তর্প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হল।

অন্তর্প্রবাহ ও ভূ-পৃষ্ঠ জলধারার প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য (Difference between interflow and surface run-off)

ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহ	অর্ন্তপ্রবাহ
1. ভূ-পৃষ্ঠের উপরে প্রবাহিত হয়।	মৃত্তিকা স্তরের নীচে ভৌমজলতলের ঢাল অনুযায়ী প্রবাহিত হয়।
2. ভূ-প্রাকৃতিক জলবিভাজিকা (topographic divide) এই প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে।	'ফ্রিয়ে স্টিক' জলবিভাজিকা (Phreatic divide) এই প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে।
3. জলপ্রবাহের গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত।	জলপ্রবাহের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর।

9.3.3.6 ভৌমজলপ্রবাহ বা 'এফ্লুয়েন্ট সিপেজ' (Ground water run-off or effluent seepage)

অনেক সময় ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং ভৌমজলতলের ঢাল বরাবর অগ্রসর বা প্রবাহিত হয়। এই প্রকার প্রবাহকে ভৌম জলপ্রবাহ বা 'এফ্লুয়েন্ট সিপেজ' (effluent seepage) বলে। এফ্লুয়েন্ট সিপেজ প্রবেশ্য শিলাস্তরের মাধ্যমে পুনরায় নদী উপত্যকায় অনুপ্রবেশ করলে তাকে তলদেশীয় প্রবাহ (base flow) বলে। সাধারণতঃ শুষ্ক ঋতুতে নিত্যবহ নদীগুলি এই প্রকার তলদেশীয় প্রবাহ দ্বারা পুষ্ট হয়। তাই এই ভৌমজলপ্রবাহ মোট প্রবাহিত জলধারার একটি অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে বিবেচিত হয়।

9.3.3.7 তুষার ও বরফগলা জল (snow melt)

পরিশেষে, উচ্চ পার্বত্য বা শীতল জলবায়ু প্রধান অঞ্চলে নদী মূলতঃ তুষার বা বরফগলা জলে পুষ্ট হয় এবং এই বরফগলা জল ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারার একটি অন্যতম বলে বা অংশ রূপে পরিগণিত হয়।

নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত বা অধোক্ষেপন শুরু হওয়ার পর থেকে এবং শেষ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারার বিভিন্ন অংশকে (Component) দেখানো হল।

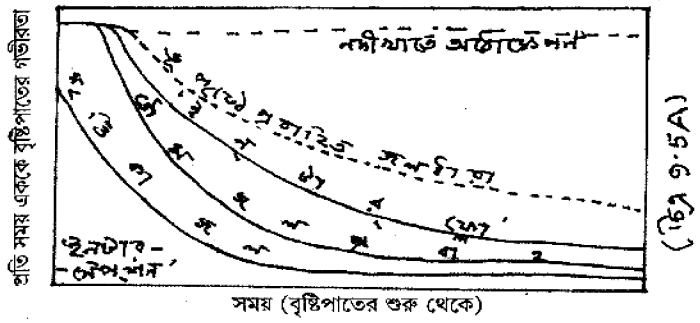

একটি আদর্শ জলধারক অঞ্চলে অধোক্ষেপণ-জলের বিভিন্ন অংশ বন্টন ও প্রবাহ [LINSLAY অনুযায়ী]

9.4 ভূতল প্রবাহের নিয়ন্ত্রকসমূহ (Factors affecting run-off)

বৃষ্টিপাত, বরফগলা জল বা ভূগর্ভ থেকে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারাকে run-off বা ভূতল প্রবাহ বলে। এই

জলপ্রবাহ জলতত্ত্বের একটি অন্যতম উপাদান এবং ঢাল অনুযায়ী প্রবাহিত এই জলধারা পরবর্তীকালে যখন নির্দিষ্ট খাত অনুযায়ী প্রবাহিত হয়, তখন তাকে নদী বলে।

জলতত্ত্বে প্রবাহিত জলরাশিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ (ক) ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত জলরাশি (sub-surface-run-off) এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত জলরাশি (sub-surface-run-off)। অতএব কোন স্থানের বা কোন নদী অববাহিকার সমগ্র জলরাশি এই দুই প্রকার জলরাশির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

ভূতল প্রবাহের গুরুত্ব (Importance of run-off)

ভূতল প্রবাহের কয়েকটি বিশেষ গুরুত্ব আছে।

প্রথমতঃ—নদীর আচরণ, নদীখাতের আকৃতি, নদীবিন্যাস প্রভৃতি এই জলধারার স্থান ও কাল অনুযায়ী বন্টনের উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়তঃ—কোন নির্দিষ্ট নদী অববাহিকায় জলচক্রের বিভিন্ন পর্যায় এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

তৃতীয়তঃ—নদী অববাহিকায় জলের ভারসাম্য বা জলের সমতা প্রবাহিত জলধারার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

চতুর্থতঃ—নদী অববাহিকার ভূমি-ব্যবহার, বিভিন্ন প্রকার জলপ্রবাহজনিত সমস্যাগুলি ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অতএব নদী অববাহিকার সুনির্দিষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভূতল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী কারণ ঃ—ভূতল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—

(1) জলবায়ু সম্বন্ধীয় (climate factors)

(2) প্রাকৃতিক (Physical factors)

(3) নদী অববাহিকার বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of drainage basin)

(4) অন্যান্য কারণ (other factors)।

9.4.1 জলবায়ু সম্বন্ধীয় কারণ (Climate factors)

ভূতল প্রবাহের তারতম্য, দৈশিক বন্টন (spatial distribution), নদী জলতলের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি জলবায়ুর বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

বৃষ্টিপাতের ধরণ একটি অন্যতম জলবায়ু সম্বন্ধীয় ভূতল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী কারণ পার্বত্য বা শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, পরিচলন বৃষ্টি, ঘূর্ণবাতজনিত বৃষ্টি প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠ প্রবাহিত জলধারাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এছাড়া ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার বিভিন্ন পর্যায়গুলি বৃষ্টিপাতের বন্টন, ঋতুগত তারতম্য এবং অধঃক্ষেপনের প্রকারের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

বৃষ্টিপাতের প্রাবল্য ভূপৃষ্ঠ ও ভৌমজলপ্রবাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দেখা যায় কোন অঞ্চলে অধিক সময়ে বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি infiltration বা ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভে উল্লম্ব প্রবাহ এবং সামগ্রিকভাবে ভৌমজলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে। পক্ষান্তরে স্বল্পপরিসরে অধিক বৃষ্টিপাত ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারাকে ত্বরান্বিত করে এবং নদীর জলতলকে দ্রুত বৃদ্ধি করে। এছাড়া স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যে সীমিত অধিক বৃষ্টিপাত নদী উপত্যকায় জলস্ফীতি ও বন্যা ত্বরান্বিত করে।

ঘূর্ণবাত বা নিম্নচাপকেন্দ্রের পথ পরিক্রমা এবং তার ফলে সৃষ্ট বৃষ্টিপাত ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার পরিমাণকে নির্ধারিত করে। উদাহরণস্বরূপ বঙ্গোপসাগরে কেন্দ্রীভূত বিভিন্ন প্রকার নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণীঝড় ও বৃষ্টি মৌসুমী ঋতুতে ভূতল প্রবাহের পরিমাণকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে এবং এই অঞ্চলের সন্নিকটে বিভিন্ন নদীতে জলস্ফীতি ও বন্যা দেখা যায়।

পূর্ববর্তী অধঃক্ষেপন (Antecedent precipitaion) নদী অববাহিকায় মৃত্তিকার আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে এবং জল শোষণের মাধ্যমে ভৌম জলতল দ্রুত উপরে উঠে আসে। এর ফলেও পরোক্ষভাবে নদী উপত্যকায় জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

জলবায়ু সম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা, বাষ্পীভবন, বাষ্পীয় প্রস্বেদন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(1) প্রাকৃতিক কারণসমূহ ঃ ভূপ্রাকৃতিক ঢাল, শিলাস্তরের গঠন-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্রকার ভূমির ব্যবহার, ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার অন্যতম প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণকারী কারণ।

ভূমিরূপ এবং কৃত্রিম ঢালের পরিমাণ ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ বেশি খাড়াই ঢালে জলধারার দ্রুত প্রবাহ ও মৃদু বা সুষম বা সমতল ঢালে জলধারার ধীরপ্রবাহ দেখা যায়। আবার, খাড়াই ঢাল অঞ্চলে অধিশোষণের (percolation) পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় ভূপৃষ্ঠ প্রবাহিত জলধারার পরিমাণ ভৌম জলপ্রবাহের চেয়ে বেশি হয়। পক্ষান্তরে স্বল্পঢাল অঞ্চলে মন্থর প্রবাহ অধিশোষণের অনুকূল হওয়ায় ভৌমজলপ্রবাহ ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ অপেক্ষা বেশি হয়।

ঢালের পরিমাণ এবং দিক উভয়েই জলপ্রবাহের পরিমাণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে সৌরকিরণের পরিপ্রেক্ষিতে ঢালের অবস্থান বরফগলা জলের পরিমাণকে নির্ধারিত করে।

বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ এবং জলধারার প্রবাহিত পথে তাদের অবস্থান জলধারাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ হিমবাহ অধ্যুষিত এলাকায় তুষারপাত এবং বরফগলা জলের পরিমাণ আর্দ্র নদী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বাভাবিক জল প্রবাহের পরিমাণ, মরুঅঞ্চলে অধিক বালুকাপূর্ণ মৃত্তিকায় ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার দ্রুত অধিঃশোষণ, চুনাপাথর বা কার্স্ট অঞ্চলে ছিদ্রপথ বা প্রবেশ্য পথের মাধ্যমে জলের দ্রুত প্রবেশ এবং দ্রবণ জলধারার পরিমাণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি, দারণ, চ্যুতি বা অন্যান্য প্রবেশ্য পথের উপস্থিতি, প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের অবস্থান, ভূগর্ভে, অ্যাকুইফার স্তরের উপস্থিতি প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভ জলপ্রবাহকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে উন্মুক্ত ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি, পক্ষান্তরে দারণ ও চ্যুতির অবস্থান অথবা প্রবেশ্য শিলার মাধ্যমে অধিশোষণ প্রভৃতি ভৌমজলধারার পরিমাণকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

মৃত্তিকার প্রকার, রাসায়নিক গঠন, বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী মৃত্তিকার মাধ্যমে জলের অধিশোষণ এবং ধৌত প্রক্রিয়া ও কৌশিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলের সঞ্চারণ জলধারার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নদী অববাহিকায় স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকার ও ঘনত্ব বাষ্পীয় প্রস্বেদনের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে এছাড়া দীর্ঘ প্রসারিত শিকড়ের মাধ্যমে ভৌমজলস্তর থেকে একপ্রকার কৌশিক জলপ্রবাহ জলধারার পরিমাণকে বৃদ্ধি করে।

উপরিউক্ত প্রাকৃতিক কারণগুলি ছাড়া ভূমির ব্যবহার জলধারার প্রবাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ অব্যবহৃত, অকৃষিযোগ্য বা পতিত জমিতে জলধারার প্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। আবার কৃষিযোগ্য ভূমিতে জলের অধিশোষণের ফলে জলপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত কম হয়। এছাড়া ভূমি ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে অপেক্ষাকৃত অবনমিত অঞ্চলে জলধারা সঞ্চিত অবস্থায় থাকে এবং নদীর জলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়।

9.4.3 নদী অববাহিকার বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of drainage basin)

ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার যখন কোন নির্দিষ্ট নদী অববাহিকায় প্রবেশ করে, তখন ঐ অববাহিকার বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য, জলধারার বিভিন্ন দৈশিক বন্টনকে প্রভাবিত করে। নদী অববাহিকার কারণগুলির মধ্যে (a) নদীবিন্যাস, (b) নদীখাতের প্রণালী, (c) আড়াআড়ি জ্যামিতিক প্রস্থচ্ছেদে নদীর জলধারণ ক্ষমতা, (d) বিভিন্ন প্রকার

উপনদী ও শাখানদীর মাধ্যমে নদী অববাহিকায় জলের বন্টন, (e) নদী ঘনত্ব ও নদী বুনন, (f) নদী উপত্যকার গঠনগত আকৃতি, (g) নদী অববাহিকার আয়তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

9.4.4 অন্যান্য কারণ

ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের মধ্যে মানুষের অনুপ্রবেশ অন্যতম। অধিক বৃক্ষচ্ছেদন, ভূমিক্ষয় প্রভৃতির মাধ্যমে ভূমিব্যবহার প্রভাবিত হয়। এর ফলেও পরোক্ষভাবে প্রবাহিত জলধারার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি বিশেষতঃ ভূমিধ্বস, ভূ আন্দোলন, ভূমিকম্প প্রভৃতি আঞ্চলিকভাবে জলধারার পরিমাণকে প্রভাবিত করে। জনবসতির বিস্তার, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ বা বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বিশেষতঃ জলাধার (reservoir) বা ব্যরেজ প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে জলধারা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়।

9.5 ভূতল প্রবাহ চক্র (run-off cycle)

ভূতল প্রবাহ বা ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা বিভিন্ন পর্যায়ে চক্রাকারে কোন অঞ্চলে বা নদী অববাহিকায় কাজ করে। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকার অধঃক্ষেপন (precipitation) ও ভৌমজলতল থেকে তলদেশীয় প্রবাহের (Baseflow) মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে জলধারার প্রবাহ হয়। প্রখ্যাত জলতত্ত্ব বিশারদ উইলিয়াম হইট (William Hoyt) এই প্রবাহের বিভিন্ন পর্যায়কে একটি চক্রের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। একে ভূতল প্রবাহ চক্র বা ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার চক্র (run-off cycle) বলে।

সম্পূর্ণভাবে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার চক্রকে বিশ্লেষণ করার জন্য Hoyt নিম্নলিখিত কয়েকটি আদর্শ অবস্থার উল্লেখ করেছেন ঃ

(a) এই চক্রের প্রারম্ভিক পর্যায় শুষ্ক বা বৃষ্টিহীন থাকার প্রয়োজন।

(b) ভূপ্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্চলটি আদর্শগতভাবে একটি নদী অববাহিকার অঞ্চলরূপে থাকা প্রয়োজন এবং আড়াআড়িভাবে ভূ-প্রাকৃতিক প্রস্থচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার ঢালে উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন।

(c) অঞ্চলটির কোন কোন অংশে উদ্ভিদের বা বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের অবস্থান বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, বিভিন্ন পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার বৃক্ষাদির মাধ্যমে জলশোষণ বাষ্পীয় প্রস্বেদনের তারতম্য চক্রটিকে আদর্শগতভাবে কাজ করতে সহায়তা করে।

(d) মৃত্তিকাস্তর এবং তার নীচে আদি সামগ্রী (parent material) এবং আদিশিলার (bed rock) মাধ্যমে জলের ইনফিলট্রেসন (infiltration) এই চক্রের বিভিন্ন পর্যায়কে প্রভাবিত করে।

(e) সমগ্র অঞ্চলটির নীচে সুনির্দিষ্টভাবে একটি ভৌমজলতল থাকা বিশেষ প্রয়োজন। যার মাধ্যমে প্রবাহিত জলধারা একটি প্রণালী থেকে অপর প্রণালীতে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

হইট আরও উল্লেখ করেছেন যে উপরিউক্ত আদর্শ অবস্থাগুলি বিরাজ করলে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার চক্রটির নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায় (phase) বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম পর্যায় ঃ তত্ত্বগতভাবে প্রথম পর্যায়টি শুষ্ক বা বৃষ্টিহীন পর্যায়রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই সময় ভূপৃষ্ঠে অধিকাংশ স্থান এবং নদীখাত থেকে জলের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ভূপ্রাকৃতিক অবনমিত অংশে ও নদীখাতে জলধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার পরিমাণ সামান্য হয় বলে ভৌমজলতল থেকে মূলতঃ নদী এবং অবনমিত স্থানগুলি জল অধিগ্রহণ করে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলের অধিগ্রহণ হয়, তাকে

তলদেশীয় প্রবাহ বলে। এর ফলে ভৌমজল স্তর ক্রমশঃ নীচের দিকে নামতে থাকে এবং ভৌমজলতলের জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বৃষ্টিহীন পর্যায় ভূপৃষ্ঠে বাষ্পীভবন এবং বাষ্পীয় প্রস্বেদন, মৃত্তিকা—বাষ্পীভবন প্রভৃতি দ্রুতহারে কাজ করে, এর ফলে মৃত্তিকা স্তর এবং গাছপালার জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত কাজ করলে শুষ্ক বা 'খরা' পর্যায়ের সৃষ্টি হয়।

ভূতল প্রবাহ চক্রের প্রথম পর্যায় শুষ্ক অবস্থা

[সূচক : E = বাষ্পীভবন ; T = প্রস্বেদন ; B = তলদেশীয় প্রবাহ বা বেস ফ্লো]

(চিত্র নং. 9.6)

উপরে দেওয়া চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে সে এই পর্যায়ে বাষ্পীভবন, বাষ্পীয় প্রস্বেদন এবং মৃত্তিকা বাষ্পীভবন দ্রুত কাজ করে এবং ভৌমজলতল x থেকে x_1 এ নেমে আসে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ—বৃষ্টির শুরু এই পর্যায়কে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করে। এই সময় অধিকাংশ নদী উপত্যকা বা অবনমিত অংশে জলধারণ ক্ষমতা অধিক হওয়ায় এদের জলতল সামান্যভাবে বর্ধিত হয়। মৃত্তিকা স্তর, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঢালে অধিক পরিমাণ জলশোষণ হওয়ায় এই প্রারম্ভিক বৃষ্টিপাতের সামান্য পরিমাণই প্রবাহিত জলধারারূপে নদীখাতে প্রবেশ করে। এছাড়া ভৌম জলতলের বাতায়ন স্তরেও (zone of aeration) অধিক পরিমাণ অধিশোষণ হয়। সামান্য পরিমাণ ভৌমজল ভৌমজলস্তরে সংযোজিত হয়।

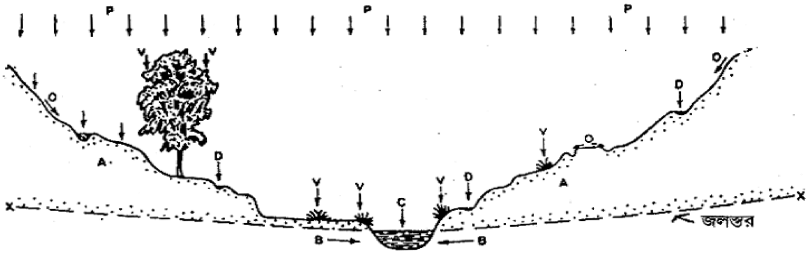

জলপ্রবাহ চক্রের দ্বিতীয় পর্যায় : বৃষ্টিপাতের শুরু বা বর্ষা শুরু

[**সূচক** : P = অধঃক্ষেপন ; C = নদীখাতের মধ্যে প্রবাহিত জল ; O = ওভারল্যাণ্ড প্রবাহ ;
B = তলদেশীয় প্রবাহ বা বেস ফ্লো ; D = হ্রদ বা জলাশয়ে আবদ্ধ জল]

(চিত্র নং. 9.7)

উপরে দেওয়া চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির শুরুতে গাছপালা মৃত্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে জল দ্রুত শোষিত হয়। সামান্য পরিমাণ জল Overland প্রবাহের মাধ্যমে উপত্যকায় প্রবেশ করে। সামান্য পরিমাণ জল ভৌম জলস্তরে প্রবেশ করে।

তৃতীয় পর্যায় ঃ—Hoyt এই পর্যায়কে প্রধান এবং ধারাবাহিক বৃষ্টির পর্যায়রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়ে উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকার মাধ্যমে জল শোষণের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। অবনমিত স্থানগুলি ক্রমশঃ ভরাট হয়। নদী উপত্যকায় জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকার বাতাস্থয়ন স্তরে জলধারণ ক্ষমতা প্রায় হ্রাস পায় এবং ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা প্রবাহ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ভৌমজলতলে উর্ধ্বগামী হওয়ায় নদী উপত্যকার প্রবেশ্য শিলাস্তরের মাধ্যমে তলদেশীয় প্রবাহ নদীর জলতলকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

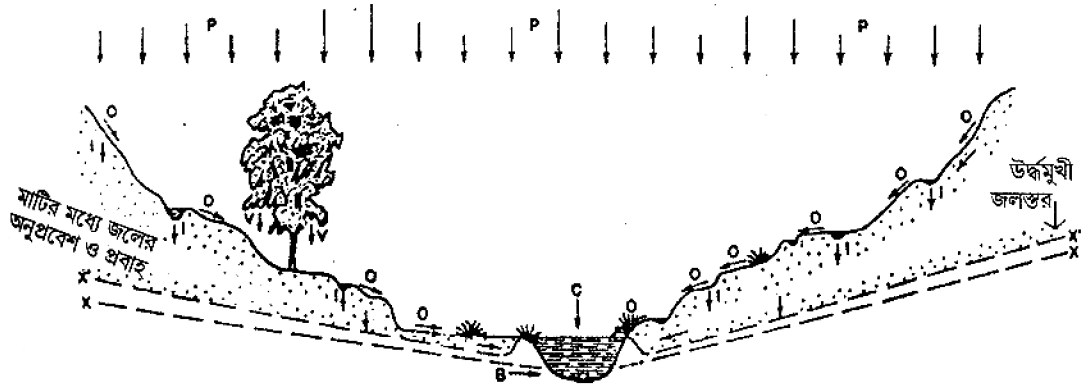

ভূতল প্রবাহের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় : ধারাবাহিক বৃষ্টিপাত

(চিত্র নং. 9.8)

উপরিউক্ত চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে নদী উপত্যকা ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা এবং তলদেশীয় প্রবাহের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে ভরাট হয়। ভৌমজলস্তরের দ্রুত উর্ধ্বগমন হয়। অবনমিত স্থানগুলি সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয় এবং বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে হ্রাস পায়। জলতত্ত্ববিশারদগণ এই পর্যায়কে বন্যা ও জলস্ফীতির প্রাথমিক পর্যায়রূপে চিহ্নিত করে থাকে। এছাড়া infiltration-এর পরিমাণ এবং ভৌমজলের অনুপ্রবেশের পরিমাণ এই পর্যায়ে সমান থাকে।

চতুর্থ পর্যায় ঃ—এই পর্যায়ে বৃষ্টিপাতের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হয়। এই সময় বিভিন্ন প্রকার ভূ-প্রাকৃতিক জলধারগুলি সম্পূর্ণভাবে ভরাট হওয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত জলস্ফীতির সৃষ্টি করে। নদী উপত্যকায় পাড়ের সর্বোচ্চ তল বরাবর জলের অবস্থানের ফলে (bankful discharge) অধিকাংশ নদীতে বন্যা দেখা দেয়। ভৌমজলস্তরও ক্রমাগত উর্ধ্বগামী হওয়ায় নদী উপত্যকায় তলদেশীয় জলপ্রবাহের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। তবে এই পর্যায়ের শেষভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ কম হওয়ায় এবং আপেক্ষিকভাবে বাষ্পীভবন এবং বাষ্পীয় প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভৌমজলস্তর ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে।

পঞ্চম পর্যায় ঃ—Hoyt এই পর্যায়কে পুনরায় শুষ্ক বৃষ্টিহীন পর্যায়রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই সময় নদীর জলতল ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। ভৌমজলস্তর থেকে তলদেশীয় প্রবাহের মাধ্যমে ভৌমজলতলও নীচে নামতে থাকে। পক্ষান্তরে সৌরতাপের ফলে বাষ্পীভবন, বাষ্পীয় প্রস্বেদন, মৃত্তিকার বাষ্পীভবনের পরিমাণ অধিক হওয়ায় স্বাভাবিক

ও মৃত্রিকা মৃত্তিকাস্তর, বাতাধ্বয়নস্তর, উদ্ভিদ এবং নদীর জলধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে এই পর্যায়টি চক্রাকারে প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থা ফিরিয়ে আনে।

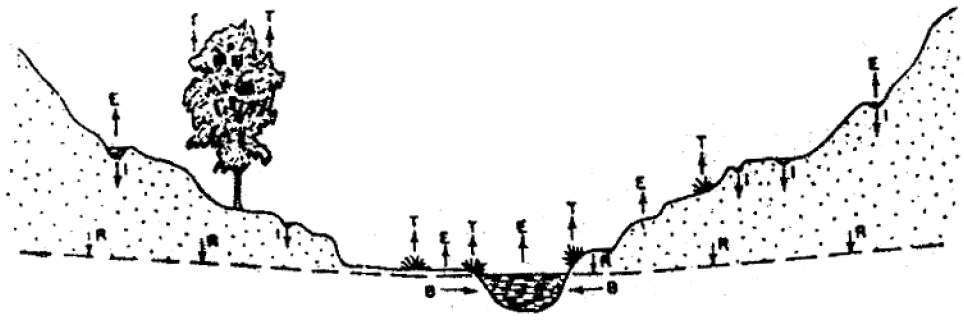

ভূতল জলপ্রবাহ চক্রের পঞ্চম বা অন্তিম পর্যায় : বর্ষার শেষ

(চিত্র নং. 9.9)

উপরিউক্ত চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক জলধার নদী উপত্যকা, মৃত্তিকাস্তর এবং উদ্ভিদ স্তরে জলধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ভৌম জলস্তর ক্রমশঃ নিম্নগামী হওয়ায় তলদেশীয় প্রবাহের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হয় এবং সামগ্রিকভাবে শুষ্ক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

উপসংহার ঃ—উপরিউক্ত ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার চক্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চিত জলের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়ের শেষে বা চতুর্থ পর্যায়ের প্রারম্ভে নদী অববাহিকায় জলস্ফীতি ও বন্যা দেখা যায়। Hoyt আরও উল্লেখ করেছেন যে এই চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আনুভূমিক এবং উল্লম্ব জলপ্রবাহ ভূপৃষ্ঠ প্রবাহিত জলধারার চক্রের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। এছাড়া Hoyt তাঁর প্রবাহিত জলধারা চক্রে আদর্শ জলবায়ু হিসাবে সুস্পষ্ট রূপে চিহ্নিত শুষ্ক এবং আর্দ্র ঋতুযুক্ত জলবায়ুকেই চিহ্নিত করেছেন।

ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা চক্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই জলারা চক্রের সঙ্গে পৃথিবীর জলচক্র বা উদক-চক্রের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। যে কোন নদী অববাহিকার ক্ষেত্রে এইপ্রকার চক্র জলবাজেটের পরিমাণকেও নির্ধারণ করে তাই জলসম্পদের যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং তাদের রূপায়ণের ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা চক্রের বিশদ্ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

9.6 সারাংশ

জলচক্র ও ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারা জলতত্ত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন স্থান এককের মাধ্যমে জলের যে স্থানান্তর ও রূপান্তর, তাকেই জলচক্র বলে। এই জলচক্রের তিনটি প্রধান পর্যায় আছে—(ক) বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন, (খ) অধোক্ষেপন এবং (গ) ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভে প্রবাহিত জলধারা। তবে মূলচক্রের কয়েকটি উপচক্র (sub-cycle) কাজ করে এবং এর ফলে বিভিন্ন স্থান ও দৈশিক একক ও স্থানান্তর এককের মধ্যে জলের পরিমাণ ও অবস্থার তারতম্য ঘটে।

অধোক্ষেপনের পর ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভ ঢাল অনুযায়ী জলের যে প্রবাহ তাকে জলধারা প্রবাহ বা 'রান্-অফ্' (run-

off) বলে। বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুগত কারণ, প্রাকৃতিক কারণ, নদী অববাহিকার বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য কারণ (মানবিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত) প্রবাহিত জলধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

জলধারা প্রবাহের বিভিন্ন পর্যায়গুলি চক্রকারে দেখা যায়। জলতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রবাহিত জলধারা চক্রের পাঁচটি পর্যায় উল্লেখ করেন ঃ (a) শুষ্ক বৃষ্টিপাতহীন পর্যায়, (b) প্রারম্ভিক বৃষ্টি পর্যায়, (c) ক্রমাগত বৃষ্টিপাত পর্যায়, (d) ক্রমহ্রাসমান বৃষ্টি পর্যায় এবং (e) বৃষ্টির সমাপ্তি পর্যায়।

উপরিউক্ত জলচক্র ও জলপ্রবাহের চক্র যথাযথভাবে অবহিত হওয়া দরকার কারণ যেকোন দৈশিক এককের জলসম্পদ পরিকল্পনা ও পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য এই দুইটি বিষয়ের জ্ঞান ও ধারণা বিশেষ প্রয়োজন।

9.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. বিষয়মুখী রচনাধর্মী প্রশ্ন (600 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে) প্রতিটি প্রশ্নের মান—10

(1) জলচক্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(2) চিত্র সহযোগে জলচক্রের বিবরণ দিন।

(3) জলচক্রে যে সকল উপচক্র দেখা যায়, তাদের বিশ্লেষণ করুন।

(4) ভূতল প্রবাহ (run-off) যে সকল কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের ব্যাখ্যা করুন।

(5) ভূতল প্রবাহ চক্র বা প্রবাহিত জলধারা চক্রে বিভিন্ন পর্যায় চিত্র সহযোগে বর্ণনা করুন।

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (150 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে) প্রতিটি প্রশ্নের মান—4

(1) নদী-অববাহিকা জলচক্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(2) ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা চক্র ও জলচক্রের পর্যায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

(3) স্তর প্রবাহ ও খাত প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

(4) ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহ ও অন্তর্প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

(5) নদী অববাহিকার বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করে ?

C. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (50 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে) প্রতিটি প্রশ্নের মান—2

(1) বিভিন্ন প্রকার জল এবং তাদের পারস্পরিক রূপান্তর প্রক্রিয়া চিত্র সহযোগে উল্লেখ করুন।

(2) বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

(3) জলধারা প্রবাহের (run-off) শ্রেণীবিভাগ করুন।

(4) নদী-অববাহিকা জলচক্রে বিভিন্ন আধার একক (storage unit) উল্লেখ করুন।

(5) নদী-অববাহিকা জলচক্রে বিভিন্ন স্থানান্তর একক (transfer unit) উল্লেখ করুন।

(6) জলচক্র কাকে বলে ?

(7) ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার সংজ্ঞা দিন।

(8) 'ওভারল্যান্ড ফ্লো' কাকে বলে ?

(9) 'সিপেজ' জল বলতে কী বোঝেন ?

(10) অধোক্ষেপনের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করুন।

9.8 উত্তরমালা

A. বিষয়মুখ রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

1. 9.1 দ্রষ্টব্য।
2. 9.2.1, 9.2.2 ও 9.2.3 দ্রষ্টব্য।
3. 9.2.4 দ্রষ্টব্য।
4. 9.4 দ্রষ্টব্য।
5. 9.5 দ্রষ্টব্য।

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. 9.2.4 দ্রষ্টব্য।
2. 9.5 দ্রষ্টব্য।
3. 9.3.3.4 দ্রষ্টব্য।
4. 9.3.3.5 দ্রষ্টব্য।
5. 9.4.3 দ্রষ্টব্য।

C. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. 9.2.2 দ্রষ্টব্য।
2. 9.2.2 দ্রষ্টব্য।
3. 9.3.3 দ্রষ্টব্য।
4. 9.2.4 দ্রষ্টব্য।
5. 9.2.4 দ্রষ্টব্য।
6. 9.2 দ্রষ্টব্য।
7. 9.3.1 দ্রষ্টব্য।
8. 9.3.3.4 দ্রষ্টব্য।
9. 9.3.3.6 দ্রষ্টব্য।
10. 9.4.1 দ্রষ্টব্য।

9.9 গ্রন্থপঞ্জী

1. Todd, D. K. Ground Water Hydrology 1959). John Wiley & Sons Inc. London.
2. Brater, W., Hydrology (1978), Wiley International.
3. Meinzer Hydrology (1975), Methuen & Co. Ltd.

একক 10 ❑ ভৌমজলের প্রকার, নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ ও ভৌমজলের পরিচলন ও প্রবাহ (Types of Groundwater, Factors, circualtion and flow)

10.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

10.2 ভৌমজলের সংজ্ঞা

10.3 ভৌমজলের গুরুত্ব

10.4 ভৌমজলের বিভিন্ন স্তর

10.4.1 মৃত্তিকা জলস্তর

10.4.2 বাতাস্বয়ন স্তর

10.4.3 মধ্যবর্তী স্তর

10.4.4 কৈশিক স্তর

10.4.5 সংপৃক্ত স্তর

10.5 ভৌমজলের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

10.5.1 ভৌমজল পরিবর্তনশীল

10.5.2 ভৌমজলবিভাজিকার প্রকৃতি

10.5.3 ভৌমজলপ্রণালীর প্রকৃতি

10.5.4 ভৌমজল বাজেট

10.5.5 ভৌমজল ও অনুছিদ্রস্থান

10.5.6 ভৌমজল ও সছিদ্রতা ও প্রবেশ্যতা

10.6 ভৌমজলের বিভিন্ন প্রকার ও উৎস

10.6.1 সহজাত বা আবদ্ধ জল

10.6.2 ম্যাগমাটিক বা উৎস্যন্দজল

10.6.3 সমুদ্রের জল

10.6.4 মিটিওরিক জল

10.7 ভৌমজল নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ

10.7.1 ভৌমজলচক্র

10.7.2 ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা

10.7.3 ভৌমজলবিভাজিকা
10.7.4 ভূ-প্রাকৃতিক ঢাল
10.7.5 মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা
10.7.6 শিলার প্রবেশ্যতা
10.7.7 অ্যাকুইফাকের অ্যাকুইটার্ড, অ্যাকুইফ্লুড
10.7.8 'ড্যাডোস' ও 'ফ্রিয়েটিক' স্তর
10.8 ভৌমজলের পরিচলন ও প্রবাহ
10.8.1 ভৌমজলের পরিচলন ও ডার্সির সূত্র
10.8.2 ভৌমজলপ্রবাহের সীমা নির্ধারণ ও রেনল্ডের সূত্র
10.8.3 ভৌমজলের গতিবেগ ও ফ্রড সংখ্যা
10.8.4 ভৌমজলের পরিচলন ও অ্যাকুইফার
10.8.5 ভৌমজলের পরিচলন ও প্রস্রবণ
10.8.5.1 প্রস্রবণের শ্রেণীবিভাগ
10.9 সারাংশ
10.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
10.11 উত্তরমালা
10.12 গ্রন্থপঞ্জী

10.1 প্রস্তাবনা

ভৌম জল হল মাটির নীচের ভূগর্ভস্থ জল। পৃথিবীর সঞ্চিত জলভান্ডারের একটা মুখ্য অংশ ভৌমজল হিসেবে পাওয়া যায়। কৃষি, শিল্প ও পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ভৌম জল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এবং মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের গতিকে সবল রাখার জন্য ভৌমজল সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে জানা দরকার।

উদ্দেশ্য—

আপনি এই এককটি পড়ে,

- ভৌমজলের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব নির্দেশ করতে পারবেন।
- ভৌমজলের বিভিন্ন স্তরের শ্রেণীভেদ করতে পারবেন।
- ভৌমজলের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- ভৌমজলের বিভিন্ন প্রকার ও উৎস সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- ভৌমজল নিয়ন্ত্রণকারী কারণ সমূহের উল্লেখ করতে পারবেন।
- ভৌমজলের পরিচলন ও প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।

10.2 ভৌমজলের সংজ্ঞা

ভৌমজল শব্দটির অর্থ ভূগর্ভস্থ জল। বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অধঃক্ষেপন (precipitation) ভূপৃষ্ঠের ঢাল অনুযায়ী প্রবাহিত হয়ে নদী, সাগর, হ্রদ, অবনমিত অংশ বা উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা স্তরে প্রবেশ করে। বিশ্বব্যাপী জলচক্রের (Global hydrological cycle) মাধ্যমে এই জল যখন মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করে, তখন এই ভূগর্ভের জলকেই ভৌমজল (Ground water) বলে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ভৌমজল সেই প্রকার ভূ-আভ্যন্তরস্থ জল যা শিলাস্তরের সচ্ছিদ্রতা ও প্রবেশ্যতা অনুযায়ী সংপৃক্ত অবস্থায় থাকে এবং অভিকর্ষজ বল অনুযায়ী প্রবাহিত হয়। মূলতঃ সংপৃক্ত স্তরেই (zone of saturation) ভৌমজল অবস্থান করে।

10.3 ভৌমজলের গুরুত্ব

প্রাকৃতিক পরিবেশে জল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয় এবং ভৌমজল পৃথিবীর সঞ্চিত জলভান্ডারের একটি মুখ্য অংশ। বস্তুতঃ এই ভৌমজলভান্ডার থেকেই পৃথিবীর সর্বাধিক পরিমাণ স্বাদু জল (fresh water) পাওয়া যায়। বর্তমানে কৃষি, শিল্প ও পানীয়জলের সবরাহের ক্ষেত্রে ভৌমজলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। জৈবজগতের ক্ষেত্রেও এর বিশেষ ভূমিকা আছে। শুষ্ক ও প্রায়শুষ্ক অঞ্চলে উদ্ভিদ শিকড়ের মাধ্যমে ভৌমজল থেকে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করে। পৃথিবীতে যে সকল নিত্যবহ নদী আছে, তাদের অধিকাংশই শুষ্ক ঋতুতে ভৌমজল থেকে জল ধারণ করে। চুনাপাথর বা কার্স্ট (karst) অঞ্চলে ভৌমজল ও তার প্রবাহ বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠন করতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ভৌমজলের দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার চুনাপাথরের গহ্বর (caves) এবং গহ্বরে সৃষ্ট স্ট্যালাক্টাইট, স্ট্যালাগমাইট, স্তম্ভ ও অন্যান্য প্রকার দ্রবণ জাতীয় ভূমিরূপের উদ্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভৌমজল ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন উৎসমুখ বা ছিদ্রপথ (rise or resurgence) এর মাধ্যমে প্রস্রবণের সৃষ্টি করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তঃসলিলা নদী পুনরায় ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়। এই প্রকার উপত্যকাকে 'পকেট্ ভ্যালী' (pocket valley) বলে। এই প্রস্রবণ বা পকেট্ভ্যালীকে কেন্দ্র করে অনেক সময় জলবসতি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্ভব হয়। সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্য সম্প্রসারণের ফলে ভৌমজলের ক্রমবর্ধমান চহিদা অনুভূত হয়। তাই জলসম্পদের বৈজ্ঞানিক সদ্ব্যবহার, সুষম বণ্টন এবং সার্বিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য ভূতত্ত্ববিদ্, পরিবেশবিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভৌমজলের পরিমাণ, গভীরতা, উৎস ও পরিচলন প্রভৃতি পরিমাপ করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে শুধু ভৌমজল বিষয়েই নয়, ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন বিষয়ে নতুন তথ্য ও তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে। এই সকল কারণে সাম্প্রতিককালে ভৌমজলবিদ্যা (Groundwater Hydrology) ভূ-বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখারূপে পরিগণিত হয় ও ভৌমজলের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

10.4 ভৌমজলের বিভিন্ন স্তর

10.4.1 মৃত্তিকা জলস্তর

ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক নীচের স্তরটি অর্থাৎ ভূগর্ভের সবচেয়ে উপরের স্তরটিকে মৃত্তিকা জলস্তর (Soilmoisture layer) বলে। এখানে কৈশিক প্রক্রিয়ায় জলের আগমন ঘটে। যখন ভৌমজলস্তর থেকে মৃত্তিকা ও শিলাস্তরের ছিদ্রপথ ও

প্রবেশ্যপথের মধ্য দিয়ে জলের উর্দ্ধগমন হয়, তখন তাকে কৈশিক প্রক্রিয়া (capillary process) বলে। মৃত্তিকায় হাইগ্রোস্কোপিক ক্ষমতা বা জলধারণ ক্ষমতা বেশী হওয়ায় মৃত্তিকা ভৌমজলস্তর থেকে কৈশিক প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে। ভৌমজলের ওঠা-নামা ও ভৌমজলতলের হ্রাসবৃদ্ধি এই স্তরে জলের শোষণ ও মৃত্তিকা জলের বাষ্পীভবন এবং এই স্তরের ভিতর দিয়ে ধৌত প্রক্রিয়ায় জলের অধৌতগমনের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকাস্তরের ভিতর দিয়ে চোয়ানো জলের ভূগর্ভে উল্লম্ব অনুপ্রবেশকে ধৌত প্রক্রিয়া (leaching) বলে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে এই মৃত্তিকাজলস্তরের মাধ্যমেই উদ্ভিদগোষ্ঠী শিকড়ের সাহায্যে ভৌমজল সংগ্রহ করে। তবে এই স্তরের মাধ্যমে ভৌমজলের পরিচলন মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতার উপরে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা (porosity) বলতে বোঝায় মৃত্তিকায় শতকরা কত ভাগ ফাঁক-ফোকর বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ কাদা মৃত্তিকায় সচ্ছিদ্রতা সর্বাধিক।

10.4.2 বাতাস্বয়ন স্তর (zone of aeration)

মৃত্তিকা জলস্তরের নীচের স্তরটিকে বাতাস্বয়ন স্তর বলে। মৃত্তিকাজলস্তর ও বাতাস্বয়ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে মৃত্তিকা জলস্তর একটি অগভীর আর্দ্রস্তর যার জল উদ্ভিদের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয় এবং বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের ফলে শোষিত হয়। পক্ষান্তরে মধ্যবর্তী বাতাস্বয়ন স্তরটি একটি গভীর স্তর যার মাধ্যমে কৈশিক জল কোনভাবেই বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রক্রিয়ায় শোষিত হতে পারে না। যখন ভৌমজলতল (Groundwater table) ভূ-পৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি বা অগভীরে থাকে। তখন বাতাস্বয়ন স্তরের গভীরতাও কম হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে। সাধারণতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের (sea level) খুব কাছাকাছি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাতাস্বয়ন স্তরের গভীরতা খুব কম হয়। পক্ষান্তরে পার্বত্য অঞ্চলে এই স্তরের গভীরতা খুব বেশী হয়।

10.4.3 মধ্যবর্তী স্তর (intermediate zone)

আলোচনার সুবিধার জন্য এই স্তরটিকে পৃথক করা হলেও মূলতঃ এই স্তরটি বাতাস্বয়ন স্তরের একটি অংশ। যেহেতু এই স্তরটি মৃত্তিকাজলস্তর এবং বাতাস্বয়ন স্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে, সেই কারণে এই স্তরটিকে মধ্যবর্তী স্তর বলা হয়। এই মধ্যবর্তী স্তরে মহাকর্ষ-জল (Gravitational water) বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক নিখিলকৃষ্ণ দে তাঁর-মৃত্তিকা ভূবিদ্যা পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, "অতিরিক্ত জল সরবরাহের ফলে মহাকর্ষ চাপ বেড়ে যায়। এর ফলে মাটিকণার জলে অধিশোষণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় ও মহাকর্ষের চাপে জল নীচের দিকে মাটির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়।" এই নিঃসৃত জলকে মহাকর্ষ জল বলে।

10.4.4 কৈশিক জলস্তর (capillary water)

উল্লম্বভাবে বাতাস্বয়ন স্তরের সবচেয়ে নীচের স্তরটিকে কৈশিক জলস্তর বলে এবং কৈশিক প্রান্তদেশ (capillary fringe) এই স্তরটিকে মধ্যবর্তী স্তর থেকে পৃথক করেছে। এই স্তরে কৈশিক প্রক্রিয়া কাজ করে। বস্তুতঃ এটি মহাকর্ষবলের ঠিক বিপরীত একটি শক্তি। কৈশিক প্রক্রিয়ায় জলের উর্দ্ধগমনের সঙ্গে কেরোসিন ল্যাম্পের তুলনা করা যেতে পারে।

কৈশিক প্রান্তদেশের জল মৃত্তিকার অনুছিদ্রস্থান (pore-space) ভরাট করে রাখে এবং এর ফলে এর প্রান্তদেশ অবিচ্ছিন্নভাবে ভৌমজলস্তরের সঙ্গে অবস্থান করে।

10.4.5 সংপৃক্ত স্তর (zone of saturation)

ভৌমজলতলের নীচে ভৌমজলের যে স্তর দেখা যায়, তাকে সংপৃক্ত স্তর বলে। এই স্তরে ভৌমজল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং এই কারণে ভৌমজলস্তরের উর্দ্ধসীমা বা ভৌমজলতল (water table) আনুভূমিক তলের সমান্তরালে অবস্থান করে। কিন্তু শিলাস্তরের ভিতর দিয়ে ভৌমজল খুব ধীরগতিতে প্রবাহিত হয় বলে বস্তুতঃ

ভৌমজলতলের একটি ঢাল থাকে। শিলাস্তরের গভীরতা অনুযায়ী এই ঢাল ভৌমজলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে, ভূ তত্ত্ববিদগণ ভৌমজলতলের ঢালকে বিভিন্ন গভীর ও অগভীর নলকূলের সাপেক্ষে পরিমাপ করে থাকেন। (চিত্র নং 10.1)

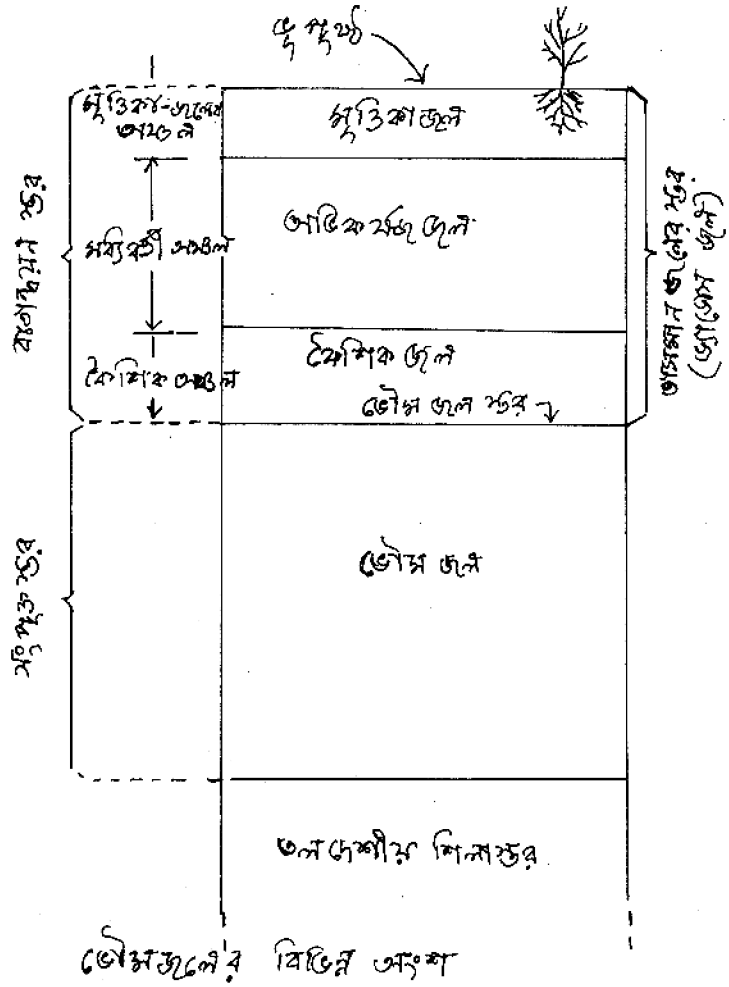

(চিত্র নং. 10.1)

10.5 ভৌমজলের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ (Characteristics and behaviour of ground water)

10.5.1

ভৌমজল পরিবর্তনশীল। এই জলতল বিভিন্ন কারণে হ্রাসবৃদ্ধি হয়। নিম্নলিখিত কারণে ভৌমজলের হ্রাস বা অবনমন ঘটে।

(a) মৃত্তিকাজলস্তরের বাষ্পীভবনের ফলে ভৌমজল শোষিত হয়।

(b) কৈশিক প্রক্রিয়ায় জলের উর্দ্ধগমন ও বিভিন্ন উদ্ভিদের মাধ্যমে তা অধিগ্রহণ ও শোষণ ;

(c) তলদেশীয় প্রবাহের (Baseflow) মাধ্যমে ভৌমজলের নদীউপত্যকায় অনুপ্রবেশ।

(d) ভৌমজলস্তরের নীচে দ্রবীভূত বা প্রবেশ্য স্তরের অস্তিত্ব ও ভৌমজলের দ্রুত গভীরে অনুপ্রবেশ

(e) ভৌমজল যখন তলদেশীয় প্রবাহের মাধ্যমে সাগরে অনুপ্রবেশ করে।

(f) ভূ-আন্দোলনের ফলে ভৌমজলতলের চাপ বৃদ্ধি ও দ্রুত ভৌমজলনিষ্কাশন (subsurface drainage)

নিম্নলিখিত কারণে ভৌমজল ও জলতলের বৃদ্ধি হয়।

(a) ভূ-পৃষ্ঠের প্রবাহিত জলধারা (surface run off) যখন ছিদ্রপথ বা প্রবেশ্য পথের মাধ্যমে মৃত্তিকায় প্রবেশ করে ;

(b) ভৌমজলতল যখন নদীতলের (river bed) নীচে অবস্থান করে, তখন নদীর জল ভৌমজলস্তরে প্রবেশ করে ;

(c) আর্দ্র ঋতুতে যখন ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন জলাধারগুলি, উপত্যকা ও অবনমিত অংশের জলধারণক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় ও উদ্ভিদ ও মৃত্তিকাস্তরে জলশোষণ সম্পূর্ণ হয়, তখন অতিরিক্ত ভূপৃষ্ঠের জল ধৌতপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূগর্ভে প্রবেশ করে ;

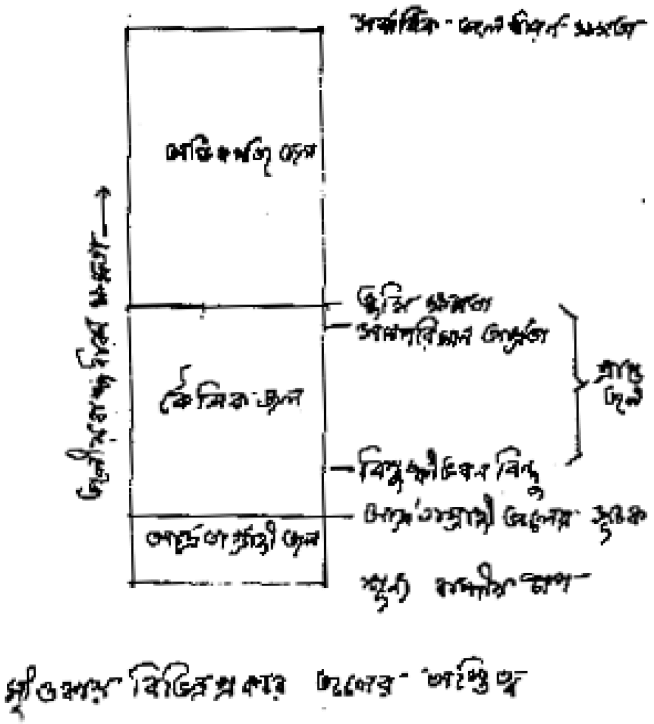

(চিত্র নং. 10.2)

10.5.2 ভৌমজলবিভাজিকার প্রকৃতি (Nature of Phreatic Divide)

ভূ-পৃষ্ঠে যেমন দুটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে জলবিভাজিকা থাকে, তেমনি ভূ-অভ্যন্তরেও এক প্রকার জলবিভাজিকা অবস্থান করে। এই জলবিভাজিকাকে ভৌম জলবিভাজিকা বা 'ফ্রিয়েটিক্ ডিভাইড্' (Phreatic Divide) বলে। এই

বিভাজিকা ভৌমজলপরিচলনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। জলতত্ত্ববিশারদ ব্রেটার (W. Brator) উল্লেখ করেন যে যখন ভূ-প্রাকৃতিক জলবিভাজিকা ও ভৌমজলবিভাজিকা একই উল্লম্বতল বরাবর অবস্থান করে, তখন ভৌমজলধারার প্রবাহ বিভাজিকার উভয়পার্শ্বে সমান হয়। কিন্তু যখন এই দুই জলবিভাজিকার মধ্যে উল্লম্বতল বরাবর ব্যবধান থাকে, তখন ভৌমজলপ্রবাহ এই বিভাজিকার উভয় পার্শ্বে অসমান হয়। (চিত্র 10.3)

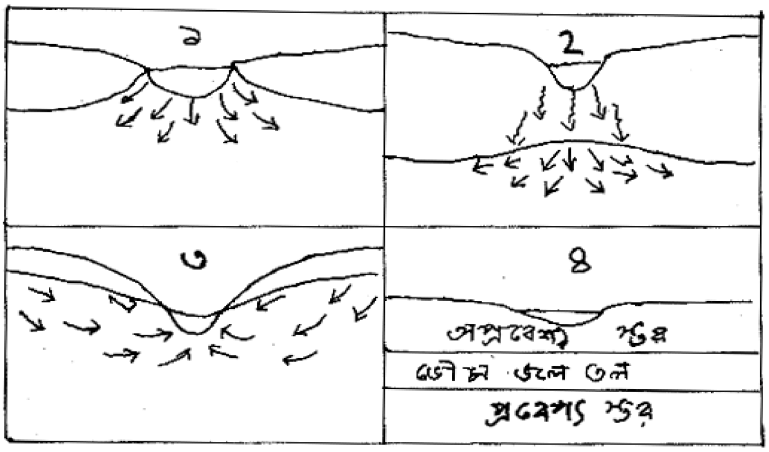

(চিত্র নং. 10.3)

10.5.3 ভৌমজল প্রণালী (Ground water system)

ভৌমজল প্রণালী একটি মুক্ত প্রণালীর (open system) উদাহরণ। মুক্ত প্রণালী বলতে এমন একটি প্রণালী বোঝায় যেখানে প্রণালীর বাইরে থেকে বিভিন্ন চালক (variable) কাজ করে এবং পরিশেষে ঐ প্রণালী থেকে বহির্গত হয়। ভৌমজলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভূপৃষ্ঠ থেকে জল ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করে এবং শেষপর্যন্ত ভৌমজলতলের ঢাল অনুযায়ী বা শিলার প্রবেশ্যতা ও সচ্ছিদ্রতা অনুযায়ী প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নদী, সাগর বা আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করে।

10.5.4 ভৌমজল বাজেট (Groundwater Budget)

ভূপৃষ্ঠে যেমন একপ্রকার জলবাজেট বা জলসমতা পরিলক্ষিত হয়, অনুরূপভাবে ভূগর্ভেও ভৌমজলের একপ্রকার বাজেট দেখা যায়। এই বাজেট পরিবর্তনশীল ; অর্থাৎ ভৌমজলের পরিমাণ স্থান ও কাল অনুযায়ী সমান থাকে না। ভৌমজলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন উপাদান বাজেটের সাপেক্ষে ধনাত্মক (positive) এবং কোন কোন উপাদান বাজেটের সাপেক্ষে ঋণাত্মক (negative) নিম্নলিখিত সমীকরণ ও চিত্রের মাধ্যমে ভৌমজলের বাজেট দেখানো হল ঃ

Δ ভৌজ = (ভৌজ$_{\downarrow}$ — ভৌজ$_{\uparrow}$) + উ — (কৈ + ত)

যেখানে Δ ভৌজ = ভৌমজলের পরিমাণের পরিবর্তন ;

ভৌজ$_{\downarrow}$ = ভৌমজলবিভাজিকার শীর্ষদেশ থেকে মুক্ত ভৌমজলপ্রণালীতে জলের অনুপ্রবেশ ;

ভৌজ$_{\uparrow}$ = মুক্ত ভৌমজল প্রণালী থেকে ভৌম জলের বর্হিগমন ;

উ = ভূপৃষ্ঠ থেকে জলের উল্লম্ব অনুপ্রবেশ।

কৈ = কৈশিক প্রক্রিয়ায় জলের উর্দ্ধগমন ও ভূপৃষ্ঠে বর্হিগমন

ত = তলদেশীয় প্রবাহের মাধ্যমে ভৌম জলপ্রণালী থেকে ভৌমজলের নদী বা সাগরে অনুপ্রবেশ।

উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে 'ইনফিলট্রেশন' বা জলের উল্লম্ব অনুপ্রবেশ (উ) এবং ভৌমজলবিভাজিকা থেকে উৎসারিত ভৌমজলধারা (ভৌজ$_{\uparrow}$) —এই দুটি উপাদান ধনাত্মক। পক্ষান্তরে, ভৌমজলপ্রণালী

থেকে নির্গত জলধারা (ভৌজ্), তলদেশীয় প্রবাহ (ত) এবং কৈশিক প্রবাহ (কৈ) ভৌমজলের সাপেক্ষে ঋণাত্মক উপাদান। এই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উপাদানের মাধ্যমে ভৌমজলের আয় ও ব্যায়ের পার্থক্য বা তারতম্যই হল ভৌমজলবাজেট। এই জলবাজেট দুই প্রকারের ঃ ধনাত্মক বাজেট ও ঋণাত্মক বাজেট। যখন ধনাত্মক উপাদানের মারফৎ জলের আয় ঋণাত্মক উপাদানের মাধ্যমে ব্যয়িত জল অপেক্ষা বেশী হয় তখন ভৌমজল ধনাত্মক প্রকৃতির হয় এবং এর বিপরীত হলে অর্থাৎ ঋণাত্মক উপাদানের মাধ্যমে ব্যয়িত জল যখন ধনাত্মক উপাদানের মারফৎ জলের আয় অপেক্ষা বেশী হয়, তখন ঋণাত্মক জলবাজেট দেখা যায়।

10.5.5 ভৌমজল ও অনুছিদ্রস্থান (Groundwater and porespace)

মৃত্তিকায় ও শিলায় যে ছিদ্রস্থান থাকে, তাকে সংক্ষেপে অনুছিদ্রস্থান বা 'পোর স্পেস' (pore space) বলে। অনুছিদ্রস্থানের পরিমাণের উপর ভৌমজলের প্রবাহ ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। কঠিন, অবশিষ্ট পরিবাহিত ও কোমল শিলাস্তরে এবং বিভিন্ন সঞ্চিত পাললিক স্তরে ভৌমজল সংপৃক্ত অবস্থায় থাকে। কোন শিলাস্তরে অনুছিদ্রস্থানের মোট আয়তনকে সচ্ছিদ্রতার সূচক (Index of porosity) বলে। জলতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন কোন শিলাস্তর কত পরিমাণ ভৌমজল ধারণ করবে, তা সেই শিলার সচ্ছিদ্রতার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বেলেপাথর বা কংগ্লোমারেট্ জাতীয় পাললিক শিলার সচ্ছিদ্রতা অনেক বেশী। পক্ষান্তরে কাদাপাথর বা 'শেল' (shale) শিলার সচ্ছিদ্রতা অনেক কম। আগ্নেয় ও পাললিক শিলায় সচ্ছিদ্রতার পরিমাণ কম হলেও এই সব শিলায় ফাটল, দারণ ও পরস্পর সংযোগকারী ছিদ্রপথ থাকায় এই সকল শিলার ভিতর দিয়ে ভৌমজল পরিচালিত হয়।

তবে প্রশ্ন হল এই ভৌমজল ভূ-অভ্যন্তরের কত নীচে দেখা যাবে ? ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ গভীর নলকূপ পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করেছেন যে প্রায় ১ মাইল বা ৩.২ কিলোমিটার গভীরে ভৌমজলের পরিমাণ খুবই সীমিত হয় এবং তাঁরা আরো বলেন যে ১০ মাইল বা ১৬ কিলোমিটার গভীরে প্রচণ্ড চাপে শিলার একপ্রকার ধীর প্রবাহ হয় এবং সব ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে জল ঐ স্তরে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এই স্তরটিকে শিলাপ্রবাহী স্তর (Zone of Rock Flowage) বলে। অতএব, এই স্তরের উর্দ্ধসীমাই হল ভৌমজলস্তরের নিম্নসীমা বা নিম্নতল।

সচ্ছিদ্রতা ছাড়া প্রবেশ্যতা (permeability) পরিচলনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। শিলার প্রবেশ্যতা যত বেশী হয় সেই শিলায় ভৌমজল ধারণ ক্ষমতা তত বেশী হয়।

10.6 ভৌমজলের বিভিন্ন প্রকার ও উৎস (Different types and sources of ground water)

10.6.1 সহজাত বা জন্মগত জল (Connate water)

আমরা জানি যে পাললিক শিলার স্তরায়ন সামুদ্রিক পরিবেশে প্রাথমিক ভাবে সংঘটিত হয়। এই জলজ পরিবেশে শিলা গঠিত হওয়ার সময় কিছু পরিমাণ জল শিলার মধ্যে থেকে যায়। এই প্রকার জলকে সহজাত বা জন্মগত জল বলে। শিলার মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলে এই প্রকার জলকে আবদ্ধ জলও (confined water) বলা হয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভৌমজল স্বাদু জল হলেও এই প্রকার সহজাত জলে লবণের পরিমাণ বেশী থাকে ও আবদ্ধ অবস্থায় থাকে বলে পরিশ্রুত হতে পারে না। এই কারণে জল লবণাক্ত প্রকৃতির হয়।

10.6.2 'ম্যাগমাটিক' বা উৎস্যন্দ জল (Magmatic or Juvenile water)

ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত লাভা ও অন্যান্য পদার্থের অগ্ন্যুদ্‌গম হওয়ার সময় কিছু খনিজ পদার্থ মিশ্রিত জল ভৌমজলস্তরে উপনীত হয়। এই প্রকার জলকে 'ম্যাগমাটিক' বা উৎস্যন্দ জল বলে।

10.6.3 সমুদ্রের জল (Marine water)

উপকূলবর্তী অঞ্চলে যখন সামুদ্রিক তরঙ্গ উপকূলের ভৃগুদেশে আছড়ে পড়ে, তখন ছিদ্রপথ বা শিলাস্তরের ফাটলের মাধ্যমে সমুদ্রের লবণাক্ত জল ভৌমজলের স্তরে প্রবেশ করে। এই প্রকার জলে লবণের পরিমাণ সহজাত জল অপেক্ষা বেশী হয়।

10.6.4 'মিটিওরিক' জল (Meteoric water)

বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ও বরফগলা জল ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার মাধ্যমে ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করে। এই প্রকার জলকে 'মিটিওরিক' জল বলা হয়। বস্তুত এই প্রকার জল ভৌমজলের অন্যতম প্রধান উৎস।

10.7 ভৌমজল নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ (Factors controlling ground water)

10.7.1 ভৌমজলচক্র

ভৌমজলের পরিমাণ, অবস্থান ও আকৃতির যে চক্রাকারভাবে পরিবর্তন ও স্থানান্তর, তাকে ভৌমজলচক্র বলে। বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ও ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত বিভিন্ন প্রকার জলধারা ভূ-পৃষ্ঠের ছিদ্রপথ বা ফাটল বা মৃত্তিকা ও শিলার প্রবেশ্যতা ও সচ্ছিদ্রতা অনুযায়ী উল্লম্বভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং ভৌমজল গঠন করে। এরপর ভৌমজল শিলার প্রবেশ্যতা অনুযায়ী আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করে এবং এই ভৌমজল কৈশিক প্রক্রিয়ায় পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে, অথ বা তলদেশীয় প্রবাহের মাধ্যমে নদী বা সাগরে প্রবেশ করে। এইভাবেই ভৌমজলচক্র সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভৌমজলচক্র ভৌমজলের পরিমাণ, পরিবর্তন ও স্থানান্তর বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

10.7.2 ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার প্রকৃতি (Nature of surface run-off)

ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে জলের প্রবাহকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারা (surface run-off) বলে। এই জলধারা ভৌমজলকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। জলচক্র বা উদকচক্রের মতো ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার একপ্রকার চক্রাকারে পরিবর্তন ও জলের স্থানান্তর ঘটে। অধ্যাপক হয়েট্ (Hoyt) সর্বপ্রথম এই প্রবাহিত জলধারার চক্রের উল্লেখ করেন (Run-off cycle)। নিম্নলিখিত তালিকার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার চক্র কিভাবে ভৌমজলকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা দেখানো হল ঃ

ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার বিভিন্ন পর্যায় ঃ	ভৌমজলের নিয়ন্ত্রণে প্রবাহিত জলধারার ভূমিকা
প্রথম পর্যায় : শুষ্ক বা বৃষ্টিহীন	বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে জলের পরিমাণ হ্রাস এবং ভৌমজলতলের (ground water table) অবনমন ও ভৌম জলতলের হ্রাস।
দ্বিতীয় পর্যায় : বৃষ্টিপাতের শুরু	ভূ-গর্ভে সামান্য জলের অনুপ্রবেশ ; বাতাঘয়ন স্তরেও অধিক পরমিাণ অধিশোষণের ফলে ভৌমজলের সামগ্রিক পরিমাণ হ্রাস।
তৃতীয় পর্যায় : ধারাবাহিক ও অবিরাম বৃষ্টিপাত	ভূ-পৃষ্ঠে ও মৃত্তিকা স্তরে জলধারণক্ষমতা সম্পূর্ণ-ভাবে শেষের দিকে জলের ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ ; ভৌমজলের পরিমাণ বৃদ্ধি ; ভৌমজলতলের উর্দ্ধগমন ; তলদেশীয় প্রবাহের শুরু।

চতুর্থ পর্যায় : ক্রমহ্রাসমান বৃষ্টিপাত	বৃষ্টিপাতের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান। এই কারণে এই পর্যায়ে ভৌমজলের ধীর উর্দ্ধগমন।
পঞ্চম পর্যায় : বৃষ্টিপাতের সমাপ্তি	ভৌমজলের জলধারণ ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে তৃপ্ত হলেও এই পর্যায়ের শেষের দিকে মৃত্তিকা জল ও বাতান্বয়ন স্তর থেকে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া পুনরায় চালু হলে ভৌমজলের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। এছাড়া তলদেশীয় প্রবাহের মাধ্যমে ভৌমজলের কিয়দংশ নদী বা সাগরে প্রবেশ করলেও ভৌমজলের পরিমাণ হ্রাস পায় ও জলতলের পুনঃ অবনমন হয়।

10.7.3 ভৌমজলবিভাজিকা

ভৌমজলবিভাজিকা সম্বন্ধে আগেই আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ভৌমজলবিভাজিকার চলে ভৌমজলের প্রবাহ ও গতিবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে। এছাড়া ভৌমজলবিভাজিকার ঢাল বেশী হলে প্রবেশ্য শিলাস্তরে বা জলধারক অ্যাকুইফারের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী অপেকাকৃত কম পরিমাণে জল ধার্য হবে। পক্ষান্তরে ভৌমজলবিভাজির ঢাল কম হলে ভৌমপ্রবাহ মন্থর হবে এবং তুলনামূলকভাবে প্রবেশ্য শিলাস্তর বা অ্যাকুইফারে বেশী জল শোষিত বা অধিগৃহীত হবে।

10.7.4 ভূ-প্রকৃতি (relief)

পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতা অনুযায়ী গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যকে ভূ-প্রকৃতি বলে। পৃথিবীতে তিন প্রকার ভূ-প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয় : (ক) পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি ; (খ) মালভূমি ও (গ) সমভূমি।

পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত হয় ; সর্বোচ্চ ও আপেক্ষিক ভূ-প্রকৃতি উভয়ই খুব বেশী হয়। ভূমির ঢাল খাড়া প্রকৃতির এবং বেশী হয়। এর ফলে প্রবাহিত জলধারার গতিবেগও খুব বেশী হয় ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভে জলের উল্লম্ব অনুপ্রবেশ বা 'ইন্‌ফিলট্রেশন' (infiltration) এর মাত্রা কম হয়। এই কারণে পার্বত্য ভূপ্রকৃতিতে ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভে জলের অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত কম হয়। পক্ষান্তরে সমভূমি অঞ্চলে উচ্চতা ও ঢাল উভয়ই কম হওয়ায় প্রবাহিত জলধারার গতিবেগ কম হয়। এবং এই কারণে মৃত্তিকা ও শিলাস্তরের মাধ্যমে জলের উল্লম্ব অনুপ্রবেশের মাত্রা ও পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। ভৌমজলের ক্ষেত্রে মালভূমি অঞ্চলে জলের ভূ গর্ভ অনুপ্রবেশ উপরিউক্ত পার্বত্য ভূপ্রকৃতি ও সমভূমি মধ্যবর্তী অবস্থার পরিলক্ষিত হয়।

ভূপ্রকৃতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য ভৌমজলকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় যে, পর্বত গঠনের সময় ভাঁজ, চ্যুতি, ও ভূ আন্দোলনজনিত উত্থান ও অবনমনের ফলে শিলাস্তর দুর্বল হয়। এর ফলে ঐ সকল দুর্বল স্থান ভেদ করে ভূপৃষ্ঠের জল ভূগর্ভে প্রবেশ করে। আবার সমভূমি অঞ্চলে নদী বা অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি পরিবাহিত মৃত্তিকায় ভৌত বা প্রকৃতির গুণাবলীর তারতম্যে জলধারণ ক্ষমতা এবং জলশোষণ ক্ষমতা উভয়েরই পার্থক্য ঘটে। অতএব বলা যেতে পারে, ভৌম জলের নিয়ন্ত্রণে ভূপ্রকৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণাত্মক ও কোন কোন ক্ষেত্রে ধনাত্মক কারণ হিসেবে কাজ করে।

10.7.5 সচ্ছিদ্রতা (porosity)

কঠিন, অবশিষ্ট, পরিবাহিত, কোমল শিলাস্তরে এবং বিভিন্ন সঞ্চিত পাললিক স্তরে ভৌম জল সংপৃক্ত অবস্থায় থাকে। কোন শিলাস্তর বা মৃত্তিকা স্তরে অনুচ্ছিদ্র স্থানে (proe space) মোট আয়তনকে সেই শিলার সচ্ছিদ্রতার

সূচক বলা হয়। কোন মৃত্তিকার স্তর বা শিলাস্তরে কত পরিমাণ ভৌম জল ধারণ করবে, তা সেই মৃত্তিকা বা শিলাস্তরের সচ্ছিদ্রতার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বেলেপাথর বা কংগ্লোমারেট জাতীয় পাললিক শিলার সচ্ছিদ্রতা অনেক বেশী। পক্ষান্তরে, কাদাপাথর বা 'শেল' শিলার সচ্ছিদ্রতা অনেক কম। আগ্নেয় ও পাললিকশিলার সচ্ছিদ্রতার পরিমাণ খুব কম হলেও এই সব শিলায় ফাটল, দারণ ও পরস্পর সংযোগকারী ছিদ্রপথ থাকায় এইসব শিলার ভিতর দিয়েও ভৌমজল পরিচালিত হয়।

10.7.6 প্রবেশ্যতা (permeability)

শিলার প্রবেশ্যতা ধর্ম ভৌমজলকে নিয়ন্ত্রিত করে। শিলাস্তরের ভিতর দিয়ে জলের পরিচলন ধর্মকেই বলে শিলার প্রবেশ্যতা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যে শিলাস্তরের ভিতর দিয়ে জলের স্বাভাবিক ও নিয়মিত প্রবাহ হয়, তাকে প্রবেশ্য শিলাস্তর বলে। ফাটলযুক্ত চুনাপাথর, কোয়ার্জাইট বা দারণসমৃদ্ধ গ্রানাইট শিলা প্রবেশ্য শিলার উদাহরণ। পক্ষান্তরে, যে শিলার মধ্য দিয়ে জলের স্বাধীন ও স্বাভাবিক অনুপ্রবেশ ব্যহত হয় সেই শিলাকে অপ্রবেশ্য শিলা বলে। যেমন স্লেট, শেল ও গ্যাব্রো প্রভৃতি অপ্রবেশ্য শিলার উদাহরণ।

10.7.7 অ্যাকুইফার (Aquifer)

ভৌমজলের একটি অন্যতম আধার ও উৎস হল 'অ্যাকুইফার'। যখন শিলাস্তরের মধ্যে জল আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন সেই জলকে অ্যাকুইফার বলে। সাধারণতঃ কোন প্রবেশ্য শিলাস্তরের নীচে অনুপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকলে ভৌমজল ওই অপ্রবেশ্য স্তর ভেদ করে নীচে যেতে পারে না। এবং প্রবেশ্য স্তরেই অবস্থান করে।

বিভিন্ন প্রকার অ্যাকুইফার ঃ শতকরা ৯০ ভাগ অ্যাকুইফারগুলি অসংবদ্ধ শিলা এবং বিশেষতঃ 'গ্র্যাভেল' ও বালিগঠিত শিলার মধ্যে দেখা যায়। এই সকল অ্যাকুইফারগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ (a) ভৌম নদীখাত, (b) পরিত্যক্ত ভৌমনদীখাত বা ভূআন্দোলনের ফলে মাটি ও শিলাস্তরের নীচে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে ; (c) ভৌম সমভূমি এবং (d) দুই পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা যা ভৌমজলের নীচে অবস্থান করে।

আবার ভৌমজলের ভিত্তিতে অ্যাকুইফারকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (a) মুক্ত অ্যাকুইফার (open Aquifer) এবং (b) আবদ্ধ অ্যাকুইফার (confined Aquifer)। (চিত্র নং 4)

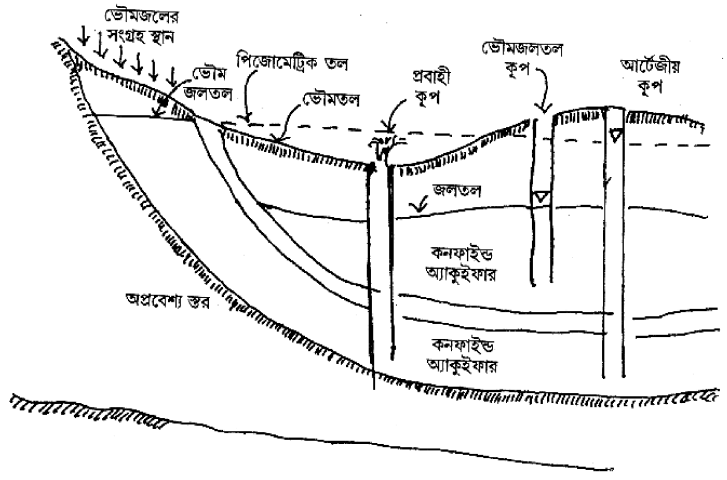

(চিত্র 10.4)

সংপৃক্ত স্তরের উর্দ্ধসীমা যখন ভৌমজলের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, তখন মুক্ত অ্যাকুইফারের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার

অ্যাকুইফারকে অনেক সময় 'ফ্রিয়েটিক' বা 'অ-আর্টেজীয়' অ্যাকুইফার (phreatic aquifer or non-Artesian aquifer) বলে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে ভৌমজলের অনুপ্রবেশ বা বর্হিগমন, গভীর বা অগভীর কূপ থেকে জল নির্গমন এবং শিলার প্রবেশ্যতা অনুযায়ী ভৌমজলতল এই প্রকার অ্যাকুইফারে তরঙ্গায়িত বা ঢালু প্রকৃতির হয়।

আবদ্ধ অ্যাকুইফারকে আর্টেজীয় অ্যাকুইফার বলে। যখন অপ্রবেশ্য শিলাস্তর প্রবেশ্য শিলাস্তরের উপরে অবস্থান করে তখন জল ঐ প্রবেশ্য শিলাস্তরে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং এই প্রবেশ্য স্তরে কূপ খনন করলে আবদ্ধ অ্যাকুইফারের জল উপরে উঠে আসে। যে অঞ্চল আবদ্ধ অ্যাকুইফারের জল সরবরাহ করে, তাকে ভৌমজলের সরবরাহ অঞ্চল বা 'রিচার্জ' অঞ্চল বলে এবং আবদ্ধ অ্যাকুইফারের 'হাইড্রস্ট্যাটিক' চাপ বরাবর যে কাল্পনিক তল পাওয়া যায় তাকে 'পিজোমেট্রিক' পৃষ্ঠ বা তল (pizometric sufrace) বলে। (চিত্র 10.5) অর্থাৎ কোন আবদ্ধ অ্যাকুইফারে কূপ খনন করলে যে তল বরাবর ভূপৃষ্ঠে ভৌমজল উৎসারিত হয়, তাকে পিজোমেট্রিক তল বলে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে এই পিজোমেট্রিক তল ভূপৃষ্ঠের উপরে থাকলে কূপ খনন করলে স্বাভাবিকভাবেই ভৌমজল বর্হিগত ও প্রবাহিত হয়। এই প্রকার কূপকে প্রবাহী কূপ (flowing well) বলে।

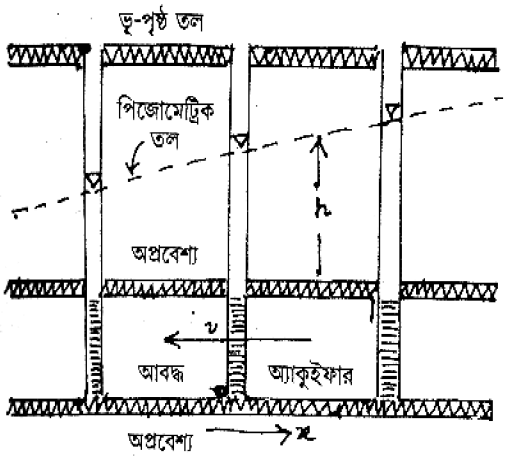

(চিত্র 10.5)

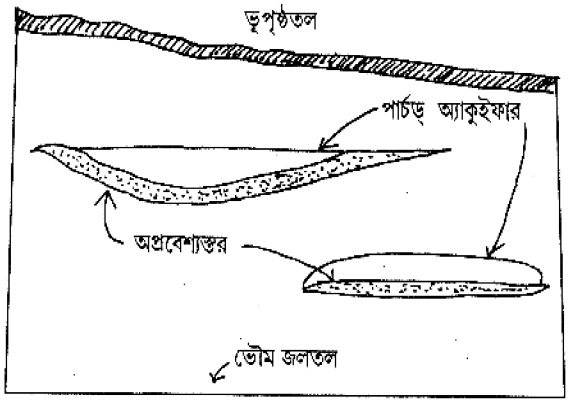

(চিত্র 10.6)

অনেক সময় বাতাস্বয়ন স্তরে এবং ভৌমজলতলের উপরে লেন্সের আকারে অপ্রবেশ্যস্তর অবস্থান করে এবং এই স্তর ভূগর্ভে যেখানে শুরু হয়েছে এবং যেখানে শেষ হয়েছে সেই দুই স্থানকে যোগ করলে যে অ্যাকুইফার পাওয়া যায়, তাকে পাখির দাঁড় বিশিষ্ট অ্যাকুইফার বা 'পার্চড্', অ্যাকুইফার (perched aquifer) বলে। চিত্র 10.6।

10.7.8 'ভ্যাডেস' ও ফ্রিয়েটিক স্তর (Vadose and Phereatic levels)

ভৌমজলতলের সাপেক্ষে দুটি ভৌমজলস্তর দেখা যায়। ভৌমজলতলের উপরে অবস্থিত ভৌমজলস্তরকে ভ্যাডেস স্তর বলে। আবার ভৌমজলতলের নীচে অবস্থিত ভৌমজলস্তরকে ফ্রিয়েটিক স্তর বলে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে ভ্যাডেস অঞ্চলের ভৌমজলতল পরিবর্তনশীল ; পক্ষান্তরে ফ্রিয়েটিক স্তরে ভৌমজল স্থায়ী প্রকৃতির হয়। ভৌমজলের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ভৌমজলতলের ওঠা নামা বা হ্রাস বৃদ্ধি এই দুই প্রকার স্তরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

10.8 ভৌমজলের পরিচলন ও প্রবাহ (Circulation and movement of ground water)

ভৌমজলের স্বাভাবিক প্রবাহ এবং উল্লম্বতল বরাবর স্তরান্তর ও আনুভূমিক তল বরাবর স্থানান্তরকেই ভৌমজলের পরিচলন ও প্রবাহ বলে।

জলতত্ত্ববিদ্‌গণ উল্লেখ করেন যে ভূপৃষ্ঠে জলের প্রবাহ অপেক্ষা ভৌমজলের প্রবাহ অপেক্ষাকৃত মন্থর এবং এই পরিচলন ও প্রবাহ কিরূপ হবে তা জলপ্রবাহের নিম্নলিখিত দুটি নীতির উপর ভিত্তি করে স্থিরীকৃত হয় ;

প্রথম নীতি : যে নির্দিষ্ট দিক বরাবর জলের চাপ ক্রমহ্রাসমান হয়, ভৌমজলের প্রবাহ সেই দিক বরাবর হয়। বলা যেতে পারে যে এই প্রবাহ উর্দ্ধমুখী বা নিম্নমুখী উভয় প্রকৃতির হতে পারে, তবে তা নির্ভর করবে উচ্চ ও নিম্ন জলচাপের (high and low hydrostatic pressure) উপর। অন্যান্য পদার্থের পরিবাহিতার ধর্ম বা নীতির মত ভৌমজলও উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ অভিমুখে প্রবাহিত হয়।

দ্বিতীয় নীতি : অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করলে ভৌমজল সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ খাত অপেক্ষা প্রশস্ত খাতে দ্রুতবেগে পরবাহিত হবে, কারণ সঙ্কীর্ণ খাত অপেক্ষা প্রশস্ত খাতে ঘর্ষণজনিত জলের গতিবেগ হ্রাস অপেক্ষাকৃত কম হয়।

10.8.1 ভৌমজলের পরিচলন ও ডার্সির সূত্র

ভৌমজলের প্রবাহের ক্ষেত্রে 'ডার্সির সূত্র' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফরাসী জলতত্ত্ববিদ্ হেনরি ডার্সি (Henry Darcey) আনুভূমিক বালির স্তরে পরিশ্রুত জলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে ভৌমজলপ্রবাহের একটি সূত্র উল্লেখ করেন। এই সূত্র 'ডার্সি সূত্র' নামে পরিচিত। এই সূত্রে বলা হয় যে প্রবেশ্য স্তরের মাধ্যমে ভৌমজলের প্রবাহ ভৌমজলবিভাজিকার দূরত্বের সাপেক্ষে সমানুপাতিক এবং প্রবাহীপথের সাপেক্ষে ব্যাস্তানুপাতিক।

ডার্সির সূত্রটি বের্‌নৌলির সমীকরণের (Bernoulli Equation) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। বেরনৌলির সমীকরণটিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :

$$\frac{p_1}{Y} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{Y} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + hL$$

যেখানে
- p = চাপ
- Y = জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব
- v = জলপ্রবাহের গতিবেগ
- g = অভিকর্ষজ ত্বরণ
- z = উচ্চতা
- hL = জলবিভাজিকা থেকে দূরত্ব

প্রবেশ্যস্তরের গুরুত্ব : উপরিউক্ত সমীকরণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যেহেতু প্রবেশ্য স্তরের ভিতর দিয়ে জলপ্রবাহের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম, সেই কারণে hL-এর গুরুত্ব কম হয়। নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে জলবিভাজিকা থেকে দূরত্বের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ভৌমজলের প্রবাহীপথের দৈর্ঘ্য দেখানো যেতে পারে :

$$hL = \left(\frac{p_1}{Y} + z_1\right) - \left(\frac{p_2}{Y} + z_2\right)$$

এখন ডার্সির সূত্র অনুযায়ী উল্লিখিত সমানুপাতিক ও ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্কগুলি যথাক্রমে Q – hL and $Q \sim \frac{1}{L}$ রূপে প্রকাশ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে সমানুপাতিক ও ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্কে একটি ধ্রুবক (constant) k হিসাবে ধরলে সমীকরণটি $Q = kA\frac{hL}{L}$ হয় এবং ভৌমজলের প্রবাহ ও গতিবেগ নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে : $V = \frac{Q}{A} = k\frac{dh}{dl}$

যেখানে $\frac{dh}{dl}$ হচ্ছে জলপ্রবাহ ঢাল বা হাইড্রলিক্ গ্রেডিয়েন্ট (Hydraulic Gradient)

উপরিউক্ত সমীকরণটি ডার্সির সূত্র অনুযায়ী একটি স্বাভাবিক সূত্র এবং ডার্সির মতে **জলপ্রবাহের ঢাল অনুযায়ী ভৌমজল এক স্থান থেকে অপর স্থানে পরিচালিত ও পরিবাহিত হয়।**

10.8.2 ভৌমজল প্রবাহের সীমা নির্দ্ধারণ ও রেনল্ডের সূত্র

ভৌমজল প্রবাহের শেষ সীমা ডার্সি উল্লেখ না করলেও রেনল্ডের (Reynold) সূত্র অনুযায়ী তা নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে।

$$NR = \rho\frac{VR}{\mu}$$

যেখানে
- ρ = ঘনত্ব
- V = গড় গতিবেগ
- R = হাইড্রলিক ব্যাসার্দ্ধ
- μ = তরলের সান্দ্রতা

হাইড্রলিক ব্যাসার্দ্ধটি একটি অনুপাতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় R = A/p

যেখানে A তাড়াতাড়ি প্রস্থচ্ছেদে আয়তন এবং p = সংপৃক্ত স্তরের পরিসীমা

10.8.3 ভৌমজলের গতিবেগ ও ফ্রড সংখ্যা (Velocity of Ground water and Frounde Number)

ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত জলের গতিবেগ যেমন ফ্রড সংখ্যা দ্বারা নির্দ্ধারণ করা হয়, অনুরূপভাবে ভৌমজলপ্রবাহের গতিবেগও এই সংখ্যা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে 'ফ্রড সংখ্যাটি' দেখানো হল।

$$F = \frac{v}{\sqrt{gD}}$$

যেখানে
- v = গড় গতিবেগ।
- g = মহাকর্ষবল
- D = ভৌমজলের গভীরতা

উপরিউক্ত সমীকরণ অনুযায়ী যদি দেখা যায় যে ফ্রড সংখ্যাটির মান এক-এর কম (less than unity) তা হলে ভৌমজলের গতিবেগ মন্থর হবে এবং সংখ্যাটির মান এক-এর বেশী হলে ভৌমজলের গতিবেগ বেশী হবে।

10.8.4 ভৌমজলের পরিচলন ও অ্যাকুইফার (Circulation of Ground water and aquifer)

ভৌমজলের পরিচলনের ক্ষেত্রে অ্যাকুইফারের বিশেষ ভূমিকা আছে। অ্যাকুইফার সম্বন্ধে 7.5.7 অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। ভৌমজলতলের সাপেক্ষে অ্যাকুইফারের অবস্থান ও তার গভীরতা, অ্যাকুইফারের উপরে ও নীচে শিলার প্রবেশ্যতার প্রকৃতি এবং অ্যাকুইফার স্তরে জলের চাপ ভৌমজল প্রবাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

10.8.5 ভৌমজলের পরিচলন ও প্রস্রবণ (Circulation of ground water and spring)

ভূপৃষ্ঠের কোন স্থান দিয়ে ভৌম জল নির্গত হলে তাকে প্রস্রবণ (spring) বলে। অতএব ভূপৃষ্ঠে ছিদ্রপথের (rise or resurgence) অস্তিত্ব এবং ঐ ছিদ্রপথের সঙ্গে ভৌমজলস্তরের সংযোগ প্রস্রবণ সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক এবং এই প্রস্রবণের ফলেই ভৌমজলের ভূগর্ভ থেকে ভূপৃষ্ঠে উল্লম্ব উর্দ্ধমুখী প্রবাহ দেখা যায়।

10.8.5.1 প্রস্রবণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of springs)

প্রস্রবণকে বিভিন্ন ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ব্রায়ান (K. Bryan, 1919) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ঃ (a) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়াই যে সকল প্রস্রবণের উৎপত্তি হয়, তাদের অ-মাধ্যাকর্ষণ জনিত প্রস্রবণ (non-gravitational spring) বলে এবং (b) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে সৃষ্ট প্রস্রবণ (gravitational spring)। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে আগ্নেয় প্রস্রবণ ও ফিশার প্রস্রবণ উল্লেখযোগ্য। ভূ-অভ্যন্তরের অনেক গভীর থেকে নির্গত হয় বলে এই সকল প্রস্রবণের জলের তাপমাত্রা স্থানীয় ভৌমজলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশি থাকে। এছাড়া এই প্রকার প্রস্রবণের জলে খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে ও ভৌমজল ছাড়া জুভেনাইল জলও এই প্রকার প্রস্রবণের উৎস।

যখন হাইড্রোস্টাটিক চাপের ফলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে ভৌমজল নির্গত হয়, তখন তাকে মাধ্যাকর্ষণ প্রস্রবণ (gravitational spring) বলে। এদের মধ্যে অবনমিত প্রস্রবণ, সংযোগ প্রস্রবণ, আর্ট জাতীয় প্রস্রবণ, টিউব প্রস্রবণ বা ফাটল প্রস্রবণ উল্লেখযোগ্য।

নিচের ছক অনুযায়ী প্রস্রবণের শ্রেণীবিভাগ করা হয় ঃ

মূলবিভাগ	উপবিভাগ
অ-মাধ্যাকর্ষণ প্রসবণ	আগ্নেয় প্রস্রবণ
	ফিসার প্রস্রবণ
মাধ্যাকর্ষণ প্রসবণ	অবমিত প্রস্রবণ
	সংযোগ প্রসবণ
	আর্টেজীয় প্রস্রবণ
	ফাটল প্রস্রবণ

যে সকল প্রস্রবণের মাধ্যমে ভৌমজলে ভূ-পৃষ্ঠে নির্গত হয়, তাদের নিঃসৃত গতিবেগ বা ভৌম জলের পরিমাণে তারতম্য দেখা যায়। মিয়েনজার ভৌমজলের নির্গত পরিমাণ (magnitude of discharge) এর উপর ভিত্তি করে প্রস্রবণের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করেন ঃ

শ্রেণীবিভাগ	জলের পরিমাণ
প্রথম	100 cfs-এর বেশী
দ্বিতীয়	10-100 cfs
তৃতীয়	1-10 cfs
চতুর্থ	100 gal / min (22 cfs) - 1 cfs
পঞ্চম	10-100 gal / min
ষষ্ঠ	1-10 gal / min
সপ্তম	1 pt / min - 1 gal / min
অষ্টম	< 1 pt / min, 180 gal / day

cfs = cubic ft per second বা ১ ঘন ফুট প্রতি সেকেন্ডে।

gal / min = gallon per minute বা প্রতি মিনিটে গ্যালন পরিমাণ জল।

উপরিউক্ত প্রস্রবণের শ্রেণীবিভাগটি 1927 সালে মিয়েনজার (O.E. Meinzer, 1927) উপস্থাপিত করেন।

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জলের পরিমাণ অনুযায়ী প্রস্রবণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of springs on the basis of availability of water over time) :—প্রস্রবণের জল সারাবছর সমানভাবে প্রবাহিত হয় না। যে সকল প্রস্রবণ বিস্তীর্ণ প্রবেশ্য অ্যাকুইফার স্তর অনুযায়ী সারাবছর সমানভাবে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ সারাবছর যে সকল প্রস্রবণ থেকে জল পাওয়া যায়, তাকে অবিরাম প্রস্রবণ (perennial spring) বলে। পক্ষান্তরে, যে সকল প্রস্রবণের জল বছরের নির্দিষ্ট সময়ে শুধু প্রবাহিত হয়,এবং বছরের বাকী সময় জল থাকে না, সেই সকল প্রস্রবণকে সবিরাম প্রস্রবণ (intermittent spring) বলে। উপরিউক্ত দুই প্রকার প্রস্রবণ ছাড়া আরও একপ্রকার প্রস্রবণ পাওয়া যায়, যাকে অনিয়মিত প্রস্রবণ (periodic spring) বলে। যখন বৃষ্টিপাত বা অন্যান্য উৎস থেকে নিঃসৃত জলের পরিমাণ ব্যাতিরেকে শুধুমাত্র ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী বা ভৌম জলতলের ওঠানামার কারণে যে সকল প্রস্রবণের জল অনিয়মিতভাবে পাওয়া যায়, তাদের অনিয়মিত প্রস্রবণ বলে। সাধারণতঃ বাষ্পীয় প্রস্বেদন, বায়ুচাপজনিত স্থানীয় জলবায়ুর পরির্বতন এবং জোয়ার ভাটাজনিত আবদ্ধ অ্যাকুইফারের জলের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে এই প্রকার প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়।

শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী প্রস্রবণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of springs on the basis of structure) :—ভূ-তত্ত্ববিদগণ শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী প্রস্রবণের শ্রেণীবিভাগ করেন। এদের মধ্যে চ্যুতির ও ফাটল বা দারণ প্রস্রবণ (fault & joint spring), ভৃগুতট পাদদেশীয় প্রস্রবণ (scarp-foot spring), নাতি-ঢাল প্রস্রবণ (dipslope spring), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কার্স্ট (Karst) ভূমিরূপ অঞ্চলে ও চক (chalk) অঞ্চলে অপ্রবেশ্য কাদাপাথর এবং প্রবেশ্য চুনাপাথর, চক বা বেলেপাথরের সংযোগ রেখা বরাবর ভৃগুর পাদদেশে যে ভৌমজল ভূ-পৃষ্ঠে নির্গত হয়, তাকে ভৃগুতট পাদদেশীয় প্রস্রবণ বলে।

অনেক সময় শিলাস্তরের নতি-ঢাল বরাবর যে প্রস্রবণের সৃষ্টি হয় তাকে নতি-ঢাল প্রস্রবণ বলে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ভূমির ঢাল এবং শিলাস্তরের নতি (dip) যখন একই দিকে দেখা যায়, অর্থাৎ যেদিকে ভূমির ঢাল সেদিকেও নতির ঢাল থাকে, তাকে নতি-ঢাল বলে (dip-slope)।

শিলাস্তরের চ্যুতি বা গঠনগত ফাটল এবং দারণের উপস্থিতির ফলে যখন প্রবেশ্য শিলাস্তর অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপরে অবস্থান করে, তখন অ্যাকুইফার স্তর থেকে ভৌমজল ঐ প্রবেশ্য স্তরের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে বর্হিগত হয়, এই প্রকার প্রস্রবণকে চ্যুতিপ্রস্রবণ, ফাটল প্রস্রবণ এবং দারণ প্রস্রবণ বলে অনেক সময় ভূ-অভ্যন্তরে কোন ডাইক (dyke) বা সিল (sill) যখন প্রবেশ্য শিলাস্তরকে স্পর্শ করে এবং ভৌমজল বিশেষতঃ আগ্নেয় বা ম্যাগমাটিক বা উৎস্যন্দ জল ভূ-পৃষ্ঠে নির্গত হয়, তখন সেই প্রকার প্রস্রবণ ডাইক প্রস্রবণ বলে।

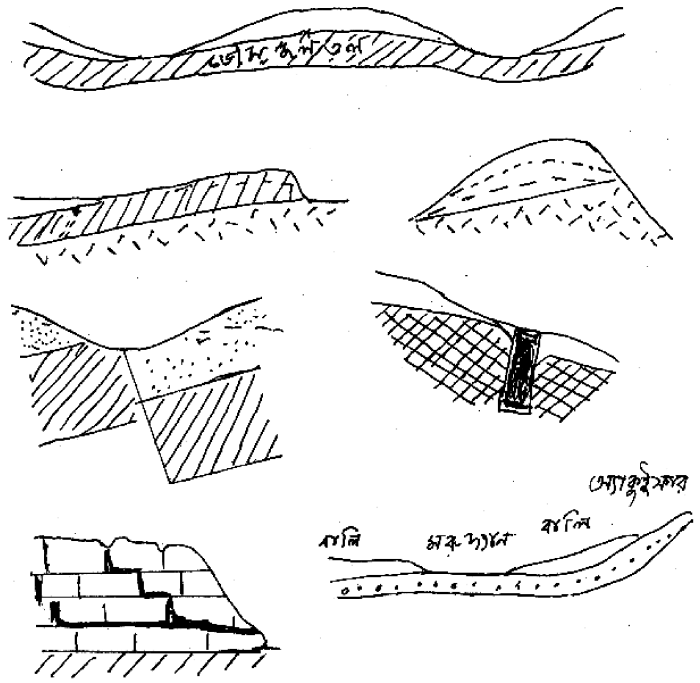

(চিত্র 10.7)

চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চল বা কার্স্ট অঞ্চলে, বৃষ্টির জল ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হলে 'সিঙ্ক হোল' বা 'সোয়ালো হোল'-এর মাধ্যমে ঐ বৃষ্টির জল ভূগর্ভ অনুপ্রবেশ করে এবং ভৌজলতলের ঢাল বরাবর প্রবাহিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবেশ্য চুনাপাথর যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের তলকে স্পর্শ করে, তখন পুনরায় ভৌম জল ভূ-পৃষ্ঠে বর্হিগত হয়। সাধারণতঃ রাইজ অথবা রিসারজেন্স (Rise or Resurgence)-এর মাধ্যমে ভৌমজল ভূ-পৃষ্ঠে প্রস্রবণের আকারে নির্গত হয়। এই প্রকার প্রস্রবণ ফ্রান্সের রোন উপত্যকায় (Rhone valley) দেখা যায় এবং 'ফন্‌তেন্‌ দ্য ভ্যক্লুস' (Fontanne de Vaucluse) নামে পরিচিত। এই কারণে এই সকল প্রস্রবণকে ভ্যুক্লুসিয় প্রস্রবণ বলে।

বৃষ্টির জল অনেক সময় ভূগর্ভের গভীরে প্রবেশ করলে সেখানে অত্যধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত হয় এবং ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে ভূপৃষ্ঠে নির্গত হয়। এই প্রকার প্রস্রবণকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলে। ভারতের বীরভূম (বক্রেশ্বর), সিমলা (তাতাপানি) অঞ্চলে এইপ্রকার উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়। ভূ-অভ্যন্তরের অনেক গভীরে প্রচুর পরিমাণ খনিজ পদার্থ গভীর ভৌমজলের মাধ্যমে দ্রবীভূত হয় ও উষ্ণ প্রস্রবণের মাধ্যমে নির্গত হয়, তাই এই প্রকার প্রস্রবণকে খনিজ প্রস্রবণ (mineral spring) ও বলা হয়।

যে সকল উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে জল ও বাষ্প নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রবলবেগে উর্ধ্বেউৎক্ষিপ্ত ও নির্গত হয়, তাদের গিসার (gyser) বলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়লোস্টোন পার্কে এই প্রকার গিসার ওল্ড ফেথ্‌ফুল গিসার নামে পরিচিত এবং প্রায় ১ ঘণ্টা অন্তর অন্তর 50-60 মিটার উর্ধ্বে জলোৎক্ষেপ হয়।

ভৌমজলের পরিচলনের ক্ষেত্রে আর্টেজীয় কূপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন দুটি অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে প্রবেশ্য স্তর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে অবস্থান করে এবং বৃষ্টির জল ঐ প্রবেশ্যস্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই জল ঐ অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবেশ্যস্তরের জলের চাপ অনুযায়ী প্রবলবেগে ভূপৃষ্ঠে নির্গত হতে পারে। ফ্রান্সের আর্তোয়া (Artois) অঞ্চলে সর্বপ্রথম এই কূপ খনন করা হয় বলে একে আর্টেজীয় কূপ বলে। আর্টেজীয় কূপের মাধ্যমে শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় এবং ভারতের আমেদাবাদ জেলার বীরমগন্ত অঞ্চলে এই প্রকার আর্টেজীয় কূপের সাহায্যে জলসেচ করা হয়। (চিত্র নং 10.8)

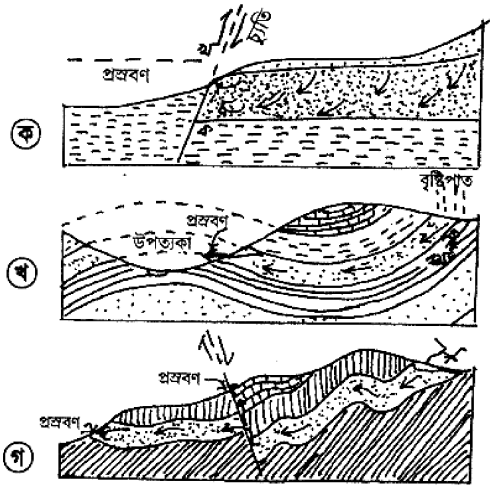

চিত্র : অ্যাকুইফার অবস্থা অনুযায়ী তিন প্রকার প্রস্রবণ :
(ক) চ্যুতির ফলে গঠিত ;
(খ) হাইড্রস্ট্যাটিক চাপের ফলে সৃষ্ট ;
(গ) চ্যুতিরেখা বরাবর ভৌমজলের নির্গমন ও প্রস্রবণের গঠন।

(চিত্র 10.8)

10.9 সারাংশ

ভৌমজল পৃথিবীর জলসম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভূ-তাত্ত্বিক গঠন, ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ভৌম জলতল, অ্যাকুইফারের অবস্থান প্রভৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ভৌম জলস্তরের সৃষ্ট হয়। ভৌম জল প্রণালী একটি মুক্ত জলপ্রণালীর উদাহরণ। ভৌম জল বাজেট অনুযায়ী, স্থান ও কাল অনুযায়ী ভৌমজলের তারতম্য হয়। শিলাস্তরের ও মৃত্তিকার অনুছিদ্র স্থান, প্রবেশ্য পথ এবং বিভিন্ন প্রকার অ্যাকুইফারের অবস্থান অনুযায়ী ভৌমজলের পরিচলন ও প্রবাহ ঘটে। ভৌমজলের উৎস নানান প্রকার হয়। তাদের মধ্যে ম্যাগ্‌মাটিক বা উৎস্যন্দ জল, সমুদ্রের জল, মেটিওরিক জল, রূপান্তরিত জল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভৌমজলের পরিচলনের ক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলধারার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভৌমজল পরিচলনে নীতি ডার্সির সূত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। পরিশেষে, ভৌমজলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার প্রস্রবণের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

10.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(1) ভৌমজল কাকে বলে ? (2)
(2) ফ্রিয়েটিক স্তর কাকে বলে ? (2)
(3) বাতাস্বয়ন স্তর কাকে বলে ? (2)
(4) সংপৃক্ত স্তরের ভূমিকা কি ? (2)
(5) সহজাত বা আবদ্ধ জল কাকে বলে ? (2)
(6) মিটিওরিক জল কাকে বলে ? (2)
(7) ভ্যাদোস জল কাকে বলে ? (2)
(8) ম্যাগমাটিক জলের সংজ্ঞা দিন। (2)
(9) কৈশিক স্তরে কী ভৌমজলের কী প্রক্রিয়া দেখা যায় ? (2)
(10) প্রস্রবণের সংজ্ঞা দিন। (2)
(11) বাতাস্বয়ন স্তর ও সংপৃক্ত স্তরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? (4)

(12) অ্যাকুইফারের শ্রেণীবিভাগ করুন। (4)
(13) প্রস্রবণের শ্রেণীবিভাগ করুন। (4)
(14) শিলার প্রবেশ্যতা ও সছিদ্রতার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? (4)
(15) ভৌমজল প্রণালীর প্রকৃতি আলোচনা করুন। (4)
(16) ভৌমজল বাজেট কাকে বলে ? এই বাজেট কখন ধনাত্মক এবং কখন ঋণাত্মক হয় ? (4)
(17) ভৌমজল কোন কোন কারণে নিয়ন্ত্রিত হয় ? (4)
(18) ভৌমজলচক্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (4)
(19) ভৌমজলের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (4)
(20) ভৌমজলের উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ করুন। (4)
(21) **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান 4 নম্বর)**
(a) অনুছিদ্র স্থান
(b) মৃত্তিকা জলস্তর
(c) ভৌমজলবিভাজিকা
(d) ডার্সির সূত্র
(e) বের্‌নৌলির সমীকরণ
(f) পি জ্যোমেট্রিক পৃষ্ঠতল
(g) পাখির দাঁড় বিশিষ্ট অ্যাকুইফার
(22) ভৌমজলের প্রকার ও নিয়ন্ত্রণকারী কারণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (10)
(23) ভৌমজলের পরিচলন এবং প্রবাহ চিত্র সহযোগে বর্ণনা করুন। (10)
(24) অ্যাকুইফার কাকে বলে ? অ্যাকুইফারের প্রকৃতি ভৌমজলের পরিচলনকে কিভাবে প্রভাবিত করে ? (10)
(25) **অব্‌জেকটিভ্‌ প্রশ্ন ঃ**
A. ভুল শব্দ কেটে দিন ঃ
(1) ভৌমজলবিভাজিকাকে ফ্রিয়েটিক / টোপোগ্রাফিক ডিভাইড বলে।
(2) ভৌমজলতলের উপরে ভ্যাদোস / ফ্রিয়েটিক জল পাওয়া যায়।
(3) ভৌমজলের মৃত্তিকার ভিতর দিয়ে উর্দ্ধগমনকে কৈশিক / ধৌত প্রবাহ বলে।
(4) ভূগর্ভে সর্বাপেক্ষা উপরের স্তরটির নাম মৃত্তিকা জলস্তর / সংপৃক্ত জলস্তর।
B. **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**
(1) অন্তঃসলিলা নদী যখন ভূপৃষ্ঠে পুনঃপ্রবাহিত হয় তাকে —— বলে।
(2) মধ্যবর্তী ভৌমজলস্তরে —— জল বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।
(3) যে প্রবাহের মাধ্যমে ভৌমজল নদীতে প্রবেশ করে তাকে ——— বলে।
(4) মৃত্তিকায় যে ছিদ্রস্থান থাকে তাকে ——— বলে।
(5) শিলার মধ্যে যে জল ——— থাকে তাকে আবদ্ধ জল বলে।

10.11 উত্তরমালা

1. 10.2 দ্রষ্টব্য।
2. 10.4 দ্রষ্টব্য।

3.	10.4.2	দ্রষ্টব্য।
4.	10.4.5	দ্রষ্টব্য।
5.	10.6.1	দ্রষ্টব্য।
6.	10.6.4	দ্রষ্টব্য।
7.	10.7.8	দ্রষ্টব্য।
8.	10.6.2	দ্রষ্টব্য।
9.	10.4.4	দ্রষ্টব্য।
10.	10.8.5	দ্রষ্টব্য।
11.	10.4.2, 10.4.5	দ্রষ্টব্য।
12.	10.7.7	দ্রষ্টব্য।
13.	10.7.5, 10.7.6	দ্রষ্টব্য।
14.	10.8.1	দ্রষ্টব্য।
15.	10.7.1	দ্রষ্টব্য।
16.	10.7.1	দ্রষ্টব্য।
17.	10.7	
18.	10.7.1	
19.	10.3	
20.	10.6	
21.	(a) 10.5.5	
	(b) 10.4.1	
	(c) 10.5.2	
	(d) 10.8.1	
	(e) 10.8.1	
	(f) 10.7.7	
	(g) 10.7.7	
22.	10.7	
23.	10.8	
24.	10.7.7	

10.12 গ্রন্থপঞ্জী

1. Todd, D. K., Ground Water Hydrology, (1959) John Wiley & Sons Inc. London.
2. Kuenen, P.H. Realms of water (1963), John Wiley & Sons Inc. New York.
3. Brator W. Hydrology, Wiley International 1978
4. Mienzer, Hydrology, Methnen & Co. Ltd. 1975
5. Chorley, R. (Ed.) Water, Earth & Man, Methnen & Co. 1975
6. Singh V.P. Elementary Hydrology, Prentice Hall of India, New Delhi, 1994.

একক 11 ❑ মহাসাগর তলের ভূপ্রকৃতি (Topography of the Ocean floor)

গঠন

11.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

11.2 মহীসোপান

11.3 মহীঢাল

11.4 গভীর সমুদ্রের সমভূমি

11.5 সামুদ্রিক শৈলশিরা

11.6 সমুদ্রখাত

11.7 প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূপ্রকৃতি

11.7.1 শৈলশিরা ও উচ্চভূমি

11.7.2 বেসিন ও খাত

11.7.3 দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ

11.7.4 প্রান্তদেশীয় সাগরসমূহ

11.8 আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূপ্রকৃতি

11.8.1 শৈলশিরা ও উচ্চভূমিসমূহ

11.8.2 বেসিনসমূহ

11.8.3 খাতসমূহ

11.8.4 দ্বীপসমূহ

11.8.5 সীমান্তবর্তী সাগরসমূহ

11.8.6. মহীসোপান

11.9 ভারত সমহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি

11.9.1 শৈলশিরা ও উচ্চভূমিসমূহ

11.9.2 বেসিনসমূহ

11.9.3 খাত

11.9.4 দ্বীপসমূহ

11.9.5 প্রান্তদেশীয় সমুদ্র

11.9.6 মহীসোপান

11.10 সুমেরু মহাসাগর

11.10.1 ভূপ্রকৃতি

11.10.2 শৈলশিরা
11.10.3 দ্বীপসমূহ
11.10.4 প্রান্তদেশীয় সমুদ্র
11.11 কুমেরু মহাসাগর
11.11.1 সমুদ্র তলদেশের ভূপ্রকৃতি
11.11.2 প্রান্তদেশীয় সমুদ্র
11.11.3 দ্বীপসমূহ
11.12 সমুদ্র স্রোত
11.12.1 সমুদ্রস্রোতের দিক
11.12.2 আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত
11.12.3 প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
11.12.4 ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
11.12.5 সমুদ্র স্রোতের প্রভাব
11.13 সারাংশ
11.14 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
11.15 উত্তরমালা

11.1 প্রস্তাবনা

আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি যে পৃথিবীর মোট অংশের শতকরা প্রায় 71.4 ভাগ এবং 28.6 ভাগ যথাক্রমে জল এবং স্থলভাগ দ্বারা আবৃত ; এই বিপুল জলরাশির (যা আমাদের কাছে সমুদ্র নামে পরিচিত) তলায় ভূমিরূপ কেমন, সে সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। গত 1872-76 সালে, ব্রিটিশ জাহাজ 'চ্যালেঞ্জারের' সাহায্যে অতল জলরাশির নীচে সমুদ্রতলের ভূমিরূপ জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক অভিযান আমাদের মানসিক ক্ষুধা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারেনি। তারপর আরও বহু বহু অভিযানের পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, সমুদ্রতল সম্পর্কে ব্যাপক অভিযান ও গবেষণা শুরু হয় ; আজ আমরা সমুদ্রের তলার ভূমিরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন উপায়ে (methods) অনেক তথ্যই পেয়েছি। সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোও শুরু হয়েছে। সাধারণতঃ যে বিজ্ঞানে সমুদ্র সংক্রান্ত সকল বিষয়, যেমন সমুদ্র জলের প্রকৃতি (লবণতা, রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি), উষ্ণতা বিচলন (জোয়ারভাটা, সমুদ্রস্রোত, তরঙ্গ ইত্যাদি), জলের গভীরতা, সমুদ্রের তলদেশের ভূপ্রকৃতি, জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন করা হয়, তাকে সমুদ্রবিজ্ঞান (Oceanography) বলা হয়। আমাদের দেশে গোয়ার পানাজিতে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশোনগ্রাফী' অবস্থিত।

অতীতে অগভীর সমুদ্র অঞ্চলে কাঠের লাঠির সাহায্যে (wooden pole) অথবা জাহাজের ধারে, শক্ত তারের মাথায় ভারী জিনিষ ঝুলিয়ে দিয়ে সাধারণতঃ গভীরতা অথবা সঞ্চিত দ্রব্যের প্রকৃতি মাপার চেষ্টা করা হত। তারপর, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে অনেক কিছুই। বর্তমানে echo-sounder-এর সাহায্যে সমুদ্র তলের প্রকৃতির অনেকটাই জানা যায়। সাধারণতঃ শব্দ গ্রাহক যন্ত্রের

(receiver) সাহায্যে শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে, তার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি (sound and echo)-র সময় লিপিবদ্ধ (chart recorder) করে, সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয় ; এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের গভীরতা নির্ভুলভাবে জানা যায়। এছাড়া ড্রেজিং দ্বারা, অথবা নিঃশ্বাসের নল (breathing tube) লাগিয়ে একজন ডুবুরীর পক্ষে 50 মিটার পর্য্যন্ত নীচে নেমে সমুদ্র তলের অনেক কিছুই জানা সম্ভব হয়। পরিশেষে বর্তমানে কমপিউটারাইজ্‌ড্‌ ক্যামেরার সাহায্যে সমুদ্র তলদেশের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং তার সাহায্যে সমুদ্র তলদেশের সঠিক মানচিত্র তৈরীর কাজ এগিয়ে চলেছে। সাধারণতঃ সমগভীরতা রেখা (isobath)-র সাহায্যে সমুদ্রের ভূমিরূপ তথা গভীরতা দেখানো হয়ে থাকে। সুতরাং এই অধ্যায়ে সমুদ্রতলের ভূমিরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে এবং সমুদ্র তলের বিভিন্ন অংশ কত গভীর, কেমন তাদের চেহারা, কি কি দ্রব্য সঞ্চিত আছে, কেমন করে তাদের উৎপত্তি হল ইত্যাদি অনেক কিছুই আপনারা জানতে পারবেন। (চিত্র নং 11.1)

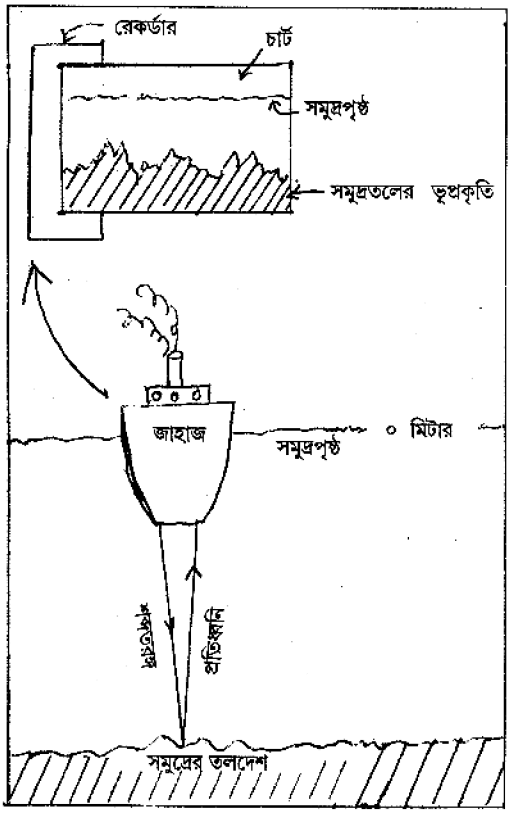

শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে জাহাজ থেকে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়

(চিত্র 11.1)

সমুদ্রবিজ্ঞানীদের সমীক্ষার ফলে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে মহাসাগরের তলদেশকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—(1) মহীসোপান, (2) মহীঢাল, (3) গভীর সমুদ্রের সমভূমি ও মালভূমি (4) সমুদ্রের শৈলশিরা, (5) গভীর সমুদ্রখাত। (চিত্র নং 11.2)।

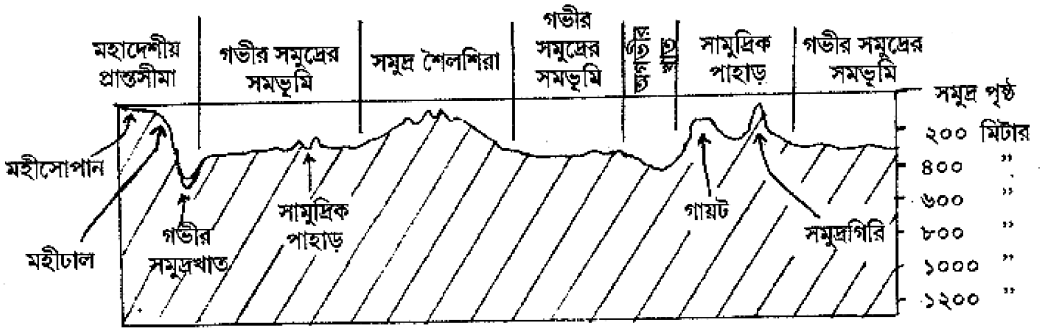

মহাসাগর তলের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ

(চিত্র 11.2)

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি,

- সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- পৃথিবীর পাঁচটি মহাসাগর যেমন প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগর সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- মহাসাগরগুলির ভূপ্রকৃতি, যেমন—শৈলশিরা ও উচ্চভূমি বেসিন ও খাত এছাড়া দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ, প্রান্তদেশীয় মহাসাগর ইত্যাদি বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

11.2 মহীসোপান (Continental shelf)

মহাদেশের উপকূলের প্রান্ত বা শেষ অংশ থেকে যে ভূভাগ ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সমুদ্রের তলায় নেমে যায়, সেই ভূভাগকে মহীসোপান বলা হয় ; বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী Monkhouse-এর মতে “অমাবস্যা ও পূর্ণিমা” তিথিতে, ভরা ভাটার সময়, সমুদ্রপৃষ্ঠের নিম্নসীমা উপকূলভাগে, যেখান পর্য্যন্ত নেমে আসে, সেই উপকূলরেখা থেকে সমুদ্রের 110 ফ্যাদম (অর্থাৎ প্রায় 200 মিটার) গভীরতা বিশিষ্ট মগ্ন অঞ্চলকে মহীসোপান বলে।

প্রতিটি মহাদেশের উপকূলভাগে মহীসোপান আছে, মহীসোপান সাধারণতঃ খুব মৃদু ঢালে (10 ও তার কম ঢালের পরিমাণ) সমুদ্রের দিকে নেমে যায় ; গঠনের দিক থেকে মহীসোপান হল মহাদেশেরই মগ্ন অংশ এবং মহীসোপানের প্রান্তভাগই মহাদেশের শেষ সীমা নির্দেশ করে। এই মহীসোপান অঞ্চলে নানা রকম পলি, মাটি, বালি ও নুড়ি পাথর সঞ্চিত থাকে।

মহীসোপানের বিস্তার বিভিন্ন উপকূলের বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মহীসোপান কোথাও চওড়া, কোথাও সংকীর্ণ। সাধারণত, মহীসোপানের প্রশস্ততা নির্ভর করে উপকূলভূমির প্রকৃতির ওপর। সাধারণতঃ, উপকূলভূমিটি নিম্ন সমভূমি হলে, অথবা ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নামলে মহীসোপান প্রশস্ত হয়, যেমন সুমেরু অঞ্চলে। উত্তর এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, প্রধানত বেরিং সাগর থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত মহীসোপান অত্যন্ত চওড়া। আবার ভঙ্গিল পর্বতমালা অঞ্চলে ও ভূমিকম্প অধ্যুসিত অঞ্চলে মহীসোপান সংকীর্ণ হয়। আবার প্রবাল অধ্যুসিত

অঞ্চলে মহীসোপান অগভীর প্রকৃতির হয়, অন্যদিকে কুমেরু মহাদেশের চারিদিকে মহীসোপান অত্যন্ত গভীর। কখনও কখনও মহীসোপান অঞ্চলে নদী উপত্যকার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এই উপত্যকাগুলি মহীসোপান অতিক্রম করে গভীর সমুদ্রের দিকে বিস্তার লাভ করেছে। যেমন, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে জাইরে নদীর ক্ষেত্রে। এই উপত্যকাগুলি দেখে ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, হয় ভূমি সেখানে বসে গেছে (subside), অথবা সমুদ্র পৃষ্ঠ উঁচু হয়েছে। অনেকে আবার ধারণা করেন যে, উপকূলভাগ সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবার ফলে অথবা নদীবাহিত ক্ষয়জাত পদার্থসমূহ উপকূলে সঞ্চিত হবার ফলে মহীসোপানের উৎপত্তি হয়েছে।

যে ভাবেই উৎপত্তি হোক না কেন, বর্তমান জগতে মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন—

(i) এই অঞ্চলেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলি গড়ে উঠেছে। এখানেই প্ল্যাংকটনের উপস্থিতির জন্য মাছের সর্ব্বাধিক সমাবেশ দেখা যায়। যেমন গ্র্যান্ড ব্যাংক, ডগার্স ব্যাংক, জর্জেস ব্যাংক, সিডার পেট ব্যাংক ইত্যাদি। (চিত্র 11.3)।

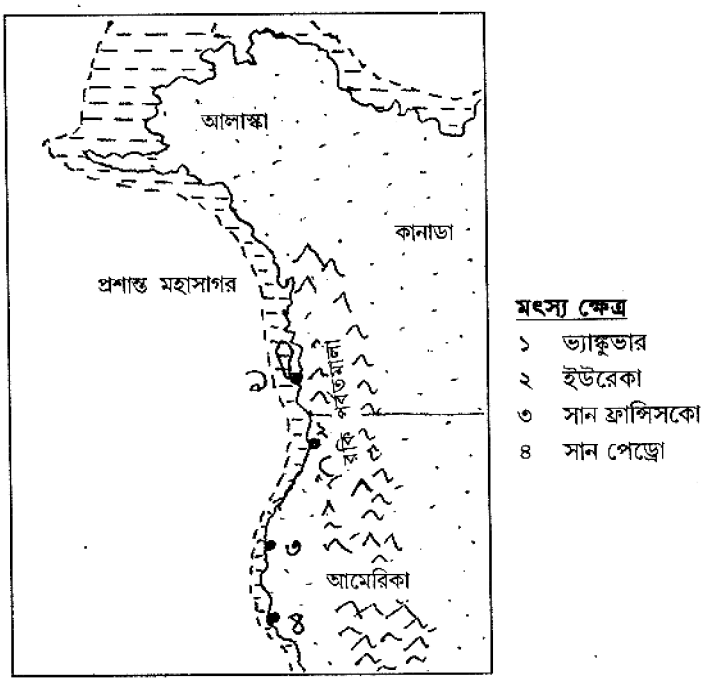

উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের রকি পর্বতমালা অঞ্চলের পাশে অবস্থিত মহীসোপান অত্যন্ত সংকীর্ণ প্রকৃতির।

(চিত্র 11.3)

(ii) মহীসোপান অঞ্চল থেকে বহুদেশে পেট্রোলিয়াম ও স্বাভাবিক গ্যাস উত্তোলন করা হয়, যেমন উত্তর সাগরের বিশাল তৈলভাণ্ডার।

(iii) মহীসোপান অঞ্চলের উপকূলরেখা ভগ্ন হলে বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

(iv) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষিত বিশাল খাদ্য ভাণ্ডারের উৎস হিসাবে এই অঞ্চলকে গণ্য করা হয়ে থাকে। (চিত্র নং 11.4)

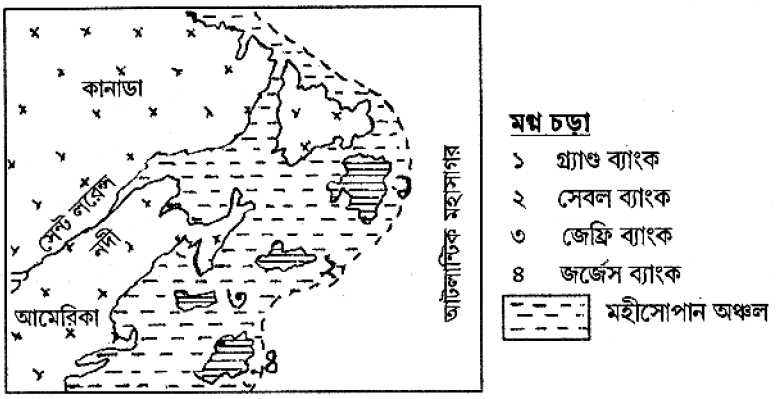

উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরীয় মৎসক্ষেত্র সমূহ

(চিত্র 11.4)

11.3 মহীঢাল (Continental slope)

মহীসোপানের প্রান্তভাগ থেকে সমুদ্রের তলদেশ হঠাৎ বেশী ঢালু হয়ে যায়। যে স্থান থেকে মহীসোপানের ঢাল, হঠাৎ করে অত্যন্ত বেশী হয়ে যাচ্ছে, তাকে আমরা সোপানের **ছেদ বিন্দু** (shelf break) বলে উল্লেখ করে থাকি। এই ছেদ বিন্দু থেকেই সমুদ্রের তলদেশ হঠাৎ বেশী ঢালু হয়ে যায়, একেই মহীঢাল বলা হয়। মহীঢালের ঢাল সাধারণতঃ $2^{\circ} - 5^{\circ}$ হয়। কোথাও কোথাও 15° পর্য্যন্ত ঢাল দেখতে পাওয়া যায়। ঢাল অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এই বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত কম। এর গভীরতা কিন্তু অনেক বেশী। মোটামুটিভাবে মহীঢালের গড় গভীরতা 200 মিটার থেকে 2000 মিটার বা তারও বেশী হতে পারে। (চিত্র নং 11.5)।

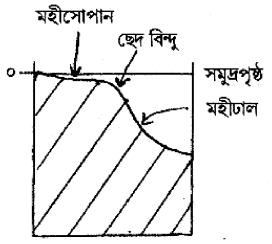

ছেদ বিন্দু (shelf break) থেকে সমুদ্রের তলদেশের ঢাল হঠাৎকরে বৃদ্ধি পায় ও মহীঢাল গঠন করে।

(চিত্র 11.5)

মহীঢালে, ভূমির ঢাল অত্যন্ত বেশী হয় ; ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলে সঞ্চয় অত্যন্ত কম সাধারণতঃ লাল, নীল ও সবুজ রংয়ের কাদা ও প্রবাল দেখা যায় এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষও সঞ্চিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে মহীঢাল হল খাড়া ভূমি ঢাল, যা মহীসোপানের প্রান্তভাগ থেকে খাড়া (steep) ভাবে নেমে গভীর সমুদ্রের সমভূমির সঙ্গে গিয়ে মিলেছে ; এই স্থানের ভূপ্রকৃতির মধ্যে প্রধান হল সামুদ্রিক, গভীর গিরিখাত (submarine canyons) এবং সংকীর্ণ নিম্নভূমি (trenches) এই গভীর গিরিখাতগুলি দেখতে, অনেকটাই স্থলভাগের নদী উপত্যকার মত—সেই 'V' আকৃতির উপত্যকা, আঁকাবাঁকা নদী পথ এবং অসংখ্য উপনদীর উপস্থিতি।

মহীঢালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের মতামত শোনা যায় ; অনেকের মতে, গভীর সামুদ্রিক গিরিখাতগুলি প্রধানত সামুদ্রিক তরঙ্গের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গঠিত হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী ভূগাঠনিক শক্তির (tectonic force) ওপর জোর দিয়েছেন ; এঁদের মতে, মহাদেশের প্রান্তসীমায় চ্যুতির ফলে মহীসোপানের সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকের মতে, মহাদেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত মহীসোপান কাত হবার ফলে এবং বেঁকে যাবার জন্য (bending and warping of continental shelf), এবং পরবর্তী পর্যায়ে, সে স্থানে সঞ্চয়ের ফলে মহীঢাল গঠিত হয়েছে।

11.4 গভীর সমুদ্রের সমভূমি (Deep sea plain, Abyssal plain)

মহীঢালের শেষ প্রান্ত থেকেই গভীর সমুদ্রের সমভূমি শুরু হয়ে যায়। এই অঞ্চল সাধারণভাবে সমতল হলেও জায়গায় জায়গায় বেশ উচু নীচু এবং তরঙ্গায়িত। 1947 সালের গ্রীষ্মকাল থেকে পনের মাস অ্যালবাট্রস (Albatross) জাহাজে করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে দেখা যায় যে গভীর সমুদ্রে বহু মালভূমি, উচ্চভূমি, পাহাড়, শৈলশিরা, খাদ ইত্যাদি রয়েছে।

এই গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চল সমুদ্রের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ জায়গা জুড়ে আছে। এই অঞ্চলের গভীরতা মোটামুটিভাবে 3000 - 5000 মিটারের মধ্যে থাকে।

এই অঞ্চলে সঞ্চয়ের পরিমাণ সবথেকে বেশী। এখানে, নানা রংয়ের ও নানা রকমের বালি, নুড়ি, পাথর, কাদা, প্রবাল কীট, বিভিন্ন রকমের সামুদ্রিক প্রাণী, খনিজ পদার্থ ইত্যাদির সঞ্চয় দেখতে পাওয়া যায়। এই সঞ্চয়ের ফলে সমুদ্রের তলদেশের অসমতা কিছুটা দূর হয়।

11.5 সামুদ্রিক শৈলশিরা (Oceanic Ridges)

গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মধ্যেই অনেক জায়গায় পাহাড় পর্বত, আগ্নেয়গিরি ও শৈলশিরা দেখা যায়। সাধারণতঃ, যে সব জায়গায় ক্ষুব্ধ মণ্ডলের (sub stratum) গলিত ম্যাগমা আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে লম্বা, দীর্ঘ আকৃতির ভূমিরূপ সৃষ্টি করে, সেখানে শৈলশিরা দেখা যায়। কখনও কখনও আগ্নেয়শৃঙ্গাগুলি খাড়াভাবে ওপরের দিকে উঠে আছে কিন্তু সমুদ্রের জলের ওপরে যায়নি, তাদের সমুদ্রগিরি (sea mount) বলে এবং মাথা চ্যাপ্টা, টেবিল আকৃতির পাহাড়কে গিয়াট (guyot) বলে। অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে গিয়াটগুলি হল সম্ভবত তরঙ্গাকর্তিত আগ্নেয়গিরি। প্রশান্ত মহাসাগরেই প্রায় ১০ হাজার সমুদ্রগিরি ও গিয়াট আছে।

11.6 সমুদ্রখাত (Ocean Deeps)

গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে মাঝে অত্যন্ত গভীর খাত অবস্থান করে ; এই খাতগুলিকে সমুদ্র খাত বলা হয়ে থাকে। এরা, সমুদ্রের মাত্র 1.2% অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। অনেক সময়ে এই সংকীর্ণ, দীর্ঘায়ত খাতগুলি উপকূলের কাছে উপকূলের সমান্তরালে বিস্তার লাভ করেছে এবং ভঙ্গিল পর্বতদ্বারা সীমায়িত (terminated) হয়েছে। সাধারণভাবে, সামুদ্রিক পাত ও মহাদেশীয় পাতের সংযোগস্থলে গভীর খাতগুলি বিরাজ করে। এই দীর্ঘ

খাতগুলির মহাদেশের দিকের ঢালটি বেশী হয় এবং উন্মুক্ত সমুদ্রের দিকের ঢালটি অপেক্ষাকৃত কম হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে উত্তর-পশ্চিম এ্যালুসিয়ান খাত, কিউরাইল খাত, জাপানখাত ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। (চিত্র নং 11.6)

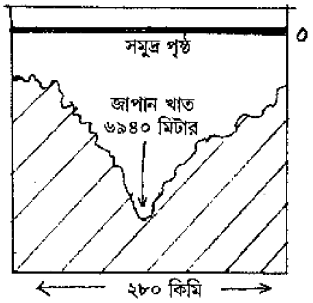

উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত জাপান খাত

(চিত্র 11.6)

সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি জানার পর এবার আমরা প্রত্যেকটি সমুদ্রতলের সম্বন্ধে আলাদাভাবে আলোচনা করব। এর থেকে আমরা জানতে পারব, কোন সাগরতলের মধ্যে কি ধরণের পাহাড় পর্বত, আগ্নেয়গিরি, গভীর নীচু জায়গা, শৈলশিরা ইত্যাদি আছে ; সমুদ্রগুলির আয়তন ও গভীরতা কত, চারপাশে কোন কোন দেশ, দ্বীপপুঞ্জ, উপসাগর অবস্থান করছে ইত্যাদি।

পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর দেখা যায়, এরা হল—

(1) প্রশান্ত মহাসাগর
(2) আটলান্টিক মহাসাগর
(3) ভারত মহাসাগর
(4) সুমেরু মহাসাগর
(5) কুমেরু মহাসাগর

(চিত্র 11.7)

11.7 প্রশান্ত মহাসাগর তলদেশের ভূপ্রকৃতি (Topography of Pacific Ocean)

পৃথিবীর মহাসাগরগুলির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর হল বৃহত্তম ; এর আয়তন প্রায় ১৬ কোটি বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর মোট জলভাগের প্রায় 46% প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় রয়েছে। এই মহাসাগরের পূর্বে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিমদিকে এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ, উত্তর দিকে বেরিং প্রণালী এবং দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর ও কুমেরু মহাদেশ।

প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূপ্রকৃতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(1) এই মহাদেশের গভীরতা সব থেকে বেশী।

(2) বহু গভীর সমুদ্রখাতের অবস্থান।

(3) গভীরতম সমুদ্রখাতের অবস্থান এই মহাসাগরে।

(4) তলদেশের আয়তন পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড়।

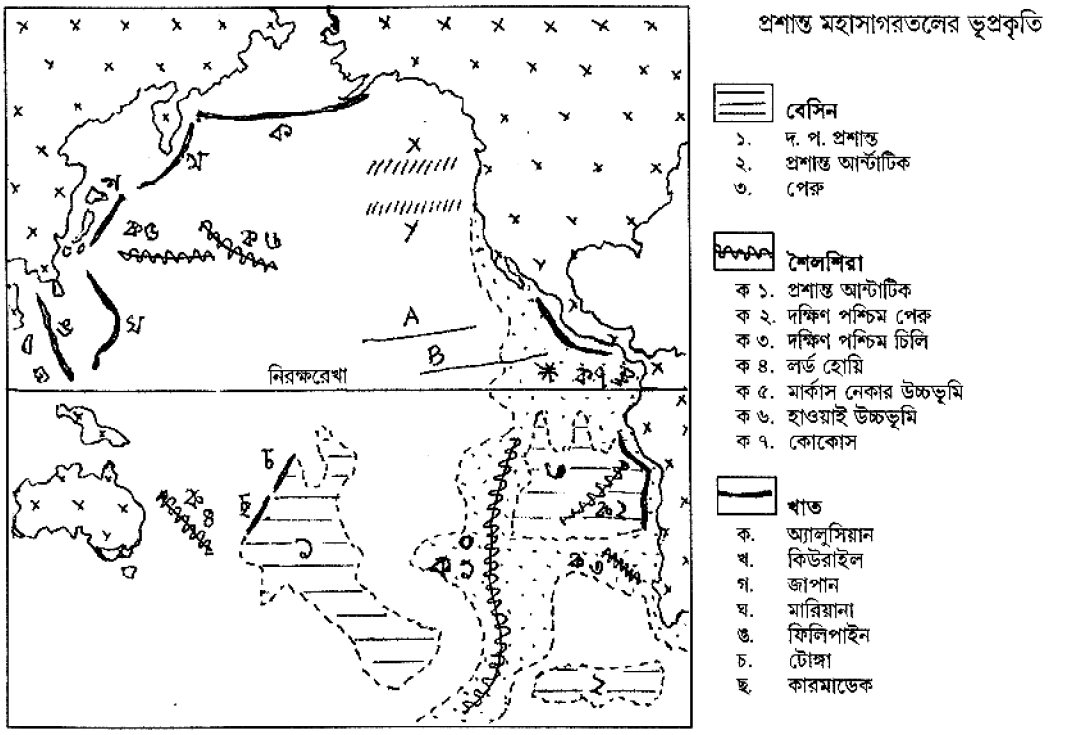

(চিত্র 11.8(a))

11.7.1 শৈলশিরা ও উচ্চভূমি (Ridges and Rises)

প্রশান্ত মহাসাগর হল পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর ; এর গড় গভীরতা হল 3940 মিটার। এর আকৃতি একটি বড় ত্রিভুজের মত ; এই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু উত্তরে বেরিং প্রণালীর কাছে অবস্থিত। এই মহাদেশের মহীসোপান অঞ্চল সংকীর্ণ এবং মহীঢাল অঞ্চল, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অত্যন্ত ঢালু

(steep) মহীঢালের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এখানে কিছু আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু শৈলশিরার অবস্থান বিশেষ দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে নিমজ্জিত শৈলশিরাগুলি চওড়া হয়ে মালভূমি গঠন করেছে ; যেমন,

(1) দক্ষিণে রয়েছে অ্যালবাট্রস (Albatross) মালভূমি,

(2) চিলির পশ্চিমে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মালভূমি,

(3) নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ পূর্ব নিউজিল্যান্ড মালভূমি,

(4) নিউজিল্যান্ড দ্বীপের উত্তর পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছে লর্ড হাউ উচ্চভূমি (Lord Howe Rise)।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগে দুটি প্রধান উচ্চভূমি আছে—মার্কাস নেকার উচ্চভূমি (Marcus Necker Rise) এবং হাওয়াই উচ্চভূমি (Hawaiiwan Swell)। এই উচ্চভূমি থেকে উত্থিত আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জেগে উঠে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলিতে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া পেরুর দক্ষিণ পশ্চিমে দেখা যায় দক্ষিণ পশ্চিম পেরু শৈলশিরা, কোকো দ্বীপের কাছে কোকস শৈলশিরা, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত অ্যান্টার্টিক শৈলশিরা ইত্যাদি।

উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের কাছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একাধিক সমুদ্রভৃগু (sea scarp) এবং বিভঙ্গ অঞ্চল (fracture zone) রয়েছে। যেমন— মেনডোসিনো ও মারে (Mendocino and Murray) সমুদ্রভৃগু এবং ক্ল্যারিয়ন (Clarion) ও ক্লিপারটন (Clipperton) বিভঙ্গ অঞ্চল।

11.7.2 বেসিন (Basin) ও খাত

প্রশান্ত মহাসাগরে বহু বেসিন বা সামুদ্রিক অববাহিকা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—(a) উত্তর ফিজি বেসিন, (b) পূর্ব ক্যারোলাইন বেসিন, (c) ফিলিপাইন বেসিন, (d) এ্যালুসিয়ান বেসিন, (e) পশ্চিম ক্যারোলাইন বেসিন, (f) দক্ষিণ ফিজি বেসিন, (g) পূর্ব অষ্ট্রেলীয় বেসিন, (h) প্রশান্ত কুমেরু মহাসাগরীয় বেসিন, (i) দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় বেসিন, (j) দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় বেসিন।

খাত (trenches and deeps)—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গভীর, দীর্ঘ খাতগুলি মহাসাগরের প্রান্তভাগে অবস্থান করছে, কখনও কখনও বা দ্বীপের সমান্তরালে এরা বিস্তার লাভ করেছে। বেশীরভাগ খাতগুলি মহাসাগরের মধ্যভাগে ও পশ্চিমভাগে দেখা যায়। পশ্চিম ভাগের সমুদ্র খাতগুলি হল—

(1) উত্তর অ্যালুসিয়ান খাত, (2) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব কিউরাইল খাত, (3) মারিয়ানা ও গুয়াম দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব মারিয়ান খাত। এই মারিয়ানা খাত হল পৃথিবীর গভীরতম, খাত ; এই খাতটির মধ্যেও একাধিক গভীর খাত দেখা যায়, যেমন খাতটির উত্তর অংশে ফ্লেমিং ডেপথ্ (Fleming Depth), দক্ষিণ অংশে নীরো ডেপথ্ (Nero Depth) এবং একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে চ্যালেঞ্জার ডেপথ্ (Challenger Depth, 11033 মি), (4) জাপানের পূর্বে জাপান খাত, (5) নিউ গিনি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মাঝে প্ল্যানেট ডেপথ্ (Planet Depth), (6) দক্ষিণ পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব দিকে টমসন ডেপথ্ (Thomson Depth), (7) ফিলিপাইনের পূর্বে আছে ফিলিপাইন খাত।

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বদিকে মাত্র দুটি উল্লেখযোগ্য সমুদ্রখাত আছে—(1) মধ্য আমেরিকান খাত, (2) গুয়াতেমালা খাত, (3) দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে অবস্থিত রয়েছে আটাকামা খাত।

এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগের খাতগুলি হল (a) হাওয়াই দ্বীপের কাছে মারে ডীপ (Murray Deep), টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকে ডোঙ্গা খাত (Tonga trench) এবং এরও দক্ষিণে, কারমাডেক দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকে কারমাডেক খাত (Karmadek trench)।

11.7.3 দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ (Islands)

ভূবিজ্ঞানীদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতটি ক্রমশঃ নিমজ্জিত হবার ফলে এই মহাসাগরীয় প্রান্তভাগে ও উপকূলে আগ্নেয়গিরি সংকুল দ্বীপমালা ও দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তি ঘটেছে। যেমন, জাপান, কিউবাইল, এ্যালুসিয়ান,

ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি। মধ্যভাগের চ্যুতিরেখা বরাবর জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত ঘটার দরুণ আগ্নেয়গিরি ও আগ্নে দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। আবার কিউরাইল, শাখানীল, হোক্কাইডো, হনসু, শিকোকু, কিউসু, তাইওয়ান, ফিলিপিনস, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, তাসমানিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দ্বীপগুলির অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এরা সকলেই মহাসাগরের পশ্চিমদিকে ধনুকের আকারের ন্যায় বেঁকে বিস্তারলাভ করেছে।

আরও একভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে ভাগ করা যায়। এরা প্রধানত মহাসাগরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থান করছে। যেমন—(a) মেলানেশিয়া—সলোমনস, নিউক্যালেডোনিয়া ইত্যাদি (Melanesia - Solomons, New Caledonia etc.)।

(b) মাইক্রোনেসিয়া—ক্যারোলিনস্, মারশালস্ ইত্যাদি (Micronesia - Carolines, Marshalls etc.)

(c) পলিনেশিয়া — কুক, সোসাইটি, টাহিতি (Polynesia - Cook, Society, Tahity etc.)।

11.7.4 প্রান্তদেশীয় সাগরসমূহ (Marginal seas)

প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানায় অবস্থিত মহাদেশগুলির উপকূলভাগ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা এবং আঁকা বাঁকা ; ফলে বহু সাগরের উপস্থিতি এইসব উপকূল অঞ্চলে দেখা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমপ্রান্তে এশিয়া মহাদেশের সংলগ্ন সাগরগুলি হল—(a) বেরিং সাগর, (b) ওখটস্ক সাগর, (c) জাপান সাগর, (d) পীত সাগর, (e) পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগর ইত্যাদি। পীত সাগর ছাড়া বাকি সাগরগুলি বেশ গভীর।

অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানায় রয়েছে—(f) কার্পেনটারিয়া উপসাগর, (g) আরাফুয়া সাগর, (h) প্রবাল সাগর, (i) টাসমানিয়া সাগর। এগুলি অত্যন্ত গভীর সাগর।

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব দিকে সাগর বা উপসাগরের সংখ্যা কম ; একমাত্র উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর, যার গভীরতা বেশী নয়। এছাড়া, আলাস্কা উপসাগর, পানামা উপসাগর, চ্যাথাম প্রণালী, জর্জিয়া প্রণালী ইত্যাদি দেখা যায়। (চিত্র নং 11.8(b))

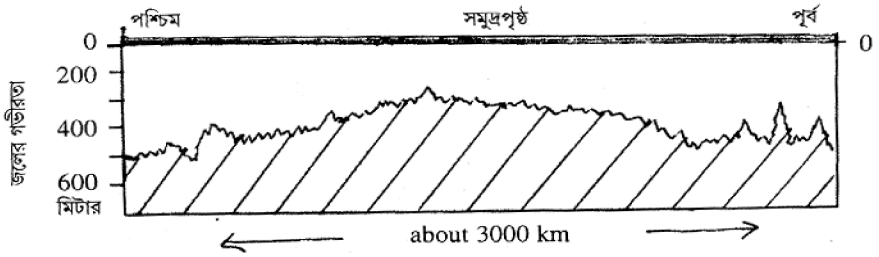

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরতলের প্রস্থচ্ছেদ

(চিত্র 11.8(b))

11.8 আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি (Topography of Atlantic Ocean)

আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত, এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর এবং এর আয়তন প্রায় 8.22 কোটি কিমি। পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা 16 ভাগ এবং পৃথিবীর মোট জলভাগের

শতকরা 23 ভাগ অংশে আটলান্টিক মহাসাগর বিস্তারলাভ করেছে। এই মহাসাগরের পূর্বদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ, পশ্চিমদিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ দিকে কুমেরু মহাসাগর ও কুমেরু মহাদেশ ও উত্তরদিকে গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, ইত্যাদি দ্বীপ অবস্থিত।

এই মহাসাগরের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(1) এই মহাদেশ অনেকটা ইংরাজী 's' অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট।

(2) আটলান্টিক মহাসাগরে সমুদ্রখাতের সংখ্যা অনেক কম।

(3) মহাসাগরের উত্তরপ্রান্তে বিস্তীর্ণ মহীসোপান দেখা যায়।

(4) মহাসাগরের মধ্যভাগে এক বিশাল, সুদীর্ঘ শৈলশিরা অবস্থান করছে।

11.8.1 শৈলশিরা ও উচ্চভূমিসমূহ (Ridges and Rises)

এই মহাসাগরের মধ্যভাগের, আটলান্টিক মহাসাগরের আকৃতির মতই 's' আকারের একটি মগ্ন শৈলশিরা রয়েছে, একে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা বলা হয় এবং এটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, গড় গভীরতা প্রায় 3000 মি। এই শৈলশিরার মাঝে, নিরক্ষরেখার ওপর রয়েছে রোমাঞ্চ খাত (Romanche Deep) অথবা রোমাঞ্চ ফাঁক (Romanche gap)। রোমাঞ্চ খাতটি মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরাকে দুটি অংশে ভাগ করেছে, উত্তরাংশকে বলা হয়, (1) ডলফিন উচ্চভূমি (Dolphin Rise) এবং দক্ষিণাংশকে বলা হয় চ্যালেঞ্জার উচ্চভূমি (Challenger Rise)।

ডলফিন উচ্চভূমিটি উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করেছে এবং নিউফাউন্ডল্যান্ড ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কাছে গিয়ে প্রশান্ত হয়ে মালভূমিতে পরিণত হয়েছে, এই মালভূমির নাম টেলিগ্রাফ মালভূমি (Telegraph plateau)।

রোমাঞ্চ খাতয়ের দক্ষিণ দিকে রয়েছে চ্যালেঞ্জার উচ্চভূমি (Challenger Rise)। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে, এই উচ্চভূমিতে অবস্থিত ট্রিস্টান ডি কুনহা (Tristan de Cunha) দ্বীপের কাছ থেকে উত্তর পূর্ব দিকে অফ্রিকা পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত একটি শৈলশিরা প্রসারিত হয়েছে, এর নাম ওয়ালভিস্ শৈলশিরা (Walvis Ridge)। এছাড়া রয়েছে আরও অনেক শৈলশিরা, যেমন রায়ো গ্রান্ডি শৈলশিরা (Rio Grande Ridge), স্কোশিয়া শৈলশিরা (Scotia Ridge), আটলান্টিক কুমের শৈলশিরা (Atlantic Antarctic Ridge) ইত্যাদি।

মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা দুপাশে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গভীর সমুদ্রের খাত (basin) গুলির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই অঞ্চলটি ভূমিকম্প প্রবণ এবং এখানে অসংখ্য চ্যুতিযুক্ত ধাপ, পাহাড় ও ফাটলযুক্ত লাভা মালভূমি, স্তুপ পর্বত, গ্রস্ত উপত্যকা ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র নং 11.10)

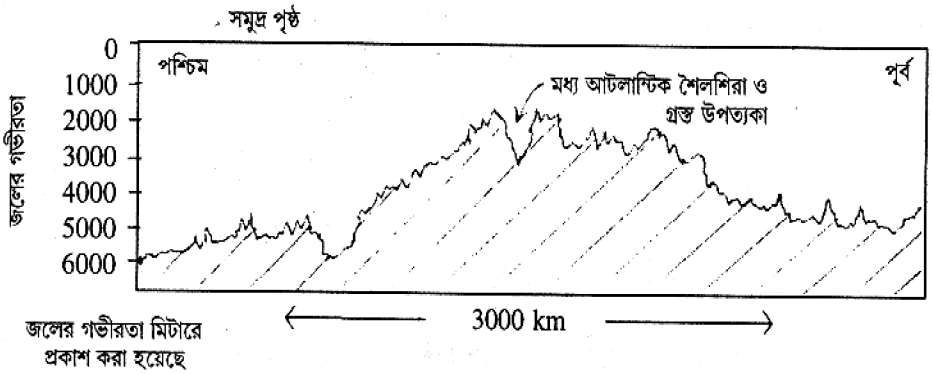

মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরার প্রস্থচ্ছেদ

(চিত্র 11.10)

11.8.2 বেসিন সমূহ (Basins)

মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরার পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকে মহাসাগরের তলদেশ ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং বিভিন্ন শৈলশিরা ও উচ্চভূমির দ্বারা নানা সামুদ্রিক অববাহিকায় (basin) বিভক্ত হয়েছে। এই অববাহিকার ভূপ্রকৃতি প্রায় সমতল এবং গড় গভীরতা প্রায় 6000 মিঃ।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে, মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরার পশ্চিমে রয়েছে উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক বেসিন এবং পূর্ব দিকে রয়েছে উত্তর পূর্ব আটলান্টিক basin এবং কেপ ভার্দে বেসিন (Cape Verde Basin)।

দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে মধ্য শৈলশিরার পশ্চিমে দেখা যায়—(1) আর্জেন্টিনা বেসিন (2) ব্রাজিল বেসিন এবং পূর্ব দিকে রয়েছে, (1) দক্ষিণে পূর্ব আটলান্টিক বেসিন, (2) আগুলহ্রাস বেসিন, (3) কেপ বেসিন। এছাড়া উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের, উত্তরাংশে স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও গ্রীনল্যান্ডের মাঝে রয়েছে নরওয়ে বেসিন, নিরক্ষরেখার কাছে রয়েছে গিনি বেসিন এবং দক্ষিণে কুমেরু মহাদেশের কাছে আছে আটলান্টিক—ভারত—কুমেরু বেসিন (Atlantic - Indian - Antarctic Basin)।

11.8.3 খাত সমূহ (Trenches and Deeps)

আটলান্টিক মহাসাগরে, প্রশান্ত মহাসাগরের মত গভীর সমুদ্রখাত বিশেষ নেই। এই মহাসাগরের প্রধান প্রধান খাতগুলি হল—(1) পোর্টোরিকোর কছে পোর্টোরিকো খাত, যার গভীরতা 929 মি. (Puerto Rico trench), (2) স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের কাছে স্যান্ডউচ খাত, (3) ডলফিন খাত, (4) মিটিয়র খাত (Meteor), (5) ডিসকভারি খাত, (6) নেয়াজ খাত (Nares Deep), কেমান খাত (Cayman Deep) ইত্যাদি। (চিত্র নং 11.9)।

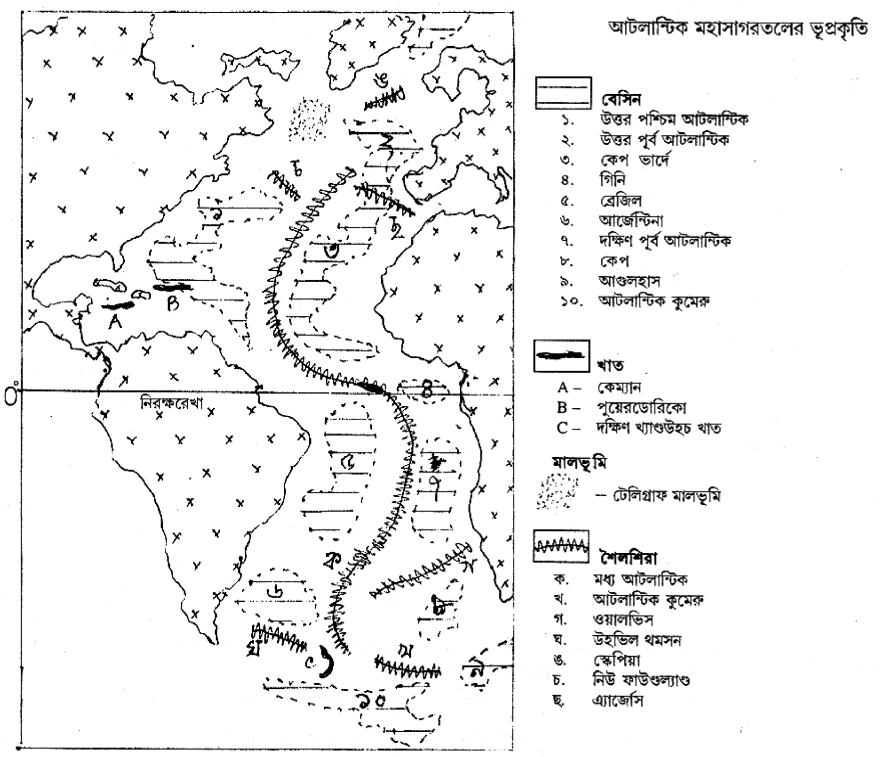

(চিত্র 11.9)

11.8.4 দ্বীপসমূহ (Islands)

এই মহাসাগরে দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের সংখ্যাও কম। এর মধ্যে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভূগঠনগত প্রক্রিয়ার ফলে (as a result of tectonic process) সাধারণতঃ লাভা দ্বারা গঠিত হয়েছে। প্রবাল কীটের দেহাবশেষ দ্বারা গঠিত হয়েছে বারমুডা দ্বীপ, এছাড়া মহীসোপানের উচ্চ অংশ দ্বারা গঠিত হয়েছে নিউফাউন্ডল্যান্ড ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ; শৈলশিরার উচ্চ অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে আইসল্যান্ড।

একইভাবে দক্ষিণে সমুদ্রে নিমজ্জিত শৈলশিরা ও মালভূমির উচ্চ অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে ফকল্যান্ড, জর্জিয়া, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি দ্বীপ।

মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরায় বহু শিখর আছে ; কোন কোন শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচু হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি করেছে, যেমন আজোর্জ (Azoris) দ্বীপপুঞ্জের পিকো দ্বীপ (Pico Island)। আবার গভীর সমুদ্রের সমভূমি থেকে উত্থিত হয়ে গঠিত হয়েছে সেন্ট হেলেনা ও ত্রিনিদাদ দ্বীপ। নিমজ্জিত মালভূমির অংশবিশেষ ওপরে উঠেও কিছু দ্বীপ গঠন করেছে, যেমন ক্যানারী (Canary), কেপ ভার্ড (Cape Verde) ইত্যাদি। (চিত্র নং 11.10)

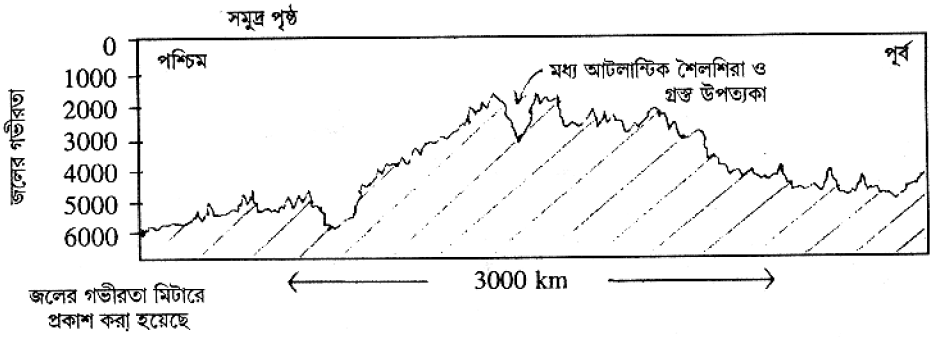

মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরার প্রস্থচ্ছেদ

(চিত্র 11.10)

11.8.5 সীমান্তবর্তী সাগর সমূহ (Marginal seas)

এই মহাসাগরের প্রান্তভাগের মহাদেশসমূহের উপকূলভাগ বঙ্কিম এবং ভগ্ন প্রকৃতির ; ফলে ভগ্ন উপকূলের খাঁজে খাঁজে সৃষ্টি হয়েছে সাগর ও উপসাগর। আবার উত্তর আটলান্টিকের তুলনায়, দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে সাগর ও উপসাগরের সংখ্যা নিতান্তই কম।

উত্তর আটলান্টিক মহাদেশের উপকূলভাগে যে সমস্ত গভীর ও অগভীর সমুদ্র এবং উপসাগর দেখা যায়,—সেগুলি হল—ইওরোপ মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত—(1) ভূমধ্যসাগর, (2) বিস্কে উপসাগর, (3) অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, (4) বাল্টিক সাগর, (5) উত্তর সাগর। অন্যদিকে আমেরিকা মহাদেশের পূর্বদিকে (উপকূলে) সংলগ্ন সাগর ও উপসাগর হল—(1) ক্যারিবিয়ান সাগর, (2) মেক্সিকো উপসাগর, (3) ব্যাফিন উপসাগর, (4) হাডসন উপসাগর। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে, সাগর ও উপসাগরের সংখ্যা অনেক কম এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ফকল্যান্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত স্কোশিয়া সাগর।

11.8.6 মহীসোপান (Continental shelf)

এই মহাসাগরের মহীসোপান অঞ্চল কোথাও প্রশস্ত, আবার কোথাও অত্যন্ত সংকীর্ণ। উপকূলে পাহাড় এবং মালভূমি থাকার জন্য মহাসাগরের পশ্চিমভাগে ব্রাজিলের কাছে এবং পূর্বভাগে উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে উত্তরে বিস্কে

উপসাগর পর্য্যন্ত মহীসোপান অত্যন্ত সংকীর্ণ ; মোটামুটিভাবে, ইউরোপের উত্তর উপকূলের মহীসোপানের প্রশস্ততা 80-150 কিমি। অপর দিকে উত্তর আমেরিকার (কানাডার) ল্যাব্রাডার উপকূলে, মহীসোপান প্রায় 200-400 কিমি চওড়া এবং এখানেই নিউফাউন্ডল্যান্ডে এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কাছে পৃথিবীর সবথেকে চওড়া মহীসোপানের ওপর গ্র্যান্ড ব্যাংক, ডগার্স ব্যাংক, মেফ্রিস ব্যাংক, সেবল ব্যাংক ইত্যাদি মাছ ধরার পক্ষে উপযুক্ত মগ্ন চড়াগুলি অবস্থিত।

দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মহীসোপানটি দক্ষিণে ক্রমশ চওড়া হয়ে দক্ষিণ পূর্বে প্রসারিত হয়েছে এবং গ্রাহাম উপদ্বীপের মহীসোপানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। (চিত্র নং 11.11)

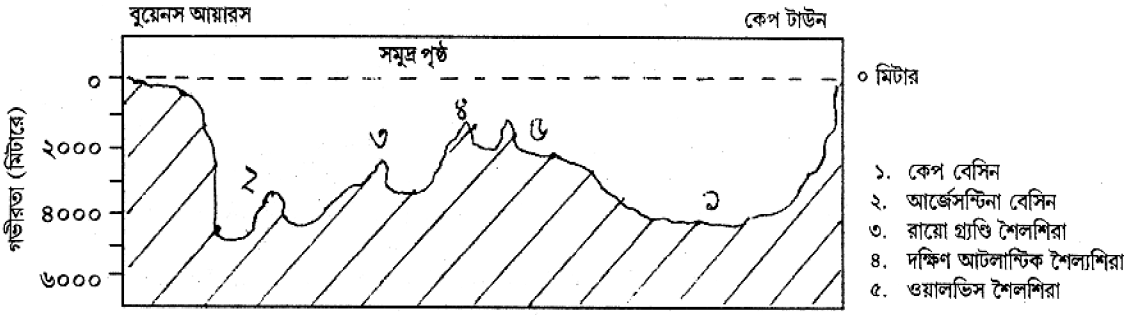

দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের প্রস্থচ্ছেদ

(চিত্র 11.11)

11.9 ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর হল ভারত মহাসাগর ; এটি পৃথিবীর প্রায় শতকরা 14 ভাগ এবং জলভাগের শতকরা প্রায় 20 ভাগ অধিকার করে আছে। এই মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় 4000 মিঃ পর্যন্ত।

ভারত মহাসাগরের উত্তরে আছে এশিয়া মহাদেশ, পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণে কুমেরু মহাদেশ। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(1) ভারত মহাসাগরের বেশীরভাগ উপকূল গন্ডোয়ানা যুগের শীল্ড মালভূমি অঞ্চলের (আফ্রিকা, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি) দ্বারা গঠিত।

(2) উত্তর গোলার্দ্ধে ভারত মহাসাগরের বিস্তার মোটামুটি ভাবে 30° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত মাত্র। তারপর এশিয়া মহাদেশ দ্বারা এই মহাসাগর আবদ্ধ হয়েছে।

(3) মায়ানমার ও ইন্দোনেশিয়ার উপকূল অঞ্চলে ভঙ্গিল পর্বতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

(4) ভারত মহাসাগরে সমুদ্রখাতের সংখ্যা অনেক কম।

(5) সবচেয়ে বেশী ঢালু মহীঢাল ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। শ্রীলংকা দ্বীপের পূর্ব দিকে এই মহীঢালটি অবস্থিত।

11.9.1 শৈলশিরা ও উচ্চভূমিসমূহ (Ridges and Rises)

এই মহাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি মগ্ন শৈলশিরা আছে ; একে মধ্য ভারত মহাসাগরীয়

শৈলশিরা বলা হয় ; এটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত শৈলশিরা (300 কিমি এবং তার বেশী)। তবে এটির গভীরতা কম (প্রায় 200 মি), ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি এটি উঠে আসেনি।

শৈলশিরাটির উত্তর অংশকে বলা হয় লাক্ষা দ্বীপ—চাগোস শৈলশিরা (Laccadive-Chagos ridge)। মধ্য অংশের নাম হল মধ্য ভারত মহাসাগরীয় উচ্চভূমি (Mid Indian Rise) এবং দক্ষিণাংশ সাধারণতঃ কারগিলিন—গাউসবার্গ শৈলশিরা (Kargueen - Gaussburg Ridge) নামে পরিচিত।

এই মধ্যভারতীয় শৈলশিরা দক্ষিণে (20° দক্ষিণে—50° দক্ষিণ অক্ষাংশ) এবং পরে পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়ে ক্র্যামস্টারড্যামসেন্ট পল মালভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই মালভূমিটি 1500 কিমি চওড়া এর পূর্ব সীমার উত্তর প্রান্ত থেকে দুটি শৈলশিরা বেরিয়ে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করেছে। এদের নাম যথাক্রমে দক্ষিণ পূর্ব ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা এবং ভারত-কুমেরু মহাসাগরীয় শৈলশিরা।

এছাড়া, মধ্যবর্তী শৈলশিরা থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য শৈলশিরা বিস্তারলাভ করছে ; এরা হল (1) সোকোত্রা (Socotra) দ্বীপ পর্যন্ত সোকোত্রা চাগোস শৈলশিরা, (2) মরিশাস দ্বীপ এবং সেশেল (Seychelles) দ্বীপের মাঝ দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রসারিত সেশেল-মরিশাস শৈলশিরা।

আরও দক্ষিণে, মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণ দিকে থেকে, মাদাগাস্কার শৈলশিরা প্রসারিত হয়েছে ; এটি আরও দক্ষিণে, প্রিন্স এডওয়ার্ড— ক্রোজেট শৈলশিরা পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণে উল্লেখযোগ্য শৈলশিরা হল কেপ উচ্চভূমি (Cape Rise)।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে 90° পূর্ব দ্রাঘিমার সমান্তরালে, একটি শৈলশিরা দেখা যায়, একে নব্বে ডিগ্রী পূর্ব শৈলশিরা বলা হয়ে থাকে (Ninety degree east rise)।

11.9.2 বেসিনসমূহ (Basins)

ভারত মহাসাগরের তলদেশের মোট আয়তনের প্রায় শতকরা 60 ভাগ হল গভীর সমুদ্রের সমভূমি ; এদের গড় গভীরতা হল 3500 - 5000 মি। বিভিন্ন শৈলশিরা উচ্চভূমি ও মালভূমি এই মহাসাগরের গভীর সমভূমি অঞ্চলকে বিভিন্ন অববাহিকায় (basins) বিভক্ত করেছে। যেমন—

(1) ভারত ও এডেন উপসাগরের মাঝে এডেন বেসিন।

(2) মাদাগাস্কার দ্বীপের পূর্বে মাসকারিন বেসিন।

(3) সোমালি রাষ্ট্রের পূর্বে সোমালি বেসিন।

(4) মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণ পূর্বে মরিশাস বেসিন।

(5) কুমেরু মহাদেশের উত্তর পশ্চিমে আটলান্টিক-ভারতীয়—কুমেরু বেসিন।

(6) দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্বে নাটাল ও আগুলহাস বেসিন।

(7) উত্তর পূর্ব পূর্ব ভারতীয় — কুমেরু বেসিন।

(8) ক্রোজেট দ্বীপের উত্তর কারগুয়েলেন বেসিন।

(9) মধ্য ভারত মহাসাগরীয় উচ্চভূমির পূর্ব দিকে 10° উত্তর থেকে 50° দক্ষিণ এর মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে কোকোস কিলাং বেসন (cocus-keeling basin)। এটি ভারতীয় মহাসাগরের বিস্তৃততম বেসিন। 90° পূর্ব শৈলশিরা এটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে—পূর্বাংশকে পশ্চিম অস্ট্রেলীয় বেসিন ও

(10) পশ্চিমাংশকে মধ্য বেসিন (Central basin) বলা হয়।

11.9.3 খাত (Trenches)

ভারত মহাসাগরে গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা খুবই কম। একমাত্র উল্লেখযোগ্য হল জাভা ও সুমাত্রার দক্ষিণে সমান্তরালে বিস্তৃত সুন্ডা (Sunda) খাত, যার গভীরতা হল 7454 মিঃ। (চিত্র নং 11.12)।

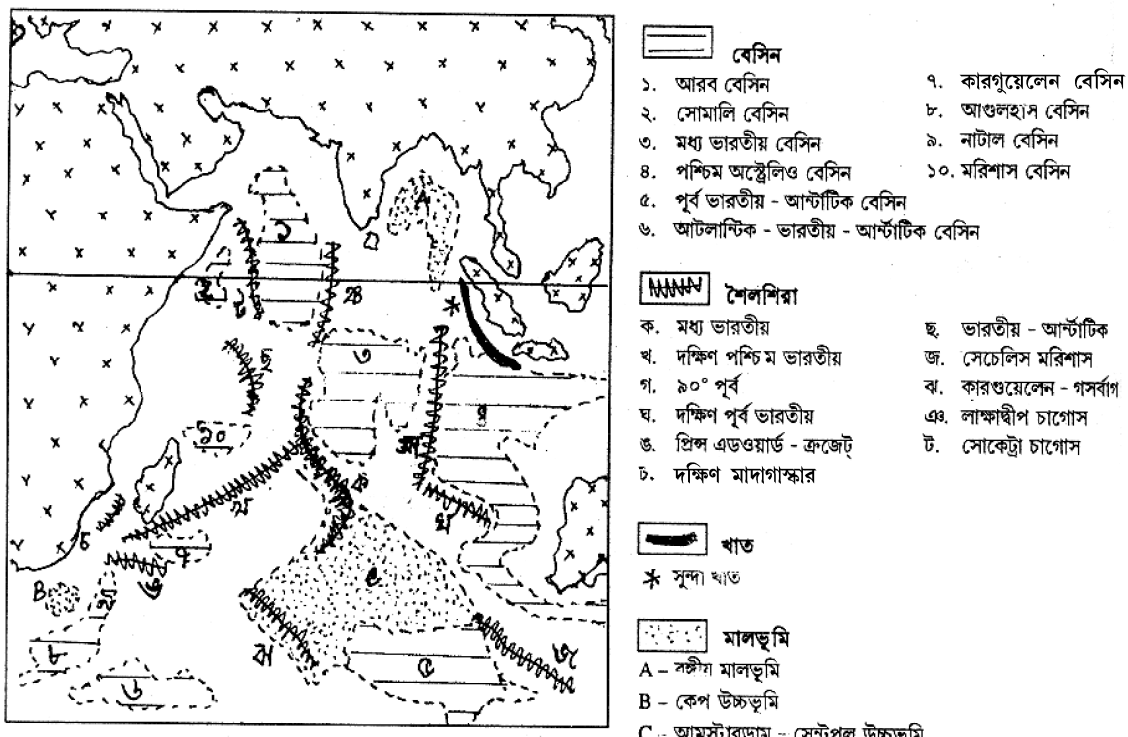

ভারত মহাসাগরতলের ভূপ্রকৃতি

(চিত্র 11.12)

11.9.4 দ্বীপ সমূহ (Islands)

ভারত মহাসাগরে বিভিন্ন রকমের দ্বীপ দেখা যায়। উৎপত্তি অনুযায়ী (1) মায়ানমারের আরাকান য়োমা নামের ভঙ্গিল পর্বতের নিমজ্জিত অংশ দ্বারা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়েছে।

(2) ভারতের পশ্চিমে মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ দুটি প্রধান গঠিত দ্বীপ।

(3) মাদাগাস্কার, শ্রীলংকা, জাঞ্জিবার ইত্যাদি দ্বীপ মহাদেশের নিমজ্জিত অংশ দ্বারা গঠিত।

(4) মরিশাস ও রিইউনিয়ন দ্বীপ দুটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে গঠিত হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হল ক্রাজেট, কোকোস, প্রিন্স এডওয়ার্ড ইত্যাদি।

11.9.5 প্রান্তদেশীয় সমুদ্র (Marginal Seas)

ভারত মহাসাগরের প্রান্তভাগে অবস্থিত মহাদেশগুলির উপকূলরেখা বিশেষ ভগ্ন নয় ; এর ফলে মহাদেশগুলির উপকূলে বেশী সংখ্যক সাগর বা উপসাগর নেই।

প্রধানত আফ্রিকা ও আরব উপদ্বীপের মধ্যে রয়েছে (1) লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগর (2) আরব উপদ্বীপের পূর্বে রয়েছে পারস্য উপসাগর, (3) তারও দক্ষিণে আছে আরব সাগর। ভারতীয় উপদ্বীপের পূর্বে আছে (4) বঙ্গোপসাগর, (5) আফ্রিকা ও মাদাগাস্কার দ্বীপের মধ্যে আছে মোজাম্বিক প্রণালী।

এছাড়া মহাসাগরের উত্তরদিকে ওমান উপসাগর, কচ্ছ উপসাগর, মান্নার উপসাগর, পাক প্রণালী, পূর্ব দিকে মালাস্কা প্রণালী ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত সাগর বা উপসাগরগুলির গভীরতা খুবই কম।

11.9.6 মহীসোপান (Continental shelves)

আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে মহীসোপান যথেষ্ট প্রশস্ত প্রায় 400-600 কিমি চওড়া। আফ্রিকার দক্ষিণে, মাদাগাস্কার দ্বীপের কাছে মহীসোপান অনেক চওড়া, কিন্তু পূর্ব দিকে জাভা, সুমাত্রার উপকূলে মহীসোপান অনেক সংকীর্ণ, মাত্র 150 কিমি চওড়া। শ্রীলংকার পূর্ব দিকের মহীঢালটি পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশী ঢালু মহীঢাল হিসাবে পরিচিত।

উপরিউক্ত এই তিনটি মহাসাগর ছাড়াও পৃথিবীতে আরও দুটি মহাসাগর আছে ; এ দুটি হল উত্তর গোলার্দ্ধের একদম উত্তর প্রান্তে সুমেরু মহাসাগর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধের দক্ষিণ প্রান্তে কুমেরু মহাসাগর। সারা বছরই প্রায় বরফে ঢাকা থাকার জন্য এদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের খুবই সীমিত ; তবু এ পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তাই নিয়েই আলোচনা শুরু করা হল। (চিত্র নং 11.13)

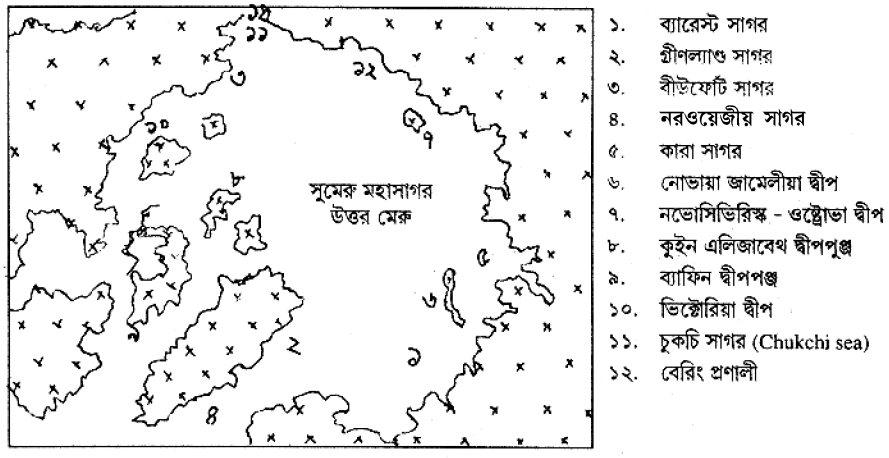

সুমেরু মহাসাগর, পার্শ্ববর্ত্তী সাগর এবং দ্বীপপুঞ্জ

(চিত্র 11.13)

11.10 সুমেরু মহাসাগর (Arctic Ocean)

পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধের শেষ প্রান্তে উত্তর মেরু অঞ্চল ; এই মেরু অঞ্চলকে বৃত্তাকারে ঘিরে সুমেরু মহাসাগর বিস্তার লাভ করেছে। সুমেরু মহাসাগরের দক্ষিণে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার দিকে রয়েছে উত্তর আমেরিকা, গ্রীনল্যান্ড, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর অংশ। এর আয়তন হল প্রায় 1.44 কোটি বর্গ কিমি। পৃথিবীর মোট জলভাগের প্রায় শতকরা 4 ভাগ অংশ সুমেরু মহাদেশের তলায় রয়েছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(1) সুমেরু মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই সারা বছর বরফাবৃত থাকে।

(2) এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের চারপাশে যে মহীসোপান আছে, তা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশী প্রশস্ত।

(3) গ্রীনল্যান্ড ও আমেরিকার মহীসোপান তুলনায় অনেক সংকীর্ণ।

11.10.1 সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি (Topography of the ocean floor)

মোটামুটি ভাবে চারটি, ছোট আকৃতির গভীর সমুদ্রের সমভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে, এরা হল ফ্লেচার

(Fletcher), পোল (Pole), কানাডা (Canada) ও ব্যারেন্ট (Barents) সমুদ্র ; কোন কোন জায়গায় আবার এই সমভূমির ওপর অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গভীর সমুদ্রের সমভূমিগুলি প্রায় 4000-4500 মি. গভীর।

11.10.2 শৈলশিরা (Ridges)

প্রশান্ত মহাসাগরের বা আটলান্টিক মহাসাগরের মত সুমেরু মহাসাগরে প্রচুর সংখ্যায় শৈলশিরার অস্তিত্বের কথা তেমন ভাবে জানা যায়নি। দেখা গেছে, 140° পূর্ব দ্রাঘিমার কাছ দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে (1) লোমোনোসোভ শৈলশিরা (Lomonosov); এছাড়া উল্লেখযোগ্য শৈলশিরাগুলি হল, (2) কানাডা ও ফ্লেচার সমভূমির মধ্যে আলফা (Alfa), (3) গ্রীনল্যান্ড সমুদ্রের পূর্বদিকে রয়েছে মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা (Arctic - Mid - Oceanic Ridge)।

11.10.3 দ্বীপ সমূহ (Island)

সুমেরু মহাদেশে, ছোট, বড় কিছু দ্বীপ দেখা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দ্বীপগুলি মহাদেশের (কানাডা, সাইবেরিয়া) বিচ্ছিন্ন অংশ। উল্লেখযোগ্য দ্বীপগুলি হল নোডায়া জামেলিয়া, কানাডীয় দ্বীপপুঞ্জ, স্মিটস্ বার্জেন ইত্যাদি।

11.10.4 প্রান্তদেশীয় সমুদ্র (Marginal seas)

কোন কোন জায়গায় উপকূলভাগ ভগ্ন থাকার জন্য কিছু সাগর ও উপসাগর দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, কানাডার ম্যাকেঞ্জী নদীমোহানায় বিউফোর্ট সমুদ্র ; আলাস্কার উত্তরে চাকচি সমুদ্র (Chukchi sea), গ্রীনল্যান্ডের পাশে গ্রীনল্যান্ড সমুদ্র, আরও পূর্বে, সাইবেরিয়ার উত্তরে কারা সমুদ্র ব্যারেন্ট সমুদ্র, সাইবেরীয় সমুদ্র ইত্যাদি।

11.11 কুমেরু মহাসাগর (Antarctic Ocean)

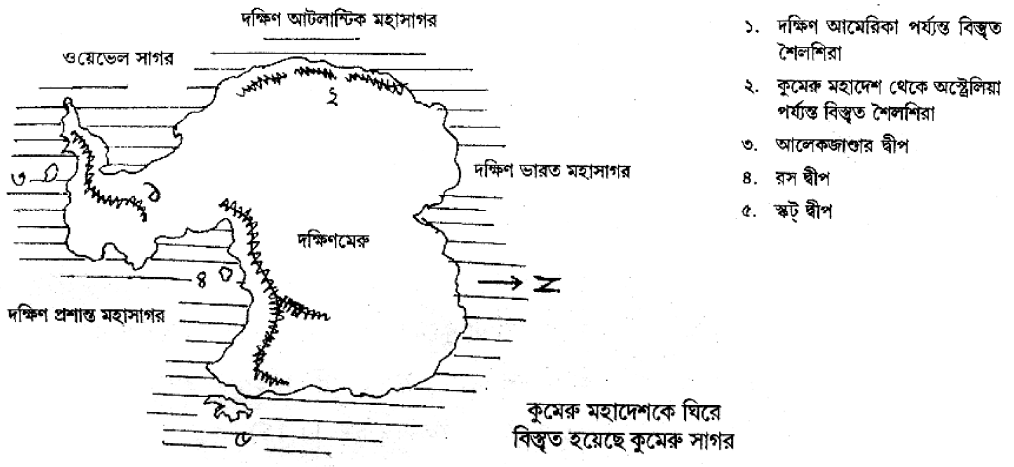

(চিত্র 11.14)

পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে, দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু অঞ্চলে এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত ; এই মহাদেশকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান করছে কুমেরু মহাসাগর। এই মহাসাগর, ধীরে ধীরে, উত্তর অর্থাৎ নিরক্ষরেখার দিকে, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। আয়তনের দিকে থেকে,

কুমেরু মহাদেশ, সুমেরু মহাদেশ অপেক্ষা ছোট (মোট আয়তন 1.42 কোটি কিমি.) পৃথিবীর মোট জলভাগের প্রায় শতকরা 4 ভাগ স্থান এই মহাসাগরের তলায় আছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(1) এই মহাসাগর অনেকটা গোলাকার ধরণের।

(2) এই মহাসাগরের গভীরতা অত্যন্ত কম।

(3) এই মহাসাগরের তলায় গভীর সমুদ্রখাতের (যা সাধারণত অন্যান্য মহাসাগরে দেখা যায় সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।)

11.11.1 সমুদ্র তলদেশের ভূপ্রকৃতি (Topography of Oceanfloor)

মোটামুটিভাবে দুটি শৈলশিরার সন্ধান পাওয়া গেছে, একটি কুমেরু মহাদেশ থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। অন্যটি, কুমেরু মহাদেশ থেকে বেরিয়ে, কুমেরু মহাসাগরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

11.11.2 প্রান্তদেশীয় সমুদ্র (Marginal Seas)

কয়েকটি সাগর ও উপসাগর দেখা যায়, যেমন হ্যালি (Halley Bay) উপসাগর, ম্যাকেঞ্জী উপসাগর (Mackenzie Bay), রস সমুদ্র ইত্যাদি। এগুলি কুমেরু মহাসাগরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত।

11.11.3 দ্বীপ সমূহ (Island)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হল—আলেকজান্ডার, রস, স্কট্ ইত্যাদি।

পরিশেষে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে মহাসুমদ্রতল সম্বন্ধে জ্ঞান আজও সীমিত, বিগত কিছু বছর ধরে কুমেরু মহাদেশে সামুদ্রিক অভিযানের ফলে আমরা কুমেরুমহাসাগর সম্বন্ধে জানতে পারছি। অন্যান্য দেশের মত, আমাদের ভারতবর্ষও কুমেরু অভিযানে অংশ নিয়েছে, এই অভিযান শুরু হয় গোয়া থেকে সাধারণতঃ শীতকালে (উত্তর গোলার্দ্ধে ভারত অবস্থিত বলে)। (চিত্র 11.15)

Institute of Oceanography

ভারতের পানাজীতে (গোয়া) অবস্থিত।

(চিত্র 11.15)

11.12 সমুদ্র স্রোত (Ocean Currents)

উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা ঃ

এতক্ষণ আমরা সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার আমরা মহাসাগরের অন্য একটি দিক নিয়ে আলোচনা করব। তা হল, সমুদ্রস্রোত। পৃথিবীর মহাসাগরগুলিতে সারা বছর ধরেই এই সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়। এই পাঠক্রমে আমরা জানতে পারব সমুদ্র স্রোত কি করে সৃষ্টি হয়, কোন দিক থেকে কোন দিকে তার গতি, মহাদেশগুলির উপকূলভাগে তার প্রভাবই বা কি ; শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি মহাসমুদ্রের সমুদ্রস্রোতগুলি আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে এবং তাদের ভালো এবং অসুবিধা জনক প্রভাব সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করব।

সমুদ্রের জলরাশি, কতকগুলি প্রাকৃতিক কারণের ফলে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয়, এই নিত্য প্রবাহিত জলরাশিকেই সমুদ্রস্রোত বলা হয়। নদীর সঙ্গে সমুদ্রস্রোতের এক জায়গায় মিল আছে। নদী যেমন ভূপৃষ্ঠের ঢাল অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়, সমুদ্রের জলরাশিও তেমনি একটি দিকে নিয়মানুযায়ী প্রবাহিত হয়। সমুদ্রস্রোতের গতিবেগ অত্যন্ত প্রবল ; সমুদ্রে উত্থিত ঢেউয়ের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। স্রোতের ফলে, সমুদ্রের জলরাশি হাজার হাজার কিমি দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়, তাই এর ব্যাপ্তি অনেক বেশী।

পৃথিবীর সর্বত্র সমুদ্রজলের উষ্মতা সমান নয় ; উষ্ম বা ক্রান্তীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক জলরাশি উষ্ম হয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উষ্মতা মাঝারী রকমের এবং হিমমণ্ডলে, সমুদ্রের জল অত্যন্ত শীতল হয়, একেবারে মেরু অঞ্চলে সময়ে সময়ে, জল বরফেও পরিণত হয়। ফলে সমুদ্রস্রোতও আমরা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রকমের (অর্থাৎ গরম অঞ্চলে গরম স্রোত এবং শীতল অঞ্চলে শীতল স্রোত) দেখতে পাই। (চিত্র 11.16)

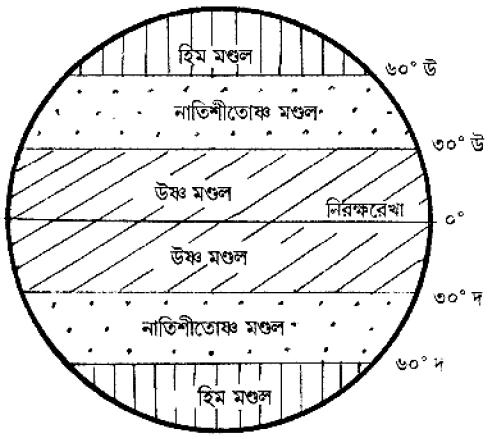

পৃথিবীর তাপ (উষ্ণতা) মণ্ডলের বিস্তার

(চিত্র 11.16)

এছাড়াও, জলরাশির পরিমাণ, তার ব্যাপ্তি, গতিবেগ ইত্যাদি অনুযায়ী সমুদ্রস্রোত বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন—(1) সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নিয়ত বায়ুর প্রভাবে যে জলরাশি একই দিকে (অর্থাৎ নিয়ত বায়ুর প্রবাহিত দিকে) প্রবাহিত হয়, তাকে drift বলা হয়। (2) একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবল গতিতে সমুদ্রের জলরাশি প্রবাহিত হলে, তাকে current বলা হয়। (3) আবার, বিপুল পরিমাণ জলরাশি, প্রবল গতিতে, একটি নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হলে, তাকে আমরা stream বলে উল্লেখ করে থাকি। উপরিউক্ত, তিন ধরনের চলমান জলরাশিকে আমরা সমুদ্রস্রোতের আওতায় আনি ; তিনটি মূল প্রকৃতি এক, তফাৎ হল শুধু তাদের গতিবেগ এর জলরাশির পরিমাণের (mass) মধ্যে।

অনেক বিজ্ঞানীর মতে, সমুদ্রস্রোত আরও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(a) বহিঃস্রোত (surface current)—যে উষ্ম স্রোত সমুদ্রের ওপরের অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। (b) অন্তস্রোত (under current)—যে স্রোত ঠাণ্ডা ও ভারী হবার জন্য সমুদ্রের নিচু অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়।

এখন প্রশ্ন হল, ওই সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি হয় কেন এবং কিভাবে? দেখা গেছে উৎপত্তির মূলে বিভিন্ন কারণ বর্তমান। এগুলি হল—(1) সমুদ্র জলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জলের চাপের উষ্মতা এবং লবণতার পার্থক্যের জন্য সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়। (2) বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের জন্য যেমন চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত এবং বাষ্পীভবন। (3) পৃথিবীর গোল আকৃতি, আবর্তন গতি এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। (4) মহাদেশসমূহের আকৃতি, বিশেষ করে উপকূল ভাগের আকৃতি, ঋতুভেদে সমুদ্রজলের পরিমাণের তারতম্য এবং সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে সমুদ্র স্রোতের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

এই কারণগুলির আর একটি বিশদ ব্যাখ্যা করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

(1) অনেক ক্ষেত্রে সমুদ্র জলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্থানীয় পার্থক্য সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির কারণ হয়। যেমন—

(a) **লবণতার পার্থক্য ঃ** এক স্থান থেকে অন্য স্থানের ঘনত্বের (density) পার্থক্যের জন্য সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয় ; সাধারণত, অধিক লবণ যুক্ত জলের ঘনত্ব বেশী হয় ; ফলে কম লবণতা এবং ঘনত্বযুক্ত জল বেশী লবণতা এবং ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলের দিকে বহিঃস্রোত (surface current) হিসাবে সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়। আবার অধিক লবণতাযুক্ত এবং ঘনত্বযুক্ত জল অন্তরস্রোত (sub surface current) হিসাবে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ বিশাল উন্মুক্ত সমুদ্রের জলের লবণতা অনেক কম হয় ; ফলে ঘনত্বও কম হয়। (জলের লবণতা সাধারণত নির্ভর করে বাষ্পীভবনের পরিমাণের ওপর, বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর এবং কী সংখ্যক নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে তার ওপর। অন্যদিকে স্থলবেষ্টিত সমুদ্রের, যেমন ভূমধ্যসাগরের জলের লবণতা তথা ঘনত্ব অনেক বেশী ; ফলে অধিক লবণতা ও ঘনত্ব বেষ্টিত জল অন্তঃস্রোত হিসাবে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ কম লবণতা ও ঘনত্ব বেষ্টিত জলরাশি বহিঃস্রোত হিসাবে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পূর্বদিকে জিব্রাল্টর প্রণালীর মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে অগ্রসর হয় এবং বিপরীত, ভূমধ্যসাগর থেকে অধিক লবণতা এবং ঘনত্বযুক্ত জলরাশি অন্তঃস্রোত হিসাবে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে ধাবিত হয়।

(b) **উষ্মতার পার্থক্য ঃ** উষ্মমণ্ডলে অতিরিক্ত উষ্মতার জন্য সমুদ্রের জল অত্যন্ত গরম থাকে, ফলে জলের ঘনত্বও কম হয় এবং হাল্কা প্রকৃতির হয় ; এই উষ্ম, হালকা, কম ঘনত্ব বিশিষ্ট জলরাশি সাধারণত সমুদ্রের উপরিভাগে দিয়ে বহিঃস্রোত হিসাবে শীতল মেরু প্রদেশের দিকে ধাবিত হয় ; অন্য দিকে, অধিক শীতলতার জন্য মেরু প্রদেশের সমুদ্রের জলরাশি ঠাণ্ডা ও ভারী (high density) হয় ; এই শীতল, ভারী জল মেরুপ্রদেশ থেকে উষ্ম মণ্ডলের দিকে অন্তঃস্রোত হিসাবে প্রবাহিত হয় ; এই শীতল, ভারী জল মণ্ডলের মধ্যে সমুদ্রের জলরাশির প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র নং 11.16)

কখনও কখনও, নদীর জলের (মিষ্টি জলের) উপস্থিতি হিমমণ্ডলে, সমুদ্রজলের ঘনত্ব কমিয়ে দেয় (অর্থাৎ লবণতার ভাগ কমে যায় বলে)। ফলে, ঐ অঞ্চল থেকে, বহিঃস্রোত হিসাবে জলরাশি বেশী ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব দিক থেকে যে স্রোত দক্ষিণে প্রবাহিত হয়, তার সম্ভবত কারণ হল মিষ্টি নদীর জলের উপস্থিতি।

সুতরাং,আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লবণতা বা উষ্মতার পার্থক্যের জন্য সমুদ্রজলের ঘনত্বের পার্থক্য হয় এবং পরিশেষে, এই ঘনত্বের পার্থক্যের জন্যই সমুদ্রের জলরাশি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়।

(2) সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির পেছনে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের, যেমন চাপের পার্থক্য, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত

এবং বাষ্পীভবনের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এগুলি আমরা এখন আলাদাভাবে, সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করব।

(a) **বায়ুর চাপ এবং বায়ুপ্রবাহ ঃ** বায়ুর চাপ এবং বায়ুপ্রবাহের প্রভাব সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রবল। তিনটি প্রধান নিয়ত (planetary) বায়ু, যথা পূর্ব (আয়ন / বাণিজ্য) বায়ু, পশ্চিমা বায়ু এবং মেরু বায়ু যখন সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সমুদ্রের জলরাশির সঙ্গে সংঘর্ষের (friction) ফলে এরা সমুদ্রের ওপরের স্তরের জলরাশিকে একই দিকে চালিত করে। তাই নিয়ত বায়ু প্রবাহকেই সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে, (0-30° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশ) উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। ফলে, এই অঞ্চলে সমুদ্রস্রোতের দিকও পূর্ব থেকে পশ্চিমে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রত্যায়ন বা পশ্চিমা বায়ু, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়, ফলে সমুদ্রস্রোতের দিকও প্রধানত পশ্চিম থেকে পূর্বে। আবার হিমমণ্ডলে মেরু বায়ু প্রবাহের দিক হল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, একইভাবে, এই অঞ্চলে স্রোতও প্রধানত পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন মহাসাগরের সমুদ্র স্রোতের আলোচনার সময় আমাদের নিয়ত বায়প্রবাহের দিকগলি খেয়াল রাখতে হবে। (চিত্র নং 11.17)

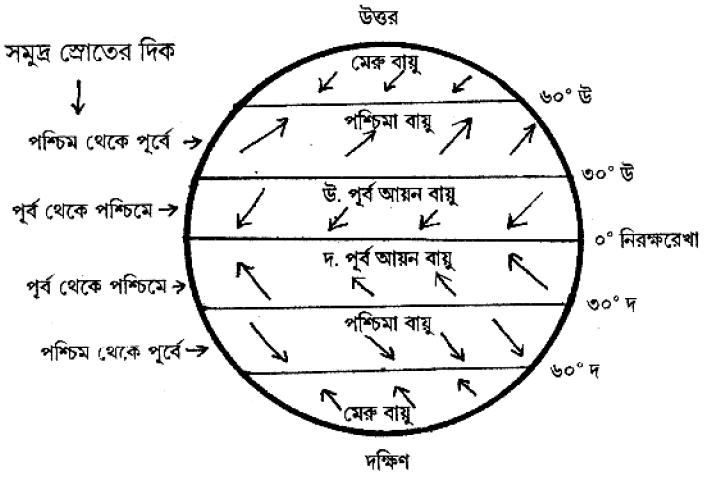

সাধারণত আয়ন বায়ু প্রবাহের দিক দ্বারা সমুদ্র স্রোতের দিক নিয়ন্ত্রিত হয়।

(চিত্র 11.17)

(b) বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবন ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অধিক উষ্মতার জন্য এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য জলের ঘনত্ব কম ; ফলে এই অঞ্চলের জলরাশি, হালকা বলে প্রসারিত হয় এবং সমুদ্র জলের উচ্চতা কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, বাষ্পীভবনের হার যেখানে বেশী, সেখানে জলের লবণতাও বেশী, ফলে ঘনত্বও বেশী হয়ে থাকে। এর ফলে এই অঞ্চলে, (অর্থাৎ অধিক লবণতা ও ঘনত্ব যুক্ত অঞ্চলে) সমুদ্র জলের উচ্চতা (sea level) কিছুটা কম হয়। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চ সমুদ্র জলের অঞ্চল থেকে জলরাশি বহিঃস্রোত হিসাবে নিম্ন সমুদ্রপৃষ্ঠ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। (The Ocean water, as a surface current flows from regions having comparatively higher sea level to lower sea level)।

(3) পৃথিবীর গোল আকৃতি এবং আবর্তন গতির জন্যও সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি হয় এবং তার প্রবাহের দিকও নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা জানি যে, পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তাকে আবর্তন ঘটিত শক্তি (Coriolis Force) বলা হয়। এর প্রভাবে এবং ফেরেলের সূত্র (Ferrell's Law) অনুযায়ী বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে

ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাঁ দিকে বেঁকে যায়, ফলে একই ভাবে সমুদ্রস্রোত (যা নিয়তবায়ুর চলাচলের ফলে সৃষ্ট হয়) ও ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্দ্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাঁ দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। এছাড়া আহ্নিক গতির (Rotational movement) জন্যই নিরীক্ষয় অঞ্চলে সমুদ্রের জলের প্রবাহের দিক বিপরীতমুখী হয় (অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে) আবার, আটলান্টিক মহাসাগরে, বিশেষ করে নিরক্ষীয় অঞ্চলে একটি প্রতিস্রোতও (counter equatorial current) দেখা যায়, যার গতিপথ হল পশ্চিম থেকে পূর্বে, অর্থাৎ পৃথিবীর আহ্নিক গতির মতই।

(4) মহাদেশগুলির উপকূলের আকৃতি বা চেহারা (configuration) ও সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতির ওপর সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি ও প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন—

(a) আটলান্টিক মহাসাগরে নিরক্ষীয় স্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে ব্রাজিলের উপকূলে গিয়ে প্রতিহত হয় বা ধাক্কা খায় ; এর ফলে জলরাশি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং উপকূলের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। উত্তর শাখা মধ্য আমেরিকার উপকূল দিয়ে সমান্তরালে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় ; অন্যদিকে, দক্ষিণ শাখা ব্রাজিলের উপকূলের সমান্তরালে দক্ষিণগামী হয়ে প্রবাহিত হয়।

(b) সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি—সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি, বিশেষ করে শৈলশিরার অস্তিত্বের জন্য সমুদ্র স্রোতের দিকে পরিবর্তন ঘটে। দেখা গেছে, উচ্চ ও মধ্য অক্ষাংশে, সমুদ্রতলে অবস্থিত শৈলশিরার সঙ্গে ধাক্কা খাবার ফলে উত্তর গোলার্দ্ধে সমুদ্র স্রোত ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাঁ দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

(c) ঋতুভেদে, সমুদ্রস্রোতের প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়, এটি খুব ভালো বোঝা যায় ভারত মহাসাগরে ; গরম কালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জন্য সমুদ্রস্রোত উত্তর পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় ; আবার শীতকালে, উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর জন্য স্রোতের দিক বিপরীতমুখী হয় অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়।

ওপরে উল্লিখিত কারণগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, সমুদ্রস্রোত কোনও একটি বিশেষ কারণের জন্য সৃষ্ট হয় না, এটি হল বিভিন্ন কারণের সম্মিলিত ফল।

11.12.1 সমুদ্রস্রোতের দিক

মহাসাগরগুলিতে সমুদ্র স্রোত কখনও এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হয় না, সকল সময় একটি নির্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হয়। এগুলি হল—

(a) সমুদ্রস্রোত সবসময় নিয়ত বায়ু অর্থাৎ আয়ন বায়ু (বাণিজ্য বা পূর্ব বায়ু) প্রত্যায়ন বায়ু, (পশ্চিমা বায়ু) এবং মেরু বায়ুর গতির দিকে চালিত হয়। সাধারণতঃ উষ্ম মণ্ডলে (0° - 30°) উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশে) আয়ন বা পূর্ব বায়ু, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে (30°-60° উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশে) প্রত্যায়ন বা পশ্চিমা বায়ু এবং হিম মণ্ডলে (60°-র ওপরের অঞ্চলে) মেরু বায়ু প্রবাহিত হয়। (চিত্র নং 11.17)

(b) একইভাবে পৃথিবীর আবর্তনের জন্য ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী, উত্তর গোলার্দ্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাঁ দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

(c) কখনও কখনও সমুদ্রস্রোত, মহাদেশের উপকূলে ধাক্কা খেয়ে দিক পরিবর্তন করে অথবা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে উপকূলের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। যেমন, দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত, ব্রাজিলের উপকূলে ধাক্কা খেয়ে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এতক্ষণ আমরা সমুদ্র স্রোতের কি ভাবে উৎপত্তি হয় এবং তার প্রবাহের দিক সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এবার আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন মহাসমুদ্রের স্রোত আলোচনা করব।

11.12.2 আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

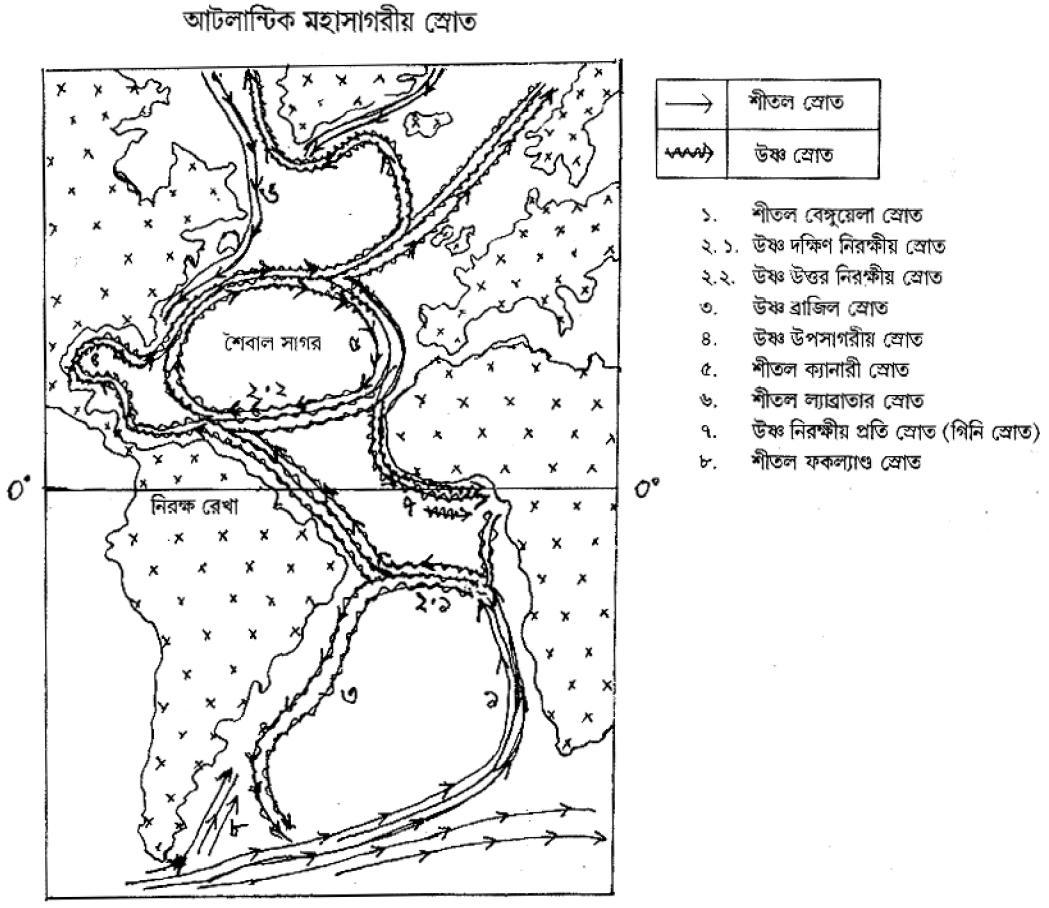

(চিত্র 11.18)

(1) **বেঙ্গুয়েলা স্রোত (শীতল স্রোত)** ঃ শীতল কুমেরু মহাসাগর থেকে কুমেরু স্রোত উত্তর দিকে (অর্থাৎ নিরক্ষরেখার দিকে) প্রবাহিত হয় ; কিছুদূর যাবার পর এটি পশ্চিমা বায়ুর (দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল) প্রভাবের মধ্যে পরে পূর্ব দিকে বেঁকে যায়। এরপর আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হবার পর আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এসে প্রতিহত হয়। ধাক্কা খাবার ফলে এটি উত্তরমুখী হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সমান্তরালে প্রবাহিত হয় এবং অবশেষে, কুমেরু মহাসাগর ত্যাগ করে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে। একে বেঙ্গুয়েলা স্রোত বলা হয় ; এটি শীতল স্রোত।

(2) উষ্মমণ্ডলে, উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় ; উপরন্তু এ অঞ্চলে পৃথিবীর আবর্তনও সব থেকে বেশী হয়ে থাকে। ফলে, এ দুটি কারণের জন্য, নিরক্ষীয় অঞ্চলের উভয়দিকে, দুটি স্রোতের সৃষ্টি হয় ; এদের উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত বলা হয়ে থাকে। উষ্মমণ্ডলে এদের উৎপত্তি হয় বলে এরা উষ্ম হয়, এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। এদের মধ্যে (a) **উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত, 15°** উত্তর অক্ষাংশের কাছে, মধ্য

আটলান্টিক শৈলশিরার ওপর দিয়ে যাবার সময় কিছুটা উত্তরগামী হয় শৈলশিরাটি অতিক্রম করার পর আবার দক্ষিণগামী হয়। এর পরে পশ্চিমগামী হয়ে ব্রাজিলের উপকূলে ধাক্কা খেয়ে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। যেমন—

(i) প্রথমটিকে **এন্টিলিস স্রোত** (Antilles current) বলা হয়, এটি প্রথমে কিছুটা উত্তরে এবং পরে পূর্ব দিকে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। (ii) দ্বিতীয় শাখাটি **ক্যারিবিয়ান স্রোত** নামে পরিচিত ; এটি ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে।

(b) **দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত** প্রধানত 0°-20°দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত অঞ্চলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের তুলনায় এই স্রোত অনেক বেশী শক্তিশালী এবং এর বিস্তারও অনেক বেশী অংশ নিয়ে।

(3) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সমান্তরালে প্রবাহিত শীতল বেঙ্গুয়েলা স্রোত, অরও উত্তরে এসে, দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ুর প্রভাবে পরে দিক পরিবর্তন করে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বেঁকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলিত শাখা, পশ্চিমগামী হলে, আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে, ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে, সেন্টরক অন্তরীপে এসে ধাক্কা খায় এবং দুটি (উত্তর ও দক্ষিণ) শাখায় বিভক্ত হয়। উত্তর শাখাটি উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে, ত্রিনিদাদের কাছে, উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়। অপরদিকে, দক্ষিণ শাখাটি দক্ষিণমুখী হয়ে **উষ্ম ব্রাজিল স্রোত** নামে, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সমান্তরালে প্রবাহিত হয় এবং অবশেষে দক্ষিণ শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গিয়ে কুমেরু স্রোতের সঙ্গে মিলে যায়।

(4) দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তর শাখাটি ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে, উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের দক্ষিণ শাখা অর্থাৎ ক্যারিবিয়ান স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয় এবং এই মিলিত স্রোত অবশেষে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। এটি উষ্ম স্রোত এবং **উপসাগরীয়** (মেক্সিকো উপসাগরে সৃষ্টি হয় বলে) স্রোত নামে খ্যাত। এই উপসাগরীয় স্রোতের সাধারণত তিনটি গতিপথ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— (চিত্র 11.19)

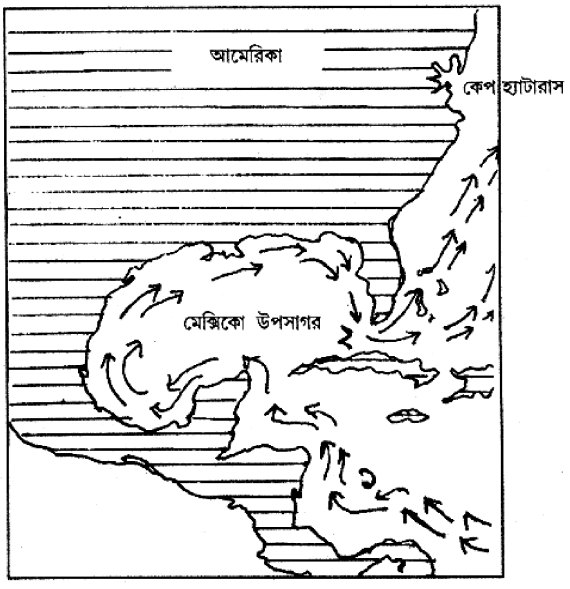

মেক্সিকো উপসাগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত।
১. ক্যারিবিয়ান স্রোত
২. ফ্লোরিডা স্রোত

(চিত্র 11.19)

(a) ফ্লোরিডা স্রোত ঃ সংকীর্ণ ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্য দিয়ে অত্যন্ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে এই স্রোত প্রথমে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তর শাখার (Antilles current) সঙ্গে মিলিত হয়। এই সময় এই স্রোতের গড় উষ্মতা

75°F এবং লবণতা প্রায় 63%। ফ্লোরিডা প্রণালী পার হয়ে আসার পর এই স্রোতের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায় এবং উপকূলের অত্যন্ত কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, মেক্সিকো উপসাগরের মধ্যে আয়নবায়ুর প্রভাবে, বিপুল পরিমাণ জলরাশি জমা হয় এবং সেই জলরাশির নির্গমণের ফলেই এই শক্তিশালী উপসাগরীয় স্রোতের সৃষ্টি হয়। শীত এবং গরমকালে এই স্রোতের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে দিন প্রতি প্রায় 120 মাইল হয়। কেপ হ্যাটারাস পর্য্যন্ত এই স্রোতকে ফ্লোরিডা স্রোত বলা হয়।

(b) কেপ হ্যাটারাসের (Cape Hatteras) পর, ফ্লোরিডা স্রোতকে সাধারণত **উপসাগরীয়** বা Gulf stream বলা হয়। ইতিমধ্যে এন্টিলি স্রোত এসে এই স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ফলে এই স্রোতের ব্যপ্তি অত্যন্ত বেশী এবং উষ্মতাও যথেষ্ট। এই সময় বাঁদিকে থাকে উপকূলের কাছে শীতল জলরাশি এবং ডান দিকে থাকে শীতল ক্যানারী স্রোত। এই শীতল জলের অঞ্চল বা সীমারেখা (যার বাঁ দিকে আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং ডান দিকে উষ্ম উপসাগরীয় স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে) কে হিমপ্রাচীর (cold wall) উল্লেখ করা হয়। মাঝখান দিয়ে এই উষ্ম স্রোত উত্তরগামী হয়। তারপর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে (80° উত্তর অক্ষাংশে) প্রবেশ করার ফলে, পশ্চিমা বায়ুর সংস্পর্শে এসে এটি পূর্বদিকে বাঁক নেয়। আরও উত্তরে, এটি আবার কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রধান উত্তর পূর্ব শাখা উপসাগরীয় স্রোত নামেই পরিচিত। এই স্রোত উত্তর—উত্তর পূর্বগামী হয় এবং এর গতিবেগের পরিবর্তন হয়। প্রথমে মোটামুটিভাবে, ধীরগামী হয় (15 মাইল প্রতি ঘণ্টায়), পরে নিউইয়র্কের কাছে এসে প্রবল হয় (72 মাইল/ঘণ্টায়) এবং পরে, স্রোত ক্রমশঃ পূর্বগামী হয় এবং গতিবেগও কমে যায় (30 মাইল/ঘণ্টায়)। আরও উত্তরে, উত্তর থেকে আসা শীতল ল্যাব্রাডার স্রোতের সঙ্গে এই স্রোত মিশে যায়, ফলে বিপরীত উষ্মতা সম্পন্ন দুটি জলস্রোতের মিলনের ফলে এখানে সমুদ্রে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়, যার ফলে জাহাজ চলাচলের বিঘ্ন ঘটে।

(c) প্রায় 45° উত্তর অক্ষাংশের কাছে এই উষ্ম উপসাগরীয় স্রোত যখন আসে—তখন তাকে **উত্তর আটলান্টিক স্রোত** বলে উল্লেখ করা হয়।

এই স্রোত আবার বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, যেমন—

(i) উত্তর শাখা উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ইউরোপের উত্তর পূর্ব উপকূলে পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের সঙ্গে মিলনের ফলে এর উষ্মতা কিছুটা কমে যায় এবং গতিবেগও হ্রাস পায়। তথাপি এই উষ্ম স্রোত পশ্চিম ইউরোপের উপকূলভাগ যথেষ্ট গরম রাখে, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যান্ড, হল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের উপকূলভাগ অক্ষাংশ অনুযায়ী যতখানি ঠাণ্ডা হবার কথা, উষ্ম উপসাগরীয় স্রোতের উপস্থিতির ফলে ততখানি ঠাণ্ডা হয় না।

(ii) পূর্বশাখা পূর্বগামী হয়ে ফ্রান্স এবং স্পেনের উপকূলভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। উত্তর শাখার থেকে পূর্ব শাখা অনেক বেশী উষ্ম হয়। এই শাখার একটি অংশ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে ; আর একটি শাখা বিস্কে উপসাগর অবধি যায় এবং তারপর এটি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—একটি ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত হয়, অপরটি পশ্চিমে, আয়রল্যান্ডের দক্ষিণ দিক দিয়ে উত্তরগামী হয়ে উত্তর আটলান্টিক স্রোতের সাথে মিলে যায়। অপর একটি শাখা একদম পূর্বগামী হয়ে স্পেনের উপকূলে এ্যাজোর দ্বীপে (Azore) এবং আরও দক্ষিণে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর এগিয়ে গিয়ে অবশেষে ক্যানারী স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়।

(5) **শীতল ক্যানারী স্রোত** (Canary Current) ঃ প্রকৃতপক্ষে, ক্যানারী স্রোত হল শীতল স্রোত ; এর গতি মাঝারী রকমের হয়, ক্যানারী স্রোত পশ্চিম আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর কেপ ভার্ড থেকে ম্যাডেরিয়া (maderia) পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। তারপর, আয়ন বায়ুর প্রভাবে, আবার পশ্চিমগামী হয়ে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়।

সারগাসো সী বা শৈবাল সাগর (Sargasso sea) ঃ এইভাবে উত্তর উপসাগরীয় স্রোত, পূর্বে ক্যানারী স্রোত এবং দক্ষিণে নিরক্ষীয় স্রোত দ্বারা একটি জলাবর্তের (gyral) সৃষ্টি হয়, এই জলাবর্তের মধ্যে কোন স্রোত প্রবাহিত হয় না, ফলে স্রোতহীন অবস্থার জন্য এখানে ভাসমান আগাছা, শৈবাল (see weeds) ইত্যাদি জন্মায় ; পর্তুগীজ

শব্দ (sargassum) থেকে এই বিশাল জলাবর্তের নাম দেওয়া হয়েছে শৈবাল সাগর (Sargasso sea)। এই সাগর স্রোতহীন, শান্ত এবং সামুদ্রিক ভাসমান আগাছা এবং শৈবাল দ্বারা পরিপূর্ণ। উষ্মতা (28° সে) এবং বাষ্পীভবনের হার অত্যন্ত বেশী হবার জন্য এই সাগরের লবণতার হারও (37%) অত্যন্ত বেশী। মূলহীন, ভাসমান, সামুদ্রিক আগাছাগুলির অস্তিত্বের জন্য এখানে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হয়ে থাকে।

(6) **শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত** (Labrador Current) ঃ হিমমণ্ডলে অবস্থিত উত্তর মহাসাগর থেকে উৎপন্ন দুটি স্রোত দক্ষিণগামী হয় ; এরা গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কানাডার ল্যাব্রাডার উপদ্বীপের কাছে মিলিত হয়। হিমমণ্ডল থেকে উৎপন্ন বলে এরা শীতল হয় এবং ল্যাব্রাডর উপদ্বীপের নাম অনুযায়ী এদের ল্যাব্রাডর স্রোত বলা হয়। এই স্রোত কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ধরে দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং মোটামুটিভাবে 45°-50° উত্তর অক্ষাংশের কাছে এটি উষ্ম উপসাগরীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়। উষ্ম উপসাগরীয় স্রোতের রং নীল, এটি উত্তরগামী ; অপরপক্ষে, ল্যাব্রাডর স্রোত দক্ষিণগামী, শীতল এবং গাঢ় সবুজ রংয়ের। ফলে, বিপরীতগামী এই দুই স্রোতের সীমারেখা ক্রমশঃ হালকা উষ্ম উপসাগরীয় স্রোতের তলায় চলে যায়।

(7) **নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত** (Equatorial counter current) উত্তর এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের (পশ্চিমগামী) মাঝে একটি প্রতিস্রোত দেখা যায়। যা সাধারণত পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের গিনি উপসাগরের কাছে এই স্রোত বেশ ভালোভাবে বোঝা যায় বলে একে গিনি স্রোত (Guinea current) ও বলা হয়। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে, নিরক্ষীয় পশ্চিমা বাতাসের (যা I.T.C. অঞ্চলে প্রবাহিত হয়) প্রভাবে এই স্রোতের উৎপত্তি হয় এবং পশ্চিমগামী হয়। অনেকে আবার ভিন্ন মতও পোষণ করেন। এদের মতে উত্তর এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত ব্রাজিল উপকূলে এসে ধাক্কা খায় ; ফলে এই অঞ্চলে জলরাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই, এই বর্দ্ধিত জলরাশির কিছু অংশ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং এটিই নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত নামে পরিচিত হয়।

11.12.3 প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত (Pacific Ocean's Currents)

আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের পর আমরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের আলোচনা করব। এখানেও সমুদ্র স্রোতের গতি এবং দিক প্রধানত নিয়ত বায়ু প্রবাহ এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দক্ষিণ গোলার্দ্ধ থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক। (চিত্র নং 11.20)

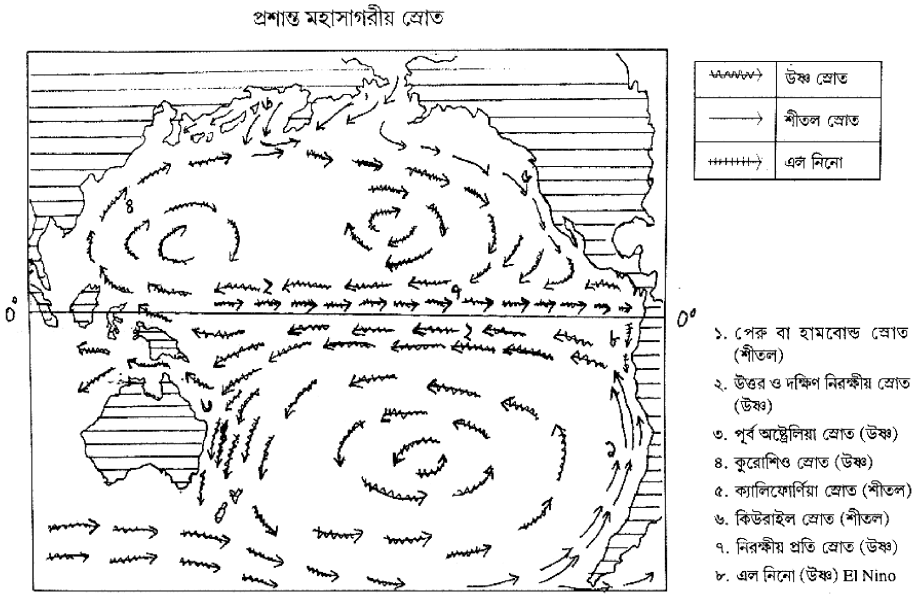

(চিত্র 11.20)

(1) কুমেরু মহাসাগর থেকে শীতল কুমেরু স্রোতের একটি শাখা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমগামী হয় এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রতিহত হয়। গর্জ্জনশীল চল্লিশা (Roaring Forties) দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী হয় এবং এর গতিবেগও বেশী হয়। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ধাক্কা খাবার পর এটি উত্তরে বেঁকে মহাদেশের পশ্চিম উপকূল বরাবর অগ্রসর হয় ; একে **পেরু অথবা হামবোল্ট** (Humbolt) স্রোত বলা হয়। এটি শীতল স্রোত (শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে আসছে বলে), গড় বার্ষিক উষ্মতা মোটামুটিভাবে 16° সেঃ।

(2) আটলান্টিক মহাসাগরের মতই, এই মহাসাগরে উত্তর এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত, প্রধানত আয়নবায়ুর প্রভাবে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। এরা উষ্ম স্রোত।

(3) **উত্তরগামী পেরু স্রোত,** নিরক্ষরেখার কাছাকাছি আসার পর ক্রমশঃ উষ্ম হতে শুরু করে এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলিত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত (দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে) পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়, সুদীর্ঘ প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে, অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব উপকূলে এসে প্রতিহত হয় এবং ত্রিধাবিভক্ত হয়। যেমন—

(a) একটি স্রোত, উষ্ম পূর্ব অষ্ট্রেলীয় স্রোত হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল ধরে দক্ষিণগামী হয় এরপর নিউজিল্যান্ডের চারপাশ ঘিরে প্রবাহিত হয়ে, আরও দক্ষিণে, পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এই স্রোত আবার পশ্চিমগামী হয় এবং শীতল কুমেরু স্রোতের সঙ্গে মিলে যায়।

(b) দ্বিতীয় শাখা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে।

(c) তৃতীয় শাখা, উত্তরগামী হয়ে, উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়।

(4) **উষ্ম কুরোশিও স্রোত**—উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত, উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে, পশ্চিমগামী হয় এবং ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জগুলির সঙ্গে এবং মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলের কাছে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। জাপানের কাছে এসে এই স্রোতের নাম হয় জাপান স্রোত এবং উষ্ম কুরোশিও (Kuroshio) স্রোত। আটলান্টিক মহাসাগরের উপসাগরীয় স্রোতের সঙ্গে এই স্রোতের তুলনা করা যায়। এই উষ্ম কুরোশিও স্রোত, উত্তর পূর্ব হয়ে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। যেমন—(a) কুরোশিও স্রোত জাপানের উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে, প্রায় 35° উত্তর অক্ষাংশের কাছে এসে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পূর্ব দিকে বেঁকে যায় এবং দ্বিধাবিভক্ত হয় ; একটি উত্তরগামী হয়ে শীতল ওয়াশিও/কিউরাইল (Oyashio \ Kurile) স্রোতের সঙ্গে মিশে যায় ; অন্যটি আরও পূর্বগামী হয়ে, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে এসে পৌঁছায়।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আসার পর এই উষ্ম স্রোত আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়। যেমন—(i) একটি এ্যালুসিয়ান স্রোতরূপে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয় এবং এটি আবার দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি যায় আলাস্কা উপসাগর পর্যন্ত, অপরটি বেরিং প্রণালী পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

(5) উষ্ম কুরোশিও স্রোতের দ্বিতীয় শাখাটি (যা উত্তর পূর্ব নয়) দক্ষিণ দিকে বেঁকে, ক্যালিফোর্ণিয়া স্রোত নামে উপকূল বরাবর অগ্রসর হয় ; এরপর প্রায় মেক্সিকোর উপকূলের কাছে এসে, উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে দিক পরিবর্তন করে এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় ; অবশেষে এটি উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। ক্যানারী স্রোতের মতই এটি শীতল স্রোত এবং এই জলাবর্তের মধ্যে একটি শৈবাল সাগরের সৃষ্টি হয়েছে।

(6) **শীতল কিউরাইল স্রোত** — ল্যাব্রাডর স্রোতের মতই প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরে, শীতল নাতিশীতোষ্ণ

এবং হিমমণ্ডল থেকে, কিউরাইল অথবা ওয়াশিও নামের একটি শীতল স্রোতের জন্ম হয়। এটি বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রথমে দক্ষিণে এবং পরে পূর্বগামী (পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে) হয় এবং প্রায় 50^0 উত্তর অক্ষাংশের কাছে এসে এটি উষ্ম কুরোশিও স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। আটলান্টিক মহাসাগরের মত, এখানেও শীতল এবং উষ্ম স্রোতের মিলনের ফলে, বায়ুমণ্ডলের ঝড় ঝঞ্ঝা ও নিবিড় কুয়াশার সৃষ্টি হয় এবং জাহাজ চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে।

(7) আটলান্টিক মহাসাগরের মতই এখানেও অর্থাৎ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মাঝে, একটি নিরক্ষীয় প্রতিস্রোতের সৃষ্টি হয়। এই উষ্ম স্রোত, পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় পানামা উপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

(8) **এল নিনো (El Nino)** — দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে একটি উল্লেখযোগ্য স্রোতের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। একে El Nino বলা হয় ; পেরুর উপকূল দিয়ে এই উষ্ম স্রোত, উত্তর থেকে দক্ষিণে, প্রায় 35^o দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এর প্রভাবে, পেরুর উপকূলীয় অঞ্চল অপেক্ষাকৃত বেশী উষ্ম থাকে কিন্তু এর একটি ক্ষতিকারক দিকও আছে ; এই এল নিনোর উপস্থিতির ফলে প্ল্যাঙ্কটনের (যা উপকূলীয় মাছেদের প্রধান খাদ্য) ক্ষতি হয় এবং বিভিন্ন রকমের রোগেরও প্রার্দুভাব ঘটে। (চিত্র 11.20)

11.12.4 ভারত মহাসাগরীয় স্রোত (Currents of Indian Ocean)

ভারত মহাসাগরীয় স্রোতগুলি প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয় (ক) মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ, (খ) স্থলভাগের অবস্থান দ্বারা। ভারত মহাসাগর বস্তুতপক্ষে, তিনদিক দিয়েই স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্বে রয়েছে মালয়েশিয়া, নিউগিনি এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ, উত্তরে ভারত ইত্যাদি এবং পশ্চিমে রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশ। সুতরাং, এই মহাসাগরে প্রবাহিত স্রোতগুলি প্রধানত স্থলভাগ দ্বারা প্রতিহত হয়ে দিক পরিবর্তন করে প্রবাহিত হয় নতুবা মৌসুমী বায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়। উত্তর ভারত মহাসাগরে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বেশী করে পরিলক্ষিত হয়।

(1) **শীতল পশ্চিম অষ্ট্রেলীয় স্রোত ঃ** কুমেরু অঞ্চলে উৎপন্ন, শীতল কুমেরু স্রোতের একটি শাখা পশ্চিমা বায়ুর (গর্জ্জনশীল চল্লিশা) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, পূর্বগামী হয় এবং অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে এসে প্রতিহত হয়। এরপর, এটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—

(a) একটি শাখা দক্ষিণগামী হয়।

(b) দ্বিতীয় শাখাটি পশ্চিম অষ্ট্রেলীয় উপকূল বরাবর উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় ; এটি শীতল পশ্চিম অষ্ট্রেলীয় স্রোত নামে পরিচিত। উত্তরগামী পূর্ব আয়নবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এটি দিক পরিবর্তন করে এবং পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়।

(2) **দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের** সঙ্গে, এই স্রোতের মিলন হয় এবং এই মিলিত উষ্ম স্রোত পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে একেবারে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত মাদাগাস্কার দ্বীপের কাছে প্রতিহত হয় এবং দ্বিধাবিভক্ত হয়। যেমন—(a) একটি শাখা মাদাগাস্কারের পূর্ব উপকূল ধরে দক্ষিণে অগ্রসর হয়। (b) দ্বিতীয় শাখাটি, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে, মোজাম্বিক স্রোত হিসাবে, দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।

(3) **আগুলহাস স্রোত** (Agulhas Current) ঃ মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণে এই দুটি স্রোত আবার মিলিত হয় ; তখন এর নাম হয় উষ্ম আগুলহাস স্রোত। পরে আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে, এটি শীতল কুমেরু স্রোতের সঙ্গে ক্রমশঃ মিশে যায়।

(4) উত্তর গোলার্দ্ধে ভারত মহাসাগরীয় স্রোতের প্রকৃতি, একটু অন্য রকমের। **শীতকালীন** উত্তর পূর্ব মৌসুমী

বাতাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, শীতল মৌসুমী স্রোত আন্দামান, নিকোবর অঞ্চল থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে আফ্রিকার সোমানিল্যান্ড পর্যন্ত অগ্রসর হয়। (চিত্র 11.21)

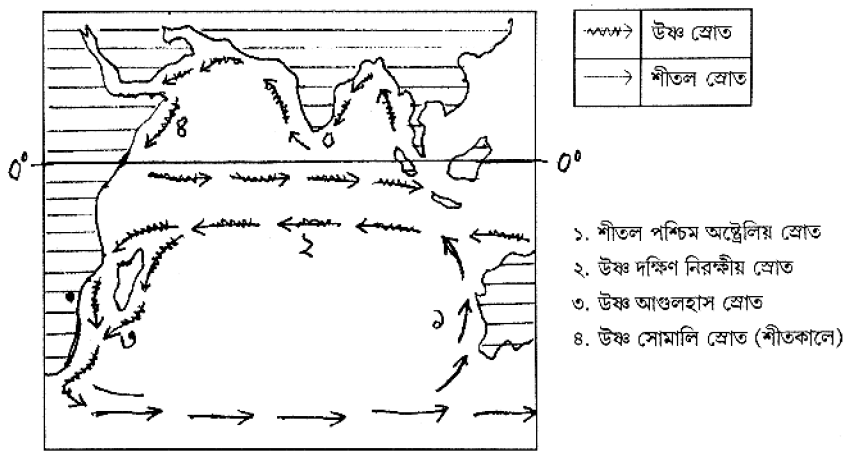

শীতকালীন ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

(চিত্র 11.21)

(5) **গ্রীষ্মকালে** এই স্রোতের দিক সম্পূর্ণভাবে বিপরীত হয়। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা, আফ্রিকার উত্তর পূর্ব উপকূল ঘেঁসে, উষ্ম **সোমালিস্রোত** নামে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে, পরে এটি পূর্বগামী হয় এবং আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে একেবারে ইনদোনেশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর আবার শীতকালে, এর দিক পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমগামী হয়। (চিত্র নং 11.22)

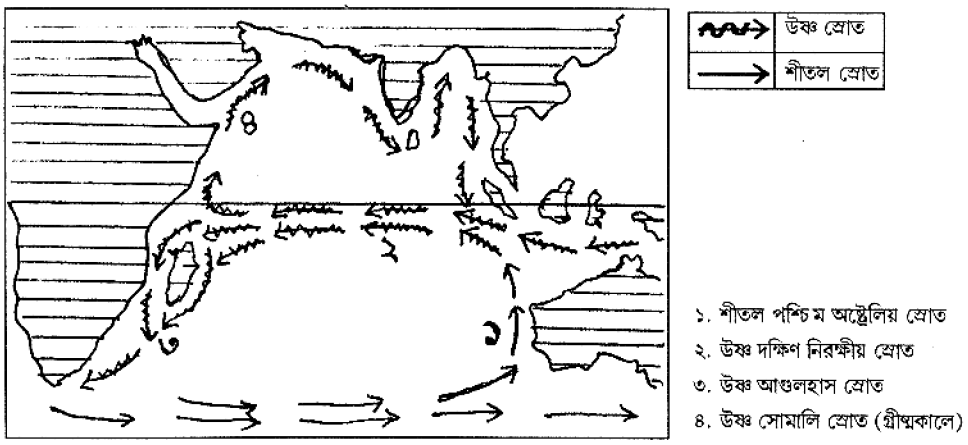

গ্রীষ্মকালীন ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

(চিত্র 11.22)

(6) শীতকালে, উত্তর ভারত মহাসাগরে একটি **প্রতিস্রোত** (counter current) লক্ষ্য করা যায়; এটি, মোটামুটিভাবে আফ্রিকার জাঞ্জিবার থেকে, সুমাত্রা পর্যন্ত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

11.12.5 সমুদ্র স্রোতের প্রভাব (Effects of Ocean Currents)

পরিশেষে, আমরা সমুদ্র স্রোতের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

(1) প্রথমত, সমুদ্র স্রোত নিকটবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলের উষ্মতার তারতম্য ঘটায়, অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনে। শীতল অঞ্চলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত উষ্ম স্রোত ঐ অঞ্চলের উষ্মতা বাড়িয়ে দেয় ; ফলে অক্ষাংশ অনুযায়ী, ঐ নির্দিষ্ট স্থানটি যতটা ঠাণ্ডা হবার কথা, উষ্ম স্রোতের উপস্থিতির জন্য ততটা ঠাণ্ডা হয়না ; আবার এর বিপরীত অবস্থাও দেখা যায়। শীতল স্রোত প্রবাহিত হবার জন্য কোন উপকূলীয় অঞ্চল স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী ঠাণ্ডা হয়। যেমন, উত্তর আটলান্টিক স্রোতের (উষ্ম) প্রভাবে, পশ্চিম ইউরোপের উপকূলভাগে যথেষ্ট উষ্ম থাকে। অন্যদিকে শীতল লাব্রাডর স্রোত প্রবাহিত হবার ফলে, কানাডা এবং আমেরিকার পূর্ব উপকূল স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী শীতল থাকে। একই কারণে লন্ডন, নিউইয়র্ক অপেক্ষা উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত হলেও, উষ্ম আটলান্টিক স্রোতের জন্য শীতকালে, অন্যের বেশী উষ্ম থাকে।

(2) উষ্ম স্রোত প্রবাহিত হবার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের উষ্মতা বৃদ্ধি পায় ; ফলে, ঐ অঞ্চল বরফমুক্ত থাকে, বন্দরের কাজকর্ম অব্যহত থাকে এবং জাহাজ চলাচলেরও সুবিধা হয়।

(3) উষ্ম স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে ; ফলে স্থলভাগের ওপর দিয়ে যখন প্রবাহিত হয়, তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। যেমন, উত্তর আটলান্টিক উষ্ম স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ঘটায়।

(4) মহাসাগরগুলিতে স্রোত চলাচলের ফলে উত্তাপের বিনিময় ঘটে ; উষ্মমণ্ডল থেকে উৎপন্ন উষ্ম স্রোত বহিঃস্রোত হিসাবে শীতল হিমমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয় এবং বিপরীতে, হিমমণ্ডল থেকে শীতল স্রোত, অন্তঃস্রোত হিসাবে উষ্ম মণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়। এর ফলে উত্তাপের বিনিময় ঘটে এবং জলভাগে উত্তাপের বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্য আসে (it helps in bringing the horizontal heat balance of the earth)।

(5) শীতল স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু সাধারণতঃ জলীয় বাষ্প বহন করে না। ফলে, উপকূল সংলগ্ন স্থলভাগে বৃষ্টির পরিমাণ কম হয়। যেমন, আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কালাহারি মরুভূমির বৃষ্টিহীন অবস্থার জন্য অন্যতম দায়ী হল শীতল বেঙ্গুয়েলা স্রোত।

(6) শীতল স্রোতের সঙ্গে প্রচুর মাছ ভেসে আসে ; উষ্ম স্রোত যেখানে শীতল স্রোতের সঙ্গে মেশে, সেখানে এরা থেকে যায়, ফলে ঐ অঞ্চল ক্রমশঃ মৎস্য চাষের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। যেমন শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত ও উষ্ম উপসাগরীয় স্রোতের মিলনস্থলে, পৃথিবীর বিখ্যাত মৎস্য চারণক্ষেত্রগুলি গড়ে উঠেছে। ডগার্স ব্যাংক, রকফল ব্যাংক, গ্র্যান্ড ব্যাংক, সেবল ব্যাংক, ইত্যাদি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। (চিত্র নং. 11.4)

(7) আবার, শীতল স্রোতের সঙ্গে, হিমমণ্ডল থেকে হিমশৈল (iceberg) ভেসে আসে ; উষ্ম স্রোতের সংস্পর্শে এসে এগুলি গলে যায় এবং এদের বয়ে আনা কাদা, মাটি, বালি ইত্যাদি (morraine) সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়, কালক্রমে ক্রমাগত সঞ্চয়ের ফলে, এরা অগভীর মগ্ন চড়ার সৃষ্টি করে ; এই মগ্নচড়াতেই মাছেদের খাদ্য প্ল্যাঙ্কটনের উপস্থিতি সব থেকে বেশী হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, খাবারের আকর্ষণে সামুদ্রিক মাছেরা এখানে এসে বিচরণ করে এবং এই অঞ্চলগুলি, মৎস্যচারণ ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে ওঠে, যেমন গ্র্যান্ড ব্যাংক, জর্জেস ব্যাংক, ডগার্স ব্যাংক ইত্যাদি।

(8) স্রোতের মুখে (বাঁ দিকে) জাহাজ চালাতে অনেক সুবিধা হয়।

কিন্ত সমুদ্রস্রোতের ফলে, মহাসাগরগুলিতে কিছু কিছু অসুবিধাও ঘটে। যেমন—

(1) হিমমণ্ডল থেকে উৎপন্ন শীতল স্রোতের সঙ্গে হিমশৈল ভেসে আসে ; অনেক সময়, জাহাজের সঙ্গে হিমশৈলের সংঘর্ষ ঘটে এবং জাহাজের ক্ষতি হয়। যেমন নিউফাউন্ডল্যান্ডের কাছে, শীতল ল্যাব্রাডার স্রোত এবং উষ্ম উপসাগরীয় স্রোতের মিলনের ফলে কুয়াশার সৃষ্টি হয় এবং জাহাজ চলাচলে অসুবিধা ঘটে।

(2) উষ্ম ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলের বায়ুমণ্ডলে কিছু স্থানীয় পরিবর্তন হয় ; উত্তাপের বৈপরীত্যের জন্য এ অঞ্চলে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়, ঝড় ঝঞ্ঝাও প্রায়শই হয়। ফলে, জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধাও দেখা দেয়।

(3) দক্ষিণ আমেরিকার পেরু উপকূল দিয়ে প্রবাহিত উষ্ম এল নিনো (El Nino) স্রোত মাছেদের খাদ্য প্ল্যাঙ্কটনগুলিকে নষ্ট করে দেয় ; শুধু তাই নয় ; এই উষ্ম স্রোতের সঙ্গে কখনও কখনও মাছেদের পক্ষে ক্ষতিকারক কিছু রোগেরও আগমন ঘটে। (চিত্র নং 11.20)

11.13 সারাংশ

পাঠক্রমের এই অংশে আমরা সমুদ্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রথমেই আমাদের আলোচনার মধ্যে এসেছে সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি, তার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি। দেখা গেছে, মহাসাগরের মধ্যে প্রধান পাঁচটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল রয়েছে, এরা হল, মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর সুমদ্রের সমভূমি, সামুদ্রিক শৈলশিরা এবং গভীর সমুদ্রখাত। এরপরে, প্রত্যেকটি মহাসমুদ্রের (প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, সুমেরু ও কুমেরু) আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রের ভূপ্রকৃতি ছাড়াও প্রত্যেকটি সমুদ্রের আয়তন গভীরতা, অবস্থান, দ্বীপপুঞ্জগুলির বিস্তার, চারপাশে অবস্থিত সাগর ও উপসাগরগুলির অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তবে, জলবায়ুর প্রতিকূলতার জন্য (অত্যন্ত ঠাণ্ডা হবার ফলে) সুমেরু অথবা কুমেরু মহাসাগর সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের সীমাবদ্ধ আজও তবু সমুদ্রবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব উন্নতির ফলেই আমরা সমুদ্রতল সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

এরপরে, আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সমুদ্রস্রোত। আমরা জেনেছি যে সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি হয় প্রধানত কয়েকটি কারণে, যেমন নিয়ত বায়ুপ্রবাহের ফলে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে, সমুদ্র জলের উষ্মতার তারতম্যের ফলে, অথবা মহাদেশগুলির বিশেষ আকৃতির জন্য। আমরা এও জেনেছি যে সমুদ্রস্রোতের প্রবাহের দিক প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয় নিয়তবায়ু দ্বারা এবং স্রোতের (উষ্ম অথবা শীত) প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয় সাধারণত তার উৎস অঞ্চল অনুযায়ী ; হিমমণ্ডল থেকে উৎপন্ন স্রোত এবং উষ্মমণ্ডল থেকে উৎপন্ন স্রোত হবে যথাক্রমে শীতল ও উষ্ম প্রকৃতির। প্রতিটি মহাসমুদ্রে প্রবাহিত স্রোতগুলি সম্বন্ধে আমরা আলাদাভাবে জেনেছি। পরিশেষে, আমাদের জীবনে সমুদ্রস্রোতের প্রভাব কি কি, নৌ চলাচলের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি, কোন দেশের অর্থনীতিতে এর ভূমিকাই বা কি, এগুলি নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি।

11.14 সর্বশেষ প্রশ্নমালা

(1) সঠিক উক্তিটি √ চিহ্নিত করুন —(প্রতিটি 1 নম্বর করে)

(a) পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রখাতটির নাম—

(i) মারিয়ানা খাত, (ii) ব্লেকখাত, (iii) সুন্ডাখাত।

(b) টেলিগ্রাফ মালভূমি কুমেরু / আটলান্টিক / ভারত / প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।

(c) ভারত মহাসাগর / প্রশান্ত মহাসাগর / কুমেরু মহাসাগরের স্রোত প্রধানত মৌসুমী বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

(d) উষ্ম স্রোতের রং সাধারণত সবুজ / নীল / হলুদ হয়ে থাকে।

(e) শীতল স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম / বেশী থাকে।

(f) হামবোল্ড স্রোত মেক্সিকো / পেরু / চীন দেশের উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়।

(g) শৈবাল সাগর আটলান্টিক / কুমেরু / ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।

(h) এল নিনো হল উষ্ম / শীতল স্রোত।

(i) লাক্ষা দ্বীপ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে / প্রবাল সঞ্চয়ের ফলে গঠিত হয়েছে।

(j) মরিশাস দ্বীপ আটলান্টিক / প্রশান্ত / ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।

(k) মহীসোপানের ঢাল খুব কম / মাঝারী / বেশী হয়ে থাকে।

(l) সবচেয়ে বেশী ঢালু মহীখাত আটলান্টিকে / প্রশান্ত / ভারত মহাসাগরে দেখা যায়।

(m) রোমাঞ্চ খাত ভারত মহাসাগর / আটলান্টিক / প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।

(n) সাধারণত হিমবাহ অধ্যুসিত অঞ্চলে / ভঙ্গিল পর্বতমালা অঞ্চলে মহীসোপান সংকীর্ণ হয়।

(o) মহীঢাল অঞ্চলে সামুদ্রিক সঞ্চয় অত্যন্ত বেশী / কম হয়ে থাকে।

(p) মাথা চ্যাপ্টা, টেবিল আকৃতির সামুদ্রিক পাহাড়কে সমুদ্রগিরি / গিয়াট বলা হয়ে থাকে।

(q) প্রবাল কীটের সঞ্চয়ের ফলে / আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সমুদ্রতলের অবনমনের ফলে হাওয়াই দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে।

(r) অ্যালবাট্রাস হল সমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড় / মালভূমি / খাতের নাম।

(s) ক্যালিফোর্ণিয়া স্রোত হল শীতল / উষ্ম স্রোত।

(2) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন — (প্রতিটি 2 নম্বর করে)

(a) আইসোবাথ (Isobath) কাকে বলে ?

(b) সমুদ্রগিরি কাকে বলে ?

(c) নিরক্ষীয় স্রোত উষ্ম হয় কেন ?

(d) হিমপ্রাচীর কাকে বলে ?

(e) আগুলহাস স্রোত কোথায় দেখতে পাওয়া যায় ?

(f) মহীসোপান কোন কোন অঞ্চলে সব থেকে বেশী বিস্তৃত ?

(g) কোন সামুদ্রিক শৈলশিরার আকৃতি ইংরাজী 's' অক্ষরের মত ? এটি কোন মহাসমুদ্রে অবস্থিত ?

(h) প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে অবস্থিত চারটি সাগরের নাম লেখ।

(i) ক্যানারী স্রোত কোথায় দেখা যায় ?

(j) ল্যাব্রাডর স্রোতের সঙ্গে হিমশৈল ভেসে আসে কেন ?

(3) **ব্যাখ্যা করুন** — (প্রতিটি 4 নম্বর করে)

(a) মহীসোপান ও মহীঢালের মধ্যে পার্থক্য কী কী ?

(b) বর্তমানে সমুদ্রতল সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করা হয় কিভাবে ?

(c) সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির কারণগুলি (যে কোন দুটি) আলোচনা করুন।

(d) আটলান্টিক মহাসাগরের চারপাশে কী কী সাগর, উপসাগর ও দ্বীপ দেখা যায় ?

(e) লন্ডন অপেক্ষা নিউইয়র্কে শীতকালে ঠাণ্ডা বেশী হয় কেন ?

(f) শৈবাল সাগর কী করে সৃষ্টি হয়েছে ? এটি কোথায় দেখা যায় ?

(g) কুমেরু মহাসাগরের বর্ণনা দিন।

(h) উষ্ম উপসাগরীয় স্রোতের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিন।

(i) সমুদ্রস্রোতের প্রভাবগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(j) উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত ভারত মহাসাগরীয় স্রোতের বর্ণনা করুন।

(4) **উত্তর দিন** — (প্রতিটি 10 নম্বর করে)

(a) চিত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসাগরের ভূপ্রকৃতি ও গভীরতা বর্ণনা করুন।

(b) সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতির বর্ণনা দিন।

(c) নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত কেন সৃষ্টি হয়? কোন কোন মহাসাগরে এই স্রোত দেখা যায়? এই স্রোতের গতিপথ সম্পর্কে যা জানেন লেখুন?

(d) সমুদ্র স্রোতের উৎপত্তির কারণ কী কী? প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রস্রোত বর্ণনা করুন এবং পার্শ্ববর্তী উপকূলের জলবায়ুর ওপর উহাদের প্রভাব লিখুন।

(e) টীকা লিখুন—

(i) শীতল ল্যাব্রাডার স্রোত

(ii) বেঙ্গুয়েলা স্রোত

(iii) ব্রাজিল স্রোত

(iv) সোমালি স্রোত

11.15 উত্তরমালা

1. (a) মারিয়ানা খাত। (b) আটলান্টিক মহাসাগরে। (c) ভারত মহাসাগরে। (d) নীল রং, (e) কম। (f) পেরু। (g) আটলান্টিককে, (h) উষ্ম স্রোত। (i) প্রবাল সঞ্চয়ের। (j) ভারত মহাসাগরে, (k) খুব কম। (l) ভারত মহাসাগরে। (m) আটলান্টিকে। (n) ভঙ্গিল পর্বতমালা অঞ্চলে। (o) কম। (p) গিয়ট। (q) আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে। (r) মালভূমি। (s) শীতল স্রোত।

2. (a) 8.0 অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(b) 8.05 অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(c) 8.12 অনুচ্ছেদটি দেখুন (উষ্মতার পার্থক্য)।

(d) 8.14 অনুচ্ছেদটি দেখুন (4-খ অংশে)

(e) 8.16 অনুচ্ছেদটি দেখুন ('3' নম্বরে)

(f) 8.02 অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(g) 8.08 অনুচ্ছেদটি দেখুন (শৈলশিরা ও উচ্চভূমি সমূহতে)।

(h) 8.07 অনুচ্ছেদটি দেখুন (প্রান্তদেশীয় সাগরসমূহ)

(i) 8.14 অনুচ্ছেদটি দেখুন ('5' নম্বর দেখুন)

(j) 8.14 অনুচ্ছেদটি দেখুন ('6' নম্বর দেখুন)

3. (a) 8.02 এবং 8.03 অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(b) 8.0 অনুচ্ছেদটি দেখুন (উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা দেখুন)।

(c) 8.12 অনুচ্ছেদটি থেকে যে কোন দুটি কারণ লিখুন।

(d) 8.08 অনুচ্ছেদটি দেখুন

(e) 8.17 অনুচ্ছেদটি দেখুন ('1' নম্বর দেখুন)

(f) 8.14 অনুচ্ছেদটি দেখুন ('5' নম্বরের মধ্যে শৈবাল সাগর দেখুন)।

(g) 8.11 অনুচ্ছেদটি দেখুন

(h) 8.14 অনুচ্ছেদটি দেখুন ('4' নম্বর দেখুন)

(i) 8.17 অনুচ্ছেদটি দেখুন

(j) 8.16 অনুচ্ছেদটি দেখুন ('4', '5' এবং '6' নম্বর দেখুন)।

4. (a) 8.08 অনুচ্ছেদটি দেখুন ; ছবির নম্বর '9'।

(b) 8.01 এবং 8.02 অনুচ্ছেদ দুটি দেখুন।

(c) 8.14 অনুচ্ছেদের '7' নম্বর দেখুন আটলান্টিক মহাসাগরের জন্য।
প্রশান্ত মহাসাগরের জন্য—8.15 অনুচ্ছেদটির '7' দেখুন।

(d) 8.12 অনুচ্ছেদটি দেখুন (কারণ বর্ণনার জন্য)
8.15 অনুচ্ছেটি দেখুন (প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রস্রোত বর্ণনার জন্য)
8.17 অনুচ্ছেদটি দেখুন (সমুদ্রস্রোতের প্রভাব)

(e) (i) 8.14 অনুচ্ছেদের '6' নম্বরটি দেখুন।
(ii) 8.14 অনুচ্ছেদের '1' নম্বরটি দেখুন।
(iii) 8.14 অনুচ্ছেদের '3' নম্বরটি দেখুন।
(iv) 8.16 অনুচ্ছেদের '5' নম্বরটি দেখুন।

11.15 উত্তরমালা

Allen J. R. L.	:	Physical Geology.
Cotter C. H.	:	Physical Geography of the Oceams.
Danny & John Pernetta	:	Oceans, General Editors-Mitchell Beazly Publications, London.
Dayal P.	:	A text book of Geomorphology.
শ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়		
শ্রী অজিত কুমার শীল	:	আধুনিক ভূ-পরিচয়।
Physical Geography	:	Savindra Singh
Sharma & Vatal	:	Oceanography for Geographers
F. P. Shepard	:	The Earth beneath the sea.
F. P. Shepard	:	Submarine Geology.
W. D. Thornburg	:	Principles of Geomorphology.

একক 12 ❑ মহীসোপান ও মহীঢাল

গঠন

12.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য

12.2 মহীসোপান ও মহীঢালের সংজ্ঞা
- **12.2.1** মহাদেশীয় প্রান্তসীমা
- **12.2.2** মহাদেশীয় প্রান্তসীমার শ্রেণীবিভাগ

12.3 মহীসোপান
- **12.3.1** মহীসোপানের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ভূমিরূপ
- **12.3.2** মহীসোপানের শ্রেণীবিভাগ
- **12.3.3** মহীসোপানের উৎপত্তি
- **12.3.4** মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

12.4 মহীঢাল
- **12.4.1** বিস্তার
- **12.4.2** আটলান্টিক মহাসাগরে প্রধান নিমজ্জিত খাতসমূহ
- **12.4.3** প্রশান্ত মহাসাগরে প্রধান নিমজ্জিত খাতসমূহ
- **12.4.4** নিমজ্জিত খাতের উৎপত্তি

12.5 মহীজাগান **(Continental Rise)**

12.6 সারাংশ

12.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

12.8 উত্তরমালা

12.1 প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে আমরা সমুদ্রতলে ভূপ্রকৃতি এবং সমুদ্রস্রোত সম্বন্ধে জেনেছি। এখন আমরা, এই এককে আলোচনা করব সমুদ্রতলের বিভিন্ন ভূপ্রকৃতির অন্তর্গত দুটি বিশেষ ভূপ্রকৃতি নিয়ে, অর্থাৎ মহীসোপান ও মহীঢাল নিয়ে। পূর্ববর্তী এককে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা স্বল্প পরিসরে। এবার এদের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হবে, তা হবে অনেক ব্যাপক ও গভীর (extensive and detailed study)।

উদ্দেশ্য ঃ—

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- মহীসোপান ও মহীঢাল সম্পর্কে বিশদ ধারণা করতে পারবেন।

12.2 মহীসোপান ও মহীঢালের সংজ্ঞা

গভীরতা ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—
(a) মহাদেশীয় প্রান্তসীমা (continental margins)
(b) গভীর সমুদ্রতল (deep sea floor)

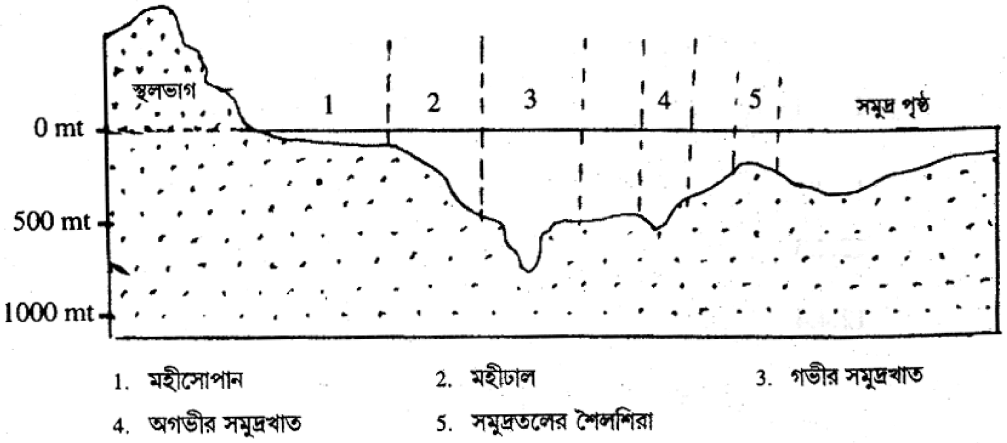

(চিত্র 12.1)

গভীর সমুদ্রতল সম্বন্ধে পূর্ববর্তী এককে আলোচনা হয়েছে, সুতরাং এই এককে আর নতুন করে আলোচনা করা হবে না।

12.2.1 মহাদেশীয় প্রান্তসীমা

সাধারণত, সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত মহাদেশের অংশবিশেষকেই (বা ভূত্বককেই) মহাদেশের প্রান্তসীমা বলে উল্লেখ করা হয়। মহাদেশের প্রান্তসীমা যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে গভীর সমুদ্রের তল।

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারছি যে, মহাদেশ এবং সমুদ্রতলের মধ্যবর্তী অংশই হল মহাদেশীয় প্রান্তসীমা অঞ্চল। এটিকে আবার ভূপ্রকৃতির দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন মহীসোপান, মহীঢাল ও মহীসঞ্চিত উচ্চভূমি বা জাগান (continental shelf, continental slope and continental rise)। (চিত্র 12.2)

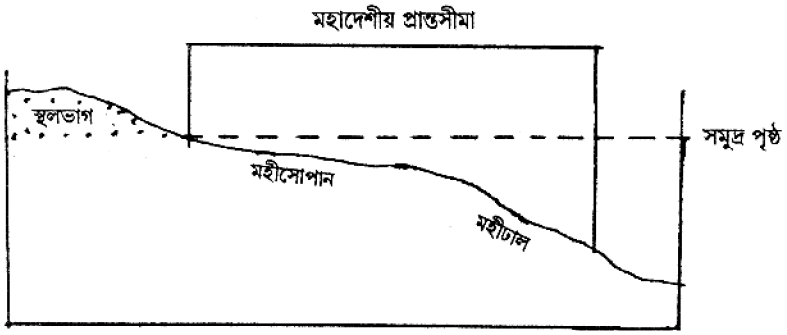

(চিত্র 12.2)

12.3 মহাদেশীয় প্রান্তসীমার শ্রেণীবিভাগ

প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় :

(A) স্থির অথবা নিষ্ক্রিয় মহাদেশীয় প্রান্তসীমা

এখানে ভূগঠনকারী শক্তিগুলি ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাওয়া যায় না (অর্থাৎ ভূমিকম্প অগ্নুৎপাত, চ্যুতি বা ভাঁজগঠনকারী শক্তি)। সাধারণত আটলান্টিক মহাসাগরের দুপাশে অবস্থিত মহাদেশগুলির প্রান্তসীমা এই ধরনের হয়ে থাকে। এখানে মহাসাগরতলের তিনটি ভূমিরূপই, যেমন মহীসোপান, মহীঢাল এবং মহীঢালের প্রান্তসীমায় অবস্থিত মহীসঞ্চিত উচ্চভূমি বা মহীজাগান (continental rise) ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(B) দ্বিতীয়টি হল সক্রিয় (active) মহাদেশীয় প্রান্তসীমা। প্রধানত প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশে এই ধরনের প্রান্তসীমা দেখা যায়। এগুলি ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি অধ্যুষিত অঞ্চল। যেমন, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে মহাদেশীয় প্রান্তসীমা হল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হল অঞ্চলগুলিতে মহীঢালের পরে গভীর সামুদ্রিক খাতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এই ধরণের সক্রিয় মহাদেশীয় প্রান্তসীমাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(i) প্রথমটি হল আন্দিজ পর্বতের নাম অনুসারে আন্দিয় ধরণের (Andean type)। এখানে মহীসোপানের ব্যপ্তি অত্যন্ত কম এবং মহীঢালের পরেই গভীর সমুদ্রখাত দেখতে পাওয়া যায়। (ii) দ্বিতীয়টিকে বৃত্তচাপীয় দ্বীপমালা ধরণের (island arc type) বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে, মহাদেশ এবং বৃত্তচাপীয় দ্বীপমালার মাঝে একটি অগভীর সমুদ্রখাত লক্ষ্য করা যায় ; গভীর সমুদ্রখাতটি প্রধানত, দ্বীপমালার পরে, সমুদ্রের দিকে, অনেক দূরে অবস্থান করে।

আমরা ইতিমধ্যে, পূর্বের অধ্যায়ে (এককে) সমুদ্র তলদেশের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে জেনেছি ; এবার এদের বিষয়েই অনেক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব। অনেক বিজ্ঞানী এ প্রসঙ্গে, মহীসোপান ও মহীঢালকে একত্রিত করে আলোচনা করেছেন। যেমন, Shepard, 'মহাদেশীয় প্রান্তসীমা' (continental margins)-এর বদলে 'মহাদেশীয় মঞ্চ' (continental terrace) হিসাবে সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতির (বিশেষত মহীসোপান ও মহীঢালের) আলোচনা করেছেন। ওঁর মতে, মহীসোপান ও মহীঢালের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রকৃতিও প্রায় একই রকমের। উনি, মোট আট (8) রকমের মহাদেশীয় মঞ্চের কথা (continental terrace) উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—(a) এবং (b) ধরনের মঞ্চ ; এই দুটি ধরণের মঞ্চকে উনি একইসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এখানে মহীঢালের প্রান্তসীমায় সাধারণত চ্যুতি দেখা যায় ; বেশীরভাগ সময়েই, মহীঢালের বেঁকে (flexing) যাবার ফলে মহীঢাল এবং চ্যুতির মাঝে নীচু জায়গায় (depression) সৃষ্টি হয় কখনও কখনও, সোপান চ্যুতির (step fault) মাঝেও নীচু জায়গা থাকে ; পরবর্তী কালে, চ্যুতিগুলি ক্ষয়কাজ দ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং নীচু জায়গাগুলিতে পলি সঞ্চিত হতে দেখা যায়।

(a) শ্রেণীর ক্ষেত্রে, মহীসোপান ক্রমশঃ তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চে (সমুদ্র তরঙ্গে ক্ষয়কাজের ফলে) পরিণত হয়।

(b) শ্রেণীতে সঞ্চয়ের ফলে মহীসোপান ক্রমশঃ উঁচু হতে থাকে।

(c) শ্রেণীতে সমুদ্রের দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া মহীসোপান দেখতে পাওয়া যায়। আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত অনেক মহীসোপান অঞ্চল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রের দিকে, বদ্বীপ অঞ্চলের ক্রমবর্ধনের ফলে অথবা তরঙ্গ কর্তিত দ্রব্যসমূহের মহীসোপানের ওপরে সঞ্চয়ের ফলে এ ধরনের গঠনমূলক মহীসোপান গঠিত হতে দেখা যায়। নীল নদ ও নাইজার নদীর বদ্বীপ এই ভাবে, অনেক দূর পর্যন্ত সমুদ্রের ভেতরে অগ্রসর হয়েছে।

(d) নিমজ্জমান মহীসোপানের ওপর তরঙ্গ কর্তিত দ্রব্যসমূহের সঞ্চয়ের ফলে এই শ্রেণীভুক্ত মহীসোপান গঠিত হয়।

(e) অনেক সময় মহীসোপানের প্রান্তভাগে, শক্ত শিলাদ্বারা গঠিত বাঁধের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় এই বাঁধ ও মহীসোপানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সঞ্চয়ের ফলে মহীসোপানটির আকারে আরও বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের বাঁধকে ভূ গঠনকারী বাঁধ (tectonic dams) ও বলা হয়ে থাকে। সানফ্রানসিস্‌কো অঞ্চলে এ রকম বাঁধ দেখা যায়।

(f) মহীসোপানের প্রান্তভাগে প্রবালদ্বারা গঠিত বাঁধ এই শ্রেণীতে দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লোরিডা উপসাগরের পূর্ব উপকূলে এই ধরনের বাঁধ দেখতে পাওয়া যায়।

(g) অনেক সময় মহীসোপানের প্রান্তভাগে নুনের ঢিবির (salt domes) বাঁধের সৃষ্টি করে।

(h) আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলেও অনেক সময় নিমজ্জিত শৈলশিরা গঠিত হতে দেখা যায়। এগুলি মহীসোপানের ঠিক পাশেই অবস্থান করলে বাঁধের সৃষ্টি করে এবং মহীসোপান ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে বর্ধিত হয়। এ্যালুসিয়ান দ্বীপের মহীসোপান এই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত।

এতক্ষণ আমরা মহাদেশীয় প্রান্তসীমার (অর্থাৎ মহীসোপান ও মহীঢালকে একত্র করে) আলোচনা করলাম। এবার এদের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে।

12.3 মহীসোপান (continental shelf)

মহাদেশের উপকূলের প্রান্ত বা শেষ অংশ থেকে যে ভূভাগ ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সমুদ্রের তলায় নেমে যায়, সেই ভূভাগকে মহীসোপান বলা হয়। বিশিষ্ট ভূ বিজ্ঞানী Monkhouse য়ের মতে "অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে, ভরা ভাটার সময়, সমুদ্রপৃষ্ঠের নিম্নসীমা উপকূলভাগে যেখান পর্যন্ত নেমে আসে, সেই উপকূলরেখা থেকে সমুদ্রের ১০০ ফ্যাদম (অর্থাৎ প্রায় 200 মিটার) গভীরতা বিশিষ্ট মগ্ন অঞ্চলকে মহীসোপান বলে।"

প্রতিটি মহাদেশের উপকূলভাগে মহীসোপান আছে ; মহীসোপান সাধারণত মৃদু ঢালে (1° অথবা তারও কম ঢালের পরিমাণ) সমুদ্রের দিকে নেমে যায় ; গঠনের দিক থেকে মহীসোপান হল মহাদেশেরই মগ্ন অংশ এবং মহীসোপানের প্রান্তভাগই মহাদেশের শেষ সীমা নির্দেশ করে।

মহীসোপানের বিস্তার কিন্তু বিভিন্ন মহাসাগরে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সাধারণত আটলান্টিক মহাসাগরের 13.3% প্রশান্ত মহাসাগরের 5.7% এবং ভারত মহাসাগরের 4.2% অংশ মহীসোপান দ্বারা আবৃত রয়েছে। আবার মহীসোপান কোথাও চওড়া, কোথাও সংকীর্ণ। সাধারণত, মহীসোপানের প্রশস্ততা নির্ভর করে, উপ-কূলভূমির প্রকৃতির ওপর। সাধারণত উপকূলভূমি নিম্নভূমি হলে অথবা ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নামলে মহীসোপান প্রশস্ত হয়, যেমন সুমেরু অঞ্চলে। আবার ভঙ্গিল পর্বতমালা অঞ্চলেও ভূমিকম্প অধ্যুসিত অঞ্চলে, মহীসোপান সংকীর্ণ হয়, যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলের মহীসোপান অত্যন্ত সংকীর্ণ প্রকৃতির। আবার প্রবাল অধ্যুসিত অঞ্চলে, মহীসোপান অগভীর প্রকৃতির হয়, অন্যদিকে কুমেরু মহাদেশের চারদিকে মহীসোপান অত্যন্ত গভীর।

মহীসোপানের ওপরে বালি, কাদা, নুড়ি, খোলা ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থের সঞ্চয় দেখতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী (size) য়ের বালির সঞ্চয়ই সব থেকে বেশী দেখা যায়।

এই বালির প্রধানত তিন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন—

(a) অজৈব বালি (terrigenous sand) ঃ প্রধানত খনিজ দ্বারা গঠিত। এই খনিজগুলি সাধারণত আবহবিকার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত স্থলভাগের শিলাসমূহ থেকে প্রাপ্ত (আবহবিকারের ফলে শিলা ভেঙ্গে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খনিজকণায়

পরিণত হয়)। প্রধানত নদী দ্বারা পরিবাহিত হয়ে এগুলি সমুদ্রে এসে জমা হয়। প্রধান খনিজ হল কোয়ার্টজ, এ ছাড়া অন্যান্য খনিজগুলি হল ফেলস্পার, অভ্র, হর্নব্লেন্ড ইত্যাদি।

(b) চূর্ণ (calcium carbonate) যুক্ত বালি (calcarenitesand)—খোলা এবং খোলা জাতীয় (shell) পদার্থের দ্বারা এই ধরণের বালি গঠিত হয়েছে। যেমন ফোরামিনিফিরা ইত্যাদি।

(c) Authigenicsand (বালি)—সমুদ্র জলের প্রত্যক্ষ অধঃক্ষেপের ফলে গঠিত হয়েছে। যেমন—উলিটি (oolites)। এই ধরণের সঞ্চয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে এবং সঞ্চয় অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়।

(2) দ্বিতীয় ধরণের সঞ্চিত দ্রব্য হল কাদা (mud) আকারের (size) দিক থেকে কাদা আবার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন—

(a) সাধারণত কাদার (mud) ব্যাস 1/6 মিলিমিটারের থেকে ছোট হয়।

(b) silt য়ের ক্ষেত্রে, ব্যাস সাধারণত 1/6-1/256 মিলি মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

(c) এর থেকেও পদার্থের ব্যাস যদি ছোট হয়, তবে তাকে বলা হয় clay। এই তিন ধরণের কাদার সঞ্চয়ই মহীসোপানের ওপর দেখা যায়।

(3) তৃতীয় ধরণের সঞ্চিত দ্রব্য হল অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট নুড়ি পাথর ; এগুলি আবার অনেক আকারের (size) হয়ে থাকে। যেমন—

নুড়ি (gravel)—2 মিলিমিটারের থেকে বেশী ব্যাস যাদের।

granules — gravel য়ের থেকে এদের ব্যাস আরও বড় হয় ; সাধারণত, 4 মিলি মিটারের কম হলে, তাদের granules বলা হয়।

pebbles (আরও বড় নুড়ি)—এদের ব্যাস সাধারণত 4-64 মিলি মিটার হয়।

cobbles (আরও বড় নুড়ি বা প্রস্তরখণ্ড)—সাধারণত 64-256 মিলি মিটার ব্যাস হয়।

boulders (অপেক্ষাকৃত বড় প্রস্তরখণ্ড)—এদের ব্যাস 256 মিলি মিটারের বেশী হয়।

এছাড়া আগ্নেয়গিরি অধ্যুসিত অঞ্চলে, লাভা জাতীয় দ্রব্য সাধারণত সঞ্চিত হয়। অনেক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা বড় বড় পাথরের খণ্ড (bomb) ছাই, ঝামা (pumice) ইত্যাদির সঞ্চয়ও দেখতে পাওয়া যায়। প্রধানত, প্রশান্ত মহাসাগরের দুই তীরবর্তী অঞ্চলে এই ধরণের সঞ্চয় বেশী দেখা যায়।

12.3.1 মহীসোপানের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ভূমিরূপ (Geomorphic features on the continental shelf)

সমুদ্রবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা জানতে পেয়েছি যে মহীসোপান মোটেই মসৃণ, ঢালু, ভূমিরূপ নয় ; এর মধ্যে ভূপ্রকৃতির যথেষ্ট বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত পক্ষে, এটি একটি অসমান, সমুদ্রের দিকে ক্রমশঃ ঢালু সোপান বিশেষ, যার মধ্যে অসংখ্য ছোট পাহাড় শৈলশিরা এবং নীচু ভূমি (depression) রয়েছে।

উপকূলের সমান্তরালে বালি দ্বারা গঠিত পাহাড় এবং শৈলশিরা দেখা যায় অগভীর সমুদ্রে ; আবার, উপকূল থেকে দূরে মহীসোপানের প্রান্তভাগেও সমান্তরাল, বালির ছোট ছোট পাহাড় এবং শৈলশিরা দেখা যায়। আবার এই সমান্তরাল পাহাড় ছাড়াও, অনেক জায়গায় আনুভূমিক (transverse) ভাবে বিস্তৃত শৈলশিরাও দেখা যায়। প্রধানত সমুদ্রতরঙ্গ অথবা জোয়ারী স্রোতের (tidal currents) ফলে এই ধরণের ভূমিরূপ গঠিত হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক উষ্মতার জন্য মহীসোপানের প্রবাল গঠিত হতে দেখা যায়। আবার হিমবাহ অধ্যুসিত অঞ্চলে, অতীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের ওঠা নামার ফলে মহীসোপানের প্রান্তভাগ মোরেন (morraine) দ্বারা গঠিত ছোট ছোট ঢিবি বা পাহাড় এবং

আউটওয়াশ (ontwash—যা সাধারণত হিমবাহের প্রান্তদেশের বড় বড় প্রস্তরখণ্ড এবং প্রান্তদেশ থেকে দূরে অবস্থিত সূক্ষ্ম পাথর, বালি, কাদার সঞ্চয়ের ফলে গঠিত হয়) দেখা যায়। কোথাও কোথাও সামুদ্রিক মহীসোপান উপত্যকা (shelf channel) দেখা যায়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী Kuenen এই সামুদ্রিক উপত্যকাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন (a) সোপান উপত্যকা (shelf channel) এবং গভীর সমুদ্রে গিরিখাত (sub marine canyons)। ওঁর মতে, সোপান উপত্যকা তিন ধরণের হয়ে থাকে, যেমন—

(a) এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত সুন্ডা সাগরের মহীসোপান অঞ্চলে এক ধরণের জোয়ারী উপত্যকা (tidal channels) দেখতে পাওয়া যায় ; মনে হয়, প্রধানত জোয়ার ভাটার স্রোতের ক্ষয়কার্যের ফলেই এই ধরণের উপত্যকা গঠিত হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন, আদতে এগুলি নদী উপত্যকা ছিল, পরে জোয়ারী স্রোতের দ্বারা আরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এগুলির দৈর্ঘ্যে বেশী বড় হয় না। (চিত্র সংখ্যা 12.3)

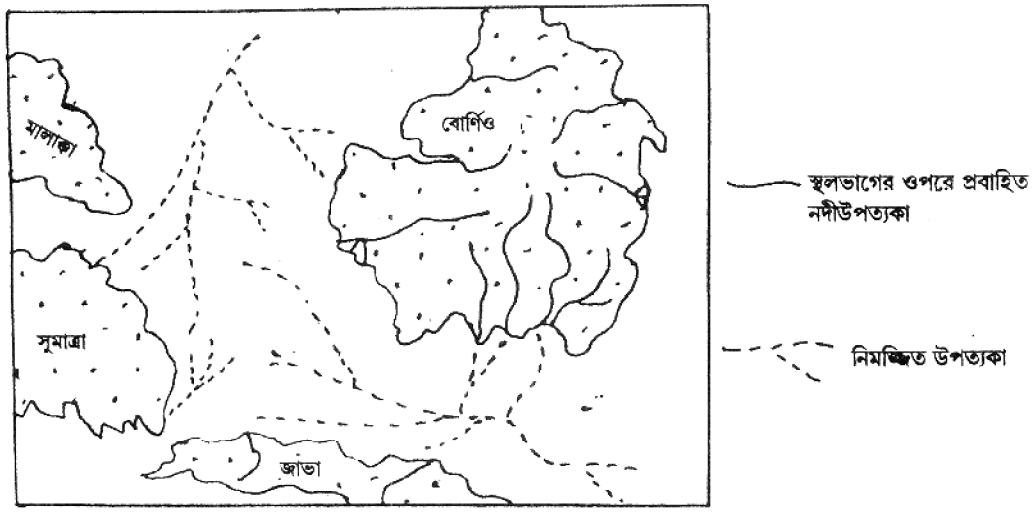

(চিত্র 12.3)

(b) হিমবাহ অধ্যুষিত, উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত মহীসোপানের মধ্যে হিমবাহ উপত্যকা (glacial troughs) দেখা যায়। এগুলি সাধারণত চওড়া এবং অগভীর প্রকৃতির হয়। বিখ্যাত সমুদ্র বিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদ Shepard য়ের মতে, হিমবাহ তার উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠের থেকে নীচে কাটার ফলে এগুলি গঠিত হয়েছে। হয়ত প্রথম অবস্থায় এই উপত্যকা স্থলভাগের ওপরেই গঠিত হয়েছিল ; পরবর্তীকালে, সমুদ্রপৃষ্ঠ নেমে যাবার ফলে (lowering of the sea level) এগুলি হিমবাহ উপত্যকা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে shepard বলেছেন যে, সাগুয়েনে (Saguenay) নদীর মোহনা থেকে সেন্ট লরেন্স উপসাগর পর্যন্ত 1200 কিমি বিস্তৃত যে উপত্যকাটি আছে, সেটি প্রকৃতপক্ষে নিমজ্জিত হিমবাহ উপত্যকা। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ জনসন-য়ের মতে, এটি আদতে নদী উপত্যকাই ছিল, পরে হিমবাহ দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত (modifield) হয়েছে।

(c) কোথাও কোথাও মহীসোপানের ওপর নিমজ্জিত নদী উপত্যকাও (river valley) দেখা যায়। মনে হয়, স্থলভাগের ওপর, নদীর ক্ষয়কাজের ফলে এগুলি প্রথমে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে, হিমযুগের পরে যখন সমুদ্র পৃষ্ঠ ওপরে উঠে গেছিল, তখন এই স্থলভাগ নিমজ্জিত হয়ে মহীসোপান গঠন করেছিল এবং পূর্বেকার

নদীউপত্যকাগুলিও স্বাভাবিক ভাবেই নিমজ্জিত উপত্যকা হিসাবেই পরিগণিত হয়। দক্ষিণ চীন সাগরে এ রকম বহু নিমজ্জিত নদী উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এ ধরণের নিমজ্জিত নদী উপত্যকা দেখা যায়। যেমন, উত্তর সাগরে অবস্থিত একটি নিমজ্জিত উপত্যকাকে অনেকে মনে করেন যে, এটি আসলে রাইন নদীর পুরো পরিত্যক্ত উপত্যকা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত নিমজ্জিত গঙ্গা উপত্যকাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরে।

12.3.2 মহীসোপানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of continental shelf)

মহাসাগরগুলির প্রান্তভাগে, বিভিন্ন রকমের মহীসোপান দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

(1) হিমবাহ অধ্যুসিত অঞ্চলকে পরিবেষ্টন করে এই ধরণের মহীসোপান অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায় এই অংশে সমুদ্রতল অত্যন্ত বন্ধুর ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এই অঞ্চলে গভীর উপসাগরের (স্থলভাগের দিকে প্রসারিত), ফিয়র্ড উপকূল হিসাবে উপস্থিতি (নরওয়ে) অথবা গভীর নিম্নভূমি (trough)-র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলগুলির গভীরতা 100 ফ্যাদময়েরও বেশী ; পাশে অবস্থিত ভূমি ভাগের (অর্থাৎ মহাদেশের) মত এখানেও, নিম্ন অঞ্চলে অনেক basin আছে এবং এগুলির মধ্যে সাধারণতঃ কাদা, বালি, নুড়ি ইত্যাদি দ্রব্য সঞ্চিত হতে দেখা যায়।

(2) যে সকল মহীসোপানগুলি হিমবাহ অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত, সেখানে বহু ছোট ছোট নুড়ি পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত পাহাড় (hill) দেখা যায়। অনেক সময় মহীসোপানের বাইরের অংশে, প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি উঁচু মগ্ন চড়া দেখা যায়, এগুলি বালি এবং বিভিন্ন আকৃতির নুড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত এবং অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎসচারণ ক্ষেত্র রূপে এগুলি পরিচিত লাভ করেছে, যেমন গ্র্যান্ড ব্যাংক, ডগার্স ব্যাংক, জর্জেস ব্যাংক ইত্যাদি। (চিত্র সংখ্যা 12.4)

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে মহীসোপানের ভেতর বহু সরু, লম্বা (elongated) বালুচড়া অথবা মগ্নচড়া এবং নিম্নভূমি দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সরু, লম্বা, বালুচড়াগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির হয় এবং নৌচলাচলের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। উত্তর সাগরে অবস্থিত ইংলিশ চ্যানেলের উত্তরের মহীসোপানে এই ধরণের মগ্নচড়া দেখতে পাওয়া যায়।

(3) শক্তিশালী সমুদ্রস্রোতদ্বারা প্রভাবিত মহীসোপান অঞ্চল—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার পূর্বদিকের মহীসোপান এই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত। এই অঞ্চলটি সাধারণত মেক্সিকো উপসাগরীয় স্রোত দ্বারা প্রভাবিত। অনেক ক্ষেত্রে, এগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ আকার ধারণ করেছে। কোথাও কোথাও আবার উপসাগরের মুখের কাছে, গভীর গর্তেরও সৃষ্টি হয়েছে।

(4) বিশাল বদ্বীপগুলির প্রান্তভাগে এই ধরণের মহীসোপান দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, মিসিসিপি, নীল নদ এবং সিন্ধু নদের বদ্বীপের প্রান্তভাগে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত কাদা, পলি (mud clay) এবং নদী দ্বারা পরিবাহিত উদ্ভিদের অংশ বিশেষ এই অঞ্চলে সঞ্চিত হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন আমাজন, অরিনকো ইত্যাদি নদীর বদ্বীপের প্রান্তভাগে প্রথমে কাদা (mud) এবং পরে, বাইরের দিকে বালির সঞ্চয় দেখা যায়। (এর থেকে বোঝা যায় যে সমুদ্রের দিকে সঞ্চিত দ্রব্যের আকার (size) বাড়তে অথবা কমতেও পারে ; আগে ধারণা ছিল যে সঞ্চিত দ্রব্যের আকার (size), সমুদ্রের দিকে সব সময় ছোট হয়ে যায় (size of the sediment always decreases towards the sea)।

(5) মসৃণ মহীসোপান (smooth self)—এই ধরণের মহীসোপানে সঞ্চিত দ্রব্যগুলি সমুদ্রের দিকে ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে এবং মহীসোপানের ঢালও অত্যন্ত কম হয় ; যেমন, মধ্য টেক্সাস অঞ্চলের মহীসোপান।

(6) এ ক্ষেত্রে মহীসোপানের মধ্যে গোলাকৃতি নুণের ঢিবি (salt domes) দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের মতে এগুলি আসলে প্রবাল প্রাচীর (coral reef)-এর অংশবিশেষ এবং এগুলি সাধারণত bioherms নামে পরিচিত। (চিত্র 12.5)

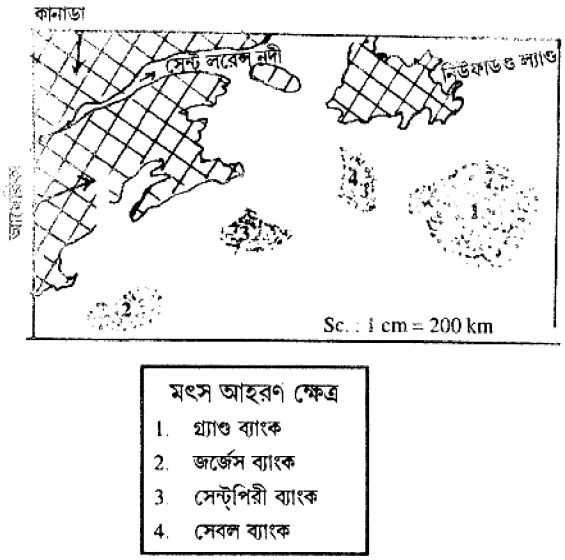

উত্তর পশ্চিম আটলান্টিকের মহীসোপান অঞ্চলে প্রধান প্রধান মৎস আহরণক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

(চিত্র 12.4)

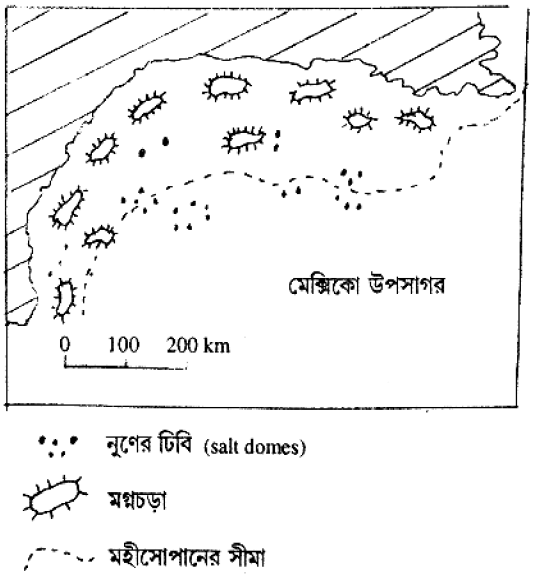

(চিত্র 12.5)

(7) পার্বত্য অঞ্চলের পাশে অবস্থিত মহীসোপানের তলদেশ অনেক সময় উন্মুক্ত শিলা (rocky bottom) দ্বারা গঠিত হয়। কখনও কখনও শিলাময় উপত্যকা বা পাথুরে দ্বীপও (rocky island) এই অঞ্চলে দেখা যায়। যেমন—San Diego of California.

(8) কখনও কখনও মহীসোপানের মধ্যে অগভীর, বিচ্ছিন্ন উপত্যকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত, হিমবাহ অধ্যুসিত অঞ্চলের মহীসোপান উপত্যকাগুলি গভীর হয় ; কিন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত উপত্যকাগুলি অত্যন্ত অগভীর প্রকৃতির। যেমন, বোর্ণিও, সুমাত্রা ও জাভার মধ্যে অবস্থিত সুন্ডা মহীসোপান। (চিত্র সংখ্যা 12.3)

(9) অনেক সময় ক্রান্তীয় অঞ্চলে, গভীর মহীসোপানের মধ্যে প্রধান প্রাচীর দেখা যায়। যেমন, অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাল সাগরে অবস্থিত গ্রেট বেরিয়ার রীফ (Great Barrier Reef of Australia)। (চিত্র সংখ্যা 12.6)

12.3.3 মহীসোপানের উৎপত্তি (Origin of Continental shelf)

এবার আমরা, মহীসোপান কি ভাবে হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করব। দেখা গেছে, মহাদেশগুলির প্রান্তভাগে অবস্থিত মহীসোপানগুলি মোটেই এক রকমের নয় ; এদের প্রকৃতি এক এক জায়গায় এক এক ধরণের। কোথাও মহীসোপান অত্যন্ত সংকীর্ণ, কোথাও আবার যথেষ্ট চওড়া ; কোথাও অগভীর, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত গভীর। ফলে, কেবলমাত্র একটি পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া (mechanism and process) দ্বারা মহীসোপানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একাধিক প্রক্রিয়ার যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলেই মহীসোপান গঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের মতামত আমরা আলোচনা করব।

প্রখ্যাত ইংরেজ ভূগোলবিদ্ C.A.M. King-এর মতে মহীসোপানের উৎপত্তির পেছনে প্রধানত চারটি কারণ বর্তমান ; এগুলি হল—(a) স্থলভাগের ক্ষয়জাগ দ্রব্য সঞ্চিত হয়ে মহীসোপান গঠিত হয়েছে। এই ধরণের

মহীসোপানকে উনি গঠনমূলক (constructional) মহীসোপান বলে উল্লেখ করেছেন। (b) উপকূলের কাছে অবস্থিত দ্বীপ, সমুদ্রতরঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবার ফলে ক্ষয়জাত দ্রব্যগুলি দ্বীপ এবং উপকূলের মধ্যবর্তী নীচু স্থানে সঞ্চিত হয়েছে এবং কালক্রমে মহীসোপান গঠন করেছে। (c) অনেক ক্ষেত্রে, সমুদ্রে পতিত নদীর দ্বারা গঠিত বদ্বীপ এক ধরনের মহীসোপান গঠন করেছে। (d) আবার, সমুদ্রের দিকে বেঁকে যাওয়া নিমজ্জিত তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চকে অনেক ক্ষেত্রে মহীসোপান গঠনের পেছনে মূল কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে।

King ছাড়াও অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। যেমন সমুদ্রবিজ্ঞানের পথিকৃত Shepard, Daly, Bourcart ইত্যাদিরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন, কেউ ভূগর্ভে উৎপন্ন পরিচলন স্রোতের কথা বলেছেন, কেউ বা আবার উপকূলের কাছে গঠিত চ্যুতি বা ভাঁজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মোটামুটিভাবে, এদের মতামতগুলি নিয়ে এবার আমরা মহীসোপানের জটিল গঠন পদ্ধতির কথা আলোচনা করব। যেমন—

(1) হিমযুগে, সমুদ্রের জল বরফে পরিণত হবার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ অনেক নীচে নেমে গেছিল ; বৈজ্ঞানিক R.A. Daly'র মতে, প্লায়োষ্টোসিন (pleistocene) যুগে, সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রায় 34 ফ্যাদম (অর্থাৎ প্রায় 224) নীচে নেমে গেছিল ; ফলে এতকাল ধরে নিমজ্জিত মহাদেশের প্রান্তভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরে উঠে এসেছিল এই উন্মুক্ত স্থলভাগের ওপর হিমবাহের ক্ষয়কাজ শুরু হল এবং কালক্রমে, এটি একটি বিশাল মহাদেশীয় মঞ্চে পরিণত হল ; তারপর, কালক্রমে, আবার উত্তাপ বৃদ্ধি পাবার ফলে হিমবাহ গলে গেল এবং তার ফলে, সমুদ্রের জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এবং স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্র পৃষ্ঠও ওপরে উঠল। এর ফলে, মহাদেশীয় মঞ্চটি আবার নিমজ্জিত হল এবং বর্তমান মহীসোপান গঠিত হল। এই মতবাদকে glacial control theory বলে উল্লেখ করা হয়।

(2) ভূপৃষ্ঠের তলায়, ভূগর্ভে, তাপের উপস্থিতির ফলে পরিচলন স্রোতের (convectional currents) সৃষ্টি হয় ; ওই উর্দ্ধগামী স্রোত মহাদেশ ও সমুদ্রতলের সীমারেখায় এসে মিলিত (converge) হয় ও আঘাত করে, এবং তারপর নিম্নগামী হয়। ফলে ওই সীমারেখায় সংনমনের (compressive force) সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে মহাদেশের প্রান্তভাগে নিমজ্জিত হয় এবং অবশেষে মহীসোপান গঠন করে।

(3) অনেক সময়, মহাদেশের প্রান্তভাগ সমুদ্রের দিকে কাত হয়ে যায় (tilting) এবং নিমজ্জিত হয় এই নিমজ্জিত অংশই তখন মহীসোপান গঠন করে।

(4) কখনও কখনও মহাদেশের প্রান্তভাগে, সাধারণ চ্যুতি অথবা সোপান চ্যুতির (step faulting) ফলে মহীসোপান গঠিত হয় ; চ্যুতির ফলে, প্রান্তভাগ নীচের দিকে নামে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের তলায় নিমজ্জিত হয়ে মহীসোপান গঠন করে। তবে চ্যুতির ফলে ভূমিভাগ যদি 300 mt এর বেশী পতিত হয়, তখন আর মহীসোপান গঠিত হয় না ; এই ধরণের মহীসোপান সাধারণত পর্বত সঙ্কুল উপকূলীয় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাংশে, কুইনস্ল্যান্ডের উপকূলীয় অঞ্চলের মহীসোপান এইভাবে গঠিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, চ্যুতির ফলে সাগরের দিকে নিমজ্জিত ভূমিভাগের গভীরতা মোটামুটিভাবে 200 mt য়ের কাছাকাছি রয়েছে। এই ধরণের সোপান চ্যুতির অস্তিত্ব মরক্কো উপকূলের প্রান্তভাগে বৈজ্ঞানিক Bourcart লক্ষ্য করেছেন। Shepard কৃত মহীসোপানের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে এই ধরণের মহীসোপানের কথা পাওয়া যায়। এই চ্যুতিগুলির মাঝে, অনেক সময় নীচু জায়গা থাকে, কালক্রমে, এই নীচু জায়গাগুলি সঞ্চিত দ্রব্য দ্বারা ক্রমশঃ ভরাট হয়ে, মহীসোপান গঠন করে। এই ধরণের (অর্থাৎ চ্যুতির ফলে গঠিত) মহীসোপানকে ভূগঠনকারী শক্তি দ্বারা গঠিত মহীসোপান (tectonically formed continental shelves) বলা হয়ে থাকে।

(5) অনেক সময়, নুড়ি, বালি ও অন্যান্য পাথরের দ্বারা অবঘর্ষ (abrasion) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

উপকূলভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ শক্তিশালী সমুদ্র তরঙ্গের সাহায্য এই বালি, নুড়ি ইত্যাদি উপকূলের ওপর আঘাত ও ঘর্ষণ করে। এইভাবে আঘাতের ফলে উপকূলে ভৃঙ্গ (sea cliff) গঠিত হয়। কালক্রমে ক্রমাগত আঘাত বা ক্ষয়কাজের ফলে এই ভৃগুগুলি ক্রমশ ভাঙ্গতে থাকে, অর্থাৎ পিছু হটতে থাকে (cliffs gradually recede towards the land)। এর ফলে আস্তে আস্তে বিস্তৃত তরঙ্গা কর্তিত মঞ্চের সৃষ্টি হয় এবং এটি নিমজ্জিত হয়ে মহীসোপান সৃষ্টি করে। (চিত্র সংখ্যা 12.7)

(চিত্র 12.6)

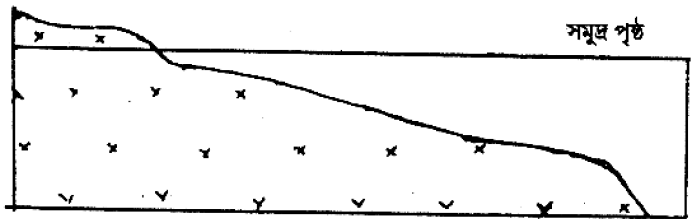

মহীসোপান — সমুদ্র তরঙ্গের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গঠিত হয়েছে।

(চিত্র 12.7)

(6) অনেক সময় নদী দ্বারা বাহিত ক্ষয়জাত দ্রব্য সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে সঞ্চিত হলে মহীসোপান গঠিত হয়। এই সঞ্চয়ের কাজ অত্যন্ত ধীরে ধীরে সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত অঞ্চলের সমুদ্র শান্ত (calm) প্রকৃতির হয়, অর্থাৎ সঞ্চয়কাজে কোনও বাধা আসে না, কেবলমাত্র সেখানেই এই ধরণের সঞ্চয়ের ফলে সমুদ্রজলের তলায়, বিস্তৃত মহীসোপান গঠিত হতে দেখা যায়। এই ধরণের মহীসোপানকে গঠনমূলক মহীসোপান (constructional type) বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন, গঙ্গা নদীর বদ্বীপের ওপর গঠিত মহীসোপান। (চিত্র সংখ্যা 12.8)

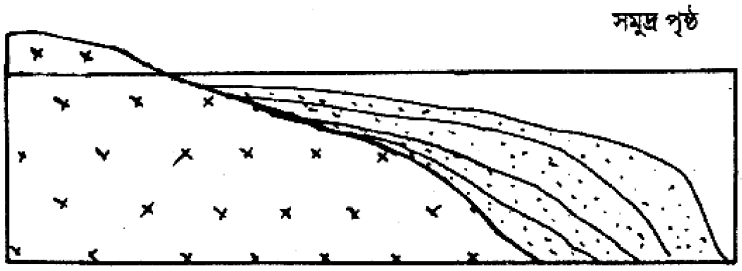

স্থলভাগ থেকে আসা পলির সঞ্চয়ের ফলে মহীসোপান গঠিত হয়েছে।

(চিত্র 12.8)

(7) কখনও কখনও, ক্ষয় এবং সঞ্চয়—উভয় কাজের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলে মহীসোপান গঠিত হয়। দেখা গেছে, মহাদেশীয় মঞ্চ সমুদ্রের দিকে বিস্তার লাভ বা প্রসারিত হবার ফলে মহীসোপান গঠিত হয়েছে। সাধারণত, সমুদ্র তরঙ্গা ও স্রোতদ্বারা মহাদেশের প্রান্তভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মহাদেশীয় মঞ্চ গঠন করে ; আবার এই মঞ্চের ওপর

নদীদ্বারা বাহিত ক্ষয়জাত দ্রব্যাদি সঞ্চিত হতে থাকে। জলের তলায় ক্রমাগত সঞ্চয়ের ফলে, এগুলি ক্রমশঃ জমাট বেঁধে যায় এবং পরিশেষে মহীসোপান গঠিত হয়। (চিত্র সংখ্যা 12.9)

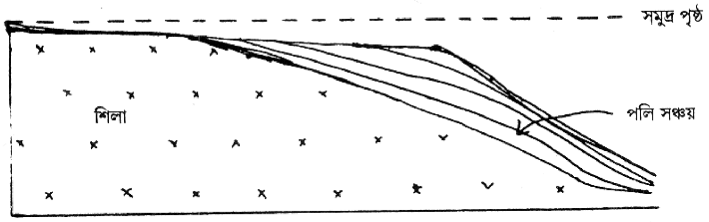

মহীসোপান — ভেতরের অংশটি সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা কর্তিত হয়ে (wave cut) গঠিত হয়েছে।

বাইরের অংশটি সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা পলি সঞ্চয়ের (wave built) ফলে গঠিত হয়েছে।

(চিত্র 12.9)

(8) মহীসোপানের উৎপত্তি সম্পর্কে Bourcurt য়ের মতবাদ—''Theory of Continental Flexure' বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। ওঁর মতে, মহাদেশের বা স্থলভাগের flexing য়ের ফলে দেখা গেছে, স্থলভাগের মধ্য অংশ ক্রমশ স্ফীত হয়েছে, অন্য দিকে, উপকূলীয় অংশ ক্রমশ অবনমিত হয়েছে ; এই অবনমিত অংশই, প্রকৃতপক্ষে মহীসোপান গঠন করেছে। উদাহরণ হিসাবে উনি মরক্কোর উপকূলে অবস্থিত মহীসোপানের কথা উল্লেখ করেছেন। ওখানে, সমুদ্রের দিকে বেঁকে যাওয়া (down warped) পর পর কয়েকটি মহীসোপান লক্ষ্য করা যায়। তবে, এই ধরণের মহীসোপানের বিস্তার অত্যন্ত সীমিত বলে মনে হয়।

(9) বৈজ্ঞানিক M. Moltedahl একটি বিশেষ ধরণের মহীসোপানের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে, (অর্থাৎ মহীসোপানে) সমান্তরালে বিস্তৃত বহু অবনমিত অঞ্চলের (parallel depressions) কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন শিলাদ্বারা গঠিত শীল্ড (shield) অঞ্চলের প্রান্তভাগে বহু fissures থাকার ফলে অতীতে অগ্নুৎপাত ঘটেছিল ; ফলে, লাভা সঞ্চয়ের জন্য এই অঞ্চলের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং উঁচু অঞ্চলের প্রান্তভাগে, সমান্তরালে বিস্তৃত বহু অবনমিত অংশের সৃষ্টি হয়, যেগুলি পরবর্তী কালে প্রধানত নদীর ক্ষয়কার্যের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। এই ধরণের অবনমিত অংশকেই মহীসোপান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সাধারণত গ্রীনল্যান্ড, নরওয়ে, ল্যাব্রাডর ইত্যাদি প্রাচীন শিলাদ্বারা গঠিত শীল্ড অঞ্চলের প্রান্তভাগে এই ধরণের মহীসোপান দেখা যায়। (চিত্র সংখ্যা 12.10)

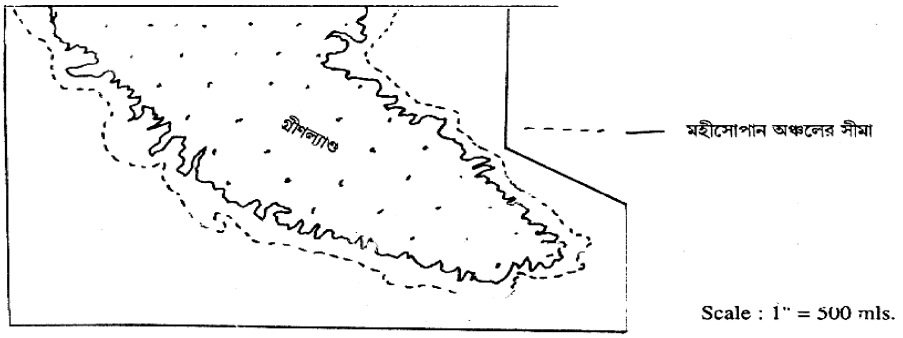

(চিত্র 12.10)

(10) আফ্রিকার উত্তর অংশে, আলজিরিয়া এবং টিউসিনিয়ার উপকূলভাগে এক বিশেষ ধরণের মহীসোপান দেখা যায় ; এই মহীসোপানের ওপরে ভাঁজের বিশেষ করে ঊর্ধ্বভঙ্গ ভাঁজের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। দুটি ভাঁজের মাঝে অবস্থিত নীচু অংশে পলি সঞ্চিত হয়েছে।

12.3.4 মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Continental shelf)

যেভাবেই উৎপত্তি হোক না কেন, বর্তমান জগতে মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন,

(1) এই অঞ্চলেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক মৎস্যচারণক্ষেত্রগুলি গড়ে উঠেছে ; এখানেই প্ল্যাংকটনের উপস্থিতির জন্য মাছের সর্বাধিক সমাবেশ দেখা যায়। যেমন বিখ্যাত ডগার্স ব্যাংক, গ্র্যান্ড ব্যাংক, সিডার পেট ব্যাংক ইত্যাদি। (চিত্র 12.11)

(চিত্র 12.11)

(2) মহীসোপান অঞ্চল থেকে বহুদেশে পেট্রোলিয়াম ও স্বাভাবিক গ্যাস উত্তোলন করা হয়। যেমন উত্তর সাগরের বিশাল তৈল ভাণ্ডার। (চিত্র সংখ্যা 12.12)

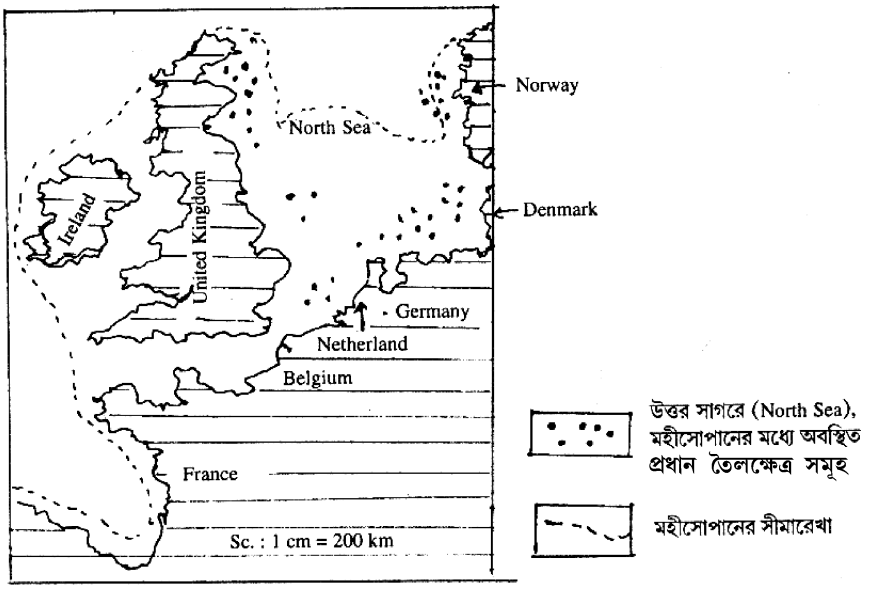

(চিত্র 12.12)

(3) মহীসোপান অঞ্চলের উপকূল রেখা ভগ্ন হলে, বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

(4) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষিত বিশাল খাদ্য ভাণ্ডারের উৎস হিসাবে এই অঞ্চলকে গণ্য করা হয়ে থাকে।

মহীসোপানের পর এবার আমরা মহীঢাল নিয়ে আলোচনা করব।

12.4 মহীঢাল (Continental slope)

মহীসোপানের ঢালের হঠাৎ করে পরিবর্তন দেখা যায় ; একে সোপানের ঢালের পরিবর্তন রেখা বা shelf break বলা হয়। এখান থেকেই, মহীঢাল শুরু হয় ; এই অংশটির ঢাল মহীসোপান অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। মহীঢালের ঢাল সাধারণত 2°-5°, কোথাও কোথাও 15° পর্যন্ত ঢাল দেখতে পাওয়া যায়। ঢাল অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এর বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত কম। এর গভীরতা কিন্তু অনেক বেশী। মোটামুটিভাবে মহীঢালের গড় গভীরতা 200 mt থেকে 2000 mt বা আরও বেশী হতে পারে। তবে, সাধারণত, প্রশান্ত মহাসাগরে, মহীঢালের ঢাল বেশী হয়, গড়ে 5° -25′; আটলান্টিক বা ভারত মহাসাগরে ঢাল অপেক্ষাকৃত কম, গড়ে যথাক্রমে 3°05′ এবং 2°55′। আবার সক্রিয় মহাদেশীয় প্রান্তসীমায় (active continental margins) মহীঢালের গভীরতা স্থির মহাদেশীয় প্রান্তসীমা (stable continental margins) অপেক্ষা অনেক বেশী।

ঢাল বেশী হবার জন্য মহীঢালে স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চয় অত্যন্ত কম। সাধারণত লাল, নীল ও সবুজ রংয়ের কাদা ও প্রবাল দেখা যায় এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষও সঞ্চিত হয়। গড়ে, সঞ্চিত দ্রব্যের প্রায় শকরা 60 ভাগ হল কাদা, 25 ভাগ হল বালি এবং বাকি 15 ভাগ হল নুড়ি, পাথর, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ ইত্যাদি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (যেখানে আগ্নেয়গিরির উপস্থিতি বেশী) লাভা জাতীয় দ্রব্যের সঞ্চয়ও দেখা যায়। (চিত্র 12.13)

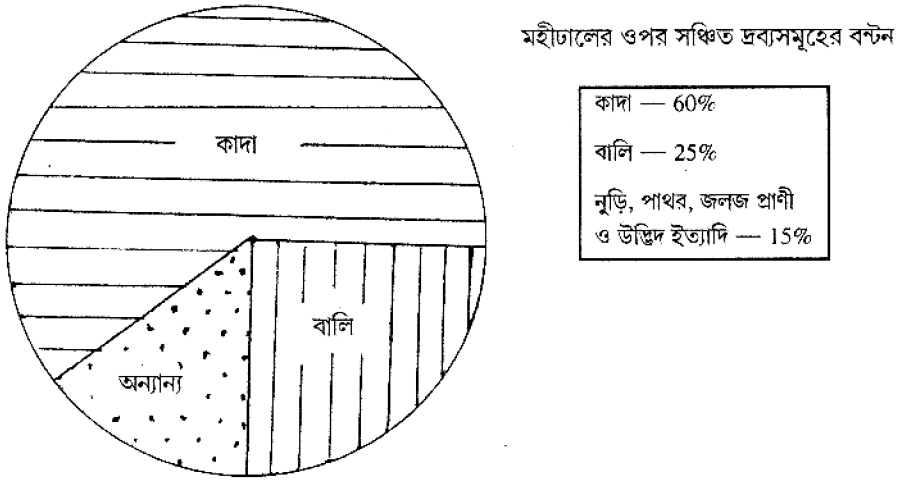

(চিত্র 12.13)

মহাদেশীয় প্রান্তসীমা যেখানে গিয়ে গভীর সমুদ্রের সমভূমির সঙ্গে মিশেছে, সেখানে মহীঢালের অবস্থান

মহীঢালের উপরের অংশে বিভিন্ন ভূমিরূপ দেখা যায়, যেমন চ্যুতি, সোপান চ্যুতি, সমান্তরাল শৈলশিরা, প্রবাল প্রাচীর, নুনের ঢিবি ইত্যাদি। তবে এগুলি ছাড়াও আরও এক ধরণের ভূমিরূপ এখানে, দেখা যায়, এটি হল নিমজ্জিত খাত (submarine canyons)। প্রকৃতপক্ষে, সংকীর্ণ, গভীর, সামুদ্রিক উপত্যকাকেই নিমজ্জিত খাত বলা হয়ে থাকে। এরা মহীঢালের ওপর দিয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়েছে, কখনও কখনও মহীসোপান থেকেই এদের গতিপথ লক্ষ্য করা গেছে।

সাধারণভাবে, স্থলভাগের ওপরে অবস্থিত নদী বা হিমবাহ উপত্যকার সঙ্গে দেহের চেহারার অত্যন্ত মিল আছে। হিমবাহ দ্বারা গঠিত নিমজ্জিত খাতের সংখ্যা (সমুদ্রের তলায়) অবশ্য খুবই কম ; তাই আমাদের আলোচনা প্রধানত অ-হিমবাহ দ্বারা গঠিত নিমজ্জিত খাতের মধ্যেই (non-glacial canyons) সীমাবদ্ধ রাখব।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা কোন বড় নদী মুখের (river mouth) শেষ সীমা থেকে, সমুদ্রের দিকে উপকূলের আড়াআড়িভাবে (transversely) বিস্তার লাভ করেছে। বৈজ্ঞানিক Shepard-এর মতে, নিমজ্জিত খাতের সঙ্গে নবীন নদী উপত্যকার যথেষ্ট মিল আছে। যদিও Kuenen এবং Crowwell এদের সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখেছেন যে এদের (অর্থাৎ খাতের) দৈর্ঘ্য বরাবর পার্শ্বচিত্র (long profile) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে—

(i) মাথার দিকে এর ঢাল অনেক বেশী এবং নীচের দিকে ঢাল ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। যেমন ওপর, মধ্য এবং নীচের অংশে এদের ঢাল যথাক্রমে 11.62%, 6.63% এবং 4.76%।

(ii) এদের উপখাতের (secondary canyons) সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম।

(iii) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মাথার দিকে এরা নদী উপত্যকা অপেক্ষা অনেক বেশী চওড়া হল (গড়ে 15/16 Km)।

(iv) প্রথম অবস্থায়, নদী উপত্যকা অপেক্ষা এদের গতিপথ অনেক বেশী আঁকাবাঁকাও হয়। এদের গভীরতাও যথেষ্ট হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে, গড়ে 300-1000 mt পর্যন্ত গভীরতা লক্ষ্য করা গেছে কখনও কখনও এদের গভীরতা 4000 mt পর্যন্তও পৌঁছিয়েছে। এই খাতের দুপাশের অংশে (valley sides) যা অত্যন্ত খাড়া ভাবে গঠিত এবং গর্ভে (floors), সাধারণত নরম (শেল) এবং কখনও কখনও শক্ত শিলার (গ্রানাইট ও কোয়ার্টজাইট) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত বালি, নুড়ি ইত্যাদি (এগুলি স্থলভাগ থেকে আসে) দ্বারা এই খাত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনেক সময়, উপত্যকার (বা খাতের) ওপরে ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্য সঞ্চিত হয়ে একটি পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে। বালির মধ্যে, অনেক সময়, স্থলভাগ থেকে আসা জৈব পদার্থও থাকে। এইভাবেই মহীঢালের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খাতটি গভীর সমুদ্রতল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সেখানে (অর্থাৎ মহীঢালের পাদদেশে) ঢালের পরিবর্তনের জন্য পরিবাহিত দ্রব্যাদি সঞ্চিত হয়ে পাখা শঙ্কুর মত ভূমিরূপ গঠন করে, যাকে আমরা মহীজাগান (continental rise) বলে উল্লেখ করে থাকি।

12.4.1 বিস্তার

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Shepard এবং Beard প্রায় 102 কোটি নিমজ্জিত উপত্যকার অস্তিত্ব সমুদ্রতলে লক্ষ্য করেছেন। মোটামুটিভাবে, কয়েকটি বিশেষ জায়গায় এগুলি অবস্থান করছে, যেমন—

(1) সক্রিয় বা অস্থির এবং স্থির বা নিষ্ক্রিয় (both in active/unstable and stable)—উভয় প্রকার উপকূলেই নিমজ্জিত খাত দেখা যায় ; তবে সক্রিয় (অর্থাৎ যেখানে স্থলভাগের অবনমন বা উত্থান সংগঠিত হয় প্রায়শই) উপকূলীয় অঞ্চলেই এদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়।

(2) সাধারণত, ভগ্ন উপকূল অপেক্ষা অভগ্ন উপকূলেই এদের উপস্থিতি বেশী হয়। আবার অত্যন্ত কম ঢালু মহীঢালে (2° কম ঢাল যেখানে) এদের কম দেখা যায়।

(3) অনেক সময়, নদী যেখানে গিয়ে সমুদ্রের সাথে মিশেছে, সেখান থেকে নিমজ্জিত খাতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

(4) অনেক সময়, নদী মুখের (নদী সঙ্গমস্থল) কাছ থেকে উৎপন্ন খাতগুলি অনেক বেশী গভীর ও চওড়া হয়।

(5) এদের বিস্তার সারা পৃথিবী জুড়েই, উষ্ম নিরক্ষীয় অঞ্চলে যেমন এদের দেখা যায়, শীতল তুন্দ্রা অঞ্চলেও এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। উত্তর আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে, উত্তর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, এ্যালুসিনিয়ান, জাপান, ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপকূলভাগে এদের উপস্থিতি বেশী দেখা যায়।

12.4.2 আটলান্টিক মহাসাগরে প্রধান নিমজ্জিত খাতগুলি হল

(a) জর্জেস ব্যাংকের কাছে, 1930 সালে Corsen gorge বা কর্সেন গর্জ আবিষ্কৃত হয় ; 1929 সালের শেষে, প্রবল ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলের টেলিফোন লাইন ছিঁড়ে গিয়েছিল ; এর কারণ খুঁজে বার করবার জন্য সামুদ্রিক অভিযান চালানো হয় এবং আটলান্টিকের পশ্চিম উপকূলে, পর পর অনেকগুলি যেমন সেন্ট লরেন্স খাত, ক্যাবট (Cabot) খাত ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

(b) যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের খাতগুলি হল—ব্রেটন খাত, ন্যাজারে (Nazare) খাত, আফ্রিকার নাইজার ও কঙ্কো নদীর মুখে গঠিত যথাক্রমে নাইজার ও কঙ্কো খাত ইত্যাদি।

12.4.3 প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান নিমজ্জিত খাতগুলি হল

(a) পশ্চিম উপকূলের কলম্বিয়া নদীর মুখে অবস্থিত কলম্বিয়া খাত, ক্যালিফোর্ণিয়ার কাছে মন্টেরে (Montery) খাত, স্ক্রীপস্ খাত (Scripps), বায়ানো (Bayano) নদীর মুখে বায়ানোখাত ইত্যাদি। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে খাতগুলি হল সাগানিন এবং চোটসুয়ি পাই (Saganin and Chotsui Pii) হাওয়াই এবং ফরমোসা দ্বীপের কাছে অবস্থিত কিছু নিমজ্জিত খাত দেখতে পাওয়া যায়।

ভারত মহাসাগরের বেশ কিছু নিমজ্জিত খাতের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই নদী মুখে অবস্থিত, যেমন গঙ্গা, সিন্ধু, পেন্নার, গোদাবরী, কৃষ্ণা ইত্যাদি নদীগুলির মুখে গঠিত নিমজ্জিত খাতসমূহ। (চিত্র সংখ্যা 12.14)

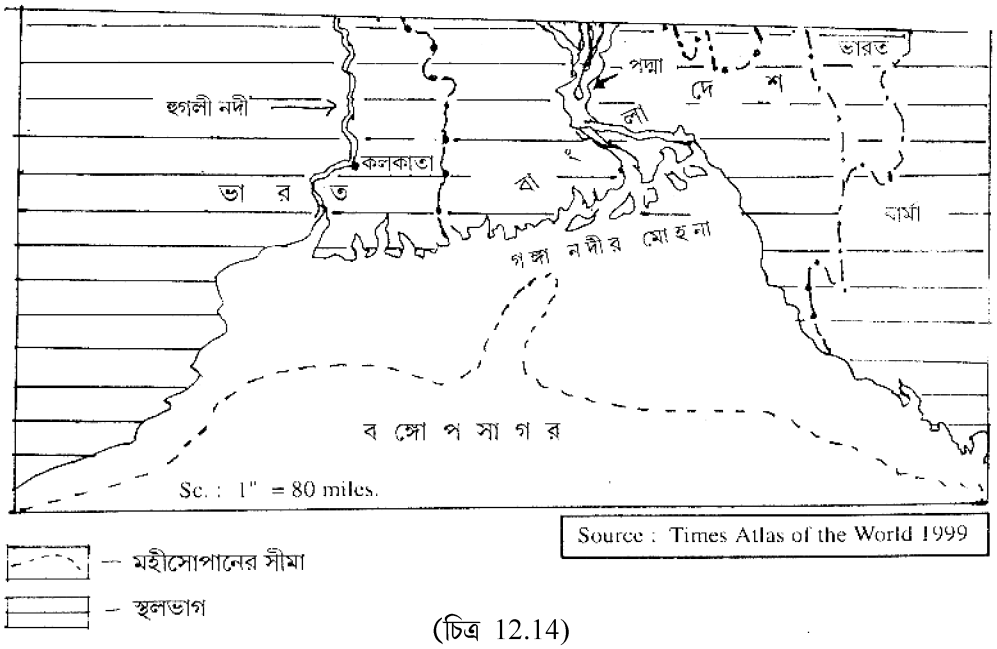

(চিত্র 12.14)

12.4.4 নিমজ্জিত খাতের উৎপত্তি (Origin of submarine canyons)

বিভিন্ন সমুদ্রে অবস্থিত নিমজ্জিত খাতগুলির বিস্তারের বর্ণনার পর, এবার আমরা এদের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করব। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ এদের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এগুলি হল—

12.4.4.1 Hull, Shepard এবং Dana'র মতবাদ

ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণ নিমজ্জিত খাতের উৎপত্তির পেছনে, ভূপৃষ্ঠের বাইরের বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়কাজের কথা আলোচনা করেছেন (Sub aerial erosion theory)। এরা লক্ষ্য করেছেন যে ভূপৃষ্ঠে গঠিত নদী উপত্যকা ও সমুদ্রে অবস্থিত নিমজ্জিত খাতের চেহারা অনেকটা একই রকমের। এর ভিত্তিতেই এরা বলেছেন যে অতীতের নদী উপত্যকাই বর্তমানে নিমজ্জিত খাতে পরিণত হয়েছে। অতীতে যখন সমুদ্রপৃষ্ঠ অনেক নীচে ছিল, তখন ভূপৃষ্ঠের ওপরে নদীর ক্ষয়কাজের ফলে গভীর উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে, ঐ অঞ্চল (অর্থাৎ মহাদেশের প্রান্তভাগ) ভূ-আন্দেলনের ফলে ক্রমশ অবনমিত হয় অথবা উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য মহাদেশীয় হিমবাহগুলি গলিত হবার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ওপরে উঠে যায় এবং নিমজ্জিত খাতে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসাবে এরা ফিলিপাইন খাত, মন্টেরে খাত ইত্যাদির নাম উল্লেখ করেন।

এই মত কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ W.M. Davis-এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে—

(1) মহাদেশীয় প্রান্তভাগের অবনমবন বা সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থানের পক্ষে বিশাল ভূতাত্ত্বিক যুগের বা সময়ের প্রয়োজন ; অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরণের ভূগাঠনিক পরিবর্তন কখনই সম্ভব নয়।

(2) দ্বিতীয়তঃ নিমজ্জিত খাতগুলি যদি প্রকৃতপক্ষে অতীতের নদী উপত্যকাই হয়, তবে বর্তমানে তাদের (অর্থাৎ নিমজ্জিত খাতগুলিকে) আমরা নদীর মুখ থেকেই সমুদ্রের দিকে বিস্তার লাভ করতে দেখব। কিন্তু বাস্তবে, এমন অনেক নিমজ্জিত খাত আছে, যেগুলি সমুদ্রের আরও ভেতরে অবস্থিত মহীঢাল থেকে শুরু হয়েছে। সমালোচনার প্রথম অভিযোগের উত্তরে Shepard প্রমুখেরা বলেছেন যে, অতীতে প্লায়োস্টোসিন হিম যুগে, সমুদ্রপৃষ্ঠ 1000 mt নেমে গেছিল যার ফলে স্থলভাগের ওপরে নদীগুলি গভীর উপত্যকা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

12.4.4.2 ভূগাঠনিক মতবাদ (Diastrophia Theory)

এটি দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণকারী মতবাদ ; এখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ, যেমন Andrade Lawson, Gregory, Yonasahi, Hourcart ইত্যাদিরা নিমজ্জিত খাত গঠনের পেছনে ভূগাঠনিক শক্তির / চ্যুতি, ভাঁজ, বাঁক, অবনমন ইত্যাদি) কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণত ভূ আন্দোলনের ফলে ভূপৃষ্ঠে শিলায় টানের (tension) সৃষ্টি হয়। টানের ফলে, মহাদেশের প্রান্তসীমায় চ্যুতি, পরিখা চ্যুতি (trough fault or graben) ইত্যাদি গঠিত হয়। কালক্রমে মহীসোপান ও মহীঢালের ওপর গঠিত এই ধরণের গ্রাবেন নিমজ্জিত খাতে পরিণত হয়। একইভাবে, ভূআন্দোলনের ফলে, মহাদেশের প্রান্তসীমায়, অর্থাৎ মহীসোপান ও মহীঢাল অঞ্চলে, কখনও কখনও বাঁকের (warping) অথবা ভাঁজের (folding) ফলে অধঃভাজের (syncline) সৃষ্টি হয় এবং অধঃভাঁজের মধ্যবর্তী অঞ্চল খাতে (synclinal trough) পরিণত হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে, এ ধরণের স্থানীয় ভূআন্দোলনের ফলে পর পর একাধিক পরিখাচ্যুতি গঠিত হতে দেখা যায় এবং এগুলিই নিমজ্জিত খাতে পরিণত হয়। এই মতবাদের সপক্ষে বৈজ্ঞানিকগণ বহু উদাহরণ উত্থাপন করেছেন। যেমন, হাউসন খাত ও সেন্ট লরেন্স খাতের কথা Gregory, জাপান উপকূলে নিমজ্জিত খাতের কথা Yanasaki, ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলের খাতের কথা Lawson উল্লেখ করেছেন।

আবার Jenson ও Bourcart-এর মতে, মহাদেশীয় প্রান্তসীমায়, কোয়াটারনারী যুগে (Quarternary), ভূ আন্দোলনের ফলে বাঁকের (warping) সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী কালে এই অঞ্চল অবনমিত হলে, প্রান্তসীমায় গঠিত নদী উপত্যকাগুলি নিমজ্জিত হয়ে খাতের সৃষ্টি করে।

অন্যান্য আরও বহু ঘটনা থেকে এই ভূ আন্দোলনের কথা জানা যায়। যেমন, 1929 সালের November মাসে, ভূমিকম্পের ফলে নিউফাউন্ডল্যান্ড অঞ্চল অবনমিত হয় ; এই অনমন বারবার হতে থাকে। প্রান্ত সীমায় অবস্থিত fissure যুক্ত অঞ্চলে চ্যুতিও দেখা যায়। এর ফলে এই অঞ্চলে নিমজ্জিত খাতের সৃষ্টি হয়, যেমন Corsair খাত। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে টেলিফোনের লাইন নষ্ট হয়ে যায়।

তবে, এই মতবাদ অনেক বিজ্ঞানীই সমর্থন করেননি। এঁদের মতে—

(1) অনেক ক্ষেত্রে, নিমজ্জিত খাতগুলি দেখতে বৃক্ষের মত (dendritic); কিন্তু চ্যুতির ফলে যদি খাত গঠিত হয়, তবে তার চেহারা কখনই গাছের মত হবে না।

(2) অধিকাংশ নিমজ্জিত খাতগুলি উপকূলের আড়াআড়িভাবে গঠিত হয়ে সমুদ্রের দিকে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু বাস্তবে, চ্যুতি বা পরিখা চ্যুতিগুলির বিস্তার উপকূলের সমান্তরালে সাধারণত দেখা যায়।

(3) আবার মহাদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত সমস্ত মহীসোপান ও মহীঢাল অঞ্চলে ভূআন্দোলন সাধিত হয়নি। (অর্থাৎ, সর্বত্র চ্যুতি, ভাঁজ, বাঁক ইত্যাদি গঠিত হয়নি)। ফলে ঐ সব জায়গায়, নিমজ্জিত খাতের অস্তিত্ব এই মতামত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন, প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত মহাসাগরীয় প্রান্তভাগে বহু ভূআন্দোলন সংঘটিত হয়েছে টার্শিয়ারী - কোয়ার্টারনারী যুগে। ফলে, ঐ অঞ্চলে নিমজ্জিত খাতের উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ একই যুগে, আটলান্টিক মহাসাগরে ভূআন্দোলন প্রায় অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং ভূআন্দোলন তত্ত্ব দ্বারা আটলান্টিকের নিমজ্জিত খাতগুলির ব্যাখ্যা করা যায় না। বরঞ্চ, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে বহু নিমজ্জিত খাত লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি টার্শিয়ারী শিলার ওপর দিয়ে গঠিত হয়েছে, অর্থাৎ ঐ যুগের পরে গঠিত হয়েছে।

(4) কোনও কোনও মহীসোপানের ওপরে অবস্থিত নিমজ্জিত খাতগুলির উভয় পার্শ্বের ঢাল অত্যন্ত মসৃণ ; এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ অঞ্চলে কোন প্রকার ভূআন্দোলন সংঘটিত হয়নি।

12.4.4.3 Submarine Density Current Theory

Salis, Hormlimann, Florel ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণ নিমজ্জিত খাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই তত্ত্বের অবতারণা করেন। সাধারণতঃ লবণতা ও উষ্মতার পার্থক্যের জন্য নদীবাহিত জল ও সমুদ্রের জলের মধ্যে ঘনত্ব (density)র পার্থক্য হয় এবং density current-এর সৃষ্টি হয়। এই density current সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে নিম্নস্রোত (bottom current) হিসাবে প্রবাহিত হয় এবং মহীসোপানের ওপর ক্ষয়কাজের দ্বারা নিমজ্জিত খাতের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ, নদীর জল, বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে, সমুদ্রের জল অপেক্ষা শীতল ও ভারী হয় ; ফলে এই ভারী জল সমুদ্র অথবা হ্রদের তলায় চলে যায় এবং গতিপথে (ক্ষয়কাজের দ্বারা) নিমজ্জিত খাতের সৃষ্টি করে। খাতের দুপাশের অংশে জল অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে বলে এবং নোনা জলের সংস্পর্শে আসে বলে সেখানে পলি সঞ্চিত হয় এবং উঁচু বাঁধের (like levee) ন্যায় গঠিত হয়। রাইন নদীর মুখে, Lake Constance এ গঠিত নিমজ্জিত খাতের উৎপত্তির কারণ হিসাবে বৈজ্ঞানিক Florel ও Hormlimann এই তত্ত্বের অবতারণা করেন। পরে, (1887), Florel বিভিন্ন নদীর মোহনায় গঠিত নিমজ্জিত খাতের গঠনের কারণ হিসাবেও এই density current-এর কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু অনেকেই, যেমন Heilprin এবং Schott এই তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি। কেননা—

(i) নদী মোহনা ছাড়াও মহীসোপানের ও মহীঢালের অন্যান্য অংশেও নিমজ্জিত খাত দেখা যায়।

(ii) যে সমস্ত খাতের ঢাল অত্যন্ত কম (Low gradient), সেখানে ক্ষয় অপেক্ষা সঞ্চয়ের কাজ বেশী হবার সম্ভাবনা থাকে।

(iii) অনেক মহীসোপানে, খাতের পাশে গঠিত উঁচু পাঁচিলের মত বাঁধ (Levee like feature) দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, প্রধানত হ্রদ, উপসাগর অথবা বিশাল জলাধারের ক্ষেত্রেই density current এর সৃষ্টি হয় ;

বিশাল সমুদ্রের প্রান্তভাগে অবস্থিত মহীসোপানের ওপর এদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম লক্ষ্য করা যায় ; তাই এদের (অর্থাৎ density current-এর) গুরুত্বও কম।

12.4.4.4 ঘন পলি স্রোত তত্ত্ব (Turbidity Current Theory)

Density Current মতবাদের মতই, অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে সমুদ্রের নিমজ্জিত খাত গঠনের মূলে রয়েছে ঘন স্রোত বা Turbidity current। 1936 সালে R. A. Daly সর্বপ্রথম নিমজ্জিত খাতের স্রষ্টা হিসাবে ঘন (পলি) স্রোতের কথা উল্লেখ করেন। জল মিশ্রিত এই পলল প্রবাহকে ঘন স্রোত (turbidity current) বলা হয়। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে জল মিশ্রিত পলিকে জলের তলায়, ঢালু জমিতে নিক্ষেপ করলে ঐ ঘন পদার্থ একটা স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে ঢাল বরাবর প্রবাহিত হয়। সমুদ্রে যে এরকম ঘন স্রোত সৃষ্টি হয়, তা অতীতের ভূমিকম্পের ফলাফল থেকে বোঝা যায়। 1929 সালে, গ্র্যান্ড ব্যাংকের কাছে, ভূমিকম্পের ফলে, তৎক্ষণাৎ উপকেন্দ্র (epicentre) থেকে 72 km ব্যাসার্ধযুক্ত জায়গার মধ্যে cable line ভেঙ্গে গেছিল ; পরে 13/14 ঘণ্টার মধ্যে, আরও দূরে cable line একে একে ভেঙ্গে যায়। মনে করা হল যে, ভূমিকম্পের ফলে, ঐ অঞ্চলে পলি ধ্বসের (slide of the sediments) সৃষ্টি হয়েছিল এবং অতিরিক্ত পরিমাণ পলি, তীব্র জল স্রোত দ্বারা মহীঢালের ওপর দিয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে পরিবাহিত হয়েছিল ; পরিবহনের সময়, এই পলিমিশ্রিত ঘন স্রোতের দ্বারা মহীঢালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং নিমজ্জিত খাতের সৃষ্টি হয়। তখন মনে করা হয়েছিল যে তীব্র ঘনস্রোতের গতিবেগ velocity) অত্যন্ত বেশী (50 knots)। কিন্তু Shepard ও Dill য়ের মতে, এই ঘনস্রোতের গতি হল 15 knots। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, গতিবেগ 15 knot হলেও, ঘনস্রোতের পক্ষে মহীসোপান ও মহীঢালের ওপর, ক্ষয়কাজের দ্বারা নিমজ্জিত খাত গঠন করা সম্ভব ; শুধু তাই নয়, এই স্রোতের পক্ষে পলির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বড় নুড়ি, পাথর ইত্যাদিও সমুদ্রতলের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কখনও কখনও অগম্ভীর সমুদ্রে, সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা তলদেশের পলি উত্থিত হয় এবং মহীঢালের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় নিমজ্জিত খাতের সৃষ্টি করে। আবার হিম যুগে, গলিত বরফস্তুপ থেকে (melting ice mass) প্রচুর পরিমাণে নুড়ি পাথর ইত্যাদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে, সমুদ্রের দিকে, ঘনস্রোত হিসাবে প্রবাহিত হয়েছিল ; বিশাল সময় ধরে এই ধরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকায়, ঘন স্রোতের পক্ষে মহীসোপান ও মহীঢালের ওপর নিমজ্জিত খাতের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু Daly'র এই মতামত Shepard সমর্থন করেননি। 1966 সালে উনি নিমজ্জিত খাতের কারণ হিসাবে নতুন একটি মতবাদের সূচনা করেন। ওঁর মতে, একটি নয়, একাধিক কারণের ফলেই নিমজ্জিত খাতের সৃষ্টি হয়েছে। ঘনস্রোত কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে খাতের নিম্ন অংশের সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর (অর্থাৎ ঘনস্রোতের) ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। ঘনস্রোত ছাড়াও, নিমজ্জিত খাতের সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুঞ্জিত প্রবাহ, শিলাপ্রপাত, ধ্বস, আবর্তনশীল ভূমি ধ্বস (mass movement, rack fall slidins, slump) ইত্যাদিকে উনি কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু নিমজ্জিত খাতের উচ্চ অংশের (upper course) উৎপত্তির কারণ হিসাবে উনি ওঁর নিজস্ব মতবাদকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথম সৃষ্টির মূলে আছে, স্থলভাগে অবস্থিত নদী উপত্যকার অবনমন (অর্থাৎ সমুদ্র পৃষ্ঠ ওপরে উঠে যাবার ফলে স্থলভাগের উপকূলীয় অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের তলায় চলে যায়)। পরবর্তীকালে এই নিমজ্জিত উপত্যকা বা খাতগুলি বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রক্রিয়া, যেমন ঘনস্রোত, পুঞ্জিত প্রবাহ ইত্যাদি দ্বারা বর্ধিত হয়। দুপাশের অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশগুলি (অর্থাৎ খাতের দুপাশের পাঁচিলগুলি) প্রধানত পলি সঞ্চয়ের ফলে (sedimentation) গঠিত হয়েছে। সুতরাং এই মিশ্র মতবাদে (Theory of Compound Origin) উনি ক্ষয়কাজ এবং সঞ্চয়—উভয়ের ওপরই জোর দিয়েছেন।

আবার বিখ্যাত বিজ্ঞানী Kuenen নিমজ্জিত খাতের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দুধরণের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এঁর মতে—

(1) কিছু কিছু নিমজ্জিত খাত প্রকৃতপক্ষে স্থলভাগের নদী উপত্যকা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে এগুলি পরবর্তী পর্যায়ে নিমজ্জিত খাতে পরিণত হয়েছে। এগুলি প্রধানত স্থির অঞ্চলে (stable areas) দেখা যায়, যেমন কর্সিকা দ্বীপের উপকূলীয় অঞ্চলে।

(2) দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত খাতগুলি প্রধানত ঘনস্রোত, ধস্ ইত্যাদি বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয়েছে। এগুলি প্রধানত আলগা অথবা অজমাটযুক্ত পদার্থ দ্বারা গঠিত অঞ্চলে (in the areas of unconsolidated materials) বেশী দেখা যায়, যেমন উত্তর পূর্ব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের উপকূলভাগে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহীসোপান ও মহীঢাল অঞ্চলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপ হল নিমজ্জিত খাত ; ভূতাত্ত্বিক যুগের বয়স হিসাবে এরা হল অত্যন্ত নবীন প্রকৃতির অনেক ক্ষেত্রেই এদের গঠন ক্রিয়া (formation) এখনও চলছে। ভূমিকম্প প্রবণ স্থানে এদের উপস্থিতি বেশী দেখা যায়। এদের উৎপতির পেছনেও একাধিক প্রক্রিয়ার ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

12.5 মহীজাগান (Continental Rise)

সর্বশেষে, আমরা মহীজাগান বা মহাস্ফীতি (continental rise) নিয়ে আলোচনা করব, নতুবা মহীঢালের (সম্পর্কে) আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মহীঢালের পাদদেশে, একটি পলিসঞ্চিত অঞ্চল দেখা যায়, একে মহীজাগান বলা হয়ে থাকে। মহীজাগান সমুদ্রের দিকে ধীরে ধীরে ঢালু (1^{o}) হয়ে গিয়ে অবশেষে গভীর সমুদ্রতলে গিয়ে মিশেছে। সাধারণত, পৃথিবীর মোট জলভাগের শতকরা প্রায় 5.3 অংশে মহীজাগান বিস্তার লাভ করেছে। পৃথিবীর স্থলভাগে পাহাড়ের পাদদেশে যেমন নদীগঠিত পলিশঙ্কু (alluvial fans) দেখতে পাওয়া যায়, এই মহীজাগানও অনেকটা সেই রকম ; এখানে পলি সঞ্চয়ে পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। মনে করা হয়, ক্রিটাশিয়াস যুগ থেকেই, মহাদেশের বিভিন্ন ক্ষয়জাতদ্রব্য, যেমন পলি, মাটি, বালি, কাদা ইত্যাদি মহীসোপান এবং মহীঢালের মধ্য দিয়ে এসে, প্রধানত মহীঢালের পাদদেশে এসে জমা হয়েছে এবং সামুদ্রিক পলিশঙ্কু গঠিত করেছে। এই একত্রে গঠিত পলিশঙ্কুগুলিকেই মহীজাগান (continental rise) বলে উল্লেখ করা হয়। মনে করা হয়, শক্তিশালী ঘনস্রোত বা Turbidity Current-এর দ্বারা পরিবাহিত হয়ে, সঞ্চিত দ্রব্য সমূহ স্থলভাগ থেকে মহীঢালের পাদদেশে এসে সঞ্চিত হয়েছে। কোথাও কোথাও এই পলিসঞ্চয়ের গভীরতা 1.5 এরও বেশী ; আবার কোথাও মহীঢালের পাদদেশ থেকে এটি সমুদ্রতলের দিকে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। মহীজাগানের ওপর স্বাভাবিক বাঁধ (levee) দ্বারা পরিবেষ্টিত, আঁকাবাঁকা বহু উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায় অনেকে মনে করেন, এগুলি প্রকৃতপক্ষে মহীঢালের ওপর অবস্থিত নিমজ্জিতখাতের (submarine cannyons)ই প্রসারিত অংশবিশেষ। খাতের দুপাশে গঠিত বাঁধগুলি খাড়া এবং বালি, কাদা ইত্যাদি অ-জমাট (unconsolidated) দ্রব্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। ঘনস্রোত দ্বারা পরিবাহিত হবার পর, মহীঢালের পাদদেশে এসে হঠাৎ করে ঢালের পরিবর্তন অর্থাৎ ঢালের হ্রাস হবার জন্য এখানে পলি সঞ্চিত হয়ে মহীজাগান গঠন করেছে।

সাধারণত স্থির, মহাদেশীয় প্রান্তসীমায় (যেমন আটলান্টিক অথবা ভারত মহাসাগরে) মহীজাগানের অস্তিত্ব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, গঙ্গার বদ্বীপের প্রসারিত অংশে বিশাল মহীজাগান গঠিত হয়েছে।

কিন্তু সক্রিয় (active) মহাসাগরীয় প্রান্তসীমায়, সাধারণত, মহীজাগান গঠন কম দেখা যায়। পাত সংস্থান তত্ত্ব অনুযায়ী (Plate Tectonic Theory) প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তসীমায়, বহু সমুদ্র খাতের (Ocean trench) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় ; ফলে মহীঢাল অত্যন্ত খাড়াই হয় এবং এর জন্য পাদদেশে সঞ্চয় কাজ কম হয়ে থাকে এবং মহীজাগানও কম গঠিত হয়।

12.6 সারাংশ

পাঠক্রমের এই অংশে আমরা সমুদ্রতলের দুটি প্রধান ভূমিরূপ—অর্থাৎ মহীসোপান ও মহীঢাল নিয়ে অনেক গভীর ও ব্যাপকভাবে (detailed and extensive study) আলোচনা করেছি। মহীসোপানও মহীঢালের সংজ্ঞা এবং তাদের সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, বিশেষত Shepard ইত্যাদি কৃত মহীসোপানের শ্রেণীবিভাগও আলাদা ভাবে আলোচিত হয়েছে ; মহীসোপানের ওপর সঞ্চিত বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থসমূহ মহীসোপানের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ভূমিরূপ, যেমন জোয়ারী উপত্যকা, সোপান উপত্যকা শৈলশিরা, হিমবাহ উপত্যকা, নিমজ্জিত নদী উপত্যকা ইত্যাদি সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে এসেছে মহীসোপানের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ সমূহের আলোচনা ও মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব। ঠিক একইভাবে মহীঢালের আলোচনাও হয়েছে, যেমন সংজ্ঞা, বর্ণনা উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ সমূহ এবং নিমজ্জিতখাত (submarine canyons) সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা ইত্যাদি এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। সর্বশেষে, মহীঢালের পাদদেশে গঠিত মহীজাগান continental rise) সম্পর্কেও গভীর আলোচনা হয়েছে। দেখা গেছে কোনও একটি মাত্র মতবাদ নয়, একাধিক মতবাদই মহীসোপানও ও মহীঢালে অবস্থিত নিমজ্জিত খাত সম্পর্কে সঠিক আলোকপাত করতে পেরেছে ; পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মহীসোপান কোথাও বা সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কাজের ফলে, কোথাও বা ভূগাঠনিক শক্তির ফলে, আবার কোথাও স্থলভাগ থেকে আসা পলির সঞ্চয়ের ফলে গঠিত হয়েছে ; নিমজ্জিত খাতের (sub marine canyons) ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, এগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে ঘনত্ব স্রোত বা পলি স্রোত দ্বারা ক্ষয়কাজের ফলে গঠিত হয়েছে ; কোথাও আবার এরা প্রকৃতপক্ষে অতীতের নদী উপত্যকা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং আমাদের সবকটি মতবাদকেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

12.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(1) প্রতিটি প্রশ্নের মান '2' নম্বর করে

(a) মহাদেশীয় প্রান্তসীমা বলতে কী বোঝায় ?

(b) স্থির মহাদেশীয় প্রান্তসীমা এবং সক্রিয় মহাদেশীয় প্রান্তসীমা কোন কোন মহাসাগরে দেখা যায় ?

(c) গঠনমূলক মহীসোপান কাকে বলে ?

(d) ভূগঠনকারী বাঁধ কাকে বলে ?

(e) কোন মহাসাগরে মহীসেপানের বিস্তার সব থেকে বেশী ?

(f) মহীসোপানের ওপরে অবস্থিত প্রবাল প্রাচীর কোন মহাদেশের পাশে দেখা যায় ?

(g) মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কী কী ?

(h) 'shelf break' কাকে বলে ?

(i) মহীঢালের ওপরে কী কী ধরণের সঞ্চিত দ্রব্য দেখা যায় ? (সংক্ষেপে)

(j) মহীঢালের ওপরে কী কী ধরণের ভূমিরূপ দেখা যায় ? (সংক্ষেপে)

(2) প্রতিটি প্রশ্নের মান '4' নম্বর করে।

(a) আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত প্রধান নিমজ্জিত খাতগুলি বর্ণনা দিন।

(b) প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত প্রধান খাতগুলির বর্ণনা দিন।

(c) যে কোন দুটি (ভিন্ন শ্রেণীর) মহীসোপানের বর্ণনা দিন।

(d) পরিচলন স্রোত দ্বারা (Convectional current) কি ভাবে মহীসোপান গঠিত হয় ?

(e) মহীসোপানের ওপরে সঞ্চিত দ্রব্যের বর্ণনা দিন।

(3) প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান '10' নম্বর করে।

(a) মহীজাগান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(b) নিমজ্জিত খাতের উৎপত্তি সম্পর্কে ঘন পলি স্রোত তত্ত্ব (Turbidity Current Theory) আপনার কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় ?

(c) মহীসোপানের ওপরে গঠিত বিভিন্ন ভূমিরূপগুলির বর্ণনা দিন।

(d) মহীসোপানের উৎপত্তি সম্পর্কিত যে কোন দুটি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(e) প্রধানত কোন কোন জায়গায় সামুদ্রিক নিমজ্জিত খাত (submarine canyons) দেখতে পাওয়া যায় ?

(f) নিমজ্জিত খাতের একটি সাধারণ বর্ণনা দিন এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(g) নিমজ্জিত খাত গঠনের উৎপত্তি সম্পর্কিত 'ভূগাঠনিক মতবাদ' (Diastrophic Theory) য়ের ব্যাখ্যা করুন। এই মতামত কতখানি গ্রহণযোগ্য ?

(h) মহীসোপানের শ্রেণীবিভাগ করুন এবং যে কোন চার ধরণের মহীসোপানের বর্ণনা দিন।

(i) Shepard কৃত 'মহাদেশীয় মঞ্চের' (Continental Terrace) শ্রেণীবিভাগ করুন এবং প্রত্যেকটির বর্ণনা দিন।

(j) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন—

(i) Glacial Control Theory (মহীসোপানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ)

(ii) Theory of Continental Flexure (মহীসোপানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ)

12.8 উত্তরমালা

1. (a) অনুচ্ছেদ 12.2 দেখে নিন।
   (b) অনুচ্ছেদ 12.3 দেখে নিন।
   (c) 12.3.3-এর 6 শ্রেণীতে আছে।
   (d) অনুচ্ছেদ 12.3.3-র শ্রেণী দেখে নিন।
   (e) অনুচ্ছেদ 12.4 দেখে নিন।
   (f) অনুচ্ছেদ 12.4 দেখে নিন।
   (g) অনুচ্ছেদ 12.9 দেখে নিন।
   (h) অনুচ্ছেদ 12.10 দেখে নিন।
   (i) অনুচ্ছেদ 12.11 দেখে নিন।
   (j) অনুচ্ছেদ 12.12 দেখে নিন।
2. (a) অনুচ্ছেদ 12.14 দেখে নিন।
   (b) অনুচ্ছেদ 12.14 দেখে নিন।
   (c) অনুচ্ছেদ 12.7 দেখে নিন।
   (d) অনুচ্ছেদ 12.8 য়ের 2) নম্বর দেখে নিন।

(e) অনুচ্ছেদ 12.5 দেখে নিন।

3. (a) অনুচ্ছেদ 12.16 দেখে নিন।

(b) অনুচ্ছেদ 12.15 য়ের 4) নম্বর দেখে নিন। এখানে সমালোচনা দিতে হবে।

(c) অনুচ্ছেদ 12.6 দেখে নিন।

(d) অনুচ্ছেদ 12.8 দেখে নিন।

(e) অনুচ্ছেদ 12.13 দেখে নিন।

(f) অনুচ্ছেদ 12.12 দেখে নিন।

(g) অনুচ্ছেদ 12.15 য়ের 2) নম্বর মতবাদ ; এখানে সমালোচনার উল্লেখ করতে হবে।

(h) অনুচ্ছেদ 12.7 দেখে নিন।

(i) অনুচ্ছেদ 12.3 মধ্যে লিখিত মহাদেশীয় মঞ্চের মধ্যে বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগ আছে।

(j) (i) —— অনুচ্ছেদ 12.8 য়ের মধ্যে 1) নম্বর বলতে হবে।

(ii) —— অনুচ্ছেদ 12.8 য়ের মধ্যে 8) নম্বর বলতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী :—

(1) Principles of Geomorphology by W. D. Thornbury.

(2) ভূমিরূপ : উদ্ভব ও প্রকৃতি by S. C. Mukherjee & R. K. Das.

(3) Physical Geography by Savindra Singh.

(4) Oceanography for Geographers by R. C. Sharma & M. Vatal.

(5) A Textbook of Geomorphology by P. Dayal.

(6) আধুনিক ভূপরিচয় by তরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(7) Oceanography for Geographers by C. A. M. King.

(8) Principles of Physical Geography by F. J. Monkhouse.

(9) Submarine Geology by F. P. Shepard.

(10) The Earth beneath the sea by F. P. Shepard.

(11) Physical Geology by J. R. L. Allen.

(12) Physical Geography of the Oceans by Charles H. Cotter.

(13) Oceans : Danny & John Pernetta — Mitchell Beazley Publication.

(14) The Times Comprehensive Atlas of the World, 2000 Millennium Edition—1999.

(15) Physical Geographer by Strahler.

(16) Coastal Geomorphology by C. AM. King.

(17) Marine Geology by P. K. Kuenin.

(18) Applied Coastal Geomorphology (Ed) by Steers.

একক 13 ❑ সামুদ্রিক অবক্ষেপণ ও সামুদ্রিক সম্পদ

গঠন

13.1 প্রস্তাবনা

13.2 উদ্দেশ্য

13.3 সামুদ্রিক অবক্ষেপণের ধরণ ও শ্রেণীবিভাগ

13.4 সামুদ্রিক অবক্ষেপণের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ

13.5 সমুদ্রে সঞ্চিত পদার্থের পরিবহন ও সঞ্চয়কার্য

13.6 সঞ্চিত পদার্থের বণ্টন

13.7 সামুদ্রিক সম্পদ

13.8 সারাংশ

13.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

13.10 উত্তরমালা

13.1 প্রস্তাবনা

সমুদ্রে সঞ্চিত পদার্থের চরিত্র, তার উৎস ও বহন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। কাজেই সর্বপ্রথম সামুদ্রিক অবক্ষেপকে উৎস অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। স্থলজ পদার্থের (terrigenous material) দানার মাপ অনুযায়ী তাদের আলোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের কর্দমের চরিত্র সম্পর্কেও কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে। জৈবিক পদার্থের মধ্যে চুন জাতীয় ও সিলিকা জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা গঠিত কর্দম বা উজ্ সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। অগ্নুতপাত জনিত পদার্থ, মহাকাশ থেকে আসা পদার্থ ও অজৈবিক পদার্থগুলি সম্বন্ধেও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এর পরবর্তী পর্যায়, সামুদ্রিক অবক্ষেপকে আরও বিভিন্ন ভাবে শ্রেণী বিভাগ করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অন্তে সামুদ্রিক অবক্ষেপের বহন ও সঞ্চয় প্রক্রিয়া ও তাদের বণ্টন সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে সামুদ্রিক সম্পদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে এই এককের শেষ হয়েছে।

13.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ক্ষয়জাত পদার্থের উৎস ও বহন প্রক্রিয়ার উপর কিভাবে সমুদ্রে সঞ্চিত পদার্থের চরিত্র নির্ভর করে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

- সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত পদার্থের ও তাদের মধ্যে উপস্থিত জৈবিক পদার্থের চরিত্র সম্বন্ধে বিশদ ধারণা করতে পারবেন এবং এর থেকে অতীতের জলবায়ুগত পরিবর্তনের ও সামুদ্রিক পরিচলনের সূত্র আবিষ্কার করতে পারবেন।
- সামুদ্রিক অবক্ষেপের মধ্যে যে সব সম্পদ রয়েছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- জীবাশ্মের সাক্ষ্য থেকে সমুদ্রে সঞ্চিত পলির সঞ্চয় কাল নির্ধারণ করা সম্ভব——এই তথ্য বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- সমুদ্রে সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে অন্ততঃ বিগত ২০০ মিলিয়ন বছরের পৃথিবীর ইতিহাসের যাবতীয় তথ্য স্তরে স্তরে বিধৃত আছে——এই সত্য উপলব্ধি করবেন।

13.3 সামুদ্রিক অবক্ষেপণের ধরণ ও শ্রেণী বিভাগ

বিভিন্ন উৎস থেকে পরিবাহিত পদার্থ ক্রমাগত সমুদ্র বক্ষে সঞ্চিত হয়ে চলেছে। এই সঞ্চিত পদার্থের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এদের উৎস সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব এবং উৎস অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ করাও সম্ভব। সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত পদার্থকে উৎস অনুযায়ী মোট ছ'টি ভাগে ভাগ করা যায়।

13.3.1 স্থলজ পদার্থ (Terrigenous material)

ভূখণ্ডে অবস্থিত আগ্নেয় ও পাললিক শিলা বিভিন্ন ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিয়োজিত (disintegrated) ও বিকারগ্রস্ত (decomposed) হয়ে ছোট ছোট অংশে ভেঙ্গে যায়। শিলার বিয়োজন ও বিকার নির্ভর করে শিলার ধর্ম, জলবায়ুর ধর্ম ও কতটা সময় ধরে শিলার উপর আবহবিকরের প্রক্রিয়া কাজ করেছে তার উপর। শিলার এই বিয়োজিত ও বিকারগ্রস্ত অংশগুলি বালি ও কর্দম হিসেবে নদী দ্বারা পরিবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

যান্ত্রিক আবহবিকার দ্বারা প্রভাবিত স্থলজ পলি (terrigenous sediments) গুলিতে কোয়ার্টজ (Quartz), মাইকা, ফেল্‌স্পার (feldspar), পাইরক্সিন (pyroxene) ও এ্যামফিবোল (amphibole) জাতীয় প্রাথমিক স্তরের খনিজ (primary minerals) দেখতে পাওয়া যায়। অপরদিকে রাসায়নিক আবহবিকার দ্বারা প্রভাবিত স্থলজ পলির মধ্যে লৌহ হাইড্রক্সাইড (hydroxides of iron), এ্যালুমিনা হাইড্রক্সাইড (alumina hydroxide), সিলিকার কোলয়েড (coloidal silica) ও বিভিন্ন কর্দম খনিজ (clay minerals) জাতীয় আবহবিকারের অন্তিম অবস্থায় সৃষ্ট খনিজ (ultimate products) দেখতে পাওয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত মোটা দানার পদার্থগুলি তটীয় অঞ্চলের সংলগ্ন অঞ্চলে জমা পড়লেও, সূক্ষ্ম দানার পদার্থগুলি গভীর সমুদ্রের দিকে পরিবাহিত হয়। কাজেই তট থেকে গভীর সমুদ্রের দিকে সঞ্চিত পদার্থ দানার মাপ অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সাজানোর কাজটি পলি সঞ্চিত হবার সময়েই হয়ে থাকে এবং সঞ্চয় কার্য যদি কোনো স্রোত (current) বা সমুদ্র পৃষ্ঠের ওঠাপড়ার (sea level change) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহলে মোটামুটি সর্বত্র এই ধারণাটি চোখে পড়ে।

সঞ্চিত পলির দানার মাপ বা গ্রথন (texture) অনুযায়ী পলিকে নিম্নোক্ত শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত করা যায়।

সামুদ্রিক অবক্ষেপণের দানার মাপ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

সঞ্চিত পদার্থের ধরণ		দানার ব্যাস (মিলিমিটার)
গ্র্যাভেল	বোল্ডার	> 256
	কব্‌ল্‌	64-256
	পেব্‌ল্‌	4-64
	গ্র্যানিউল	2-4
	খুব মোটা দানার বালি	1-2
	মোটা দানার বালি	0.5 - 1
বালি	মাঝারি দানার বালি	0.25 - 0.5
	সূক্ষ্ম দানার বালি	0.125 - 0.25
	অতি সূক্ষ্ম দানারবালি	0.625 - 0.125
কর্দম	সিল্ট্‌	0.0039-0.0625
	ক্লে	<0.0039

13.3.1.1 গ্র্যাভেল্‌ (Gravel)

দানার মাপ অনুযায়ী বোল্ডার ও গ্র্যানিয়ুলের (granule) মধ্যে অবস্থিত (256,000-2000 মাইক্রন) মোটা দানার পদার্থকে গ্র্যাভেল্‌ বলা হয়। এই জাতীয় মোটা দানার পদার্থগুলি সাধারণতঃ উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে সঞ্চিত হয় কারণ, গভীর সমুদ্রে পরিবাহিত হবার পক্ষে গ্র্যাভেলগুলির ওজন অনেকটাই বেশী। তবে রাসায়নিক গঠন (chemical composition) অনুযায়ী সেইগুলি বালির সমকক্ষ।

13.3.1.2 বালি (sand)

উপকূল ও সমুদ্র তলদেশে সঞ্চিত বালি নানা মাপের হতে পারে। বালি খুব মোটা দানার (1000-2000 মাইক্রন) হবে না অতি সূক্ষ্ম দানার (62-125 মাইক্রন) হবে তা নির্ভর করে পরিবহন প্রক্রিয়ার ক্ষমতার উপর। বালি নদী প্রলম্বভার (suspended load) হিসেবে পরিবাহিত হতে পারে এবং স্বাদু জল (fresh water) ও লবণাক্ত জলের (salt water) মিশ্রণ স্থলে সঞ্চিত হতে পারে। আবার উপকূল অঞ্চলে সঞ্চিত বোল্ডার ও গ্র্যাভেল বিয়োজিত (disintegrated) হবার ফলেও বালির সৃষ্টি হতে পারে। এই কারণে বালির মধ্যে বিভিন্ন শিলার অবশিষ্টাংশ লক্ষ্যনীয়। বিভিন্ন ধরণের খনিজ পদার্থ বালির মধ্যে মিশে থাকলেও, কোয়ার্টজের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে—সব থেকে বেশী। কোয়ার্টজ সহজে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তিত হয় না এবং যান্ত্রিক আবহবিকার দ্বারা সহজে বিয়োজিত হয় না, তাই উপকূল অঞ্চলে সঞ্চিত বালির মধ্যে কোয়ার্টজের পরিমাণ সর্বাধিক। উপসাগর বা সৈকত অঞ্চলে বালি, দানার মাপ বা গ্রথন (texture) অনুযায়ী সঞ্চিত হয়।

13.3.1.3 পলি ও কর্দম (silt clay and mud)

এই ধরণের পদার্থ বালির থেকেও সূক্ষ্ম দানার হয় (0.0039 - 0.065 মিলিমিটার) কর্দম জাতীয় পদার্থের দানাগুলি এতই সূক্ষ্ম হয় যে তারা পলির দানাগুলিকে বেঁধে রাখে। মূল ভূখণ্ড থেকে গভীর সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হলে, কর্দমের উপস্থিতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কর্দম জাতীয় পদার্থে কোয়ার্টের সঙ্গে এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। পলি ও কর্দম জাতীয় পদার্থের নদী তার প্রলম্বভাবে (suspended load) হিসেবে সমুদ্রে বয়ে আনে এবং

উপসাগরের অগভীর জলের ঘোলাটে রং তাদের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। এদের দানা এতই ছোট হয় যে জলের সামান্যতম গতিবেগ তাদের প্রলম্বভার হিসেবে ভাসিয়ে রাখে।

উপকূল অঞ্চলে সঞ্চিত বালি ও কর্দমের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণত 100-1000 ফ্যাদম্ রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে কর্দম জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়। কর্দমের সঞ্চয় কার্য অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হয় এবং প্রায় স্থির জলে বা নদীর মোহনায় যেখানে ঢেউয়ের প্রভাব নাম মাত্র সেখানে কর্দম সঞ্চয়ের কাজ বেশী দেখা যায়।

মারে (Murrey) পলির রঙের ভিত্তিতে চার ধরণের কর্দমকে পৃথক করেছেন।

● নীল কর্দম (blue mud) : ভূখণ্ডের চারধারে এব আংশিক ভাবে পরিবেষ্টিত (partially enclosed) উপসাগরের অপেক্ষাকৃত গভীর অংশে এই ধরণের কর্দম দেখা যায়। এই কর্দম কালচে নীল রঙের হয়। লৌহ সালফাইড ও জৈবিক পদার্থ দ্বারা সমৃদ্ধ শিলার বিয়োজনের ফলে এই ধরণের কর্দম গঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফেরিক অক্সাইডের উপস্থিতির জন্যে উপরের স্তর একটু লালচে রঙের হয়। নীল কর্দমে প্রায় ৩৫ শতাংশ কার্বোনেট পাওয়া যায়। সুমেরু মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে নীল কর্দম বেশী পাওয়া যায়।

● লাল কর্দম (red mud) : লৌহ অক্সাইডের উপস্থিতির জন্য এর রং লাল। এই কর্দমে গড়ে 32 শতাংশ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাওয়া যায়। রেডিও লেরিয়া ও ডায়াটম জাতীয় প্রাণী বেশী না থাকলেও, ফেরিক অক্সাইডের (ferric oxide) আধিক্য লক্ষ্যনীয়। নীল কর্দমের তুলনায় এই কর্দম অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। পীত সাগর (yellow sea), ব্রাজিল উপকূল ও আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে অনেকাংশে এই ধরনের কর্দম পাওয়া যায়।

● সবুজ কর্দম (Green Mud) : উচ্চ অক্ষাংশের উপকূল অঞ্চল, যেখানে কোন বড় নদী তার পলি বয়ে নিয়ে আসেনি, সেই ধরণের অঞ্চলে সবুজ কর্দম দেখা যায়। যেমন ক্যালিফোর্ণিয়া, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল। সাধারণতঃ 100-900 ফ্যাদম গভীরতার মধ্যে সবুজ কর্দম পাওয়া যায়। এই কর্দমে ফেরাস অক্সাইড (ferrous oxide) থাকলেও অক্সিজেন অতি অল্প পরিমাণে থাকে। সবুজ কর্দমে পটাসিয়াম ও লোহার সিলিকেট (silicate of potassium and iron) থাকে যাকে গ্লুকোনাইট (gluconite) বলে। এই গ্লুকোনাইটের জন্যেই এই কর্দমের রং সবুজ। এছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বোনেটও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

● কালো কর্দম (Black mud) : এই ধরণের কর্দমে জৈব পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। অপেক্ষাকৃত স্থির জলে, যেখানে অক্সিজেন খুবই সীমত সেইখানে কালো কর্দম পাওয়া যায়।

13.3.2 অগ্নুৎপাত জনিত পদার্থ (Product of volcanism)

সমুদ্র তলদেশে সঞ্চিত অগ্নুৎপাত জনিত পদার্থ দুধরণের হতে পারে। আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত পদার্থ যা ভূ পৃষ্ঠে জমা পড়ে এবং যান্ত্রিক রাসায়নিক আবহবিকার দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরবর্তী কালে এই পরিবর্তিত পদার্থ নদী দ্বারা পরিবাহিত হয়ে সমুদ্র তলদেশে গিয়ে সঞ্চিত হয়। খুব হাল্কা পদার্থগুলি বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হতে পারে। কিছু সময় জলের উপর ভেসে থাকবার পর, আস্তে আস্তে তলদেশে সঞ্চিত হয়। অপর দিকে অন্তঃ সাগরীয় (submarine) অগ্নুৎপাত জনিত পদার্থ সমুদ্র তলদেশে সরাসরি সঞ্চিত হয়।

সাধারণতঃ অগ্নুৎপাত জনিত পদার্থগুলিও গ্রথন (texture) অনুযায়ী সঞ্চিত হয়। মহীসোপানের কাছে সঞ্চিত পদার্থ অনেক বড় দানার হয় এবং গভীর সমুদ্রের দিকে দানাগুলি ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে। দানার মাপ অনুযায়ী সঞ্চিত পদার্থগুলিকে অগ্নুৎপাত জনিত বালি (volcanic sand) বা অগ্নুতপাত জনিত কর্দম (volcanic mud) বলা হয়ে থাকে। এই ধরণের পদার্থগুলির নীল কর্দমের সঙ্গে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। এদের রং সাধারণতঃ কালো বা ছাই রঙের হয়। অনুকূল পরিবেশে এরা সবুজ কর্দম ও প্রবালের সঙ্গে একত্রে দেখা যায়। গভীরতা বাড়ার সঙ্গে

সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের উজের (ooze) সঙ্গে এদের মিশে থাকতে দেখা যায়। সামুদ্রিক দ্বীপের চারিধারে অগ্নুৎপাত জনিত কর্দম বেশী দেখা যায়।

13.3.3 জৈবিক পদার্থ (Biogenous deposits)

সমুদ্রে সঞ্চিত পলির অনেকখানি স্থলজ পদার্থ হলেও, অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ থেকে নির্গত ক্যালসিয়াম ও সিলিকাও সঞ্চিত হয়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণী যা উপকূলের নিকটতম অঞ্চলে (littoral zone) সঞ্চয় কার্যে অংশগ্রহণ করে তাকে 'বেনথস্' (benthos) বলা হয়, অর্থাৎ "যা তলদেশে বসবাস করে।" সামুদ্রিক জৈবিক পদার্থকে দুভাবে ভাগ করা যেতে পারে—নেরিটিক (Neritic) ও পেলাজিক (Pelagic)। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশিষ্টকে নেরিটিক ভাগে ফেলা হয় এবং উন্মুক্ত সামুদ্রিক পরিবেশে (open oceanic environment) পাওয়া এক বিশেষ ধরণের এ্যাল্‌গিকে পেলাজিক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। জৈবিক পদার্থ দ্বারা গঠিত পলিতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্রচুর পরিমাণে থাকে। এই দিক দিয়ে তারা গভীর সমুদ্রে সঞ্চিত অন্যান্য পদার্থ থেকে পৃথক। নেরিটিক পদার্থ সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অগভীর জলে দেখা যায়, যেখানে সমুদ্র জলের লবণতা (salinity) কম। গভীর সমুদ্রের তলদেশে সমুদ্র জলের উষ্ণতা এতই কম থাকে যে সেখানে অতি সীমিত কয়েকটি প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি লক্ষ্য করা যায়। আবার মহীসোপানের (continental shelf) উপর সঞ্চিত পদার্থ বেশীর ভাগই স্থলজ (terrigenous)। কাজেই দেখা যায় যে জৈবিক পদার্থ সমুদ্র জলের একটি বিশেষ গভীরতায় সব থেকে বেশী সঞ্চিত হয়। গভীর ও অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত জৈবিক পদার্থের চরিত্র পৃথক হয় কারণ বিভিন্ন গভীরতায় সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের চরিত্র আলাদা।

অগভীর উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত অধিপ্রাচীর (reef) সঞ্চয় কার্যে বিশেষ ভূমিকা নেওয়া বিভিন্ন ধরণের কম্বোজ (mollusca), এ্যালগী (algae) ও ম্যানগ্রোভ (mangrove) ছাড়াও প্রবাল (coral) অধিপ্রাচীর গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশিষ্ট (skeletal remains) এই অধিপ্রাচীরে আটকে পরে এবং সঞ্চয় কার্যে সহায়তা করে।

গভীর সমুদ্রে সঞ্চয় কার্য অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। এই অঞ্চলে সঞ্চিত পদার্থ প্রধানতঃ দুটি উৎস থেকে আসে। প্রথমতঃ বিভিন্ন অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের (micro-organisms) দেহাবশিষ্ট (skeletal remains) থেকে, যাকে উজ্ (Ooze) বলা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ অতি সূক্ষ্ম দানার কর্দম যার উৎস স্থলভাগ হলেও তার স্রোত ও হাওয়া দ্বারা বাহিত হয়ে গভীর সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। লাল কর্দম (red clay) এই ধরণের কর্দমের অন্তর্ভুক্ত।

13.3.1 উজ্ (Ooze)

বিভিন্ন সামুদ্রিক এক কোষী উদ্ভিদ ডায়াটম (diatom) ও প্রাণীর (ফোরামিনিফেরা এবং রেডিওলেরিয়া (foraminifera & radiolaria) দেহাবশিষ্ট মিলে উজ্ গঠিত হয়। সামুদ্রিক সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে যদি 30 শতাংশ জৈবিক পদার্থ থাকে তাহলে তাকে উজ্ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উজ্ সধারণতঃ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা চুনজাতীয় পদার্থ যুক্ত (Calcareous) ও সিলিকা যুক্ত (siliceous) হয়ে থাকে।

(a) চুন জাতীয় উজ্ (calcareous) — গ্লবিজেরিনা (Globigerina) টেরোপড (pteropod) কোকোলিথোফোর (Cocolithophore)

(b) সিলিকা যুক্ত উজ্ (siliceous) — ডায়াটম (Diatom) রেডিওলেরিয়ান (Radiolarian)

(a) চুন জাতীয় উজ্ (Calcareous) :

এই ধরণের উজ্ সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অগভীর জলের তলায় দেখা যায়। এর মধ্যে তিন ধরণের উজ্ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

● গ্লবিজেরিনা উজ্ (Globigerina Ooze) : এই ধরণের উজ্ ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অগভীর সমুদ্রে বেশী দেখা যায়। গ্লবিজেরিনা শ্রেণীর এক বিশেষ ধরণের এক কোষি (Unicellular) প্রাণী দেহাবশিষ্ট দিয়ে এই উজ্ সৃষ্টি হয়। সমগ্র পৃথিবী জুড়েই এই উজ্ দেখা গেলেও, কিছু বিশেষ ধরণের গ্লবিজেরিনা আছে, যাদের উপস্থিতি শুধু ঠাণ্ডা জলে দেখা যায়। উত্তর পশ্চিম আটলান্টিক, পশ্চিম ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ পশ্চিম এবং দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে, প্রচুর পরিমাণে গ্লবিজেরিনা পাওয়া যায়। উপকূলের কাছাকাছি এদের রং নীলচে বা ছাই রঙের হলেও, গভীর সমুদ্রের দিকে এদের রং প্রায় সাদা। রাসায়নিক গঠন হিসেবে দেখতে গেলে এই উজে 64.49 শতাংশ ক্যালসিয়াম, 3.33 শতাংশ সিলিকা ও অন্যান্য খনিজ থাকে।

● টেরোপড্ উজ্ (Pleropod Ooze) : উপকূল থেকে খানিকটা দূরে, 800 - 1000 ফ্যাদম গভীরতায় পাওয়া এক বিশেষ ধরণের শামুক জাতীয় প্রাণীর দেহাবশিষ্ট এই উজ্ গঠন করেন। টেরোপড্ উজে প্রায় 80 শতাংশ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলে এবং প্রবাল প্রাচীরের সংলগ্ন অংশে এদের উপস্থিতি বেশী মাত্রায় চোখে পড়ে।

● কোকোলিথোফোর উজ্ (Cocolithophore Ooze) : কোকোলিথোফোর নামক অতি ক্ষুদ্র এক কোষি উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ দিয়ে এই ধরণের উজ্ গঠিত হয়। এই উদ্ভিদের বাইরের খোলসটিকে "কোকোলিথ" বলে যা পুরোপুরি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্বারা গঠিত।

জলের উষ্ণতা হ্রাস পেলে তার কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রবণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যার ফল স্বরূপ সমুদ্রের জল কার্বোনিক এ্যাসিড (Carbonic Acid H_2CO_3) হিসেবে কাজ করে। এই ঠাণ্ডা জল ভারি হওয়ার দরুণ সমুদ্রর তলদেশে নেমে আসে এবং উচ্চ অক্ষাংশে প্রায় সব গভীরতাতেই এই ধরণের ঠাণ্ডা জল দেখা যায়। এর ফলে চূন জাতীয় পদার্থ উচ্চ অক্ষাংশে জলের সব গভীরতাতেই দ্রবীভূত হতে পারে কিন্তু ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে একটি বিশেষ গভীরতার পরই তারা দ্রবীভূত হয়। ফলে চূনজাতীয় (Calcareous) পদার্থ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 4-5 কিলোমিটার গভীরতায় বেশী দেখা যায়। যে গভীরতা থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত হতে আরম্ভ করে তাকে ক্যালিসয়াম কার্বোনেট দ্রবণ সীমা রেখা বা Calcium Carbonate Compensation Depth (CCD) বলে। এই সীমারেখার নীচে চূন জাতীয় পদার্থ যে হারে জমা পড়ে, সেই হারে দ্রবীভূত হয়ে যায়। (চিত্র নং. 13.1)

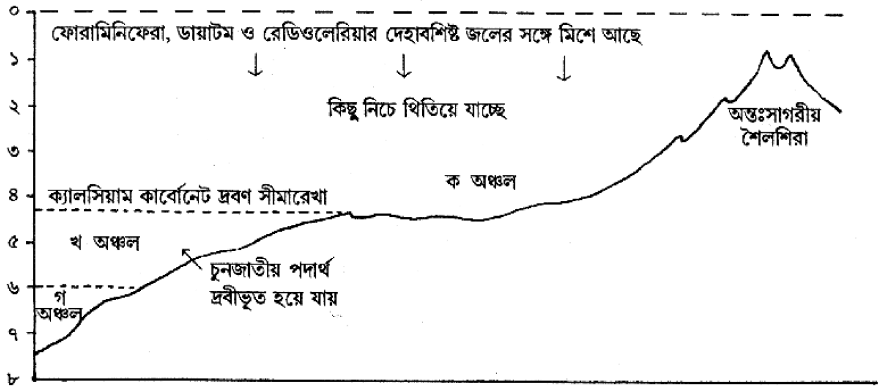

ক অঞ্চল — প্রধানতঃ চুনজাতীয় পদার্থ
খ অঞ্চল — প্রধানতঃ সিলিকা জাতীয় পদার্থ
গ অঞ্চল — লাল কাঁম

(চিত্র 13.1)

(ক) সিলিকা যুক্ত উজ্ (Siliceous Ooze) : ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ সীমারেখার নীচে সিলিকা যুক্ত উজের আধিক্য চোখে পড়ে। সিলিকা সমুদ্রের জলে সহজে দ্রবীভূত হয় না কাজেই যে হারে সিলিকার দ্রবণ হয় তার থেকে অনেক দ্রুত হারে তা জমা হয়। 50^{o} - 65^{o} অক্ষাংশে অপেক্ষাকৃত গভীর অঞ্চলে সিলিকা যুক্ত উজ্ সব থেকে বেশী দেখা যায়। এর থেকে আরও উপরে, বরফের উপস্থিতির ফলে কোন রকম জৈব প্রক্রিয়াই সম্ভব হয় না।

- ডায়াটম উজ্ (Diatom Ooze) : ডায়াটম নামক এক কোষি উদ্ভিদ থেকে এই ধরণের উজ্ গঠিত হয়। আন্টার্কটিকা পরিবেষ্টিত অঞ্চল ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এই ধরণের উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ডায়াটম যেহেতু উদ্ভিদ, বাঁচার জন্য তাদের সূর্যের আলোর সাহায্যে সালোক সংশ্লেষ (photosynthesis) করতে হয়, কাজেই ডায়াটমগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি জন্মায়, কিন্তু তাদের পচন (decomposition যখন হয় তা গভীর সমুদ্রেই হয়। কোন কোন অঞ্চলে সমুদ্রের জলের পরিচলন (convection) প্রক্রিয়ার ফলে যখন নীচের জল উপরে উঠে আসে তখন ডায়াটম উজ্ও জলের উপরের স্তরে উঠে আসতে পারে। সমুদ্র পৃষ্ঠের কাছাকাছি উঠে আসা উজ্ ও সূর্যের আলো একত্রিত হয়ে ভবিষ্যত ডায়াটমগুলির বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- রেডিও লেরিয়ান উজ্ (Radiolarian Ooze) : রেডিওলেরিয়া নামক অ্যামিবা (amoeba) জাতীয় এক কোষী প্রাণী দ্বারা গঠিত হয় বলে এই ধরণের সামুদ্রিক অবক্ষেপকে রেডিওলেরিয়ান উজ্ বলা হয়। রেডিওলেরিয়ার দেহের কাঠামো ও বাইরের খোলস সিলিকা দিয়ে গঠিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলে এই ধরণের উজ্ পাওয়া যায়। (চিত্র নং. 13.1)

13.3.4 লাল কর্দম (red clay)

পেলাজিক অবক্ষেপের মধ্যে লাল কর্দম অন্যতম। সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ও লৌহ অক্সাইড দিয়ে এই লাল কর্দম গঠিত হয়। এক সময় বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে জৈব পদার্থ থেকে নির্গত চুন জাতীয় পদার্থ যা দ্রবীভূত হয়নি, তারই অবশিষ্টাংশ দিয়ে লাল কর্দম গঠিত হয়। কিন্তু মারে (Murrey) প্রমাণ করেন যে অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ও সামুদ্রিক শিলার রাসায়নিক পরিবর্তনই এই কর্দম গঠন করে। লৌহ অক্সাইডের উপস্থিতির জন্যে এই কর্দমের রং লাল হয়। এবং লৌহ অক্সাইডের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কর্দমটি লাল হবে না খয়েরি রঙের হবে। এই কর্দমের মধ্যে 6.70 শতাংশ ক্যালসিয়াম, 2.39 শতাংশ সিলিকা, 5.56 শতাংশ খনিজ পদার্থ ও 85.35 শতাংশ অতি সূক্ষ্ম দানার অজৈব পদার্থ থাকে। লাল কর্দম নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ দিয়ে গঠিত হয়—

(a) বায়ু দ্বারা পরিবাহিত ধুলোর সঙ্গে মিশে থাকা কর্দম খনিজ (clay minerals)।

(b) আগ্নেয় গিরি থেকে নির্গত ছাই (volcanic ash) ও ঝামা (pumice) জাতীয় পদার্থের অবশিষ্টাংশ যা উৎস থেকে অনেক দূরে ভেসে এসেছে।

(c) অন্তঃসাগরীয় অগ্নুৎপাত (submarine volcanism) জনিত পদার্থ।

(d) হিমশৈল (ice berg) দ্বারা পরিবাহিত শিলাখণ্ডের ভগ্নাবশেষ।

(e) অদ্রবণশীল (insoluble) জৈব পদার্থ।

13.3.5 অজৈবিক পদার্থের সঞ্চয় (inorganic precipitate)

সমুদ্রের জলে বিভিন্ন ধরণের খনিজ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং সমুদ্রের জলের উষ্ণতা (temperature), লবণতা (salinity) ইত্যাদির সামান্যতম হেরফের হলেই এরা আর দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে না এবং আলাদা হয়ে জলের তলায় থিতিয়ে যায়। এই ধরণের পদার্থকে অজৈবিক পদার্থের সঞ্চয় বলা হয়ে থাকে। এই

সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে কার্বোনেট, ফসফোরাইট (phosphorites), ইভাপোরাইট (evaporite) এবং ম্যাঙ্গানীজ দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র পিন্ড (manganese nodule) অন্যতম।

● ইভাপোরাইট (evaporite) : এই ধরণের সঞ্চিত পদার্থ অগভীর সমুদ্রে বেশী দেখা যায়। কোনো কারণে যদি সমুদ্রের জলের লবণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তাহলে কার্বোনেট, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম প্রথমেই আলাদা হয়ে যায়। এর পরও যদি লবণতা বাড়তে থাকে তাহলে ক্যালসিয়াম সালফেট বা জিপ্সাম (gypsum) সঞ্চিত হয়। মৃতসাগর (Dead Sea) ও গ্রেট সল্ট লেকে (Great Salt Lake) এই ধরণের ইভাপোরাইট বেশী দেখা যায়।

● ম্যাঙ্গানিজ পিন্ড (Manganese nodule) : সমুদ্র তলদেশে ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ, তামা, কোবাল্ট ও নিকেল দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র পিন্ড (nodule) গুলিকে একত্রিত ভাবে "ম্যাঙ্গানীজ পিন্ড" (manganese nodule) বলা হয়। এই পিন্ড গঠনকারী পদার্থগুলি সাধারণতঃ নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে এসে পড়ে এবং গভীর সমুদ্রে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে পিন্ড গঠন করে। এই পিন্ডগুলি গঠিত হতে এত সময় লাগে যে প্রায়ই এগুলি যথেষ্ট বড় হবার আগেই অন্যান্য সঞ্চিত পদার্থের নীচে চাপা পড়ে যায়।

13.3.6 মহাকাশ থেকে আসা অজাগতিক পদার্থ (Cosmogenous deposits)

সমুদ্র সঞ্চয় কার্যে এই ধরণের পদার্থের ভূমিকা খুব বেশী না হলেও, এদের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করা যায় না। উল্কা পাতের সঙ্গে আসা মহাকাশের ধূলিকণা যখন সমুদ্র তলদেশে সঞ্চিত হয় তাকে অজাগতিক পদার্থ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র নং. 13.2)।

সামুদ্রিক অবক্ষেপণের শ্রেণীবিভাগ

সঞ্চয়ের উৎস / সঞ্চয়ের স্থান	স্থলজ পদার্থ	অজৈবিক পদার্থ	জৈবিক পদার্থ		অজাগতিক পদার্থ
			নেরিটিক বেন্থস্	পেলাজিক প্ল্যাঙ্কটন	
তটের নিকটতম অঞ্চল	গ্র্যাভেল বালি ও কর্দম	চুন জাতীয় কর্দম ইডাপোরাইট	শামুক, চুনাল পদার্থ প্রবাল		
মহীসোপান ও মহীঢাল অঞ্চল	গভীর সমুদ্রের বালি ও কর্দম	গ্লুকোনাইট পাইরাইট ইত্যাদি	প্রবাল জনিত কর্দম	গভীর সমুদ্রের উজ্ — চুনজাতীয় ও সিলিকাজাতীয় লাল কর্দম	
গভীর সমুদ্রতল		ম্যাঙ্গানীজ পিন্ড			

(চিত্র 13.2)

13.4 সামুদ্রিক অবক্ষেপের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ

13.4.1 স্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

সামুদ্রিক অবক্ষেপকে স্থান অনুযায়ী দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(1) মহীসোপান ও মহীঢালের সঞ্চিত পদার্থ (deposits of continental shelf and slope), (2) গভীর সমুদ্র তলে সঞ্চিত পদার্থ (deposits of abyssal plains)।

13.4.4.4.1 মহীসোপান ও মহীঢালের সঞ্চিত পদার্থ

এই অঞ্চলের সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে 65 শতাংশ পদার্থ কোয়ার্টজ দ্বারা গঠিত। সেই সঞ্চিত পদার্থকে তিন ভাগে পৃথক করা যেতে পারে।

- উপকূলের নিকটতম অংশের সঞ্চয় (Littoral Deposits) : এই ধরণের সঞ্চয়কার্য সাধারণতঃ জোয়ার ও ভাঁটার সীমা রেখার মধ্যে (between high and lowtide levels) দেখা যায়। মারে ও রেনার্ডের (Renard) মতে অগ্রতটে (foreshore) সঞ্চিত পদার্থকেই এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এই সঞ্চিত পদার্থ প্রধানতঃ বোল্ডার, গ্র্যাভেল, বালি ইত্যাদি গিয়ে গঠিত হয়। পরিবেষ্টিত উপসাগর (enclosed bays) অঞ্চলে শুধুমাত্র কর্দম ও পলি সঞ্চিত হয়। একাধিক ধরণের প্রাণী ও উদ্ভিদ এই অঞ্চলে দেখা যায়। ম্যানগ্রোভ (mangrove), প্রবাল, কম্বোজ (mollusca) ও খোলাযুক্ত প্রাণী (crusteceams) এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ এখানকার সঞ্চিত পদার্থ গ্রথন (texture) অনুযায়ী সাজানো থাকে।
- অগভীর সমুদ্রের সঞ্চয় (shallow water deposits) : তট থেকে 100 ফ্যাদম গভীরতা পর্যন্ত এই ধরণের সঞ্চিত পদার্থ চোখে পড়ে। সৈকত অঞ্চল থেকে সঞ্চিত পদার্থ উজানতটীয় স্রোত (rip current) ও ঢেউয়ের দ্বারা অপসারিত হয়ে এই অঞ্চলে জমা পড়ে। উপকূলের নিকটতম অঞ্চলে সঞ্চিত পদার্থের (littoral deposits) সঙ্গে এই অঞ্চলের সঞ্চিত পদার্থের প্রচুর মিল পাওয়া যায়। 50 ফ্যাদম সীমারেখার কাছাকাছি নেরিটিক (Neritic) পদার্থ চোখে পড়ে। বিভিন্ন এক কোষি ও দুই কোষি প্রাণী ও স্থলজ কর্দমের (terrigenous mud) আধিক্য এই অঞ্চলে চোখে পড়ে। সামুদ্রিক দ্বীপগুলির আশে পাশে এই ধরণের সঞ্চিত পদার্থ বেশী পাওয়া যায়। অগভীর সমুদ্রে স্থলজ ও অগ্নুতপাতজনিত পদার্থ দুই-ই জমা হতে পারে।
- মহীঢালের কাছাকাছি সঞ্চিত পদার্থকে গভীর সমুদ্র অবক্ষেপণের (deep sea deposits) মধ্যে ধরা যায়। সমুদ্রের এই অংশে বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম দানা যুক্ত কর্দম পাওয়া যায়। নীল, লাল, সবুজ ইত্যাদি নানা রঙের কর্দম 200-1500 ফ্যাদামের মধ্যে দেখা যায়। কর্দমের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ধাতব পদার্থ মিশে থাকে বলে এদের এমন বিবিধ রং দেখা যায়। কর্দম ছাড়া এই অংশে অল্প বিস্তর প্রবালও পাওয়া যায়। (চিত্র নং 13.3)।

সমুদ্রতলের বিভিন্ন অংশে সামুদ্রিক অবক্ষেপণ

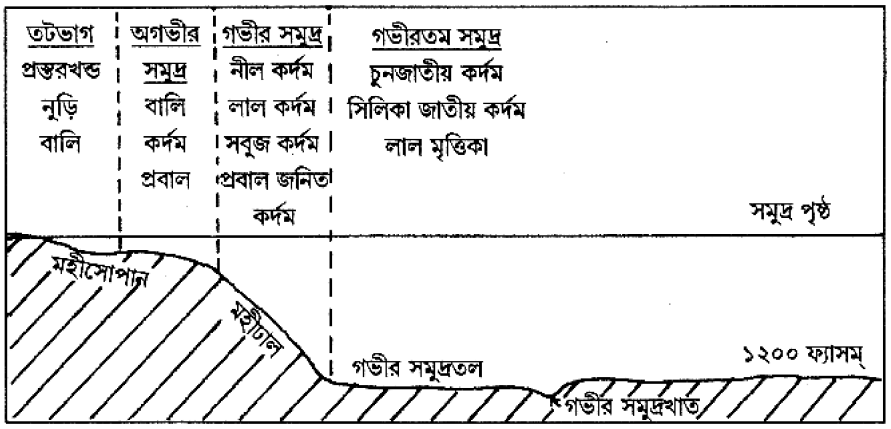

(চিত্র 13.3)

13.4.1.2 গভীর সমুদ্রতলে সঞ্চিত পদার্থ

গভীর সমুদ্র তলে সামুদ্রিক অবক্ষেপের চেহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 1200 ফ্যাদমের নীচে এই ধরণের সামুদ্রিক সঞ্চয় চোখে পড়ে। জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত কর্দম এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। অজৈব পদার্থের মধ্যে লাল কর্দম (red clay) অন্যতম। এই অঞ্চলে ভাসমান প্রাণীর দেহাবশিষ্ট দিয়ে গঠিত এই কর্দমকে উজ্ (Ooze) বলে। উজ্ সাধারণতঃ চুন জাতীয় বা সিলিকা পদার্থ দ্বারা গঠিত হয়। উজ্ গঠনকারী প্রাণী বা উদ্ভিদের নাম অনুযায়ী এই কর্দমের নাম করণ করা হয় যেমন টেরোপড্, গ্লবিজেরিনা ইত্যাদি। গভীর সমুদ্র তলের জৈবিক ও অজৈবিক সঞ্চয়কে "পেলাজিক" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উজ্ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগের অংশে করা হয়েছে (চিত্র নং. 13.3)।

13.4.2 সঞ্চিত পদার্থের উৎস অনুযায়ী অপর একটি শ্রেণী বিভাগের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী সামুদ্রিক অবক্ষেপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- উপকূলের নিকটতম অংশের সঞ্চয় (littoral) যার উৎস ভূখণ্ড।
  তটীয় ও মহীসোপান অঞ্চলের সঞ্চয় এর অন্তর্ভুক্ত।
- হেমিপেলাজিক (Hemipelagic) সঞ্চিত পদার্থ যার উৎস আংশিক ভাবে স্থল ও আংশিক ভাবে সমুদ্র। সবুজ কর্দম, অগ্নুতপাত জনিত কর্দম ও প্রবাল থেকে গঠিত কর্দম এর অন্তর্ভুক্ত।
- ইউপেলাজিক (Eupelagic) সঞ্চিত পদার্থের উৎস সামুদ্রিক ও মহাকাশ থেকে আসা অজাগতিক পদার্থ। লাল কর্দম রেডিওলেরিয়ান, ডায়াটম, গ্লবিজেরিনা ও টেরোপড্ উজ্ এই দলভুক্ত।

রিজওয়ে (Ridgway) (1922) সঞ্চিত পলির রং হিসেবে শ্রেণী বিভাগ করবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণী বিভাগ করবার সময় সঞ্চিত পদার্থের আর্দ্রতা (moisture), পলি গঠনকারী দানার গ্রথন (texture) ও রং, জারণ (oxidation) প্রক্রিয়ার প্রভাব এবং জৈবিক পদার্থের পচনের (decomposition) মাত্রা এই সবকটি কারণকে তিনি বিচার করেছিলেন।

13.5 সমুদ্রে সঞ্চিত পদার্থের পরিবহন ও সঞ্চয়কার্য

13.5.1 সামুদ্রিক অবক্ষেপণে সঞ্চিত পদার্থের পরিবহন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। টয়েনহোফেল (Twenhofel) (1932) বিভিন্ন পরিবহনের মাধ্যমগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। স্থলজ পদার্থকে সমুদ্র অবধি বহন করে আমার কাছে নদী, হিমবাহ, বায়ু ও সমুদ্র তরঙ্গ প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বৃষ্টির জলের স্থলগামী প্রবাহ (overland flow) স্থলজ উদ্ভিদের সমুদ্রে ভেসে যাওয়া ও আগ্নেয়গিরি জনিত পদার্থের বায়ু পরিবাহিত হলে সমুদ্রে এসে পড়াও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমুদ্রের জলের মধ্যে পরিচলন (convection) ও আবর্তন (turbulance) প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন স্রোতের (current) প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। এই বিভিন্ন পরিবহন প্রক্রিয়া সঞ্চিত পদার্থের দানার আকৃতি (shape) ও মাপ (size) দুটিকেই প্রভাবিত করে।

13.5.2 বিভিন্ন উৎস থেকে পরিবাহিত পদার্থ সমুদ্রে এসে জমা পড়ে। কিন্তু এই সঞ্চয় কার্যের উপর সমুদ্রের জলের চরিত্রের প্রভাব অনেকখানি। জলের উষ্ণতা (জৈবিক পদার্থের উপস্থিতি এর উপর নির্ভরশীল), জলের গভীরতা অনুযায়ী উপস্থিতিক চাপের (hydrostatic pressure) তারতম্য এবং জলের লবণতা (salinity)-এর মধ্যে অন্যতম। সঞ্চিত পদার্থের রাসায়নিক গঠন, বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ, জলের উষ্ণতা ও লবণতার উপর সরাসরি নির্ভর করে।

সামুদ্রিক পলি সঞ্চয়ের হার (rate of sedimentation) দুভাবে মাপা যেতে পারে—(1) স্তরক্রম

পদ্ধতি (stratigraphic method) অনুযায়ী এবং (2) সঞ্চিত পদার্থের সরবরাহ (sediment supply) পদ্ধতি অনুযায়ী।

প্রথম পদ্ধতিতে সঞ্চিত পলির একটি অংশের স্তরক্রম (stratigraphy) গুলি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এক একটি স্তরের সঞ্চয়কাল এবং সমগ্র অংশটিতে সঞ্চিত পলির গভীরতার (depth of sedimentation) সম্পর্ক অনুযায়ী পলি সঞ্চয়ের হারটি অনুমান করা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা ধরে নিয়ে, সেই সময়ে কতটা পলি সঞ্চিত হয়েছে তা মাপা হয়।

শুচর্টের (Schuchert) গণনা অনুযায়ী অগভীর জলে বেলেপাথর (sandstone) সঞ্চিত হবার হার প্রতি 1000 বছরে 68 সেন্টিমিটার, কর্দমশিলা (shale) সঞ্চিত হবার হার প্রতি 1000 বছরে 34 সেন্টিমিটার এবং চুনাপাথর (limestone) প্রতি 1000 বছরে মাত্র 14 সেন্টিমিটার সঞ্চিত হয়।

শর্ট (Schott) (1937) পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে গভীর সমুদ্রের থেকে অগভীর সমুদ্রে সঞ্চয়ের হার অনেক বেশী। বিভিন্ন উজের (Ooze) সঞ্চয়ের হার মেপে দেখা গেছে যে কোনোটিরই সঞ্চয়ের হার প্রতি 1000 বছরে 2 সেন্টিমিটারের বেশী নয়। তার মধ্যে গ্লবিজেরিনা উজের সঞ্চয়ের হার মাত্র 1.2 সেন্টিমিটার / 1000 বছর। তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে "পেলাজিক" পদার্থের সঞ্চয়ের হার সব সমুদ্রে এক নয়।

13.6 সঞ্চিত পদার্থের বণ্টন

13.6.4 গভীরতা অনুযায়ী সঞ্চিত পদার্থের বণ্টন

বহু ভূতাত্ত্বিকগণ সঞ্চিত পদার্থের স্তরক্রম (stratigraphy) দেখে সেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গভীরতা অনুযায়ী সঞ্চিত পদার্থের চরিত্র ভেদ ঘটে। পেলাজিক পদার্থের মধ্যে নীল কর্দম সব থেকে নীচে দেখা যায় এবং উপরের দিকে লালচে খয়েরি রঙের কর্দম থাকে। বৈজ্ঞানকিদের মতে উপরের স্তরে, ফেরিক অক্সাইডের (ferric oxides) আধিক্য ও নীচের স্তরে সালফাইডের প্রাধান্য এই রঙের তারতম্যের জন্য দায়ী।

জৈবিক পদার্থের চরিত্র হিসাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, টেরোপড্ উজ্ পাওয়া যায় সব থেকে উপরে, তার নীচে ক্রমান্বয়ে থাকে গ্লবিজেরিনা, রেডিওলেরিয়ান ও ডায়াটম উজ্। সব থেকে নীচে পাওয়া যায় লাল কর্দম। গভীরতা অনুযায়ী পেলাজিক উজের এই বণ্টন নির্ভর করে চুন জাতীয় ও সিলিকা জাতীয় জৈবিক পদার্থের দ্রবণীয়তার (solubility) তারতম্যের উপর। চুন জাতীয় পদার্থ সহজেই দ্রবীভূত হয়ে যায় বলে নীচের স্তরে সিলিকা জাতীয় পদার্থের প্রাধান্য বেশী।

13.6.2 পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরে সঞ্চিত পদার্থের বণ্টন

স্থলজ পদার্থ (terrigenous material) সর্বত্রই উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে চোখে পড়ে। তবে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপ সমূহের কাছে ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে উপকূল অঞ্চলে স্থলজ পদার্থের বিস্তৃতি লক্ষ্যনীয়। ভারত মহাসাগরে পশ্চিম দিকে গ্লবিজেরিনার প্রাধান্য বেশী হলেও, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ডায়াটম ও লাল কর্দম প্রাধান্য লাভ করেছে। আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কয়েকটি বিশেষ স্থানে গ্লবিজেরিনার মধ্যে মিশে থাকা লাল কর্দম পাওয়া যায়। দক্ষিণ অংশে ডায়াটম উজের বিস্তৃতি উল্লেখযোগ্য। পেলাজিক পদার্থের বণ্টনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রশান্ত মহাসাগরের বণ্টন অত্যন্ত জটিল। দক্ষিণ ও উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের ডায়াটম সমৃদ্ধ স্তর পাওয়া যায়। রেডিওলেরিয়ান উজ্ প্রধানত 15° দক্ষিণ ও উত্তর

অক্ষাংশের মধ্যে বেশী দেখা যায়। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের লাল কর্দমের বিস্তৃতি বেশী হলেও, দক্ষিণ প্রান্তে গ্লবিজেরিনাই বেশী (চিত্র নং 13.4)।

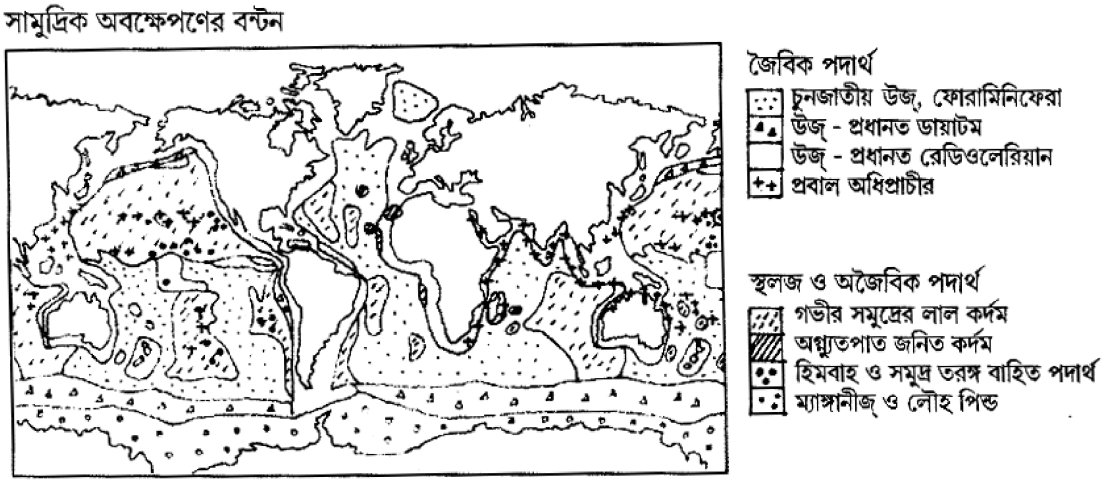

(চিত্র 13.4)

13.7 সামুদ্রিক সম্পদ

13.7.1 সামুদ্রিক সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

সামুদ্রিক সম্পদকে নিম্নোক্ত চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

13.7.1.1 স্বাদু জল সম্পদ (pure water resource)

পৃথিবীর সমগ্র জল সম্পদের (water resource) 97 শতাংশ মহাসমুদ্রগুলিতে বর্তমান। কিন্তু এই জল না মানুষের গ্রহণযোগ্য, না কৃষি কার্যের পক্ষে উপকারী। বর্তমান আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই লবণাক্ত জলকে স্বাদু জলে পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়েছে।

13.7.1.2 সামুদ্রিক খনিজ সম্পদ (marine mineral resources)

সামুদ্রিক খনিজ সম্পদ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে ; বা মহীসোপান ও মহীঢালের উপর সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে মিশে থাকতে পারে। কোন কোন অঞ্চলে সমুদ্র তলদেশে মাটির নীচেও খনিজ সম্পদ পাওয়া যেতে পারে।

(a) জলে দ্রবীভূত খনিজ সম্পদ।

সমুদ্রের জলে অন্ততঃ 62 ধরণের রাসায়নিক যৌগিক (chemical compound) পদার্থ পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক পদার্থই অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন। সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ব্রোমিন ও লবণ ছাড়া বাকি দ্রবীভূত পদার্থ এত অল্প মাত্রায় থাকে যে সেগুলি সহজলভ্য নয়। এইগুলিকে আহরণ করতে গেলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তা খুব একটা লাভজনক হবে না।

(b) মহীসোপান ও মহীঢালের খনিজ সম্পদ ঃ

এই ধরণের খনিজ সম্পদ বালির ও কর্দমের সঙ্গে মিশে থাকে। এই অঞ্চল পাওয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের তলিকা নীচে দেওয়া হল ঃ—

● জিরকন, মোনাজাইট ও বিউটাইল : ভারতের পশ্চিম উপকূল, ব্রাজিল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও আমেরিকার উপকূলে সর্বাধিক পরিমাণে এই খনিজগুলি পাওয়া যায়। পৃথিবীর ৯০ শতাংশ মোনাজাইট সম্পদ কেবল মাত্র কেরালা উপকূলেই পাওয়া যায়।

● ম্যাগনেটাইট : যে অঞ্চলে মহীসোপানের উপর আগ্নেয় শিলা পাওয়া যায়, সেইখানে ম্যাগনেটাইট থাকবার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর আমেরিকা এবং জাপান ও এশিয়ার মধ্যবর্তী মহীসোপান অংশে ম্যাগনেটাইট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

● সোনার প্রকীর্ণক সঞ্চয় (Gold placer deposit) : প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব দিকে অ্যালাস্কার সংলগ্ন মহীসোপানে সর্বাধিক সোনার প্রকীর্ণক সঞ্চয় পাওয়া যায়। এছাড়া চিলি, অরেগন ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে পলির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়ও পাওয়া যায়।

● হীরা ও প্ল্যাটিনাম : অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে নদী দ্বারা পরিবাহিত হয়ে এসে এই খনিজগুলি মহীসোপানে সঞ্চিত হয়।

মহীঢালের সঞ্চিত কর্দমের মধ্যে তামা, দস্তা, শিষা ইত্যাদি পাওয়া যায়। বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে বালির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট মিশ্রিত আছে। এছাড়া সালফার ও ফসফোরাইট মেক্সিকোর উপকূলে এবং ভূমধ্যসাগরের মহীসোপানে সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায়।

আরও গভীর সমুদ্রে ধাতব খনিজ (metallic mineral) মিশ্রিত পলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র পিন্ড (nodule) সব থেকে প্রয়োজনীয়। ম্যাঙ্গানীজের সঙ্গে লৌহ, তামা, নিকেল ও কোবাল্টও পাওয়া যায়।

(c) মাটির নীচে পাওয়া খনিজ সম্পদের মধ্যে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। প্রতি তটীয় (offshore) অঞ্চলে তৈল কূপের (oil well) উদাহরণ মেক্সিকো উপসাগর, পারস্য উপসাগর, উত্তর সাগর, ইন্দোনেশিয়ার সংলগ্ন মহীসোপান থেকে পাওয়া যায়। ফিলিপাইন্সের নিকট প্রতি তটীয় অঞ্চলে নতুন তৈল কূপ খননের সম্ভাবনা রয়েছে।

13.7.1.3 সামুদ্রিক শক্তি সম্পদ

সামুদ্রিক শক্তি সম্পদের মধ্যে সাধারণতঃ জোয়ার ভাঁটা, সমুদ্র স্রোত ও তরঙ্গ শক্তিকে ধরা হয়ে থাকে তবে ইদানীংকালে সমুদ্র জলের উষ্ণতার তারতম্যকেও শক্তি সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে OTEC বলা হয় অর্থাৎ Ocean Thermal Energy Conversion। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যুত উৎপাদন করা হয়।

13.7.1.4 সামুদ্রিক প্রাণী সম্পদ

বিভিন্ন ধরণের মাছ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও একাধিক এক কোষি ও দু কোষি প্রাণী ও উদ্ভিদ সমুদ্রের প্রাণী সম্পদের অন্তর্গত। তবে সমুদ্রের সব গভীরতায় সব ধরণের প্রাণী সম্পদ পাওয়া যায় না। সামুদ্রিক প্রাণী সম্পদের কিছু নিতান্তই খাদ্য সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, তিমি, হাঙ্গার জাতীয় কিছু প্রাণীকে বাণিজ্যক কারণেও ব্যবহার করা হয়।

13.7.2 সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের অসুবিধা

পৃথিবীর সমুদ্রে সম্পদের কম্‌তি নেই ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই সম্পদ আহরণ অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

- খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মহীসোপান বা মহীঢালের থেকে খনিজ আহরণ করা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ এবং এর জন্য সামুদ্রিক অভিযানের প্রয়োজন।

- বিভিন্ন খনিজ সম্পদ এমন ভাবে দ্রবীভূত হয়ে থাকে বা সঞ্চিত পদর্থের সঙ্গে মিশে থাকে যে তার থেকে সম্পদ আহরণ অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়।

- সমুদ্র জলের দূষণের জন্যে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে এবং জলের গুণগত মানও সর্বত্র ভাল নেই। সমুদ্রের জলে তেলের মিশ্রণ এবং শহর ও কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জিত পদার্থের মিশ্রণ সমুদ্রের জলের দূষণের দুটি অন্যতম কারণ।

13.8 সারাংশ

সামুদ্রিক অবক্ষেপণ সম্পর্কিত এই আলোচনা করতে গিয়ে আপনারা দেখেছেন যে এই সঞ্চিত পদার্থের গুরুত্ব বহুমুখী। শুধু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সঞ্চিত পদার্থের উৎস, বহন প্রক্রিয়া, উপকূল থেকে দূরত্ব, সমুদ্রতলের গভীরতা ও রাসায়নিক গঠনের তারতম্যের প্রভাব সামুদ্রিক অবক্ষেপণের উপর পড়ে। সঞ্চয় প্রক্রিয়ার আলোচনার সময়ে পলি সঞ্চয়ের হার মাপবার পদ্ধতিগুলির সামান্য ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

13.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতি প্রশ্নের মান—1)

1. যান্ত্রিক আবহবিকার দ্বারা প্রভাবিত স্থলজ পদার্থে প্রাথমিক স্তরের খনিজ (primary minerals) গুলির মধ্যে যে কোন দুটি খনিজের নাম লিখুন।
2. সঠিক উত্তরটি বেছে নিন ও শূন্য স্থানে লিখুন ঃ
   মোটা দানার পদার্থ ভূখণ্ডের —— সঞ্চিত হয়। (কাছে / দূরে)
3. গ্র্যাভেলের দানাগুলির ব্যাস কত হয় ?
4. বালির মধ্যে কোন খনিজের প্রাধান্য সব থেকে বেশী ?

5. পলির দানার মাপ কত হয় ?

6. নদী সাধারণতঃ পলি ও কর্দম জাতীয় পদার্থকে কী ভাবে পরিবহন করে ?

7. পলির রঙের ভিত্তিতে মারে (Murry) কত ভাগে কর্দমকে ভাগ করেছেন ?

8. কোন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের (chemical compound) উপস্থিতির জন্যে লাল কর্দমের রং লাল ?

9. উপকূলের কাছে যে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণী সঞ্চয়কার্যে অংশগ্রহণ করে তাদের কী নামে চিহ্নিত করা হয় ?

10. সামুদ্রিক জৈব পদার্থকে কোন দুটি মূল ভাগে ভাগ করা হয় ?

11. চুন জাতীয় উজের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুটি উজের নাম করুন।

12. ডায়াটস্ উজ্ কী ধরণের উজ্ ?

13. "ম্যাঙ্গানিজ পিন্ড" (Manganese nodule) সমুদ্র তলদেশে সঞ্চিত অজৈবিক পদার্থের একটি উদাহরণ—উক্তিটি ঠিক না ভূল ?

14. গভীর সমুদ্র তলের অবক্ষেপণ কত গভীরতায় দেখা যায় ?

15. যে সঞ্চিত পদার্থের উৎস আংশিক ভাবে স্থল ও আংশিক ভাবে সমুদ্র তাকে কী বলা হয় ?

সংজ্ঞা মূলক প্রশ্ন (প্রতি প্রশ্নের মান—2)

1. পলির গ্রথন (texture) অনুযায়ী সাজানো বলতে কী বোঝায় ?

2. কালো কর্দম কী ধরণের পরিবেশে গঠিত হয় ?

3. "বেনথস্" উদ্ভিদ ও প্রাণী বলতে কী বোঝায় ;

4. "নেরিটিক" জৈবিক পদার্থ কাকে বলে ?

5. "পেলাজিক" জৈবিক পদার্থ কাকে বলে ?

6. ম্যাঙ্গানিজ পিন্ড (Manganese Nodule) কাকে বলে ?

7. ইভাপোরাইট (evaporite) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

8. উপকূলের নিকটতম অংশে (Littoral) সঞ্চয় কোথায় দেখা যায় ?

9. হেমিপেলাজিক (Hemipelagic) সঞ্চিত পদার্থ কাকে বলে ?

10. ইউপেলাজিক (Eupelagic) সঞ্চিত পদার্থ কাকে বলে ?

11. শুচর্টের (Schuchert) মত অনুযায়ী বেলেপাথর, কর্দমশিলা ও চূনাপাথরের সঞ্চয়ের হার কত ?

12. OTEC বলতে কী বোঝায় ?

13. সমুদ্রের জলের দূষণের দুটি প্রধান কারণ কী ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (প্রতি প্রশ্নের মান—4)

1. স্থলজ পদার্থের মধ্যে উপস্থিত প্রাথমিক স্তরের খনিজ (primary minerals) ও অন্তিম অবস্থায় সৃষ্ট খনিজ (ultimate products) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
2. গ্র্যাভেল বলতে কী বোঝায় ?
3. সামুদ্রিক সঞ্চিত পদার্থ হিসেবে বালির গুরুত্ব আলোচনা করুন।
4. সামুদ্রিক পলি ও কর্দম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
5. নীল কর্দমের চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।
6. লাল ও সবুজ কর্দমের তুলনামূলক আলোচনা করুন।
7. অগ্নুৎপাত জনিত পদার্থের সঞ্চয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
8. জৈবিক পদার্থের সঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
9. চুন জাতীয় উজ্ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
10. সিলিকা যুক্ত উজ্ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
11. লাল কর্দমের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।
12. ইভাপোরাইট ও ম্যাঙ্গানীজ পিন্ডর উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
13. মহীসোপান ও মহীঢালের সঞ্চিত পদার্থের চরিত্র সম্পর্কে অলোচনা করুন।
14. সঞ্চয় কার্যের হার নির্ধারিত করবার পদ্ধতিগুলি কী কী ?
15. পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে সঞ্চিত পদার্থের বণ্টন সম্পর্কে টীকা লিখুন।
16. মহীসোপান ও মহীঢালের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন (প্রতি প্রশ্নের মান—10)

1. সমুদ্রে সঞ্চিত স্থলজ পদার্থ (terrigenous material) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
2. সমুদ্রে সঞ্চিত জৈবিক পদার্থ (Biogenous material) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
3. সামুদ্রিক অবক্ষেপনকে স্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
4. সামুদ্রিক সম্পদের শ্রেণীবিভাগ করে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

13.10 উত্তরমালা

1. কোয়ার্টজ, ফেলস্পার।
2. কাছে।

3. 256000-2000 মাইক্রন।

4. কোয়ার্টজ।

5. 0.0039 - 0.065 মিলিমিটার।

6. প্রলম্ব ভার (suspended load) হিসেবে।

7. চার ভাগে—নীল, লাল, সবুজ ও কালো।

8. ফেরিক অক্সাইড (ferric oxide)

9. বেনথস (benthos)।

10. নেরিটিক (Neritic) ও পেলাজিক (pelagic)।

11. গ্লবিজেরিনা, টেরোপড্।

12. সিলিকা যুক্ত উজ্।

13. ঠিক।

14. 1200 ফ্যাদমের নীচে।

15. হেমিপেলাজিক (Hemipelagic) পদার্থ।

সংজ্ঞামূলক ঃ

1. 13.3.1 অংশে তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন।

2. 13.3.1.3 অংশে দেখুন।

3. 13.3.3 অংশে দেখুন।

4. 13.3.3 অংশে দেখুন।

5. 13.3.3 অংশে দেখুন।

6. 13.3.5 অংশে তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন।

7. 13.3.5 অংশে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন।

8. 13.4.1.1 অংশে দেখুন।

9. 13.4.2 অংশে দেখুন।

10. 13.4.2 অংশে দেখুন।

11. 13.5.2 অংশে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন।

12. 13.7.1.3 অংশে দেখুন।

13. 13.7.2 অংশে দেখুন।

ব্যাখ্যামূলক

1. 13.3.1 অংশে দেখুন।
2. 13.3.1.1 অংশে দেখুন।
3. 13.3.1.2 অংশে দেখুন।
4. 13.3.1.3 অংশে দেখুন।
5. 3.3.1.3 অংশে ৩য় পরিচ্ছেদ দেখুন।
6. 13.3.1.3 অংশে ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ দেখুন।
7. 13.3.2 অংশে দেখুন।
8. 13.3.3 অংশে দেখুন।
9. 13.3.3.1 অংশে দেখুন।
10. 13.3.3.1 অংশে দেখুন।
11. 13.3.4 অংশে দেখুন।
12. 13.3.5 অংশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন।
13. 13.4.1.1 অংশে দেখুন।
14. 13.5.2 অংশে দেখুন।
15. 13.6.2 অংশে দেখুন।
16. 13.7.1.2 অংশে দেখুন।

রচনাধর্মী

1. 13.3.1 অংশে দেখুন।
2. 13.3.3 অংশে দেখুন।
3. 13.4.1 অংশে দেখুন।
4. 13.7.1 অংশে দেখুন।

Notes